মাওলানা ইউনুস পালনপুরী

# মুক্তার চেয়ে দামি



টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

# মুক্তার চেয়ে দামী

(নবম ও দশম খণ্ড)

# মুক্তার চেয়ে দামী-৫

(৯ম ও ১০ম খণ্ড)

মূল

**মাওলানা ইউনুস পালনপুরী**

ইবনে মাওলানা উমর পালনপুরী রহ.
যিম্মাদার : মুম্বাই মারকায, ভারত

অনুবাদ

**আবদুল্লাহ আল ফারুক**

উসতায : মাদারাসাতুল হুদা, বাসাবো, ঢাকা

**আকিক পাবলিকেশন্স ! এদারায়ে কুরআন**

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৩৬৫, ০১৩২৪২৫৪৬৪৮

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৪ ঈ., চতুর্থ প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৩ ঈ.

**মুক্তার চেয়ে দামী-৫**

(৯ম ও ১০ম খণ্ড)

**স্বত্ব : প্রকাশক**

প্রকাশক : মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

আকিক পাবলিকেশন্স

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফোন : ৪৭১১৩৩৬৫, ০১৩২৪২৫৪৬৪৮

E-mail : akikpublication@gmail.com

পরিবেশক

কথাপ্রকাশ, ৩৭/১ বাংলাবাজার, পি. কে. রায় রোড, ঢাকা-১১০০

ফোন : ২২৩৩৫২০৭৩, ০১৭০৬৮৯৩২১০, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬

কলকাতা শাখা

কথাপ্রকাশ, বিদ্যাসাগর টাওয়ার, দোকান নং এ-১৪ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)

১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

ফোন : ০৩৩২২৪১০৪০০ (+৯১৩৩২২৪১০৪০০)

মুদ্রণ : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা- ১১০০

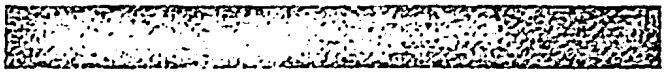
ফোন : ৫৭৩৯৭০৮১, ০১৭২৬ ৪৬২৫৩৩

প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার

**মূল্য : ৬০০/= (ছয়শত টাকা মাত্র)**

ISBN : 978-984-93075-6-3

## প্রকাশকের কথা



সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার যিনি দিয়েছেন বাকশক্তি ও কলম দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের যোগ্যতা। দরূদ ও সালাম সেই মহান রাসূলের সমীপে যিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী এবং যাঁকে দান করা হয়েছে সর্বমর্মী বচন।

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামী সৃজনশীল প্রকাশনার জগতে **"আকিক পাবলিকেশন্স"** একটি অনন্য নাম। ইসলামের দাওয়াত ও বাণী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী বই-পুস্তক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প-উপন্যাস ও জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাওলানা ইউনুস পালনপুরী'র ইসলামী জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার "বিখরে মোতী" গ্রন্থের অনুবাদ গ্রন্থ **"মুক্তার চেয়ে দামী"** গ্রন্থটি'র ৯ম ও ১০ম খণ্ড একত্রে প্রকাশ হচ্ছে। লেখক কুরআন-হাদীস, নবী-সাহাবী এবং বুযুর্গানেদীনের অমূল্যবাণী ও তাঁদের নন্দিত জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মণি-মুক্তা দ্বারা গ্রন্থটিকে সুসজ্জিত করে তুলেছেন। ইসলামী মননশীল পাঠকদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষণীয় অনেক উপাদান। যা আহরণ করে ইহকাল ও পরকালের জীবন সফল ও স্বার্থক করতে সহায়ক হবে। ইতঃপূর্বে লেখকের ১ম থেকে ৮ম খণ্ড পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। আশা করি এই খণ্ডটিও পাঠক মহলকে উপকৃত করবে।

পরিশেষে দয়াময় আল্লাহর কাছে মিনতি জানাই, তিনি যেন গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং লেখক, প্রকাশক ও একাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন এবং পরকালে নাজাতের ফয়সালা করেন। আমীন॥ —**প্রকাশক**

# অভিমত

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর বর্ষিত হোক সর্বোত্তম দরূদ।

আলহামদুলিল্লাহ! রচনার ধারাবাহিকতায় 'বিখরে মোতী'-এর নবম খণ্ড এখন আপনাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। পূর্বের খণ্ড গুলোতে আলোচনা ছিলো ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত। সেগুলোর কোনোটাই নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্যের ওপর ছিলো না। আলহামদুলিল্লাহ! এই নবম খণ্ডের আদ্যোপান্ত শুধুমাত্র একটি বিষয় কেন্দ্র করেই সংকলিত হয়েছে। তা হলো, কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব সম্পর্কে যেসকল আয়াত রয়েছে সেগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে যূথবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাখ্যাগুলোর পুরোটাই চয়ন করা হয়েছে তাফসীরে ইবনে কাসীর থেকে।

দিল্লির নিযামুদ্দীন মারকাযে আজ ১৫ শা'বান কাজটি পূর্ণতা পেলো। মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি– হে আল্লাহ! আপনি এ রচনাটিকে কবুল করুন। এটির উপকারিতা ও কল্যাণ উম্মাহর সর্বত্র ছড়িয়ে দিন। আমীন॥

আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রার্থী
**মুহাম্মদ ইউনুস পালনপুরী**
১৫ শা'বান, ১৪২৩ হিজরী
মারকাযে নিযামুদ্দীন, দিল্লি

# সূ চি

## নবম খণ্ড


সূরা বাকারার ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২১
সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২১
সূরা বাকারার ৩১-৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৪
সূরা নামলের ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৪
সূরা নামলের ৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৬
সূরা রূমের ২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৩১
সূরা রূমের ২২-২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৩২
সূরা রূমের ২৪-২৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৩৩
সূরা রূমের ২৬-২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৩৫
সূরা রূমের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৩৬
সূরা রূমের ৪৮-৫১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৩৬
সূরা রূমের ৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৩৮
সুরা লুকমানের ১০-১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা..... ৩৯
সুরা লুকমানের ২০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৪০
সূরা লুকমানের ২৫-২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৪১
সূরা লুকমানের ২৭-২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৪১
সূরা লুকমানের ২৯-৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৪৪
সূরা লুকমানের ৩১-৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৪৫
সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৪৬
সূরা আলিফ লাম মিম সেজদার ৪-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৪৯
সূরা আলিফ লাম মিম সেজদার ৭-৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৫১
সূরা আলিফ লাম মিম সেজদার ১০-১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৫২
সূরা আলিফ লাম মিম সেজদার ২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৫৩
সূরা আনকাবুতের ১৯-২০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৫৫
সূরা আনকাবুতের ৪১-৪৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৫৭

সূরা আনকাবুতের ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৫৮
সূরা আনকাবুতের ৫২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৫৮
সূরা আনকাবুতের ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৬১
সূরা আনকাবুতের ৬১-৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৬২
সূরা রূমের ৮-৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৬৩
সূরা রূমের ১৭-১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৬৫
সূরা রূমের ৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৬৬
সূরা রূমের ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৬৭
সূরা সাবার ১-২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৬৮
সূরা সাবার ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৬৯
সূরা সাবার ২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৭০
সূরা ফাতিরের ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৭০
সূরা ফাতিরের ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৭১
সূরা ফাতিরের ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৭১
সূরা ফাতিরের ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৭৩
সূরা ফাতিরের ১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৭৪
সূরা ফাতিরের ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৭৫
সূরা ফাতিরের ২৭-২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৭৬
সূরা ফাতিরের ৩৮-৩৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৭৮
সূরা ফাতিরের ৪১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৭৮
সূরা ফাতিরের ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৭৯
সূরা ইয়াসীনের ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৮০
সূরা ইয়াসীনের ৩৩-৩৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৮০
সূরা ইয়াসীনের ৩৭-৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৮২
সূরা ইয়াসীনের ৪১-৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৮৬
সূরা ইয়াসীনের ৭১-৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৮৭
সূরা ইয়াসীনের ৭৪-৭৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৮৮
সূরা ইয়াসীনের ৭৭-৮০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৮৯
সূরা ইয়াসীনের ৮১-৮৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৯১
সূরা সফফাতের ৫-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৯২
সূরা যুমারের ৫-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৯৩
সূরা যুমারের ২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৯৫
সূরা যুমারের ৩৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৯৬
সূরা যুমারের ৪২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৯৭
সূরা যুমারের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৯৮
সূরা যুমারের ৬২-৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৯৯

সূরা যুমারের ৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ৯৯
সূরা যুমারের ৭৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১০১
সূরা মুমিনের ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১০২
সূরা মুমিনের ২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১০৩
সূরা মুমিনের ৬১-৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১০৪
সূরা মুমিনের ৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১০৬
সূরা মুমিনের ৭৯-৮১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১০৭
সূরা মুমিনের ৮২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১০৮
সূরা হামীম-সেজদার ৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১০৯
সূরা হামীম-সেজদার ৫৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১১০
সূরা শূরার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১১০
সূরা শূরার ১১-১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১১১
সূরা শূরার ২৮-২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১১২
সূরা শূরার ৩২-৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১১৩
সূরা শূরার ৪৯-৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১১৫
সূরা যুখরুফের ৯-১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১১৬
সূরা যুখরুফের ৮৪-৮৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১১৮
সূরা জাসিয়ার ৩-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১১৯
সূরা জাসিয়ার ১২-১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১২০
সূরা জাসিয়ার ৩৬-৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১২২
সূরা আন'আমের ১-৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১২২
সূরা আন'আমের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১২৪
সূরা আন'আমের ১৭-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১২৫
সূরা আন'আমের ৫৯-৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১২৬
সূরা আন'আমের ৬৩-৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৩০
সূরা আন'আমের ৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৩৬
সূরা আন'আমের ৯৫-৯৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৪৭
সূরা আন'আমের ৯৮-৯৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৫০
সূরা আন'আমের ১০০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৫২
সূরা আন'আমের ১০১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৫৪
সূরা আন'আমের ১০২-১০৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৫৪
সূরা আন'আমের ১০৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৫৭
সূরা আন'আমের ১৪১-১৪২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৫৮
সূরা আন'আমের ১৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৬২
সূরা আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৬৪
সূরা আ'রাফের ৫৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৬৭

সূরা আ'রাফের ১৮৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৬৮
সূরা আ'রাফের ১৮৯-১৯০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৬৯
সূরা ইউনুসের ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৭২
সূরা ইউনুসের ৫-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৭৩
সূরা ইউনুসের ৩১-৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৭৫
সূরা ইউনুসের ৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৭৭
সূরা ইউনুসের ১০৬-১০৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৭৭
সূরা হূদের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৭৮
সূরা হূদের ৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৭৯
সূরা রা'দের ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৮১
সূরা রা'দের ৩-৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৮৪
সূরা রা'দের ৮-৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৮৬
সূরা রা'দের ১০-১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৮৮
সূরা রা'দের ১২-১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৯৩
সূরা ইবরাহীমের ৩২-৩৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৯৭
সূরা হিজরের ১৬-২০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ১৯৯
সূরা হিজরের ২১-২৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২০১
সূরা হিজরের ২৬-২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২০৪
সূরা নাহলের ৩-৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২০৫
সূরা নাহলের ৫-৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২০৬
সূরা নাহলের ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২০৮
সূরা নাহলের ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২০৮
সূরা নাহলের ১০-১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২০৯
সূরা নাহলের ১২-১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২১০
সূরা নাহলের ১৪-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২১১
সূরা নাহলের ১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২১৪
সূরা নাহলের ৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২১৪
সূরা নাহলের ৬৬-৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২১৫
সূরা নাহলের ৬৮-৬৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২১৬
সূরা নাহলের ৭০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২১৯
সূরা নাহলের ৭১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২১৯
সূরা নাহলের ৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২২১
সূরা নাহলের ৭৮-৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২২১
সূরা নাহলের ৮০-৮১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২২৪
সূরা আম্বিয়ার ৩০-৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২২৬
সূরা মু'মিনূনের ১২-১৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৩০

সূরা মু'মিনূনের ১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৩৩
সূরা মু'মিনূনের ১৮-২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৩৪
সূরা মু'মনিূনের ৭৮-৮৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৩৭
সূরা মু'মিনূনের ৮৪-৮৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৪০
সূরা মু'মিনূনের ১১৫-১১৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৪৩
সূরা মু'মিনূনের ১১৭-১১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৪৬
সূরা নূরের ৪১-৪২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৪৭
সূরা নূরের ৪৩-৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৪৮
সূরা নূরের ৪৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৪৯
সূরা নূরের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৪৯
সূরা ফুরকানের ১-২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৪৯
সূরা ফুরকানের ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৫১
সূরা ফুরকানের ৪৫-৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৫২
সূরা ফুরকানের ৪৮-৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৫৩
সূরা ফুরকানের ৫১-৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৫৬
সূরা ফুরকানের ৫৫-৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৫৮
সূরা ফুরকানের ৬১-৬২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৬১
সূরা নামলের ৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৬২
সূরা কাসাসের ৬৮-৭০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৬২
সূরা কসাসের ৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৬৪
সূরা কসাসের ৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৬৪
সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৬৫
সূরা বাকারার ১৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৬৭
সূরা বাকারার ১৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৬৮
সূরা আলে ইমরানের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৭০
সূরা আলে ইমরানের ২৬-২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ..... ২৭০

# সূচি

## দশম খণ্ড


বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-র উপদেশ ..... ২৭৯
হযরত উসমান গনী রা.-এর উপদেশ ..... ২৮৯
হযরত খাজা নিযামুদ্দীন রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮০
হযরত ইমাম গাযালী রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮০
হযরত ওয়াইস ক্বারনী রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮০
হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮০
হযরত শামসুদ্দীন রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮১
হযরত শেখ সা'দী সিরাজী রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮১
হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮২
হযরত আবু বকর সয়দলানী রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮২
হযরত খাজা মুহাম্মদ আসাদ হাশেমী রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮২
দার্শনিক প্লেটো এর উপদেশ ..... ২৮৩
আল্লামা ড. ইকবাল রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮৩
হযরত শায়খ রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮৩
হযরত খাজা গোলাম মুহাম্মদ রহ.-এর উপদেশ ..... ২৮৪
মা ..... ২৮৪
অন্যান্য ..... ২৮৪
পানি দ্বারা চিকিৎসা ..... ২৯০
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংক্ষিপ্ত জীবনী ..... ২৯২
মহৎ প্রাণ এক সত্ত্বার মহত্ত্বের রহস ..... ২৯২
ব্যক্তিত্বের প্রভাব ..... ২৯৩
দয়ালু মনিব ..... ২৯৪
এতিমের সহায় ..... ২৯৭
এতিমের সমব্যাথী ..... ২৯৯
অনন্য ব্যক্তিত্ব ..... ৩০১
অনন্য গুরুজন ..... ৩০২
আদর্শ স্বামী ..... ৩০৩

স্নেহশীল পিতা ..... ৩০৬
কোমল হৃদয় নানা ..... ৩১১
বিনয়ী সন্তান ..... ৩১৩
দায়িত্বশীল ভাই ..... ৩১৩
দয়ালু শ্বশুর ..... ৩১৫
দয়ালু ভাতিজা ..... ৩১৬
অসহায়ের সহায় ..... ৩১৭
সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক ..... ৩১৯
অতুলনীয় বিজেতা ..... ৩২০
এক বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী ..... ৩২৫
শত্রু হলো বন্ধু ..... ৩২৬
বুজুর্গদের জ্ঞানগর্ভ বাণী ..... ৩২৯
ক্লাস ও সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া ..... ৩২৯
হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর উপদেশ ..... ৩৩০
ইসলামী বিদ্যাপীঠসমূহের শিক্ষকবৃন্দ! ..... ৩৩১
বিলম্বের ক্ষতিপূরণ কীভাবে? ..... ৩৩২
মাদরাসার সময় কোথায় ব্যায় হবে? ..... ৩৩৩
অপেক্ষার যন্ত্রণা ..... ৩৩৩
ইলমের সম্মান ও মর্যাদায় যেন আঘাত না আসে ..... ৩৩৩
হযরত আয়েশা রা. কে নবীজী সা.-এর তিন উপদেশ ..... ৩৩৪
হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর নবীপ্রেম ..... ৩৩৫
বিয়েতে সাহাবায়ে কেরামের অনাড়ম্বরতা ..... ৩৩৫
বিয়েতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সফর করা ..... ৩৩৬
সন্তানদের শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচান ..... ৩৩৬
এই দোয়া কখন পড়তে হবে? ..... ৩৩৭
ভুল বোঝাবোঝির অবসান ..... ৩৩৭
হযরত হাসান বসরী রহ.-এর সত্য উচ্চারণ ..... ৩৩৮
হযরত হাসান বসরী রহ.-এর বসরা গমন ..... ৩৩৯
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনামল ..... ৩৪০
হাসান বসরী রহ.-এর হৃদয়ছোঁয়া ভাষণ ..... ৩৪১
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ রাগে অগ্নিশর্মা ..... ৩৪১
ভীত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ..... ৩৪২
ইসলামের দৃষ্টিতে কুসংস্কার ..... ৩৪৩
যবান সংযত করা ..... ৩৪৬
বিশ্বস্ত ক্রেতা ..... ৩৪৯
মোবাইলের ক্ষতি ..... ৩৫০

মোবাইলের মাধ্যমে বিরক্ত করা ..... ৩৫১
মোবাইল বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা ..... ৩৫১
পিতামাতার মর্যাদা ..... ৩৫৩
আপন স্রষ্টাকে চেনো ..... ৩৫৫
আপনি কার ইবাদত করছেন; সৃষ্টির না সৃষ্টিকর্তার? ..... ৩৫৭
উট ..... ৩৫৭
আকাশ ..... ৩৫৮
পাহাড় ..... ৩৫৯
যমিন ..... ৩৫৯
পিপীলিকা ..... ৩৬০
চুতষ্পদ জন্তু ..... ৩৬১
মানুষ ..... ৩৬২
বাতাস ..... ৩৬৩
পানি ..... ৩৬৪
বৃষ্টি ..... ৩৬৫
অদৃশ্য সৃষ্টি ..... ৩৬৬
ঋতু ..... ৩৬৬
জগত ও পৃথিবী ..... ৩৬৭
পৃথিবী (Earth) ..... ৩৬৮
বাতাস- এয়ার (Air) ..... ৩৭০
Fo fronts ..... ৩৭১
Fog (কুয়াশা) ..... ৩৭২
মেঘ (Clouds) ..... ৩৭২
ঘূর্ণিঝড় (টর্নেডো) ..... ৩৭৩
বিদুৎ -ligt and elctro megnatic wave (EMW) ..... ৩৭৩
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি ..... ৩৭৫
চমকপ্রদ উক্তিমালা ..... ৩৭৬
হারাম শরীফের সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন ..... ৩৭৭
আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কারিশমা ..... ৩৭৭
কুরআনের অলংকারিক ও ভাষাগত কারুকার্য ..... ৩৭৮
মনের গোপন কথা আল্লাহ জানেন ..... ৩৭৯
ধার্মিক মানুষের প্রতিবেশী হোন ..... ৩৮০
মানুষের মন খুব সংকীর্ণ ..... ৩৮০
দু'টি বিস্ময়কর হাদীস ..... ৩৮০
একটি হাদীস শোনার জন্য মাসভর সফর ..... ৩৮১
আল্লাহর পরিচয় জানার আমল ..... ৩৮৩

ছাত্রদের একটি বিশেষ উপহার ..... ৩৮৩
জীবনভর কল্যাণ প্রত্যাশা করো ..... ৩৮৩
হৃদয় কি পরিবর্তনশীল? ..... ৩৮৪
মূর্তিপূজার শুরু যে ভাবে ..... ৩৮৪
জান্নাতের আলোচনা ..... ৩৮৫
নবী কারীম সা. কসম খেয়ে এই দোয়া বলেছেন ..... ৩৮৯
সকালের দোয়া ..... ৩৮৯
সন্ধ্যার দোয়া ..... ৩৮৯
হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর দোয়া ..... ৩৯০
অত্যাচারী হাজ্জাজ হযরত আনাস রা.-এর কিছুই করতে পারলো না ..... ৩৯০
ভুলে যাওয়ার চিকিৎসা ..... ৩৯৪
বিস্মৃতিরোগ যে ভাবে সেরে গিয়েছিলো ..... ৩৯৫
নিরাপত্তা এবং উদ্দেশ্য পূরণের দোয়া ..... ৩৯৫
আল্লাহর কাছে রাখা আমানত হুবহু ফেরত পেলেন ..... ৩৯৫
**বিরান ভূমিতে বিপদগ্রস্থ পথিকের আমল** ..... ৩৯৬
শত্রুর দৃষ্টি থেকে বাঁচার কার্যকর আমল ..... ৩৯৭
এক রাস্তা দিয়েই অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও দেখতে পেলো না ..... ৩৯৮
গায়ে গায়ে লাগছে অথচ ধরতে পারলো না ..... ৩৯৮
পিছু ধাওয়াকারী সামনে চলে গেলো ..... ৩৯৯
ধ্বংস ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ..... ৩৯৯
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফও কিছু করতে পারেনি ..... ৩৯৯
ডেকেছিলো হত্যার জন্য কিন্তু ..... ৪০০
**আমল করেই মুক্তি পেলেন** ..... ৪০০
চুরি-ডাকাতি থেকে রক্ষার দোয়া ..... ৪০১
আয়াতের বরকতে চোরের কাণ্ড ..... ৪০১
বন্দিদশা থেকে মুক্তিদানকারী দোয়া ..... ৪০২
শেকল আপনা আপনি খুলে গেলো ..... ৪০২
শত্রুর ওপর বিজয়লাভের ব্যবস্থাপত্র ..... ৪০৩
ফেরেশতারা চারদিক থেকে শত্রুর উপর আক্রমণ করলো ..... ৪০৩
আল্লামা ইবনে তায়মিয়ার এর শিক্ষাদান ..... ৪০৩
সব ধরনের রোগে এই দোয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া ..... ৪০৪
একটি মকবুল দোয়া ..... ৪০৪
তীব্র অসুখ থেকে মুক্তি ..... ৪০৪
অহেতুক সন্দেহের চিকিৎসা ..... ৪০৫
প্রখ্যাত সাহাবীর অহেতুক সন্দেহ দূর হয়ে গেলো ..... ৪০৫
সব ধরনের ব্যথা উপশমকারী দোয়া ..... ৪০৬

প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে, মূত্রনালীতে পাথর হয়ে গেলে- এই দোয়া ..... ৪০৬
দোয়া পড়তেই প্রস্রাব শুরু হলো ..... ৪০৭
ফোঁড়ার চিকিৎসা ..... ৪০৭
উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রা.-এর ফোঁড়া ফেটে গেলো ..... ৪০৭
জ্বর সারার তদবীর ..... ৪০৮
চোখের পলকে নবী কারীম সা.-এর জ্বর সেরে গেলো ..... ৪০৮
ঋণ পরিশোধের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া ..... ৪০৯
অসহায় করে দেওয়া ঋণ শোধ হয়ে গেলো ..... ৪০৯
পিতা-কন্য দুইজনের বিস্ময়কর ঘটনা ..... ৪১০
কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখলে পাঠ্য দোয়া ..... ৪১০
অটোমেটিক এলার্ম ..... ৪১১
মুহাদ্দিস ও প্রখ্যাত ক্বারীর পর্যবেক্ষণ ..... ৪১১
দাঁতের ব্যথার জন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া ..... ৪১২
ইবনে রাওয়াহার দাঁতের যন্ত্রণা দূর হয়ে গেলো ..... ৪১২
হাত মুবারক উঠানোর পূর্বেই আল্লাহ ব্যথা দূর করে দিলেন ..... ৪১২
সুগারের রোগীদের জন্য সুখবর ..... ৪১২
এক মেয়ে ও হাজ্জাজের চমৎকার গল্প ..... ৪১৩
ঘটনার আলোকে দাওয়াত ও ফিকির ..... ৪১৪
হযরত উমর রা. প্রবর্তিত রীতি ..... ৪১৮
হযরত উসমান রা. কর্তৃক প্রবর্তিত রীতি ..... ৪১৯
হযরত আলী রা. কর্তৃক প্রবর্তিত রীতি ..... ৪২০
নির্বাচিত কবিতামালা ..... ৪২১
নবী কারীম সা.-এর ভালোবাসা ..... ৪২২
সম্মানিত পিতার স্মরণে ..... ৪২২
ক্যান্সারের বহু পরীক্ষিত চিকিৎসা ..... ৪২২
হুয় নেয়ামত ..... ৪২২
দ্বীনদার হওয়ার সহজ উপায় ..... ৪২৩
দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষিত আজিফা ..... ৪২৩
গব ধরণের সমস্যার জন্য পড়বে ..... ৪২৩
আয়াতে তওহিদ ..... ৪২৪

# মুক্তার চেয়ে দামী

(নবম খণ্ড)



## সূরা বাকারার ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে বর্ষণ করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তার মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য রিযিকস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তদ্রূপ তাদেরকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নেয়ামত দান করেছেন। তিনি জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন। সেখানে মজবুত পাহাড়-পর্বতের পেরেক গেঁথে দিয়েছেন। আকাশকে বানিয়েছেন ছাদ। আকাশ থেকে পানি অবতরণের অর্থ হলো, বৃষ্টি বর্ষণ করা। সেই নেয়ামতসমূহ থেকে শুধু মানবজাতি নয়; তাদের গৃহপালিত পশু-পাখিও উপকৃত হচ্ছে। কাজেই একমাত্র মহান আল্লাহ-ই ইবাদতের উপযুক্ত এবং তাঁর সঙ্গে কখনোই কাউকে শরীক করবে না।

## সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۭ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

তিনিই জমিনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আসমানের প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সাত আসমানে সুবিন্যস্ত করলেন। আর সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ; যিনি মাত্র দু'দিনে গোটা ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করেছেন, যিনি রাব্বুল আলামীন, যিনি ভূপৃষ্ঠের ওপর মজবুত পাহাড়কে পেরেকের মতো গেঁথে দিয়েছেন, যিনি জমিনের ভাঁজে ভাঁজে নানা বরকত ও জীবিকা রেখেছেন, মাত্র চারদিনে পৃথিবীর ওপর জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বস্তু যথাযথভাবে সংকুলান করেছেন।

এরপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। ইতঃপূর্বে সেটি ছিলো ধোঁয়ার মতো। তিনি বললেন, হে জমিন ও আকাশ! সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট যেমনি হও, চলে এসো। উভয়ে সমস্বরে বললো, হে আল্লাহ! আমরা আপনার সকাশে সন্তুষ্টচিত্তে চলে আসছি।

তিনি মাত্র দু'দিনে আসমানের সকল আয়োজনকে পূর্ণতা দান করেন। প্রতিটি আসমানকে তার দায়িত্ব বণ্টন করে দেন। দুনিয়ার আকাশ নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে সজ্জিত করেন। সেগুলোকে তিনি শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢাল বানিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা প্রথমে জমিন তৈরি করেন। এরপর সাত আসমান তৈরি করেন। আল্লাহ তার পুরুত্ব স্ফীত করে সেটিকে যথাযথ রূপ দান করেন এবং সেখান থেকে রাত ও দিন সৃষ্টি করেন। এরপর তিনি জমিনকে বিস্তৃত করেন। সেখান থেকে পানি ও উদ্ভিদ বের করেন। তার ওপর পাহাড় বসিয়ে দেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস রা. সহ প্রমূখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার আরশ ছিলো পানির ওপর। তখন পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় কোনো জিনিস সৃষ্টি করেননি। যখন তিনি অন্য সৃষ্টিজীবগুলোকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন পানি থেকে ধোঁয়া ওঠালেন। সেটি ওপর দিকে উঠতে থাকলো। তা দিয়ে আসমান তৈরি করলেন। একপর্যায়ে পানি শুকিয়ে গেলো। এর মাধ্যমে জমিন তৈরি করলেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সেটিকে সাত জমিনে পরিণত করলেন। রবিবার ও সোমবার; মাত্র দু'দিনেই এ সাত জমিন সৃষ্টি হয়ে গেলো। জমিন মাছের ওপর আর মাছ আছে পানিতে। স্বচ্ছ সেই পানি আছে ফেরেশতার ওপর। আর ফেরেশতা আছেন পাথরের ওপর। পাথর আছে বাতাসের ওপর। মাছ নড়াচড়া করতেই জমিন দুলে উঠলো। তখন আল্লাহ তাআলা তার ওপর পাহাড় গেঁথে দিলেন। যার ফলে সেটি স্থির হয়ে গেলো। পাহাড় হলো জমিনে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। গাছপালা সহ জমিনের ওপর বিরাজমান সব কিছু মঙ্গলবার ও বুধবার; এ দু'দিনেই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেন।

এরপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যা ছিলো ধোঁয়া-মাত্র। তিনি প্রথমে সেটিকে আকাশে পরিণত করেন। এরপর সেখান থেকে সাত আসমান তৈরি করেন মাত্র দু'দিনেই— বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। প্রতিটি

আকাশের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেন ফেরেশতা। এর বাইরে তিনি আরো অনেক কিছু সৃষ্টি করেন, যার কথা তিনি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না।

আকাশকে সজ্জিত করতে সেখানে তিনি নক্ষত্র তৈরি করলেন। সেগুলোকে তিনি শয়তান থেকে বাঁচার হাতিয়ার বানালেন। ছয় দিনে সৃষ্টি করলেন আকাশসমূহ ও জমিনসমূহকে। এরপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন। আসমান ও জমিন উভয়টি প্রথমতঃ ধোঁয়া ছিলো। আল্লাহ তাআলা সেখানে পাহাড় সৃষ্টি করলেন এবং পানির মাধ্যমে প্রতিটি জিনিসের মাঝে প্রাণ সঞ্চার করলেন।

ইবনে জরীরে আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রোববার থেকে সৃষ্টিজীবনের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু হয়। আল্লাহ দু' দিনে জমিন সৃষ্টি করেন। জমিনের জিনিসগুলো সৃষ্টি করেন পরবর্তী দু' দিনে। এরপর দু' দিনে আসমান সৃষ্টি করেন। শুক্রবার দিবসের শেষভাগে সেগুলোর সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়। ঠিক ওই সময়েই তিনি হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেন। আবার এ সময়েই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

মুজাহিদ রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা জমিনকে সৃষ্টি করেছেন আসমানের পূর্বে। সেখান থেকে যেই ধোঁয়া ওপর দিকে ওঠেছে তা দিয়ে আসমান সৃষ্টি করেন। আসমানগুলোর একেকটি অন্যটির ওপরে। এভাবে সাত আসমান রয়েছে। জমিনগুলোও একেকটি অন্যটির নিচে। এভাবে সাত স্তবক জমিন রয়েছে।

সহীহ বুখারিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, জমিন সৃষ্ট হয়েছে আসমানের আগে। তবে সেটি প্রসারিত হয়েছে পরবর্তীতে। তারপর জমিনের ভেতর পানি, পাহাড় ও বিভিন্ন উদ্ভিদ তৈরির যেই ক্ষমতা রয়েছে ওই সবকিছুর প্রকাশ ঘটেছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন জমিনের বিভিন্ন উদ্ভিদ, বিচিত্র বর্ণের জিনিসপত্র ও নানা পদের উদ্ভিদগুলো প্রকাশ পেয়েছে। তদ্রূপ তিনি আসমানেও স্থির ও চলোমান অসংখ্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন।

সহীহ মুসলিম ও নাসায়ী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সা. আমার হাত ধরে ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা শনিবার জমিন সৃষ্টি করেন। পাহাড় সৃষ্টি করেন রোববার। গাছপালা সোমবার সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার সকল মন্দ জিনিসগুলো ও বুধবার 'নূর' সৃষ্টি করেন। জীব-জন্তুগুলোকে সৃষ্টি করেন বৃহস্পতিবার। আর শুক্রবার দিবসের শেষভাগে হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় রাতের শেষাংশে।

## সূরা বাকারার ৩১-৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

'আর তিনি আদমকে নামসমূহ সব শিক্ষা দিলেন। তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, 'তোমরা আমাকে এগুলোর নাম বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারা বললো, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে এক বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে অন্য ফেরেশতাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। আল্লাহ আদম আ.-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দেন। অর্থাৎ তাঁর সকল সন্তানের নাম, সকল জীব-জন্তুর নাম, আসমান, জমিন, পাহাড়, স্থল ও জলভাগ, ঘোড়া, গাধা, আসবাব পত্র, ফেরেশতা, নক্ষত্র তথা ছোট-বড় সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দেন।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে সকল বস্তুর সত্তাগত নাম ও গুণবাচক নাম এমনকি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। যেমনটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর এক মন্তব্যে রয়েছে যে, তাঁকে 'পায়ু পথে নির্গত দুষিত বাতাসের নাম'ও শিক্ষা দিয়েছিলেন।

## সূরা নামলের ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۭ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۭ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ○

বরং তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তিনি তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বরং তারা সত্যবিচ্যুত এক কওম।

ব্যাখ্যা : আলোচনা হচ্ছে এ নিয়ে যে, আল্লাহই গোটা বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন, সবার জীবিকা দিচ্ছেন, সবার হিফাযত করছেন, সকল বিষয়ের

ব্যবস্থাপনা করছেন। ওই উঁচু আকাশ ও সুশোভিত নক্ষত্ররাজিকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রচণ্ড ভারত্বপূর্ণ জমিন, আকাশচুম্বী পাহাড় ও দিগন্ত বিস্তৃত ময়দান তাঁরই অনবদ্য সৃষ্টি। শস্যক্ষেত, বাগ-বাগিচা, ফল-ফুল, সমুদ্র-নদী, জীব-জন্তু, মানব ও জ্বিন সম্প্রদায়, জল ও স্থলভাগের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই গোটা পৃথিবীর সকল প্রাণীর আহারের ব্যবস্থা করেন। বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-খামার তিনিই উৎপন্ন করেন। এই ফুল-ফসল একদিকে আমাদের দৃষ্টি বিমোহিত করে, অন্যদিকে আমাদের জীবনে নানাবিধ উপকার বয়ে আনে। এগুলো শুধু স্বাদে মজাদার-ই নয়; বরং এগুলো আমাদের বেঁচে থাকতেও প্রভূত সাহায্য করে। পৃথিবীর কোনো মানুষ বা কোনো মিথ্যা স্রষ্টা উপরিউক্ত বিষয়গুলোর মধ্য হতে একটিকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। কোনো ধরনের শস্য বা ফসল বা ফল কোনো গায়রুল্লাহ সৃষ্টি করতে পারবে না। স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহই।

আল্লাহ পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন যেন সবাই স্বস্তির সঙ্গে এখানে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। জমিনের বুকে এঁকেবেঁকে বিভিন্ন নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। এই নদ-নদীগুলো দেশ-দেশান্তরে গিয়ে জমিনকে করেছে সিঞ্চিত, যেন জমিন থেকে ফসল ও বাগান ইত্যাদি জন্মাতে পারে। জমিনকে সুস্থির রাখার জন্যে আল্লাহ তার বুকে পাহাড়ের পেরেক গেঁথে দিয়েছেন। যেন জমিন হেলতে না পারে। সুস্থির থাকে।

আল্লাহর কুদরতের আরেকটি নিদর্শন হলো, একদিকে লবণাক্ত পানি ও অন্যদিকে মিষ্টি পানির দরিয়া প্রবাহিত হচ্ছে। দু'টোই সমান্তরালে প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ একটির সঙ্গে অন্যটি মিশছে না; এবং মাঝখানে কোনো বাধা সৃষ্টিকারী নেই। আল্লাহ কুদরতি ভাবে একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে রেখেছেন। লবণাক্ত পানি যেমন মিষ্টি পানির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে না; তদ্রূপ মিষ্টি পানিও লবণাক্ত পানির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না। দু' ধরনের পানিই উপকারী। মানুষ মিষ্ট, স্বচ্ছ ও টলটলে পানি পান করে নিজেরা পরিতৃপ্ত হচ্ছে; নিজেদের গবাদী পশুগুলোকে পরিতৃপ্ত করছে; শস্যক্ষেত ও বাগ-বাগিচা সিঞ্চিত করছে; গোসল ও কাপড় ধোয়ার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করছে। অন্যদিকে লবণাক্ত পানিও মানব জাতির পরম উপকার করছে। এই লবণাক্ত পানি সর্বদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে যেন পৃথিবীর পরিবেশ ও আবহাওয়া কলুষিত না হয়। আল্লাহ-ই দু' ধরনের পানি প্রবাহিত করছেন এবং তিনিই এ দু'টোর মাঝে বিভেদ তৈরি করেছেন।

## সূরা নামলের ৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

বরং তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলের ও জলের অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

ব্যাখ্যা : আসমান ও জমিনের বুকে আল্লাহ তাআলা এমন অসংখ্য নিদর্শন রেখেছেন, যদি কেউ জলভাগে বা স্থলভাগে চলার পথে পথ ভুলে যায় তাহলে সে শুধু ওই নিদর্শনগুলো দেখেই পথ বের করে নিতে পারবে। যেমন, আল্লাহ আকাশে নক্ষত্র রেখেছেন। কেউ সামুদ্রিক সফর করার সময় বা স্থলভাগে বনবাদাড়ের ভেতর দিয়ে চলার সময় ওই নক্ষত্রগুলো থেকে সে পথের নির্দেশিকা পেয়ে যাবে। আকাশের মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণের আগে ঠাণ্ডা ও মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হয়; কারণ যা দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, একটু পরেই বৃষ্টি নামবে। এই নিদর্শনাবলী আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এভাবে সুচারু ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে সক্ষম নয়। যে কোনো ধরনের অংশীদার থেকে আল্লাহ মুক্ত। তিনি পূত-পবিত্র। তিনি সর্বোচ্চ মহিয়ান।

একমাত্র তিনিই সেই সত্তা, যাকে সবাই জীবন সংকটে, মহা বিপদের সময় ডাকে। অসহায়, নিরাশ্রয়ের তিনিই একমাত্র সহায় ও আশ্রয়। জীবনে চলার পথে কেউ যখন পথ হারিয়ে ফেলে, হোঁচট খেয়ে বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে তখন একান্ত মনে সে আল্লাহকেই কামনা করে। এ কারণেই আল্লাহ বলছেন, সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে যখন তোমরা বাঁচার আশা ছেড়ে দাও; মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া সেই চরম মুহূর্তে তোমরা কেবল আল্লাহকেই স্মরণ করো। তাঁকে ডাকো, তাঁর কাছে কান্নাকাটি করো এবং তখন সবকিছু ভুলে যাও।

এক ব্যক্তি রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করলো, হুজুর! আপনি কোন জিনিসের প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছেন? নবীজী সা. বলেন, ওই আল্লাহর দিকে যিনি একক। যার কোনো অংশীদার নেই। তুমি বিপদে বা ঝঞ্ঝাটে ফেঁসে গেলে যিনি তোমাকে উদ্ধার করেন। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলার সময় তুমি যখন পথ হারিয়ে ফেলো তখন তুমি তাঁর নাম ধরে ডাকলে তিনিই তোমাকে পথের দিশা বাতলে দেন। তোমার কেউ হারিয়ে গেলে, তুমি যখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করো তখন তিনিই তাকে ফিরিয়েদেন। যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখন তুমি তাঁর কাছে দোয়া করো, তখন তিনিই তোমারদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

তখন ওই লোক বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

নবীজী সা. বললেন, কাউকে মন্দ বলো না। কোনো নেককাজ হালকা ও গুরুত্বহীন মনে করো না। যদিও কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে ভ্রুকুঞ্চিত অবস্থায় মিলিত হতেই হয় তবুও। যদিও নিজের পাত্র থেকে কোনো তৃষ্ণার্তকে এক ঢোক পানি দিতে হয় তবুও। আর স্বীয় পায়জামা হাঁটু ও টাখনুর মাঝ বরাবর পরিধান করবে। না হয় বড়জোর টাখনু পর্যন্ত রাখবে এর নিচে পরিধান করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, এটা অহংকার ও আত্মম্ভরিতাপূর্ণ কাজ; যা আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয়।

ওয়াহাব রহ. বলেন, আমি পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে এ কথা পেয়েছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমার সম্মানের কসম! যে ব্যক্তি আমার ওপর আস্থা রাখবে এবং আমাকে আঁকড়ে ধরবে, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই তার প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখবো। যদি আসমান, জমিনের মধ্যস্থিত সকল মাখলুক তার বিরুদ্ধাচারণ করে তবু তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি আমার ওপর আস্থা না রাখে, আমার আশ্রয়ে না আসে আমি তাকে নিরাপদে চলা-ফেরা করা সত্ত্বেও যদি চাই মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেবো। আমি তার কোনো সাহায্য করবো না।

হাফিয ইবনে আসাকির রহ. তাঁর কিতাবে একটি বিস্ময়কর ঘটনা লিখেছেন যে, এক ব্যক্তি বলেন, আমার পেশা ছিলো লোকদেরকে খচ্চরে চড়িয়ে দামেশক থেকে যাবেদানি নিয়ে যাওয়া। ওই উপার্জিত অর্থ দিয়েই আমার জীবিকা নির্বাহ হতো। একবার এক ব্যক্তি আমার খচ্চর ভাড়া নিলো। আমি তাকে খচ্চরে উঠিয়ে রওয়ানা হলাম। এক স্থানে দু'টি রাস্তা ছিলো, আমরা সেখানে পৌঁছলাম। তখন সে আমাকে বললো এ পথে চলো, সে যে রাস্তা দিয়ে যেতে নির্দেশ দিলো, সে রাস্তা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিলো না। আমি বললাম, আমি এ রাস্তা চিনি না। সে বললো, এটাই সোজা পথ। আমি এ পথেই নিয়মিত যাতায়াত করি। তা আমার চেনা ও এটি বেশ সংক্ষিপ্ত।

তার কথা মত আমি সে পথেই চলতে শুরু করলাম। কিছু দূর চলার পর দেখলাম একটি জনমানবহীন সংকীর্ণ জঙ্গলে আমরা চলে এসেছি। যেখানে কোনো রাস্তা দেখা যাচ্ছিল না। জায়গাটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ঝোপ-ঝাড়। চারদিকে অসংখ্য লাশের কংকাল পড়ে আছে। আমি আঁতকে উঠলাম। লোকটি আমাকে বললো, লাগাম ধরো। আমি এখানে নামবো। আমি লাগাম ধরলে সে নিচে নামলো এবং পাজামা উঁচু করে ভেতর থেকে একটি ধারালো ছুরি বের করে আমার ওপর আক্রমণ করলো। আমি সেখান থেকে উল্টো দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। লোকটি আমার পশ্চাদ্ধাবন করলো। এক পর্যায়ে সে আমাকে ধরে ফেললো। আমি তাকে নানা কসম দিয়ে অনুনয়-বিনয় করলাম; কিন্তু কিছুতেই তার মন গললো না। আমি বললাম, ঠিক আছে! এই খচ্চর সহ

আমার সকল জিনিসপত্র তুমি নিয়ে নাও। আর আমাকে ছেড়ে দাও। সে বললো, ওগুলো তো এমনিতে আমারই হয়ে গেছে অতএব আমি তোমাকে জীবিত ছাড়তেই চাচ্ছি না। আমি তাকে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের মর্মন্তুদ শাস্তির কথা স্মরণ করালাম; কিন্তু এগুলো তার ওপর কোনো প্রভাব ফেললো না। লোকটি আমাকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছে। এখন আমি নিরাশ হয়ে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলাম। তার কাছে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করলাম, তুমি আমাকে শেষ বারের মতো দু' রাকাত নামায আদায়ের সুযোগ দাও। লোকটি বললো, ঠিক আছে। জলদি আদায় করো।

আমি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। আল্লাহর কসম! ওই সময় আমার মুখ দিয়ে কুরআনের একটি অক্ষরও বেরোচ্ছিলো না। এমনিতেই হাত বেঁধে ভয়ে কাতর হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। অন্যদিকে লোকটি আমাকে ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিলো। ওই সময় হঠাৎ আমার মুখে এ আয়াত চলে এলো— أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 'অর্থাৎ আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি বিপদগ্রস্তের দোয়া শোনেন এবং সংকট দূর করেন।'

এই আয়াতটি মুখে উচ্চারিত হওয়া মাত্রই আমি দেখতে পেলাম, জঙ্গলের ভেতর থেকে একজন ঘোড়সওয়ার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে উন্মুক্ত খঞ্জর হাতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে আকস্মিক ওই ডাকাতের পেটের ভেতর খঞ্জর সেঁধিয়ে দিলো। খঞ্জরের তীক্ষ্ণ ফলা তার বুক ভেদ করে কলিজা পার হয়ে গেলো। ডাকাতের নিস্প্রাণ দেহ গড়িয়ে পড়লো মাটির ওপর। ওই ঘোড়সওয়ার আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলেই জঙ্গলের ভেতর ফিরে যেতে উদ্যত হলো। আমি তখন তার দু' পা ঝাপটে ধরে অনুনয়ের সঙ্গে বললাম, আল্লাহর ওয়াস্তে বলে যান, কে আপনি? উত্তরে লোকটি বললেন, আমাকে তিনি প্রেরণ করেছেন যিনি অসহায়, বিপর্যস্ত ও নিরুপায়ের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের ওপর থেকে বিপদ দূরীভূত করেন। আমি তখন আল্লাহর শোকর আদায় করে সেখান থেকে আমার খচ্চর ও জিনিসপত্র নিয়ে সুস্থ ও নিরাপদে বাড়ি ফিরে এলাম।

এ জাতীয় আরো একটি ঘটনা। একবার মুসলমানদের একটি বাহিনী যুদ্ধে কাফেরদের হাতে পরাজিত হয়ে ফিরে আসছিলেন। কাফেলার মধ্যে একজন মুসলমান ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও সজ্জন। তাকে বহনকারী ঘোড়াটিও ছিলো অত্যন্ত দ্রুতগামী। মাঝপথে সেই ঘোড়াটি অকস্মাৎ থেমে গেলো। আল্লাহর অলি ঘোড়াটিকে সামনে হাঁকানোর জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন; কিন্তু ঘোড়াটি তার স্থান থেকে এক পা-ও নড়ছে না। অবশেষে নিরূপায় হয়ে তিনি ঘোড়াটিকে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, কী হলো, তুই দেখি মাটির সঙ্গে লেপটে গেলি। এমন দিন দেখার জন্যই কি তোকে সেবা-যত্ন ও আদর করে লালনপালন করেছিলাম?

আল্লাহ তাআলা ঘোড়ার যবান খুলে দিলেন। ঘোড়া উত্তরে বললো, আপনি আমাকে খাওয়ানোর জন্যে যেই দানা-পানি রাখালকে দিতেন, সেখান থেকে সে চুরি করতো আর আমাকে দিতো খুব অল্প। আমার ওপর জুলুম করতো।

লোকটি বললেন, আগে যা হয়েছে, তা ভুলে যা। এখন তুই চল। আমি আল্লাহকে সাক্ষি রেখে শপথ করছি এখন থেকে আমি তোকে সবসময় নিজের কোলে নিয়েই খাওয়াবো।

এ কথা শোনা মাত্রই ঘোড়াটি আড়মোড়া ভেঙ্গে হরহরিয়ে এগিয়ে চললো এবং মনিবকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিলো। অঙ্গীকার মুতাবেক তখন থেকে ওই বুযুর্গ নিয়মিত নিজ ঘোড়াটিকে কোলে নিয়েই খাবার খাওয়াতো। মানুষ কৌতূহলবশতঃ তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি কাউকে ঘটনাটি বলে দিলেন। তখন ঘটনাটি গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। এমন হয়েছে যে, খোদ তার মুখ থেকে ঘটনাটি শোনার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন চলে আসতে লাগলো। এভাবে এক কান-দু' কান হয়ে একদিন রোমসম্রাটের কাছে ঘটনাটি পৌঁছে গেলো। সম্রাটও কৌতূহলী হয়ে ওঠলেন। তিনি নিজ কানে ঘটনা শোনার জন্যে ওই সজ্জন দয়ালু লোকটিকে বিভিন্নভাবে নিজ শহরে আনার জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন; কিন্তু কিছুতেই সফল হলেন না।

অবশেষে একদিন তার কাছে এক ধর্মত্যাগী লোক হাজির হলো। লোকটি আগে মুসলমান ছিলো; এখন মুরতাদ হয়ে গেছে। সে সম্রাটের নির্দেশ পেয়ে ওই নেককার, দয়ালু লোকটির কাছে হাজির হলো। এখানে এসে সে পুনরায় মুসলমান হওয়ার ঢং করলো। নিপুণ অভিনয়ের সঙ্গে তাওবা-ইসতিগফারও করলো। নিজেকে একজন নেককার মানুষ হিসেবে তুলে ধরার অভিনয় শুরু করে দিলো। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এক পর্যায়ে সে ওই নেককার লোকটির আস্থাভাজন হয়ে ওঠলো। তিনি এই আগন্তুককে সৎ ও আস্থাভাজন মনে করে কাছে টেনে নিলেন। দু'জনের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠলো। দু'জন একসঙ্গে চলা-ফেরা ও ওঠা-বসা করতে লাগলেন। অর্থাৎ লোকটি ছলে-বলে-কৌশলে পূর্ণ আস্থা অর্জন করে নিজের বাহ্যিক দীনদারীর ফাঁদে তাকে ফেলে দিলো। ওদিকে সে রোমসম্রাটের কাছে গোপনে এ সংবাদ পাঠালো যে, আপনি অমুক সময় সমুদ্রের পাড়ে একজন শক্তিশালী সাহসী সেনা পাঠাবেন। এদিকে আমি ওই মুসলমানকে নিয়ে হাজির হবো। দু'জনে একসঙ্গে আক্রমণ করে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবো।

চক্রান্ত অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে সে ফুসলিয়ে বন্ধুকে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানেও পৌঁছলো। হঠাৎ ওই শক্তিশালী লোকটি বেরিয়ে এসে আক্রমণ করলো। এদিক থেকে এই ভণ্ড প্রতারকও হামলা করলো। অবস্থা বেগতিক দেখে ওই সজ্জন দয়ালু লোকটি আকাশের দিকে তাঁকিয়ে দোয়া করলো, হে আল্লাহ! এ লোকটি

তোমার নাম নিয়ে আমাকে ধোকা দিয়েছে। আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, তুমি যেভাবে পারো আমাকে তাদের কবল থেকে রক্ষা করো। তাঁর দোয়া শেষ হতেই জঙ্গলের ভেতর থেকে দু'টি হিংস্র জন্তুকে তেড়ে আসতে দেখা গেলো। এই দুই ষড়যন্ত্রকারীকে মুহূর্তের মধ্যে হিংস্র জন্তু আক্রমণ করে টুকরো টুকরো করে চলে গেলো। আর ওই নেককার লোকটি সেখান থেকে আল্লাহর রহমতে নিরাপদে বাড়ি ফিরলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

উপরোল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের বড়ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন, আল্লাহই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। একের পর এক ধারাবাহিকভাবে পৃথিবীতে আসছে এবং পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছে এবং তোমাদের একে অপরের ওপর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। হযরত আদম আ.-কেও খলিফা বলা হয়েছে ওই কারণে যে, তাঁর সন্তানরা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হবে।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা থেকেও এ কথা উদ্দেশ্য যে, একের পর এক, এক যুগের পর অন্য যুগে, এক জাতির পর অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন। অতএব এটা আল্লাহ তাআলার একটি কুদরত। নয়তো আল্লাহ তাআলা যদি চাইতেন তাহলে সবাইকে একই সময় একই সঙ্গে সৃষ্টি করে দিতেন আবার একসঙ্গে ধ্বংসও করে দিতেন। কিন্তু তা না করে এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, একজন মৃত্যুবরণ করেছে তো অন্য একজনকে সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানববংশ বিস্তার করিয়েছেন। আল্লাহ দুনিয়াতে এমন ব্যবস্থাপনা রেখেছেন যে, যেন দুনিয়াবাসীদের রুটি-রূজি ও তাদের জীবন যাপন সংকীর্ণ না হয়। নয়তো সবাই একসঙ্গে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলে হয়তো জমিনে অভাব অনটনে অতিবাহিত করতে হতো। ফলশ্রুতিতে একজন অপরজনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতো।

অতএব, চলমান পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলা যে প্রজ্ঞাবান এরই প্রমাণ বহন করে, সবার জন্য, মৃত্যু তথা পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার মেয়াদকাল তাঁর কাছে নির্ধারিত। তাঁর জ্ঞানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংরক্ষিত। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি সীমার বাইরে নয়। আল্লাহ এমন একটি দিন সংঘটিত করবেন যেদিন সবাইকে তিনি একই ময়দানে একত্রিত করবেন এবং তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাবেন। ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিদান দেবেন।

এ বিবরণ উপস্থাপন করার পর আল্লাহ বলছেন, কেউ কি আছে যে উপরিউক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করবে? এ ধরনের পরিষ্কার ও স্বচ্ছ প্রমাণ- দস্ত াবেজ পাওয়ার পরও খুব কম লোকই আল্লাহকে নিয়ে ভাবে! আর এ আলোচনা থেকে খুব কম লোকই উপদেশ গ্রহণ করে।

## সূরা রূমের ২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্য হতে অন্যতম একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের পিতা হযরত আদম আ.-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের সবাইকে এক ফোঁটা নাপাক পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাদের সুন্দর মুখাবয়ব বানিয়েছেন। শুক্র থেকে জমাট রক্ত, এরপর মাংসপিণ্ডের আকৃতি দেয়ার পর হাড় বানিয়েছেন। আর হাড়গুলো মাংসের আবরণে ঢেকে দিয়েছেন। এরপর সেখানে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। চোখ, কান ও নাক সৃষ্টি করেছেন। মায়ের পেট থেকে নিরাপদে বের করে এনেছেন। অতঃপর দূর্বলতাকে শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করেছন। দিনে দিনে শক্তিশালী, মজবুত দেহ বিশিষ্ট ও সামর্থ্যবান মানুষে পরিণত করেছেন। বয়স দিয়েছেন। প্রাণোস্পন্দনের শক্তি যুগিয়েছেন। উপায়-উপকরণ দিয়েছেন। সৃষ্টিজীবের শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য উপকরণ দিয়েছেন। স্থলপথ ও জলপথ অতিক্রম করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের বাহন দিয়েছেন। স্মরণশক্তি, বোধশক্তি, কৌশল ও চিন্তা-ভাবনার জন্যে জ্ঞান দিয়েছেন। পার্থিব বিভিন্ন কাজ-কর্ম বুঝিয়েছেন। রিযিক ও সম্মান অর্জন করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। পাশাপাশি আখেরাতকে সুশোভিত করার জ্ঞান ও কর্মপদ্ধতিও শিখিয়েছেন। পবিত্র সেই আল্লাহ— যিনি প্রতিটি জিনিসকে যথাযথভাবে পরখ করতে পারেন এবং প্রতিটি জিনিসকে যথাযোগ্য স্থানে রাখেন। তিনি আকার-অবয়ব, কথা-বার্তা, দারিদ্রতা-ধনাঢ্যতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, ভালো-মন্দ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, সবাই যেন নিজের ও অন্যের মাঝে আল্লাহ তাআলার অসংখ্য-অগণিত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে।

মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ তাআলা গোটা জমিন থেকে এক মুঠো মাটি সংগ্রহ করে তা দিয়ে হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছেন। অতএব জমিনের ভিন্নতার মতো বনি আদমের শরীরও ভিন্ন ধরনের গাত্রবর্ণ হয়েছে। কেউ সাদা, কেউ লাল, কেউ কালো; কেউ

ভালো, কেউ মন্দ; কেউ সদাচারী, কেউ অনাচারী ইত্যাদি।

এরপর নবী সা. আরো বলেন, আল্লাহর কুদরতের আরো একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের ভেতর থেকেই তোমাদের জোড়া বানিয়েছে। যারা তোমাদের স্ত্রী ও তোমরা তাদের স্বামী হয়ে থাকো। আর এটা এজন্য যে, তোমরা তাদের থেকে সুখ, শান্তি ও স্থিতি অর্জন করবে। অন্য এক আয়াতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে অভিন্ন আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন। হযরত হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করেছেন হযরত আদম আ.-এর বুকের বাঁ দিকের হাড় থেকে। যে হাড়টি ছিলো সবচেয়ে ছোট। লক্ষণীয় বিষয় হলো, যদি আল্লাহ আমাদের জীবনসঙ্গিনী মানুষ জাতি থেকে সৃষ্টি না করতেন তাহলে আমাদের সংসার জীবন কখনই এমন বরকতপূর্ণ ও প্রীতিময় হতো না। এই ভালোবাসা ও আন্তরিকতার কারণ হলো, জাতি-গোষ্ঠী এক। যার ফলে আমাদের মনে পরস্পরের প্রতি বিরাজ করে ভালোবাসা, আন্তরিকতা, দয়া ও সৌহার্দ্য। অতএব এ ভালোবাসার কারণেই হয়তো পুরুষরা নারীদের খোঁজ-খবর নেয় এবং নারীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে। কারণ, তাদের সংসারে রয়েছে সন্তান। যাদের প্রতিপালন নির্ভর করে দু'জনের মিল-মিশের ওপর। মোটকথা, এমন অনেক কারণই আল্লাহ তাআলা রেখে দিয়েছেন। যেগুলোর কারণে মানুষ নিজ সাথী-সঙ্গিদের সাথে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করে। এগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর দয়া ও তাঁর সীমাহীন কুদরতের একটি অনন্য নিদর্শন। মানুষ সামান্য মনোযোগী হলেই সেখানে পৌঁছতে পারবে।

## সূরা রূমের ২২-২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوَانِكُمْ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○ وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ
ابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় তাতে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের (জীবিকা) অন্বেষণ তাঁর অনুগ্রহ থেকে। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বৈচিত্র্যময় কুদরতের এক অনন্য নিদর্শন হলো, তিনি অত্যুচ্চ আসমান সৃষ্টি করেছেন, সেখানে নক্ষত্রপুঞ্জের মিলনমেলা বসিয়েছেন, প্রতিটি নক্ষত্রকে দিয়েছেন অপরূপ বিভা। এগুলোর মধ্য থেকে কিছু নক্ষত্র চঞ্চল ও কিছু নক্ষত্র একস্থানে স্থির থাকে।

আল্লাহ এই জমিনকে সৃষ্টি করেছেন একটি মজবুত আকৃতিতে। কোথাও ঘন পত্র-পল্লবে সুশোভিত বাগান। কোথাও সারি সারি পর্বতের উঁচু-নিচু উপস্থিতি। কোথাও সমতল ভূমির বিস্তৃত ময়দান। সমুদ্র, নদী, পর্বত, পাথর ও গাছ-গাছালি দিয়ে আল্লাহ পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ পৃথিবীর সবাইকে এক ধরনের ভাষা দেননি। তিনি আরবদের যেই ভাষা দিয়েছেন, তাতারীদের সেই ভাষা দেননি। কুর্দি, রোমান, ইংরেজ, তুর্কি, বর্বর, হাবশী, হিন্দুস্তানী, ইরানী, আর্মেনিয়ান, আলজেরিয়ান তথা আল্লাহ-ই ভালো জানেন, পৃথিবীতে কতোগুলো ভাষায় মানুষ কথা বলে।

মানুষের ভাষার পার্থক্যের সাথে তাদের গায়ের বর্ণেরও পার্থক্যও আল্লাহ তাআলার কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ। কল্পনা করুন, কোনো এক সুবিশাল তেপান্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই এক দেশের এক অঞ্চলের এক গোত্রের সদস্য। তারপরও দেখবেন, তাদের পরস্পরে অবশ্যই কোনো না কোনো পার্থক্য রয়েছে। অথচ তারা প্রত্যেকেই আদম সন্তান। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিক থেকে তাদের সবার শরীর একই ধরণের। প্রত্যেকেরই রয়েছে দুটি চোখ, দুটি ভ্রু, এক নাক, দু'টি কান, এক কপাল, এক মুখ, দু'টি ঠোঁট, দু'টো গাল ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও তারা একেকজন অন্যজন থেকে অনেক ভিন্ন। দেখবেন তাদের বাচনভঙ্গি, অভ্যাস, আচরণ, কথাবার্তার ধরন ও ভাবপ্রকাশের শৈলীতে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কখনও কখনও আপনার মনে হতে পারে, এ দু'জন মানুষের সৌন্দর্য্য বা অসৌন্দর্য্য এক রকম। কিন্তু আপনি তাদের দু'জনকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখেন, তখন অবশ্যই তাদের প্রত্যেকের মাঝে এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাবেন, যা তাকে অন্যদের চেয়ে পৃথক করেছে। সবাই জানেন, এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব গুণাগুণ মহা শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী আল্লাহর দান। কাজেই আল্লাহকে চেনার অন্যতম মাধ্যম হলো তাঁর এই বৈচিত্র্যময় বিপুল সৃষ্টি।

ঘুমও আল্লাহর কুদরতের একটি নিদর্শন। এই ঘুম আমাদের শরীরের ক্লান্তি দূর করে প্রশান্তি ও প্রস্বস্তি এনে দেয়। এ জন্যেই আল্লাহ আমাদের বিশ্রামের জন্যে রাত দিয়েছেন। আর দিন দিয়েছেন কর্ম সম্পাদনের জন্যে; জীবিকা উপার্জন করতে। যা রাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিঃসন্দেহে শ্রবনশক্তি ও বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য এসব বিষয় কুদরতের নিদর্শন।

## সূরা রূমের ২৪-২৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىٖ بِهِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَ
الْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ۝

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে; তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে পুনর্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা অনুধাবন করে। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই নির্দেশে আসমান ও জমিন স্থিতিশীল থাকে। তারপর তিনি যখন তোমাদেরকে জমিন থেকে বের হয়ে আসার জন্য আহবান করবেন তখনই তোমরা বের হয়ে আসবে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের অন্যতম প্রমাণ ও নিদর্শন হচ্ছে, তাঁর নির্দেশে আকাশে বিজলী চমকায়। যা দেখে তোমরা ভয় পেয়ে যাও, এই বুঝি কাউকে ধ্বংস করে দেবে, নাকি ওপরে এসে পড়বে ইত্যাদি।

আবার কখনও তোমরা আশায় বুক বাধো যে, ভালোই হয়েছে। এখন বৃষ্টি নামবে। চারদিক পানি থৈ থৈ করবে এবং আবহাওয়া আর্দ্র হবে। তিনিই ওই আল্লাহ যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষন করেন। যে জমিন শুকিয়ে চৌচির হয়ে পড়েছিল; কোথাও সবুজ-শ্যামলিমার নাম-গন্ধও ছিল না; সবকিছু মৃতবৎ লাশের ন্যায় পড়েছিল, এখন এই বৃষ্টি পেয়ে সেই মাটিতে প্রাণের সঞ্চার ঘটবে। সেখানে সবুজের সমারোহ দেখা দেবে। নানা ধরনের ফসল ফলবে। নিশ্চয়ই এটা বুদ্ধিমানদের জন্য আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। এই নিদর্শন দেখে তারা নিশ্চিত অবহিত হন যে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা মৃত জমিন পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন, তদ্রূপ আমাদের মৃত্যুর পর তিনি আমাদেরকেও নতুন করে জীবিত করতে সক্ষম।

আল্লাহর কুদরতের আরেকটি নিদর্শন এটাও যে, তিনি আসমান ও জমিনকে সুস্থির রেখেছেন এবং তার পতনকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। হযরত উমর ইবনুল খত্তাব রা. যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কসম খাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন, 'ওই আল্লাহর কসম, যার নির্দেশে জমিন ও আসমান সুস্থির রয়েছে।' অতঃপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমান ও জমিন ভেঙ্গে ফেলবেন। আল্লাহ তাআলা শুধু একবার আওয়াজ দেবেন। শুধু এক আওয়াজ শুনেই সকল মুর্দা স্বীয় কবর থেকে জীবন্ত বেরিয়ে আসবে। যেমনটি অন্য এক আয়াতে এসেছে যে, 'স্মরণ করো সেদিনের কথা যেদিন আল্লাহ তোমাদের ডাকবেন। তোমরা তখন সপ্রশংস বাক্যের মাধ্যমে ডাকে সাড়া দেবে। সেদিন তোমাদের নিশ্চিত মনে হবে, কবরে তোমরা অল্প ক'দিনই ছিলে।'

এক আয়াতে এসেছে, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ —'শুধু এক আওয়াজেই তোমরা সকল মাখলুকাত হাশরের ময়দানে একত্র হবে।'

অন্য আয়াতে এসেছে– إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً، فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا

مُحْضَرُوْنَ—'তখন শুধু একটি আওয়াজ ধ্বনিত হবে। যা শুনে তোমরা সবাই আমার সামনে উপস্থিত হবে।'

## সূরা রূমের ২৬-২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

আর আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সব কিছুই তাঁর অনুগত। আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর জন্য অধিকতর সহজ। আসমান ও জমিনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ বলেন, আসমান ও জমিনে যতো মাখলুক আছে তার সবক'টি এক আল্লাহরই সৃষ্টি। সবাই তাঁর মালিকানাধীন। সবাই তাঁর গোলাম-বাঁদি। তাঁর সিদ্ধান্তের সামনে পৃথিবীর সবাই অসহায়, ক্ষমতাহীন ও নিরূপায়। আল্লাহ যেমন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তদ্রূপ এক সময় তিনি আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আর সৃষ্টি করার চেয়ে পুনরুজ্জীবিত করা অধিকতর সহজ।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে অস্বীকার করে; অথচ তাদের এটা উচিত নয়। তাঁরা আমাকে মন্দ বলে; এটাও তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। তারা অস্বীকার করে এভাবে বলে যে, যেভাবে তিনি আমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন; সেভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অনেকেই সহজ। আর তারা আমাকে এভাবে মন্দ বলে যে, আমার নাকি সন্তান রয়েছে; অথচ আমি একক-অদ্বিতীয়। আমার বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের কোনোটাই নেই।

মোটকথা, উভয় ধরনের সৃষ্টি আল্লাহর ক্ষমতায় রয়েছে। তাঁর জন্য কোনো কাজই অসম্ভব নয়। কোনো শাস্ত্রজ্ঞ বুযুর্গানে দীন বলেন, যদি কোনো পরিষ্কার-স্বচ্ছ পুকুর বা হাউজের মাঝে টলটলে পানি থাকে। আর সেই পানিকে যদি দখিনা হাওয়া এসে দুল না খাওয়ায় তখন তাতে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাবে। সূর্য ও নক্ষত্রগুলো পরিষ্কার দেখা যাবে। তদ্রূপ বুযুর্গানে দীনের অন্তরও। যে অন্তর সর্বদা আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পায়।

আল্লাহ তাআলা হলেন প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী; যাঁর ওপর কারো কোনো মত চলে না। সবকিছু তাঁর অধীনস্থ। সবাই তাঁর সামনে নিরূপায়, অসহায়,

দুর্বল ও অক্ষম। তাঁর কুদরত, প্রতাপ ও রাজত্ব প্রতিটি জিনিসকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনি মহান প্রজ্ঞাময়। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আদেশ-নিষেধ ও শরীয়তের সর্বত্র প্রজ্ঞার সমাহার দেখা যায়।

## সূরা রূমের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّ لِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করাতে পারেন এবং যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযানগুলো চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। আর তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

ব্যাখ্যা : বৃষ্টি আসার আগে এক ধরনের মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হওয়া। আর মানুষকে বৃষ্টির ব্যাপারে আশান্বিত করে তোলা, তারপর বৃষ্টি বর্ষণ করা যেন জনজীবনে সুখের বার্তা বয়ে আনে। জীবনের উন্মেষ ঘটায়। বৃষ্টির পানিতে টইটুম্বর হয়ে ওঠে নদ-নদী, খাল-বিল। নদীর বুকে ভেসে বেড়ায় নৌকা ও জলযান। কিছু কিছু জলযান চলে বাতাসের ওপর নির্ভর করে। সেই জলযানে করে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য, কামাই-রুজির জন্য এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে পারো। এগুলোও আমাদের ওপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত। কাজেই আমাদের অবধারিত দায়িত্ব হলো, আমরা প্রতিনিয়তঃ সেই আল্লাহর শোকর আদায় করবো।

## সূরা রূমের ৪৮-৫১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَ يَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ○ فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ○

তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে; অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে

ছড়িয়ে দেন এবং তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন, ফলে তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বারিধারা। অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের ওপর ইচ্ছা বারি বর্ষণ করেন, তখন তারা হয় আনন্দিত। যদিও এর আগে তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে তারা ছিলো নিরাশ। অতএব, তুমি আল্লাহর রহমতের নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃষ্টি দাও। কিভাবে তিনি জমিনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। নিশ্চয় এভাবেই তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা শস্যকে হলদে রঙের দেখতে পায়, তখন তো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ বলেন, আমি সেই বাতাস প্রেরণ করি যা সমুদ্রবক্ষ থেকে মেঘ উত্থিত করে নিয়ে যায়, অথবা আল্লাহ যেখান থেকে আদেশ করেন সেখান থেকে। সেই মেঘ আল্লাহ আকাশে ছড়িয়ে দেন। আপনি হয়তো দেখে থাকবেন, এক-দু' বিঘত দৈর্ঘের সেই মেঘ এক সময় দিগন্ত ঢেকে ফেলে। কখনও কখনও সমুদ্র থেকে আকাশের দিকে পানি উঠতে দেখা যায়। এটাকেই আল্লাহ তাআলা اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ শব্দে ব্যক্ত করেছেন। এরপর সেই পানিকে তিনি টুকরো, টুকরো আকারে; ভাজবিশিষ্ট বানিয়ে দেন। ওই পানিগুলো একসময় আকাশের বুকে কালো রং ধারণ করে। এরপর ধীরে ধীরে জমিনের কাছে চলে আসে। তারপর ওই মেঘমালা থেকে একসময় বৃষ্টির ঘন বর্ষণ শুরু হয়। এই বৃষ্টি যেই এলাকায় বর্ষিত হয় তাদের ভাগ্য খুলে যায়।

অতঃপর বলেন, এই লোকগুলোই এক সময় বৃষ্টি থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছিলো। তারা আশাহত হওয়ার পর তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে পানি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ বৃষ্টি হওয়ার পূর্বে তারা এই বৃষ্টির মুখাপেক্ষী ছিল। কিন্তু প্রয়োজনের সময় বৃষ্টি না হওয়ার কারণে তারা একটা সময় ভীষণভাবে নিরাশ হয়ে পড়ে। তাদের সেই নৈরাশ্যের পর হঠাৎ এক সময় প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং প্রচণ্ড বৃষ্টিতে তাদের এতোদিনের চৌচির ভূমিগুলো ভিজে ওঠে। দুর্ভিক্ষের পর জনজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য নেমে আসে। দিগন্ত জুড়ে যতো দূর দৃষ্টি যায় সর্বত্র সবুজের সমারোহ দেখা দেয়। আল্লাহ বলছেন, আমার এই নিদর্শন দেখে তোমরা বুঝে নাও, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের চোখের সামনে মৃত শস্যক্ষেত নতুন করে জীবিত করতে পারেন, সেই আল্লাহ একদিন মৃত লাশগুলোকে কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত করতেও সক্ষম। যদিও কবরে ওই লাশগুলো পঁচে-গলে নষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ সব কিছুর ওপর সক্ষমতা রাখেন। আল্লাহর এতোগুলো নিদর্শন দেখার পরও কী ভাবে তোমরা তা অস্বীকার করো। সূরা ওয়াকিয়ার মাঝে أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ থেকে শুরু করে

يُحْزَنُوْنَ পর্যন্ত আল্লাহ এ আলোচনাই করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, বাতাস আট প্রকার। এর মধ্য হতে চার প্রকার বাতাস রহমত। চার প্রকার বাতাস আযাব। রহমতের বাতাস হলো, ذاريات، مرسلات، مبشرات، ناشرات। আর আযাবের বাতাস হলো, عقيم، صرصر، عاصف، قاصف। এর মধ্য হতে প্রথম দু'টি বাতাস প্রবাহিত হয় স্থলভাগে। আর শেষোক্ত দু'টি প্রবাহিত হয় জলভাগ থেকে।

নবী কারীম সা. বলেন, বাতাস আল্লাহর নির্দেশে প্রবাহিত হয়। আল্লাহ তাআলা যখন আদ জাতিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি বাতাস পরিচালনাকারী ফেরেশতাকে নির্দেশ করলেন। সে তখন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ! আমি কি বাতাসের ভাণ্ডারের মাঝে এ পরিমাণ ছিদ্র করবো যে পরিমাণ ছিদ্র বলদের নাক হয়? আল্লাহ বললেন, না। এতো ছিদ্র করো না। তখন তো গোটা জমিন ও তার মধ্যস্থিত সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে, বরং মেপে নাও যে পরিমাণ ছিদ্র আংটিতে হয়।

দেখুন, এতোটুকু ছিদ্র দিয়ে যেই বাতাস প্রবাহিত হয়েছিলো, ওই বাতাস যেদিক দিয়ে অতিক্রম করেছে সেই জনপদকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। আজ কোথাও তাদের যৎসামান্য চিহ্ন-ও নেই।

## সূরা রূমের ৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ○

তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল অবস্থায় এবং দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন। আর শক্তির পর তিনি আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

ব্যাখ্যা : আপনি যদি মানবজীবনের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন, প্রথমত তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়। এরপর শুক্র থেকে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর সেটি পরিণত হয় এক টুকরো মাংসে। এরপর সেখানে হাড্ডির উন্মেষ ঘটে। তারপর হাড্ডির ওপর মাংসের প্রলেপ জড়ানো হয়। এরপর তার মাঝে রূহ ফুঁকা হয়।

অতঃপর সে মায়ের পেট থেকে অত্যন্ত দুর্বল ও হালকা-পাতলা হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর সে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে সে মজবুত হতে থাকে। শৈশব-কৈশোর মন্থন করে এক পর্যায়ে সে যৌবনে উপনীত হয়। এক পর্যায়ে এসে তার ক্রমবিকাশ স্থিতি লাভ করে ও থেমে যায়। এরপর আস্তে

আস্তে তার শক্তিতে চিড় ধরতে শুরু করে। শক্তি-সামর্থ্য হ্রাস পেতে থাকে এবং বার্ধক্যে উপনীত হয় ও বৃদ্ধ হয়ে যায়।

মানুষের জীবনে এই যে শক্তির পর শক্তিহীনতা; এখানেও আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সাহস হারিয়ে ফেলে। দেখাশোনা, চলাফেরা, ওঠাবসা, ধরা, লাফানো– মোটকথা সর্বপ্রকার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ভাঁজ পড়ে যায়। কপাল কুচকে যায়। দাঁত পড়ে যায়। চুল সাদা হয়ে যায়। এগুলো হলো বার্ধক্যের অনিবার্য অনুষঙ্গ। এ সবকিছু মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে। ভাঙাগড়া তাঁর কুদরতের খুবই সামান্য কারিশমা। সমস্ত সৃষ্টিজীব তাঁর গোলাম। তিনি সবার মালিক। তিনি সবকিছু জানেন; সবকিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন। তাঁর মতো জ্ঞান যেমন কারো নেই; তদ্রূপ তাঁর মতো ক্ষমতাবান পৃথিবীর কোনো সৃষ্টিজীবের নেই।

## সূরা লুকমানের ১০-১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ اَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন—যা তোমরা দেখছ, আর জমিনে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে, আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু; আর আকাশ থেকে আমি পানি বর্ষণ করি। অতঃপর তাতে আমি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ উদ্‌গত করি। ইহা আল্লাহর সৃষ্টি; অতএব তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাঁর সর্বময় কুদরতের আলোচনা করে বলছেন, জমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সমস্ত মাখলুকাতের তিনিই একক স্রষ্টা। তিনিই আসমানকে কোনো ধরনের খুঁটি বা স্তম্ভ ব্যতিরেকে উঁচু রেখেছেন। বাস্তবেই এই সুবিশাল আকাশের কোথাও কোনো খুঁটি নেই। জমিনকে সুস্থির রাখার জন্যে; কোনো ধরনের ঝাকুনি না দেওয়ার জন্যে তিনি জমিনের বুকে পাহাড়ের পেরেক মেরে দিয়েছেন। যার ফলে মাটির কম্পন ও নড়াচড়া থেকে তোমরা নিরাপদে আছো। আল্লাহ তাআলা জমিনের বুকে বিভিন্ন প্রজাতির জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন; যাদের মোট সমষ্টি আজ পর্যন্ত কেউ চূড়ান্তভাবে দিতে পারেনি।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ প্রথমে তাঁর 'খালিক' বা স্রষ্টা হওয়া সম্পর্কে

আলোচনা করেছেন। এখন তিনি তাঁর 'রাযিক' বা রিযিকদাতা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করছেন— তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে জমিনের বুকে বিচিত্র ফল-ফলাদি ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন। যা দেখতে দৃষ্টিনন্দন; স্বাদে অত্যন্ত সুস্বাদু, ক্ষতিমুক্ত, অত্যন্ত উপকারী। শা'বী রহ. বলেন, মানুষও এই মাটির ফসল। জান্নাতী মানুষ সম্মানিত ফসল। আর জাহান্নামী নিম্ন প্রকৃতির মানুষ। আল্লাহ বলছেন, আমার গোটা সৃষ্টিজগৎ তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। তোমরা আমাকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করো, বলোতো– তাদের সৃষ্টি কোথায়? যদি তাদের কোনো সৃষ্টি না থাকে তাহলে তারা স্রষ্টা নয়। আর যে স্রষ্টা নয় সে কখনই উপাসনার যোগ্য হতে পারে না। যারা তাদের উপাসনা করছে তারা অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায়মূলক কাজ করছে। কাজেই যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাদের চেয়ে বেশী অন্ধ, বধির, নির্বোধ, মূর্খ ও হতভাগা আর কে হতে পারে!

## সূরা লুকমানের ২০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَ اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً ؕ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ○

তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে। আর তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ ব্যাপক করে দিয়েছেন; মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে জ্ঞান, হিদায়াত ও আলো দানকারী কিতাব ছাড়া।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামতের কথা প্রকাশ করে বলছেন, দেখো, আকাশের নক্ষত্রগুলো তোমাদের কাজেই লিপ্ত রয়েছে। সেগুলো নিজের দীপ্তি ছড়িয়ে তোমাদের জন্যে আলোর ব্যবস্থা করছে। মেঘ, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বর্ষা— সবই তোমাদের জন্যে উপকারী। খোদ আসমান তোমাদের জন্যে সুরক্ষা দানকারী মজবুত ছাদ। মাটির ওপর এঁকেবেঁকে চলা নদী, ঝরনা, সমুদ্র, গাছ, শষ্যক্ষেত, ফুল-ফল— এসব নেয়ামতও আল্লাহ তোমাদের দিয়ে রেখেছেন। এগুলো হলো বাহ্যিক নেয়ামত।

এর বাইরে অসংখ্য বাতেনি নেয়ামতও রয়েছে। যেমন, তিনি রাসূল পাঠিয়েছেন। কিতাব নাযিল করেছেন। তোমাদের অন্তর থেকে বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে বিচিত্রসব নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন। উচিত ছিলো, সমস্ত মানুষ তাঁর সত্তার ওপর ঈমান আনা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অনেকে এখন পর্যন্ত স্রষ্টাকে নিয়েই বিতর্কে লিপ্ত। শুধু অন্ধ অনুকরণ ও মূর্খতাসুলভ আনুগত্যের জিঞ্জিরে তারা আবদ্ধ রয়েছে।

## সূরা লুকমানের ২৫-২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ○

আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন'? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না'। আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; নিশ্চয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা বলছেন, মুশরিকরা এ কথা মানে যে, সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই একক স্রষ্টা। এরপরও তারা অন্যদের ইবাদত করে। অথচ সে উপাস্যদের সম্পর্কে তারা এ কথা ভালোভাবে জানে যে, তারাও আল্লাহর সৃষ্টি ও একান্ত অনুগত। আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের স্রষ্টা কে? ওরা পূর্ণ সততার সঙ্গে জবাব দেবে, আল্লাহ। তাহলে বলুন, আল্লাহর শোকর যে, তোমরা এতোটুকুও তো স্বীকার করেছো।

আসল কথা হলো, অধিকাংশ মুশরিক অজ্ঞ হয়ে থাকে। আকাশ ও জমিনের প্রতিটি ছোট-বড়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু একান্ত তাঁরই মালিকানাধীন। তিনি সবার থেকে অমুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। প্রশংসা ও স্তুতির একমাত্র তিনিই উপযুক্ত। সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও বিধি-বিধান আরোপের ক্ষেত্রেও তিনিই প্রশংসার দাবিদার। তিনিই সকল গুণ ও কল্যাণের অধিকারী।

## সূরা লুকমানের ২৭-২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং তার সঙ্গে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ লিখে শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতই। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাঁর সম্মান, বড়ত্ব, বুযুর্গী, শ্রেষ্ঠত্ব ও কুদরতের সীমাহীন ক্ষমতার কথা আলোচনা করে বলছেন। তাঁর পূতঃপবিত্র বৈশিষ্ট্যাবলি, অত্যুচ্চ নিদর্শনের কথা আলোচনা করেছেন। যা না কেউ গুণে শেষ করতে পারবে, না কেউ তালিকাবদ্ধ করতে পারবে, না কেউ বেষ্টন করতে পারবে, আর না কেউ মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে পারবে। নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন—

لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার নেয়ামতসমূহ গুণে শেষ করতে পারবো না। আপনি সেই প্রশংসারই উপযুক্ত; যা আপনি নিজ সম্পর্কে বলেছেন।

আলোচনার সূত্র ধরে আল্লাহ বলেন, যদি ভূপৃষ্ঠের সবগুলো বৃক্ষ কলম বানানো হয় আর সবগুলো সমুদ্রের পানিকে কালি বানানো হয়। আর সেই কালি-কলম দিয়ে আল্লাহর বড়ত্ব, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, বুযুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ লেখা শুরু হয় তাহলে দেখা যাবে, একটা সময় কালি শেষ হয়ে যাবে এবং কলম নষ্ট হয়ে যাবে; কিন্তু একক ও অংশীদারহীন আল্লাহর প্রশংসাবাক্য শেষ হবে না। কেউ যেন এ কথা মনে না করে, সাতটির অধিক সমুদ্র রয়েছে। কাজেই সেই সমুদ্রগুলোর কালি আল্লাহর প্রশংসাবাক্য লেখার জন্যে যথেষ্ট হবে। আসলে সমুদ্রের ক্ষেত্রে 'সাত সংখ্যা' বলা হয়েছে শুধু গণনা করার জন্যে। কেউ যেন এ কথা মনে না করে, সাত সমুদ্র রয়েছে এবং পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে। অবশ্য সমুদ্র সাতটি হওয়ার ওপর বনি ইসরাঈলী এমন রেওয়ায়েত রয়েছে যে, সেই রেওয়ায়েতগুলোকে আমরা সত্য-মিথ্যা কোনোটাই বলতে পারি না। তবে হ্যাঁ, আমরা যে কথা বলেছি তার সমর্থন এ আয়াত থেকেও হয় যে, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا الخ — যদি সমুদ্রগুলো কালিতে পরিণত হয় আর তা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসাবাক্য লেখা শুরু হয় তাহলে আল্লাহর প্রশংসাবাক্য লেখার পূর্বেই সমুদ্রের কালিগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। এমনকি এরপর যদি তার সমপরিমাণ এমন আরো সমুদ্রের সাহায্য নেওয়া হয়, সেটাও নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য শুধু এই ধরণের সমুদ্র নয়, বরং আরো যতো সমুদ্রই নিয়ে আসা হোক; আল্লাহর প্রশংসাবাক্য লেখে কখনই পূর্ণ করতে পারবে না।

হাসান বসরী রহ. বলেন, যদি আল্লাহ তাআলা লেখাতে শুরু করেন যে, এটা আমার নির্দেশ। ওটা আমার নির্দেশ। তখন সবগুলো কলম ভেঙ্গে যাবে। সবগুলো সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে। মুশরিকরা বলতো, আল্লাহর এই কালাম এখনই শেষ হয়ে যাবে। এই আয়াতে তাদের সে কথা খণ্ডন করা হয়েছে যে, আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর তালিকা যেমন শেষ হবে না, তাঁর

জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশলের বিবরণও শেষ হবে না। তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলি, গুণাবলি ও জ্ঞানের ব্যাপকতাও শেষ হবে না। আল্লাহর জ্ঞানের বিপরীতে পৃথিবীর সকল মানুষের জ্ঞানের উদাহরণ হলো, বিশাল সমুদ্রের মুকাবেলায় এক ফোঁটা পানি। আল্লাহর কথা না কখনো ধ্বংস হবে না, আর না তা কেউ উপলব্ধি করতে পারবে। আমরা তাঁর যা কিছু প্রশংসা করি; আল্লাহ তারও অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

একবার একদল ইহুদি পণ্ডিত মদীনা মুনাওয়ারায় নবী কারীম সা.-কে বলেছিলো, আপনি যে কুরআন পড়েন-وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً. —তোমাদেরকে খুবই অল্প জ্ঞান দেয়া হয়েছে, এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য? আমরা নাকি আপনার জাতি উদ্দেশ্য?

নবী কারীম সা. বলেন, সবাই উদ্দেশ্য।

তারা বললো, তাহলে আল্লাহর কালামের এই আয়াতের কী অর্থ? যেখানে বলা হয়েছে যে, 'তাওরাতের মাঝে সব জিনিসের আলোচনা রয়েছে'?

নবী কারীম সা. বললেন, শোনো— 'তাওরাত সহ তোমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহর বানীসমূহের তুলনায় অনেক কম। তোমাদের জন্যে যতোটুকু যথেষ্ট মনে করেছেন, ততোটুকুই আল্লাহ নাযিল করেছেন।' নবীজীর এ কথার সমর্থনে ওই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ থেকে বুঝা যায় যে, আয়াত মাদানী হওয়া উচিত অথচ প্রশিদ্ধ হলো, আয়াতটি মক্কি। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। পৃথিবীর সব কিছু তাঁর সামনে অক্ষম ও অসহায়। কেউ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারবে না। কথা, কাজ, শরীয়ত, বিচক্ষণতা ও সকল বৈশিষ্ট্যাবলির ক্ষেত্রে তিনি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও মহাপরাক্রমশালী।

এরপর আল্লাহ বলেন, সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে মেরে ফেলার পর জীবিত করা আমার জন্য এমনই সহজ যেমন– এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা ও মৃত্যু দেওয়া। তাকে তো কোনো কথার নির্দেশ দিলেই যথেষ্ট। চোখের এক পলক দিতে যতক্ষণ লাগে। দ্বিতীয়বার বলতে হবে না। কোনো উপকরণ ও মাধ্যমেরও প্রয়োজন হবে না। এক নির্দেশেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে এবং একটি আওয়াজেই সবাই জেগে ওঠবে। আল্লাহ সবার কথা শোনেন। সবার কাজের কথাও জানেন। কারো কথা ও কর্ম যেমন আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না; তদ্রূপ সমগ্র পৃথিবীর কাজও তাঁর কাছে গোপন থাকে না। আল্লাহু আকবার।

## সূরা লুকমানের ২৯-৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ○

তুমি কি দেখনি, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান? আর তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই চলছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় আল্লাহ-ই সত্য এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আর নিশ্চয় আল্লাহই হলেন সর্বোচ্চ, সুমহান।

ব্যাখ্যা : কখনও রাতকে সামান্য কমিয়ে দিন বড় করা, আবার কখনও দিনকে ছোট করে রাত বড় করার কাজটি আল্লাহই করেন। শীতকালে দিন ছোট ও রাত বড় হয়। আর গ্রীস্মকালে দিন বড় ও রাত ছোট হয়। এটি আল্লাহর কুদরতেরই অনন্য প্রকাশ। সূর্য ও চন্দ্র তাঁরই অনুগত। তাদের নির্ধারিত কক্ষপথেই চলছে। কিয়ামত পর্যন্ত নিয়মিত একইভাবে চলতে থাকবে। নিজস্ব কক্ষপথ থেকে সামান্য পরিমাণও এদিক-সেদিক হবে না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সা. হযরত আবু যর রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, এই সূর্য কোথায় যায়? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-ই ভালো জানেন। নবীজী সা. বলেন, এটি আল্লাহর আরশের নিচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং আল্লাহর কাছে পরবর্তী দিন উদিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। সেই দিন বেশ সন্নিকটে যেদিন আল্লাহ বলবেন, হে সূর্য! তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সূর্য হলো– বহমান নদীর ন্যায়। দিনের বেলা সে তার কক্ষপথে বিরাজমান থাকে। সন্ধ্যায় অস্তমিত হয়ে রাতে আবার জমিনের নিচে ঘুরতে থাকে। এভাবে সে পুনরায় পূর্ব দিগন্ত থেকেই উদিত হয়। তদ্রূপ চাঁদও। আল্লাহ তাআলা তোমাদের আমল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। যেমন বর্ণিত আছে, তুমি কি জানো না যে আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর ব্যাপারে আল্লাহ অবগত। তিনি সবার স্রষ্টা। তিনিই সবার সম্পর্কে সম্যক অবগত। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং সমান সংখ্যক জমিন বানিয়েছেন।...

আল্লাহ তাআলা তাঁর এই নিদর্শনাবলী এজন্যে প্রকাশ করেছেন, তোমরা যেন তা থেকে আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর ঈমান আনো এবং আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুকে ভ্রান্ত মনে করো। আল্লাহ সবার থেকে অমুখাপেক্ষী ও নির্ভীক। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর দুয়ারের ভিখারী। সবাই তাঁর সৃষ্টি ও তাঁর গোলাম। পৃথিবীর কেউ আল্লাহর সিদ্ধান্তের বাইরে এক চুল পরিমাণ নড়ার ক্ষমতা রাখে না। যদিও সমস্ত সৃষ্টিজীব মিলে এই ইচ্ছা করে যে, তারা একটি মাছি বানাবে। তাদের এই চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়বে এবং এতটুকু সক্ষমতাও কখনো দেখাতে পারবে না। আল্লাহ সর্বোচ্চ মহিয়ান। তাঁর ওপরে কেউ নেই। তিনি সবার চেয়ে বড়। কোনো কিছু তাঁর সমকক্ষ নয়। আল্লাহর বড়ত্বের সামনে সবাই ছোট, ক্ষুদ্র ও একান্ত তুচ্ছ। সুবহানাল্লাহ!

## সূরা লুকমানের ৩১-৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○ وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ○

তুমি কি দেখোনা যে, নৌযানগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু দেখাতে পারেন। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য রয়েছে নিদর্শন। আর যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছাদিত করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন তারা একনিষ্ঠ আনুগত্যে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান, তখন তাদের কেউ কেউ (ঈমান ও কুফরীর) মধ্যপথে থাকে। কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার নির্দেশে সমুদ্রবক্ষে বিভিন্ন নৌযান চলাচল করে। আল্লাহ যদি পানির মাঝে নৌযান ভাসিয়ে রাখার ও পানি অতিক্রম করে নৌযানকে সামনে এগিয়ে যাবার শক্তি না দিতেন তাহলে নৌযান পানিতে কিভাবে চলতে পারতো? আল্লাহ এভাবে তোমাদেরকে তাঁর কুদরতের নিদর্শন দেখাচ্ছেন। বিপদে ধৈর্যধারণ ও শান্তির দিনগুলোতে শোকর আদায়কারীগণ সেখান থেকে অনেক কিছু শিক্ষা অর্জন করতে পারবে। যখন ওই কাফেরদেরকে সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গ ঘিরে ফেলে আর তাদের নৌযান দুলতে থাকে– এবং ঢেউগুলো পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে এপাশ থেকে ওপাশ ও ওপাশ থেকে এপাশ আঁছড়ে পড়তে থাকে তখন তারা তাদের কুফরী ও শিরক বেমালুম

ভুলে যায় এবং কান্নাকাটি করে এক আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। আরো বলা হয়েছে— وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ সাগরবক্ষে যখন তোমাদের ওপর বিপদ নেমে আসে তখন তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য সবাইকে ভুলে যাও। فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ তাদের ওই সময়ের অক্ষমতার ওপর যদি আমার দয়া এসে যায়, যখন তাদেরকে সমুদ্র পাড় করে দেই। তখন কিছুলোক ব্যতিরেকে অন্যরা পূর্বের কুফুরিতে ফিরে যায়। মুজাহিদ রহ. এই তাফসীর করেছেন। যেমন, আল্লাহ তাআলার এ কথা إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ–এর শাব্দিক অর্থ হলো, তাদের কেউ কেউ মধ্যবর্তী পর্যায়ের হয়ে থাকে। ইবনে যায়েদ রহ. অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলার এ কথা فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ তাদের কেউ কেউ জালিম হয়। কেউ কেউ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। হতে পারে, দু'টি অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যারা সমুদ্রের এই ভীতিপ্রদ অবস্থা দেখেছে আর পরবর্তীতে নিষ্কৃতি পেয়েছে তাদের উচিত ছিলো, পরিপূর্ণভাবে নেককাজের চেষ্টা করা। কিন্তু তা না করে মাঝপথেই রয়ে যায়। পূর্বের মতো দ্বৈত ভূমিকায় ফিরে যায়। আর কেউ কেউ পূনরায় কুফুরিতে ফিরে যায়।

## সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ুতে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

ব্যাখ্যা : গায়েবের ওই বিষয়গুলোর জ্ঞান যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু আল্লাহ যদি কাউকে অবহিত করান, তাহলে জানা সম্ভব। নয়তো সম্ভব নয়। কিয়ামত কবে সংঘঠিত হবে, তা যেমন কোনো নবী জানেন না, তদ্রূপ কোনো নৈকট্যশীল ফেরেশতাও জানেন না। কিয়ামতের সঠিক সময় এক আল্লাহই জানেন। তদ্রূপ বৃষ্টি কখন কোথায় ও কী পরিমাণ বর্ষিত হবে, সে বিষয়েও কেউ জানে না। হ্যাঁ, আল্লাহ যখন নির্দেশ করেন তখন বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা জানতে পারেন। তদ্রূপ, গর্ভবতী মহিলার গর্ভে কী আছে, তাও শুধু আল্লাহই জানেন। হ্যাঁ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন কোনো ফেরেশতাকে এই গর্ভজাত ভ্রূণের দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন সে জানতে পারে, গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে, সৎ না অসৎ। তদ্রূপ এ কথাও

কেউ জানে না যে, সে কাল কী করবে? কোথায় মারা যাবে? আয়াতে শুধু এতোটুকু বলা হয়েছে যে, وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ— 'আল্লাহর কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি; তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না'। হাদীসে বলা হয়েছে, গায়বের চাবিকাঠি বলতে উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয় উদ্দেশ্য। মুসনাদে আহমদের এসেছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, পাঁচটি বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এরপর নবীজী উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন। বুখারী শরীফের বর্ণনায় এ কথা এসেছে যে, এগুলো হলো সেই পাঁচটি গায়বের চাবিকাঠি যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় নবী কারীম সা.-এর এ বাণী এসেছে যে, আমাকে সকল বিষয়ের চাবি প্রদান করা হয়েছে, তবে এ পাঁচটি বিষয় জানানো হয়নি। এরপর নবীজী সা. এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সা. একদিন আমাদের মজলিসে বসাছিলেন। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলেন।

জিজ্ঞেস করলো— হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী?

নবীজী বললেন, ঈমান হলো— তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর সকল কিতাব, তাঁর সমস্ত রাসূল, পরকাল ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর ঈমান রাখবে।

এরপর জিজ্ঞেস করলো— ইসলাম কী?

নবীজী বললেন, ইসলাম হলো— এক আল্লাহর ইবাদত করা। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা। নামায আদায় করা। যাকাত দেওয়া। রমাযানে রোযা রাখা।

এরপর জিজ্ঞেস করলো— ইহ্সান কী?

নবীজী বললেন, ইহ্সান হলো— তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো; আর যদি এমন মনে না হয় তাহলে এমনটা মনে করো যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

এরপর জিজ্ঞেস করলো— কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

নবীজী বললেন, এ বিষয়ে না আমার জানা আছে না তোমার। তবে হ্যাঁ, আমি এর কিছু আলামত তুলে ধরছি। যখন বাঁদী তার মনিবকে জন্ম দেবে। যখন নগ্ন পা ও উলঙ্গ শরীর বিশিষ্ট লোকেরা জাতির সর্দার হবে। কিয়ামত হলো ওই পাঁচ বিষয়ের একটি; যার জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। এরপর নবীজী উপরিউক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন। এতোটুকু কথাবার্তার পর লোকটি চলে গেলো।

সে চলে যাওয়ার পর নবী কারীম সা. সাহাবীদের বললেন, যাও। তাঁকে

ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন; কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখা গেল না। নবীজী বললেন, তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল আ.। তিনি মানুষদেরকে দীন শেখানোর উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।' [সহীহ বুখারী]

মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হযরত জিবরাঈল আ. তাঁর হাতের তালু নবী কারীম সা.-এর হাঁটুর ওপর রেখে এই প্রশ্নগুলো করেছিলেন, ইসলাম কাকে বলে? উত্তরে নবীজী বললেন, তুমি তোমার চেহারা আল্লাহর দিকে মনোযোগী করো এবং এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ অংশীদারহীন একক উপাস্য ও মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। যখন তুমি এ কাজ করে নিবে তখন মুসলমান হয়ে যাবে। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কাকে বলে? বললেন, আল্লাহ, কিয়ামত দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের ওপর বিশ্বাস রাখা। মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে মেনে নেয়া। জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, মীযান ও তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, যখন আমি এইরূপ করে নিবো তখন আমি কি মুমিন হয়ে যাবো? নবীজী বললেন, হ্যাঁ।

অতঃপর লোকটি ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলা হলো– যা ওপরে উল্লেখ হয়েছে। এরপর কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবীজী বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটি ওই পাঁচটি বিষয়ের একটি যা শুধু আল্লাহই অবগত আছেন। এরপর নবীজী প্রাগুক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। কিয়ামতের আলামতে এটাও উল্লেখ আছে যে, মানুষ উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করবে।

বনূ আমের গোত্রের এক লোক নবী কারীম সা.-এর কাছে হাজির হয়ে বললো, আমি আসবো? নবীজী তখন নিজের এক খাদেমকে পাঠিয়ে বললেন, যাও। ওকে শিষ্টাচার শেখাও। সে অনুমতি চাইতে জানে না। তাকে বলো, প্রথমে সালাম করবে। এরপর জিজ্ঞেস করবে, আমি কি আসতে পারি? লোকটি নবীজীর মুখের কথা শুনে ফেললো। এবার যথানিয়মে সালাম করলো। অতঃপর ভেতরে আসার অনুমতি চাইলো। অনুমতি পেয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনি আমাদের জন্যে কী নিয়ে এসেছেন? নবীজী বললেন, কল্যাণ নিয়ে এসেছি। শোনো, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করবে। লাত-উয্যা ছেড়ে দেবে। দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। বছরে এক মাস রোযা রাখবে। তোমাদের ধনীগণ নিজেদের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে গরিবদের মাঝে বণ্টন করবে। লোকটি তখন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কোনো জ্ঞান কি রয়েছে, যা আপনি জানেন না? নবীজী বললেন, হ্যাঁ, কিছু বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এরপর নবীজী উপরিউক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।

মুজাহিদ রহ. বলেন, এক গ্রাম্য লোক এসে নবী কারীম সা.-কে প্রশ্ন

করলো যে, আমার স্ত্রী গর্ভবতী। বলুন, সে কী সন্তান জন্ম দেবে? আমাদের অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ চলছে। বলুন, কখন বৃষ্টি হবে? আমি জানি, আমি কবে জন্মগ্রহণ করেছি। এখন আপনি বলুন, আমার মৃত্যু কবে হবে? এর উত্তরে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় যে, আমার এই বিষয়গুলোর জ্ঞান নেই। মুজাহিদ রহ. বলেন, এসবই হলো গায়েবের চাবি– যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, গায়েবের চাবিসমূহ আল্লাহর কাছেই। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, কেউ যদি তোমাকে বলে যে, রাসূল সা. আগামীকালের কথা জানতেন তখন বুঝে নিয়ো, ওই লোকটি চরম মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আগামীকাল কি হবে তা কেউ জানে না।

হযরত কতাদাহ রহ. বলেন, এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহ কাউকে দেননি। না কোনো নবীকে, না কোনো ফেরেশতাকে। আল্লাহ তাআলাই জানেন, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে। কোন বছর, কোন মাস, দিন না রাতে কিয়ামত সংঘটিত হবে তা কেউ জানে না। তদ্রূপ বৃষ্টির জ্ঞানও আল্লাহ ছাড়া কারো নেই যে, কখন বৃষ্টি হবে? কেউ জানে না, গর্ভবতী মহিলার পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে? সাদা হবে, না কালো হবে? নেককার হবে, না বদকার হবে? জীবিত হবে, না মৃত হবে? হতে পারে কালই মৃত্যু অথবা কোনো বিপদ আসবে। না কারো একথা জানা আছে যে, তাকে কোনো দেশে দাফন করা হবে, না সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হবে, না জঙ্গলে মারা যাবে? নরম ভূমিতে দাফন করা হবে, না পাথুড়ে ভূমিতে?

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন কারো মৃত্যু অন্য কোনো স্থানে লেখা থাকে তখন তার সেখানেরই কোনো কাজের প্রয়োজন চলে আসবে। আর সেখানেই তার মৃত্যু হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ কথা বলার পর নবীজী উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।

এক রেওয়ায়েতে এসেছে, কিয়ামতের দিন জমিন আল্লাহ তাআলাকে এ কথা বলবে যে, নিন, এগুলো আপনার সেই আমানত– যা আপনি আমাকে সঁপে ছিলেন। তাবরানী ও অন্যান্য কিতাবে এ হাদীসটি এসেছে।

## সূরা সেজদার ৪-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا شَفِیْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الْاَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ اِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ○

আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন। তারপর তা একদিন তাঁর কাছেই উঠবে। যেদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছর। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত, মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ছয় দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এরপর আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হন। তিনিই আমাদের স্রষ্টা ও অধিপতি। পৃথিবীর সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে। তিনিই সকল কাজের ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। সবকিছুর ওপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য। তিনি ছাড়া সৃষ্টিকুলের না কোনো অভিভাবক আছে, আর না তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে। হে লোক সকল! যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করো, অন্যের ওপর নির্ভর করো, তোমরা কি এ কথা বোঝো না, যিনি এতো সুবিশাল ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনি কী কারণে কাউকে নিজের অংশীদার বানাবেন? আল্লাহ যে কোনো ধরনের সমকক্ষতা; মন্ত্রী-উজির ও পরামর্শকের প্রয়োজনীয়তা; শরীক ও অংশিদারের প্রতি নির্ভরতা থেকে পূত-পবিত্র। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নেই। তিনি ছাড়া অন্য কোনো প্রতিপালকও নেই।

নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. আমার হাত ধরে বলেন, আল্লাহ তাআলা জমিন, আসমান ও এগুলোর মধ্যবর্তী সকল জিনিস সৃষ্টি করে সপ্তম দিন আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হন। তিনি শনিবার জমিন সৃষ্টি করেন। পাহাড় সৃষ্টি করেন রোববার। গাছপালা সোমবার সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার সকল মন্দ জিনিসগুলো ও বুধবার 'নূর' সৃষ্টি করেন। জীব-জন্তুগুলোকে সৃষ্টি করেন বৃহস্পতিবার। আর শুক্রবার দিবসের শেষভাগে হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় রাতের শেষাংশে। তিনি তাঁকে এমন মাটি থেকে সৃষ্টি করেন যা সংগৃহীত হয়েছিলো গোটা ভূপৃষ্ঠ থেকে। যার মধ্যে লাল, সাদা, কালো, ভালো-মন্দ তথা সব ধরনের মাটি ছিলো। এ কারণেই আদম সন্তানদের মাঝে ভালো-মন্দের মিশ্রণ রয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ সাত আসমানের ওপর অবতীর্ণ হয় এবং পৌঁছে যায় সাত জমিনের নিচে। যেমন অন্য আয়াতে আছে— اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ। 'আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ সংখ্যক জমিন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নির্দেশ সেগুলোর মাঝে অবতীর্ণ হয়।'

সবার আমলনামা ওঠানো হয় তাঁর ভাণ্ডারে। যা দুনিয়ার আসমানের ওপর অবস্থিত রয়েছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে দুনিয়ার আসমানের দূরত্ব পাঁচশ' বছরের রাস্তা এবং তার অন্তরেরও সমান দূরত্ব। এই দীর্ঘ পথ আল্লাহর কুদরতি ফেরেশতারা চোখের এক পলকেই অতিক্রম করেন। এ কারণেই তিনি বলেছেন, তোমরা যার গণনা করে বলো এক হাজার বছর আল্লাহর কাছে তা একদিনের সমান। আল্লাহই এ সকল কর্মকাণ্ডের একমাত্র ব্যবস্থাপক। তিনি বান্দার প্রতিটি আমল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। ছোট-বড় সকল আমল আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। তিনি পরাক্রমশালী। প্রতিটি জিনিস আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। আল্লাহর সামনে পৃথিবীর সকল প্রাণীর শির অবনত থাকে। আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের ওপর অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। তিনি যেমন তাঁর রহমতের ক্ষেত্রে মহাপরাক্রমশালী, তদ্রূপ নিজ সম্মানের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত দয়ালু।

## সূরা সেজদার ৭-৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

الَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এবং কাদা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন। তারপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। পরে তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে ফুকিয়ে দিয়েছেন তাঁর রূহ। আর তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরসমূহ। তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিস সৃষ্টিনৈপূণ্য ও কর্মকুশলতা উত্তম কাঠামো দিয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। সকল মাখলুকের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার দিকে তাকানোর দরকার নেই। প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সাথে সাথে আপনি মানুষের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করুন। তার সূচনা দেখুন, মানুষ মাটি থেকে তৈরি হয়েছে। জাতির পিতা হযরত আদম আ. সৃষ্টি লাভ করেছেন মাটি থেকে। পরবর্তীতে তাঁর সকল সন্তান জন্ম নিয়েছে শুক্রাণুর মাধ্যমে। যা নির্গত হয় পুরুষের পিঠ ও নারীর বক্ষ থেকে। আল্লাহ যখন আদম আ.-কে সৃষ্টি করেন তখন তাঁর প্রতিটি অঙ্গ তৈরি করেন সুগঠিত অবয়বে। এরপর সেখানে নিজের সংরক্ষণে থাকা রূহ প্রবেশ করান। আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন সুন্দর কান, দৃষ্টিনন্দন চোখ ও প্রখর মেধা। আফসোসের বিষয় যে, তারপরও তোমরা যথাযথ শোকর আদায় করো না। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর দেয়া শক্তি শুধু তাঁর পথেই ব্যয় করেন। হে আল্লাহ! তুমি মহান ও সম্মানিত।

## সূরা সেজদার ১০-১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ قَالُوْا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۢ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ○ قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ○

আর তারা বলে, 'আমরা যখন মাটিতে মিশে যাব তখন কি আবার নতুন করে সৃষ্টি হব'? বরং তারাতো তাদের রবের সাক্ষাতকে অস্বীকারকারী। বলুন, 'তোমাদেরকে মৃত্যু দেবে মৃত্যুর ফেরেশতা যাকে তোমাদের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তারপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।'

ব্যাখ্যা : কাফেরদের বিশ্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে, তারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের কথা বিশ্বাস করে না। তারা এটিকে অসম্ভব মনে করে। তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বলে– মৃত্যুর পর যখন আমাদের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। মাটির সঙ্গে মিশে মাটিতে পরিণত হবে। তারপরও কি আমাদের আবার নতুনভাবে বানাতে পারবে!? আফসোসের বিষয় হলো, এ সকল লোক নিজের সঙ্গে আল্লাহকে তুলনা করে। নিজের সীমিত শক্তির সাথে আল্লাহর সীমাহীন শক্তিমত্তাকে অনুমান করে। তারা যখন এ কথা জানে ও মানে যে, আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তখন কেনো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে তারা অস্বীকার করে?

অথচ তিনি তো শুধু আদেশ জারি করেন। এতেই ওই কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। এ জন্যই বলা হয়েছে, তাদের স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করে।

এরপরের আয়াতে আল্লাহ বলেন, তোমাদের রূহ কবয করার জন্যে 'মালিকুল মওত'—মৃত্যুর ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তাঁর সঙ্গে আরো অনেক ফেরেশতা এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা শরীর থেকে রূহ বের করে আনেন। রূহ যখন কণ্ঠনালীতে চলে আসে তখন 'মালিকুল মওত' তা তুলে নেন এবং অতি অল্প সময়ে ভূপৃষ্ঠে অতিক্রম করে চলে যান। এ কাজ তাঁর জন্যে এতোটা সহজ, যতোটা সহজ আমাদের সামনে রাখা পাত্র থেকে কোনো কিছু ওঠিয়ে নেওয়া।

এ সম্পর্কে একটি মুরসাল হাদীসও রয়েছে এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি অমীয় বাণীও রয়েছে। ইবনে আবী হাতিম-এ রয়েছে, একবার এক আনসারী সাহাবীর শিয়রের পাশে 'মালিকুল মওত'-কে দেখতে পেয়ে রাসূল সা. বললেন, হে জান কবযকারী ফেরেশতা! আমার সাহাবীর জন্যে সহজ করুন— তিনি উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! স্বস্তিতে থাকুন এবং

নিরুদ্বেগ থাকুন। আল্লাহর কসম, আমি ঈমানদারের সঙ্গে অত্যন্ত কোমল আচরণ করি। হে আল্লাহর রাসূল! শুনুন— আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি পৃথিবীর প্রতিটি কাঁচা-পাকা ঘরে —সেই ঘর স্থলভাগ বা জলভাগের যেখানেই থাকুক— প্রতিদিন পাঁচবার প্রদক্ষিণ করি। প্রত্যেক ছোট-বড় যেই হোক না কেনো; সে নিজেকে যতোটা চেনে; আমি তাকে তারচেয়ে অনেক বেশি চিনি। হে আল্লাহর রাসূল! বিশ্বাস করুন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ব্যতিরেকে একটি মাছির জানও কবয করার ক্ষমতা রাখি না।

হযরত জা'ফর রহ. বলেন, মালিকুল মওত প্রতিদিন প্রতিটি মানুষকে পাঁচবার অনুসন্ধান করে যায়। এটা এভাবে যে, নবী কারীম সা. পাঁচ নামাযের সময় প্রত্যেককে দেখে নিতেন। যদি সে এই নামাযের প্রতি যত্নবান হয় তাহলে ফেরেশতা তার কাছাকাছি থাকে। আর শয়তান তাথেকে দূরে থাকে। তার মৃত্যুর সময় ফেরেশতা তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর তালকীন [বারংবার পাঠদান] করে।

মুজাহিদ রহ. বলেন, মালিকুল মওত পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে প্রতিদিন দু'বার করে আসেন। কা'ব আহবার রহ. এর সঙ্গে এ কথাটিও যোগ করেন যে, 'প্রতিটি দুয়ারে অবস্থান করে দিনে সাতবার উঁকি মারেন যে, এ ঘরে এমন কেউ নেই তো যার রূহ বের করার নির্দেশ হয়ে গেছে।' এরপর কিয়ামতের দিন সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। তারা কবর থেকে উত্থিত হয়ে হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। সেখানে প্রত্যেকেই তার আমলের প্রতিদান পাবে।

## সূরা সেজদার ২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ○

তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি অনুর্বর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি। অতঃপর তা দিয়ে শষ্য উদ্‌গত করি, যা থেকে তাদের গবাদি পশু ও তারা নিজেরা খাদ্য গ্রহণ করে? তবুও কি তারা লক্ষ্য করবে না?

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা এ আয়াতসমূহে তাঁর দয়া, বদান্যতা ও অনুগ্রহের আলোচনা করেছেন যে, তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। সেই পানি পাহাড় থেকে, উঁচু উঁচু জায়গা থেকে স্রোতধারা হয়ে খাল-বিল, নদী-নালা হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। যেই মাটি এতো দিন অনাবাদ ও অনুর্বর ছিলো; এই পানির কল্যাণে সেটি শস্য-শ্যামল ও সুশোভিত হয়ে ওঠে। শুষ্ক সতেজ ও মৃত এখন জীবন্ত হয়ে ওঠে। الجرز শব্দ বলে প্রত্যেক ওই মাটিকে যা পানিশূন্যতার কারণে শুকিয়ে গেছে। রুক্ষ হয়ে গেছে। ফেটে চৌচির হয়ে

গেছে। মিসরের মাটিও এমনই। যা নীলনদের পানি দিয়ে তরুতাজা করা হয়। আবিসিনিয়ার বৃষ্টির পানি যখন স্রোতধারা হয়ে প্রবাহিত হয় তখন সেই পানিতে লাল রংয়ের মাটিও মিশ্রিত থাকে। এর বিপরীতে মিসরের ভূমি হলো লবণাক্ত ও বালুময়। কিন্তু ওই পানি পেয়ে সে শস্য উৎপাদনের যোগ্য হয়ে ওঠে। নীলনদের সুমিষ্ট পানির কল্যাণে প্রতিবছর তারা প্রচুর পরিমাণে শষ্য উৎপাদন করে। পানির এই সুন্দর ও সুচারু ব্যবস্থাপনা নিঃসন্দেহ সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাবান, দয়ালু আল্লাহর অনেক বড় দয়া। সেই সত্তাই প্রশংসার একমাত্র যোগ্য।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মুসলমানরা যখন মিসর জয় করে তখন মিসরের অধিবাসীরা 'বুউনা' মাসে হযরত আমর ইবনুল আস রা.-এর কাছে এসে বলে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হলো, আমরা এ মাসে নীলনদের উদ্দেশ্যে বলী দিই। যদি কোনো বছর এই বলিদান বন্ধ রাখি তাহলে নীলনদের পানি শুকিয়ে যায়। বলিদানের পদ্ধতি হলো, এ মাসের ১২ তারিখে আমরা এমন এক কুমারী মেয়েকে নির্বাচন করি যে তার বাবা-মায়ের একমাত্র আদরের সন্তান। আমরা তার বাবা-মাকে তোষামোদ করে রাজি করিয়ে নিই। ওই কুমারী মেয়েকে উৎকৃষ্ট পোশাক ও অত্যন্ত মূল্যবান অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে, সাজিয়ে-গুছিয়ে এই নদীতে ভাসিয়ে দিই। এই বলিদানের ফলে নদীতে পানি বেড়ে যায়। যদি কখনও বলি না দিই তাহলে পানি শুকিয়ে যায়। মিসরবিজেতা মহান নৃপতি হযরত আমর ইবনুল আস রা. উত্তর দিলেন, তোমাদের এই ঐতিহ্য নিতান্তই অজ্ঞতা ও মূর্খতাসুলভ প্রথা। ইসলাম কখনই এ ধরনের কাজের অনুমতি দেয় না। ইসলাম তো এ জাতীয় কুপ্রথাকে ধ্বংস করতেই এসেছে। কাজেই তোমাদের এ কাজ করার অনুমতি নেই। তারা বিরত রইলো।

আল্লাহর কী কুদরত! দেখা গেলো, ওই বছর নীলনদ পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। পানিশূন্যতায় তার বুকে চর জেগে উঠেছে। যার ফলে মিসরবাসীর জনজীবনে চরম বিপর্যয় দেখা দিলো। নিরুপায় অনেক স্থানীয় মানুষ মিসর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলো। সংকটাপন্ন পরিবেশ দেখে হযরত আমর ইবনুল আস রা. উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি তৎকালীন খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খত্তাব রা.-এর বরাবর পত্র লিখে পুরো পরিস্থিতি জানালেন। উত্তর এলো, আপনি যা করেছেন অত্যন্ত ভালো কাজ করেছেন। আমি আপনার কাছে লেখা এ পত্রের ভেতরে একটি চিরকুট নীলনদের নামে পাঠাচ্ছি আপনি তা নীলনদে ফেলে দেবেন।

আমর ইবনুল আস রা. ওই চিরকুটটি বের করে পড়তে শুরু করলেন। সেখানে লেখা আছে— 'এ চিঠি আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনীন উমরের পক্ষ থেকে মিসরের নীলনদের প্রতি। হামদ ও নামাযের পর। পরসমাচার হলো, যদি তুমি স্বেচ্ছায়, নিজের পক্ষ থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকো তাহলে তোমার জন্যে

আমার কোনো কথা নেই। আর যদি একক, পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা তোমাকে প্রবাহিত করে থাকেন তাহলে আমি আল্লাহর কাছে এ দোয়া করছি, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।' চিরকুটটি হযরত আমর রা. নীলনদে ফেলে দিলেন। এক রাতও অতিবাহিত হতে পারেনি; নীলনদের বুকে ষোল হাত গভীর পানি বইতে শুরু করেছে।

তখন থেকে মিসরের শুষ্ক জমিন সতেজ হয়ে ওঠে এবং অভাব-অনটন স্বচ্ছলতায় পরিণত হয়ে যায়। একটি পত্রের কল্যাণে পুরো অঞ্চল সবুজ-শ্যামলিমায় সুশোভিত হয়ে গেলো। একদিকে নদীর বুকে পানির জোয়ার পূর্ণ গতিতে প্রবাহিত হতে লাগলো। অন্যদিকে প্রতিবছর নদীর নামে যে বলিদান চলতো, তা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়।

একই বিষয় বস্তুর আয়াত فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ الخ –মানুষ যেন তার খাদ্যের দিকে তাকায়। কী ভাবে আমি তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি। আমি প্রথমে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। জমিনের ভেতর থেকে শষ্য ও ফল উৎপন্ন করেছি। ওই আয়াতের অনুরূপ এখানেও আল্লাহ বলছেন যে, তারা কি এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দেখে না? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কখনও জমিনের ওপর বৃষ্টির পানি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ষণ না হওয়ার কারণে মানুষ খাল-বিলের পানি দিয়ে সে জমিনকে সিঞ্চিত করে।

ইবনে যায়েদ রহ. বলেন, এখানে الجرز শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা ওই জমিন যেখানে শষ্য উৎপন্ন হয় না। যা ধুলোমলিন পড়ে আছে। একই কথা বলা হয়েছে এ আয়াতে وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ 'তাদের জন্যে মৃত জমিনও একটি নিদর্শন। যা আমি জীবিত করার মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেই।'

## সূরা আনকাবূতের ১৯-২০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

أَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○
قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْأٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

তারা কি দেখে না, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন? তারপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। নিশ্চয় এটি আল্লাহর জন্য সহজ। বলুন, 'তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো, অতঃপর দেখ' কী ভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তারপর আল্লাহই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

ব্যাখ্যা : মানুষ দিব্যি দেখে যে, একসময় সে ছিলো না। আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করার কারণে সে অস্তিত্ব পেয়েছে। তথাপি সে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের কথা অস্বীকার করে। অথচ এর জন্যে কোনো দলীলের প্রয়োজন হয় না। যিনি

প্রথমবার সৃষ্টি করতে পারেন, তার পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ।

আল্লাহ তাদেরকে আরো উপদেশ দেন, তোমরা জমিনে আরো অন্যান্য নিদর্শনের ওপর চিন্তা-ভাবনা করো। দিগন্তবিস্তৃত আকাশ, সুশোভিত তারকারাজি, সুবিশাল জমিন, আকাশচুম্বী পবর্তমালা, ফুল-ফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষরাজি, টলটলে স্বচ্ছ জলের নদ-নদী, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, ফসলের সমারোহ রাঙ্গা শষ্যক্ষেত দেখো। এগুলোর কোনো কিছুই একসময় ছিলো না। আল্লাহ তাআলা সবকিছু করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে কি আল্লাহ তাআলা তোমাদের সামনে তাঁর কুদরতের প্রকাশ ঘটান নি? তোমরা কি দেখছো না যে, এতো বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্নকারী আল্লাহ তাআলার পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি শুধু 'হও' শব্দ বলার মাধ্যমেই যে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। তিনি স্বয়ংসম্পন্ন। তাঁর কোনো উপকরণ বা মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। একই ভাষ্য আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে এভাবে বলেছেন যে, তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন। আর এটা তো তাঁর পক্ষে খুবই সহজ।

অতঃপর বলেন, জমিনে ঘুরে ঘুরে দেখো, আল্লাহ তাআলা কী ভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন? এথেকে তোমরা বুঝতে সক্ষম হবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ কর্তৃক পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া কী হবে?! আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসের ওপর কর্তৃত্বশীল। আল্লাহ বলেন, আমি এই দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে; এমনকি মাথা হতে পা পর্যন্ত এতো পরিমাণ নিদর্শন প্রদর্শন করেছি যে, সত্য স্পষ্ট হওয়ার জন্যে সেগুলোই যথেষ্ট। অন্য আয়াতে বলেন, أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْئٍ —'তারা কি কোনো জিনিস ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে?' কোনোটাই নয়। আসলে ওদের মাঝে বিশ্বাস নেই। এটিও আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব যে, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন; যাকে ইচ্ছা রহম করেন। তিনিই বিচারক। তিনিই অধিগ্রাহক। তিনি যা মনস্থ করেন তাই করেন। কেউ তাঁর নির্দেশ লংঘন করতে পারে না। কেউ তাঁর সংকল্প বদলাতে পারে না। কেউ তাঁর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে পারে না। কেউ কোনো কাজের আপত্তি জানাবার তো প্রশ্নই আসে না। তিনি সবার ওপর প্রভাব খাটাতে পারেন। যাকে খুশি তার ব্যাপারেই অনুসন্ধান করতে পারেন। সবাই তাঁর বেষ্টনীতে আবদ্ধ। সবাই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি সবার স্রষ্টা। তিনিই নির্দেশের মালিক। তিনি যা করেন তা-ই ন্যায়সঙ্গত। কারণ, তিনিই মালিক; তিনিই জুলুম থেকে পবিত্র।

হাদীস শরীফে এসেছে, যদি আল্লাহ তাআলা সাত আসমান ও সাত জমিনের সকল অধিবাসীর ওপর আযাব দেন, তবুও তিনি জালেম হবেন না।

শাস্তি ও দয়া একান্তই তাঁর। কিয়ামতের দিন সবাই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। তাঁর সামনে উপস্থিত হবে। জমিনের বা আকাশের কোনো নিবাসী তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না। সবার ওপর তিনিই প্রভাব বিস্তার করবেন। তাঁর সামনে প্রত্যেকেই কম্পমান থাকে। সবাই তাঁর দুয়ারের ভিখারি। তিনি সবার থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি ছাড়া তোমাদের দ্বিতীয় কোনো অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও সহায়তাকারী নেই।

## সূরা আনকাবুতের ৪১-৪৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۭ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ○

যারা আল্লাহ ছাড়া বহু অভিভাবক গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং নিশ্চয় সবচেয়ে দুর্বল ঘর হলো মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে, আল্লাহ তা জানেন; আর তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দেই; কেবল জ্ঞানী লোকেরাই তা বোঝে।

ব্যাখ্যা : যারা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যের উপাসনা করে, ওই মুশরিকদের দুর্বলতা ও অজ্ঞতার কথা আলোচিত হচ্ছে। তারা ওই সকল উপাস্যের কাছে সাহায্য কামনা করে, তাদের কাছে জীবিকা, বিপদে সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা করে। তাদের উদাহরণ হলো, যেমন কেউ মাকড়সার জালের কাছে বৃষ্টি, রৌদ্র ও শৈত্যপ্রবাহ থেকে আশ্রয় কামনা করে। যদি তাদের জ্ঞান থাকতো তাহলে তারা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে কখনোই সৃষ্টির শরণাপন্ন হতো না। কাজেই তাদের অবস্থা ঈমানদারদের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈমানদারগণ মজবুত স্তম্ভ আঁকড়ে ধরেছেন। আর ওদের অবস্থা হলো, মাকড়সার জালের নিচে মাথা গুঁজেছে। ঈমানদারদের অন্তর আল্লাহর দিকে ও শরীর নেক আমলের দিকে ধাবিত থাকে। আর ওদের অন্তর সৃষ্টির দিকে আর শরীর মূর্তি পূজায় রত থাকে।

এরপর আল্লাহ মুশরিকদের ভয় দেখিয়ে বলছেন, তিনি তাদের এই শিরকি কর্মকাণ্ড ও মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত আছেন। তিনি তাদের এই সকল অনিষ্ট কর্মকাণ্ডের কারণে এমন শাস্তি দেবেন– যা তারা সর্বদা মনে রাখবে। তাদের অবকাশ দেয়ার পেছনে আল্লাহর কারণ রয়েছে, এমন নয় যে— মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা কিছুই জানেন না। তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা

করার ও বুঝার যোগ্যতা শুধু আমলদার আলেমগণেরই হয়ে থাকে। যারা স্বীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত উদাহরণসমূহ বুঝতে পারা সাচ্চা ইলমের দলীল।

হযরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, আমি রাসূল সা. থেকে এক হাজার উদাহরণ শিখেছি। [মুসনাদে আহমদ] এর মাধ্যমে রাসূল সা.-এর ফযীলত ও জ্ঞানগভীরতা বুঝে আসে।

হযরত আমর ইবনে মুররাহ রহ. বলেন, যদি কুরআন কারীমের কোনো আয়াত তেলাওয়াত করি আর তার বিশদ অর্থ ও ব্যাখ্যা আমার বুঝে না আসে তখন আমার অন্তরে প্রচণ্ড কষ্ট অনুভূত হয়। তখন আমার ভয় হতে থাকে– না জানি, আল্লাহ আমাকে অজ্ঞদের সাথে গণ্য করে ফেলেছেন! কেননা আল্লাহ তাআলা এমনটাই বলেছেন যে, আমি ওই উদাহরণগুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করছি। কিন্তু আলেম ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হবে না।

## সূরা আনকাবূতের ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ○

আল্লাহ্ যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা অনেক বড় কুদরতের কথা আলোচনা করেছেন যে, তিনিই আসমান ও জমিনসমূহের কর্তা। তিনি সেগুলোকে খেল-তামাশা হিসেবে বা অহেতুক সৃষ্টি করেন নি। এখানে মানুষদেরকে জীবন-যাপন করাবেন। অতঃপর তাদের নেক আমল ও বদ আমলের প্রতি পরখ করবেন এবং কিয়ামতের দিন আমল অনুযায়ী তাদের শাস্তি ও পুরস্কার দেবেন।

## সূরা আনকাবূতের ৫২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

قُلْ كَفٰی بِاللّٰهِ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكُمْ شَهِیْدًا ۚ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

বলুন, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাসী এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

ব্যাখ্যা : কাফেরদের ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা, গোয়ার্তুমির আলোচনা হচ্ছে। তারা আল্লাহর রাসূলদের কাছে এ জাতীয় নিদর্শনই চেয়েছিলো। যেমন, হযরত সালেহ আ.-এর কাছে তাঁর সম্প্রদায় চেয়েছিলো। এরপর আল্লাহ স্বীয় নবীকে আদেশ দেন, আপনি ওদের বলে দিন– নিদর্শন, মু'জিযা ও আয়াত পেশ করা

আমার কাজ নয়। এটি একান্ত আল্লাহ্ তাআলার হাতে। যদি তিনি তোমাদের মাঝে নেক নিয়ত আছে বলে জানতে পারেন তখন তিনি মু'জিযা দেখাবেন। আর যদি তোমরা নিজেদের গোয়ার্তুমি অস্বীকৃতির মনোবৃত্তি থেকে কথা বাড়াতে চাও তাহলে মনে রেখো– এমন নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের কাছে ফেঁসে আছেন। তাঁর ইচ্ছা তোমাদের ইচ্ছার অধিনে নয় যে, তোমরা যা চাইবে, খামোখা তিনি তা করেই দেখাবেন। তোমাদের ওপর তাঁর নিদর্শন অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই অনেক বড় প্রতিবন্ধক যে, তোমাদের পূর্ববর্তীরাও নিদর্শন পাওয়া সত্ত্বেও রীতিমতো কুফরী করে গেছে। ওই দেখো সামুদ জাতির ইতিহাস। তাদের কাছে যখন আমার নিদর্শন হিসেবে 'উষ্ট্রি' আসে তখন তারা তার ওপর জুলুম করেছিলো। আপনি বলে দিন, 'আমি তো শুধু একজন বার্তা বাহক। আমি পয়গম্বর, বার্তাবাহক, প্রতিনিধি। আমার দায়িত্ব শুধু এতোটুকু যে, তোমাদের কানে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয়া। আমি তো তোমাদেরকে তোমাদের ভালো-মন্দ বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত তোমাদের হাতে। হিদায়াত ও বিপথ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তিনি যদি কাউকে পথচ্যুত করেদেন তাহলে তাকে কেউ পথ দেখাতে পারবে না। অতএব, তাদেরকে হিদায়াত করার দায়িত্ব আপনার ওপর দেওয়া হয়নি। এটাতো আল্লাহর কাজ এবং তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

কাফেরদের এটিও একটি নির্বুদ্ধিতা যে, তাদের কাছে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিতাব এসেছে– যার মাঝে বাতিলের তিল পরিমাণ মিশ্রণ নেই– আর তারা এখনো নিদর্শনের খোঁজে রয়েছে। অথচ এই কুরআনই সকল মু'জিযা থেকে বড় মু'জিযা। দুনিয়ার সমস্ত সাহিত্যিক-কবি ও লেখক এই কুরআনের অনুরূপ আরেকটি কুরআন পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পুরো কুরআনের অনুরূপ অনুলিপি তো দূরের কথা, তারা কুরআনের মতো দশটি সূরাও রচনা করতে সক্ষম হয়নি। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা নিদেনপক্ষে একটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জেও ধরাশয়ী হয়েছে। তাহলে এতো বড় ও শক্তিশালী মু'জিযা কি কাফেরদের জন্যে যথেষ্ট নয়! এরপরও তারা অন্য মু'জিযা খুঁজতে ব্যস্ত!

কুরআন এমন এক পবিত্র কিতাব– যার মাঝে যেমন অতীতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে, তদ্রূপ আগামীতে হবে এমন বিষয়েরও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর এতে বিতর্কের মীমাংসা রয়েছে।

এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এমন ব্যক্তির ওপর যিনি 'উম্মী–নিরক্ষর'। যিনি কারো কাছ থেকে একটি বর্ণ পড়েনও নি; এমনকি লিখেনও নি। যিনি কোনো আলেমদের সংশ্রবেও কখনো বসেন নি। যাঁর মাঝে পূর্বের আসমানী কিতাবের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা জানা যায়। যেই কিতাবের শব্দের মাঝে

মিষ্টতা, ছন্দের মাঝে লাবণ্যতা, সুন্দর বচনভঙ্গি, বর্ণনায় বাকপটুতা, চিত্তাকর্ষক প্রতিযোগিতা, যাঁর মাঝে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য রয়েছে। এই কুরআনের শিল্পসুষমার কথা খোদ বনি ইসরাঈলের গুণীরাও সত্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যার শুদ্ধতার স্বপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। ওই সকল সৎ মানুষ যাদের প্রশংসা ও সমর্থন রয়েছে তারা সেই কুরআনকে অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছে। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। এতো বড় মু'জিযা তোমাদের সামনে দিব্যি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেনো তোমরা অন্য মু'জিযার বায়না ধরো!!

আল্লাহ বলেন, এই কুরআন হলো ঈমানদারদের জন্যে রহমত ও উপদেশ। এই কুরআন সত্যকে প্রকাশ করে; অন্যায় ধ্বংস করে; পূর্ববর্তীদের ঘটনা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করে; উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়। গুনাহগারদের অশুভ পরিণতি তুলে ধরে তোমাদের সতর্ক করে। বলে দিন, তোমার ও আমার ব্যাপারে আল্লাহ সাক্ষী। আর তাঁর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি তোমাদের মিথ্যাচার ও উগ্রতা এবং আমার সততা ও কল্যাণকামীতার কথা খুব ভালো করেই জানেন। যদি আমি মিথ্যাচার করতাম তাহলে অবশ্যই তিনি আমার থেকে প্রতিশোধ নিতেন। তিনি কখনই এ জাতীয় লোকদেরকে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়েন না। কারণ, তিনি নিজেই কুরআনে বলেছেন, 'যদি এই রাসূল আমার ব্যাপারে একটি মনগড়া কথাও বলতো তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে তার শাহরগ ছিড়ে ফেলতাম। এমন কেউ নেই যে, তাঁকে আমার হাত ছাড়িয়ে নেবে।' যেহেতু এক্ষেত্রে আমার সততা সবার কাছে স্পষ্ট। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রেরীত। তাঁর নামেই আমি বিধানগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। তাই তিনি আমার সমর্থন করেন এবং আমাকে দিনদিন প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছেন। আমার মাধ্যমে একটির পর একটি মু'জিযা দেখাচ্ছেন। তিনি আসমান ও জমিনের সকল অদৃশ্যের কথা জানেন। তাঁর কাছে একবিন্দু পরিমাণও গোপন নেই। এরপরও যারা বাতিলকে মানে আর আল্লাহকে না মানে নিঃসন্দেহে তারাই চরম ক্ষতিগ্রস্থ ও লাঞ্ছিত। কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদেরকে তাদের বদ আমলের পরিণতি ভোগ করতে হবে। আর যারা পৃথিবীতে দাম্ভিকতা দেখিয়েছে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে। তাহলে আল্লাহকে না মেনে, মূর্তিদের মানার চেয়ে বড় জুলুম আর কি হতে পারে? সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাদেরকে বিনিময় না দিয়ে কখনেই ছাড়বেন না।

## সূরা আনকাবূতের ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

আর এমন কত জীব-জন্তু রয়েছে, যারা নিজদের রিযিক নিজেরা সঞ্চয় করে না, আল্লাহই রিযিক দান করেন তাদের ও তোমাদের। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা : মদীনায় হিজরতকারীদের রিযিকে আল্লাহ তাআলা এতো পরিমাণ বরকত দিয়েছেন যে, তারা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মালিক বনে গিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণী রয়েছে, যারা না নিজেদের খাবার জোগাড় করার শক্তি রাখে আর না আগামীকাল কী খাবে, তা সঞ্চয় করে রাখে। তাদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর। তিনিই তাদের রিযিক পৌঁছে দেন। আল্লাহ তোমাদেরও রিযিকদাতা। তিনি কোনো সময় কোনো অবস্থায়ই কোনো মাখলুকের কথা ভোলেন না। পিপীলিকাগুলোকে নিজ গর্তে, পাখিদেরকে আসমান ও জমিনের শূন্যস্থানে আর সমস্ত মাছকে পানিতে তিনিই রিযিক পৌঁছে দেন। ইরশাদ করেছেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا الخ —'ভূপৃষ্ঠে এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নয়। তিনিই তাদের অবস্থানস্থল ও বসবাসের জায়গার কথা খুব ভালো করেই জানেন।' এমনসব আলোচনা তাঁর কুরআনের পাতায় পাতায় বিদ্যমান।

ইবনে আবী হাতিমের কিতাবে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে যাচ্ছিলাম। নবীজী তখন মদীনার একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। বাগানের ভেতরে পড়ে থাকা নষ্ট খেজুরগুলো তিনি তুলে পরিষ্কার করে খাচ্ছিলেন। আমাকেও খেতে বললেন। আমি বললাম, হুজুর! আমার পক্ষে তো এই খেজুর খাওয়া সম্ভব হবে না। নবীজী বললেন, কিন্তু আমার কাছে তো বেশ সুস্বাদু মনে হচ্ছে। আর তা এই জন্য যে, আজ আমার উপোসের চতুর্থ দিন চলছে। না খাওয়ার কারণ হলো, আমার কাছে খাওয়ার মতো কিছুই ছিলো না। শোনো! যদি আমি চাইতাম তাহলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম। আর আল্লাহ তাআলা আমাকে কায়সার ও কিসরার রাজত্ব দিয়ে দিতেন। হে ইবনে উমর! তোমার কী অবস্থা হবে যখন তুমি এমনসব লোকদের মধ্যে গন্য হবে যারা পুরো বছরের খাদ্য-শস্য সংরক্ষণ করে নেবে। আর তাদের আস্থা ও বিশ্বাস শতভাগ ঠুনকো হবে। আমিও তো সেখানে এই অবস্থায় ছিলাম। এই আয়াতে وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا অবতির্ণ হয়েছে।

রাসূল সা. বলেছেন, আমাকে আল্লাহ দুনিয়ার ভাণ্ডার সঞ্চয় করার এবং

প্রবৃত্তির পেছনে ব্যস্ত হওয়ার নির্দেশ করেননি। যে ব্যক্তি তার অবশিষ্ট জীবনের জন্য দুনিয়ার সম্পদ জমা করে, সে যেন ভালো করে বুঝে নেয়, অবশিষ্ট জীবন তো আল্লাহর হাতে। দেখো! আমি না দিনার ও দিরহাম সঞ্চয় করবো আর না আগামীকালের জন্য সম্পদের ভাণ্ডার জমা করবো।

এ কথা লোকমুখে বহুল চর্চিত যে, কাকের ছানা যখন জন্ম নেয় তখন তার সাদা শরীর দেখে তার মা-বাপ ঘৃণাবশতঃ রেখে পালিয়ে যায়। কিছু দিন পর যখন সেই ছানার শরীরের পালক কালো হয় তখন তার মা-বাবা ফিরে আসে। আর তাকে দানা পানি দিতে শুরু করে। প্রাথমিক দিনগুলোতে যখন তার বাবা-মা তাকে ফেলে রেখে গিয়েছিলো তখন তার আহারের জন্যে আল্লাহ ছোট ছোট নানা পোকা-মাকড় তার কাছে পাঠিয়ে দেন। এগুলো খেয়েই ছানাটি বেঁচে থাকে। এর ওপর আরবের বিভিন্ন কবি কবিতা লিখেছেন। নবী কারীম সা. এক হাদীসে বলেন, 'তোমরা সফর করো; যেন সুস্থ থাকো ও রিযিক অর্জন করতে পারো।' অন্য হাদীসে এসেছে, 'সফর করো; যেন সুস্থতা ও গনীমত পাও'। অপর বর্ণনায় এসেছে, 'সফর করো, লাভবান হবে। রোযা রাখো, সুস্থ থাকবে।' জিহাদ করো, গনীমত পাবে।' আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'পরিশ্রমী ও সহজতা কামীদের সঙ্গে সফর করো'।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সব কথা শোনেন এবং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও স্পন্দন সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত।

## সূরা আনকাবূতের ৬১-৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন'? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তাহলে কোথায় তাদের ফিরানো হচ্ছে? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। আর তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, 'কে আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন

তার মৃত্যুর পর'? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর'। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ প্রমাণ করছেন যে, সত্যিকার অর্থে শুধু তিনিই ইবাদতের যোগ্য। মুশরিকরাও এ কথা স্বীকার করতো যে, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, চন্দ্র-সূর্যকে বশীভূতকারী, দিন ও রাতের পালাক্রমে আগমনের এই ধারাবাহিকতা, স্রষ্টা ও রিযিকদাতা এবং জীবন ও মৃত্যুর ওপর সকল ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই। তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন, কে ধন-সম্পদের উপযুক্ত আর কে অনুপযুক্ত। তিনি বান্দাদের সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জ্ঞাত। যেহেতু মুশরিকরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, সকল কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহই। সবার ওপর একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তাহলে তারা কেনো আল্লাহকে ছাড়া গায়রুল্লাহর উপাসনা করে? তারা কী ভাবে অন্যদের ওপর তাওয়াক্কুল করে? অথচ পৃথিবীর মালিক তিনিই। ইবাদতের উপযুক্তও তিনিই। তাওহীদের রুবুবিয়ত মেনে তাওহীদে উলূহিয়ত থেকে পিছুটান; অর্থাৎ এক আল্লাহকে প্রতিপালক মানা সত্ত্বেও এককভাবে তাঁর উপাসনা না করা বিষয়টি খুবই অদ্ভূত। কুরআন কারীমে তাওহীদে রুবুবিয়তের আলোচনার সাথেই তাওহীদে উলূহিয়তের আলোচনা প্রচুর হয়েছে। যেহেতু মককার মুশরিকরা তাওহীদে রুবুবিয়ত স্বীকার করতো; এজন্যে তাদেরকে তাদের তাওহীদে রুবুবিয়তের যুক্তি দিয়েই তাওহীদে উলূহিয়তের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। মুশরিকরা হজ ও উমরার সময় একদিকে 'লাব্বাইক লাব্বাইক' বলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে, অন্যদিকে তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যদের শিরক করে। বলতো—

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ إِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ.

'হে আল্লাহ! আমরা উপস্থিত হয়েছি তোমার আহ্বানে। তোমার কোনো শরীক নেই; সেই শরীক ব্যতিরেকে যার তুমিই মালিক; এবং তার মালিকানায় যা কিছু আছে তুমি তারও মালিক।'

## সূরা রূমের ৮-৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ○ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اَثَارُوا الْاَرْضَ وَ عَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না? আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুই যথাযথভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বহু লোক তাদের রবের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। তারা শক্তিতে ছিল তাদের চেয়েও প্রবল। আর তারা জমিন চাষ করত এবং তারা তাদের চেয়েও বেশী আবাদ করত। আর তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ এসেছিলো সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ। বস্তুতঃ আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি জুলম করবেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজদের প্রতি জুলম করত।

ব্যাখ্যা : যেহেতু মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন। যা আল্লাহর একত্ববাদ ও প্রতিপালক হওয়া প্রমাণ করে। এ কারণে বলা হয়েছে যে, তোমরা সৃষ্টিসমূহের প্রতি গভীর চিন্তা-ভাবনা করো এবং আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন থেকে ওই মালিককে চেনো ও তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করো। কখনও ভূগর্ভস্থ জগৎ দেখো। কখনও ঊর্ধ্বজগৎ দেখো। কখনও মাখলুকাতের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিয়ে ভাবো এবং বোঝো যে, এগুলো অহেতুক সৃষ্টি করেন নি; বরং আল্লাহ তাআলা এগুলোকে মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকের জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে অর্থাৎ কিয়ামত। যা অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাসই করে না।

এরপর আল্লাহ নবীদের সত্যায়ন এভাবে করেন যে, দেখে নাও— তাঁদের বিরোধীতাকারীদের কী ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে? এর বিপরীতে যারা তাঁদের মেনে নিয়েছেন, তারা কিভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান পেয়েছেন। তোমরা খুঁজে খুঁজে পূর্ববর্তী ঘটনাগুলো জানো। পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠী তোমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলো; তোমাদের থেকে প্রাচুর্য ও ধনাঢ্যতার অধিকারী ছিলো; তোমাদের চেয়ে বেশি গোত্র, বংশ ও সন্তানাদী বংশবিশিষ্ট ছিলো; তোমরা তো তাদের দশভাগের এক অংশের কাছাকাছিও যেতে পারোনি। তারা তোমাদের চেয়ে অধিক হায়াত পেয়েছিলো; তোমাদের চেয়ে অধিক জমি চাষাবাদ করেছিলো। ফসলের জমি, ফলের বাগান ছিলো তোমাদের চেয়ে বেশি। তা সত্ত্বেও যখন তাদের কাছে ওই যুগের রাসূল আসেন, যিনি তাদেরকে দলিলাদি ও মু'জিযা দেখিয়েছেন। তারপরও ওই যুগের হতভাগ্যরা তাঁকে মেনে নেয় নি। নিজেদের ধ্যান-ধারণায় ডুবে ছিলো এবং মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলো। অবশেষে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে। তখন তাদেরকে রক্ষা করার মতো কেউ ছিলো না আর না তাদের ওপর থেকে আযাবকে সরিয়ে দেবার কেউ ছিলো।

আল্লাহ তাআলার সত্তা এ থেকে পবিত্র যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের ওপর জুলুম করবেন। ওই আযাব তো ছিলো তাদের কৃতকর্মের পরিণতি। কারণ, তারা আল্লাহর নিদর্শন দেখেও অস্বীকার করতো। আল্লাহর বাণীগুলো নিয়ে এরা উপহাস করতো। যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, ওই বেঈমানির কারণে আমি তাদের অন্তরকে তাদের দৃষ্টিকে সত্য থেকে সরিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে তাদের দাম্ভিকতার বৃত্তে ছেড়ে দিয়েছি। আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তাদের নিজস্ব বক্রতার কারণেই আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে বক্র বানিয়ে দিয়েছেন। আয়াতে এসেছে যে, যদি এ সকল মুশরিক-কাফেররাও আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখুন, তাদের কপালে দুর্ভোগ রয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই তাদের কৃত গুনাহের কারণে পাকড়াও করবেন।

## সূরা রূমের ১৭-১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ○ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ○ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ○

সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সন্ধ্যায় ও প্রভাতে— অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নের সময়ে; আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং জমিনকে পুনর্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার অসাধারণ কুদরত ও মর্যাদাপূর্ণ বাদশাহীর অন্যতম প্রমাণ হলো, আল্লাহর তাসবীহ ও তাঁর প্রশংসা। যার প্রতি আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে আহ্বান করেন এবং তাঁর সত্তার পবিত্রতা ও প্রশংসার যোগ্য হওয়াও বর্ণনা করেছেন। সন্ধ্যার সময়– যখন দিবস তার আলোগুলো নিয়ে আসে— এতোটুকু বলার পর তার পরবর্তী বাক্য বলার পূর্বে এ কথাও প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, জমিন ও আসমানের বুকে একমাত্র তিনিই প্রশংসা ও স্তুতির যোগ্য। প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর নিজেরই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। অতঃপর সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহর আলোচনা যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছিলো তার সঙ্গে যোহর ও এশার সময় মিলিয়ে নিয়েছেন। যা পূর্ণ অন্ধকার ও পূর্ণ উজ্জলতার সময় হয়। নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ পবিত্রতা তাঁকেই মানায়। যিনি রাতের অন্ধকারকে ও দিবসের উজ্জ্বলতাকে সৃষ্টি করেছেন। সকালকে আলোকময় ও রাতকে প্রশান্তিময় বানিয়েছেন।

মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় এসেছে, নবী কারীম সা. বলেন, আমি কি

তোমাদেরকে বলবো, আল্লাহ তাআলা সাইয়্যেদুনা ইবরাহীম আ.-এর নাম 'খলীল, বন্ধু ও বিশ্বস্ত' কেনো রেখেছেন? কারণ, তিনি প্রত্যেহ সকাল-সন্ধ্যা এ আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। এ কথা বলে নবীজী فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ থেকে وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ পর্যন্ত দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করতেন।

তাবরানী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এ আয়াতদুটি তেলাওয়াত করবে, তার দিন-রাতে যা কিছু ছুটে গিয়েছে তা পেয়ে যাবে।

এরপর ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ-ই জীবন-মৃত্যুর স্রষ্টা। তিনি মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করে নিয়ে আসেন। তিনিই সকল বস্তুর ওপর একক ক্ষমতাবান। তিনি বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে বীজ, মুরগী থেকে ডিম, ডিম থেকে মুরগী, শুক্রাণু থেকে মানুষ, মানুষ থেকে শুক্রাণু, মুমিন থেকে কাফের, কাফের থেকে মুমিন; মোটকথা পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস ও তার বিপরীত জিনিসের ওপর তাঁর সক্ষমতা রয়েছে। শুষ্ক জমিনকে তিনিই আর্দ্র করে দেন, অনাবাদি জমিন থেকে তিনিই শষ্য উৎপন্ন করে দেন। যেমনটি সূরা ইয়াসীনে বলেছেন যে, শুষ্ক জমিন তরতাজা করে সেখান থেকে নানা রকমের শষ্য ও ফল উৎপন্ন করাটাও আমার কুদরতের পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন। তোমরা দেখে থাকবে ওই জমিনকে যেখান থেকে ধুলো-বালি উঠতো, দু' ফোঁটা বৃষ্টির বদৌলতে আমিই সেটিকে সতেজ করে তুলি এবং সেখান থেকে নানা রকমের ফসল দিয়ে তাকে শষ্য-শ্যামল ও সুজলা-সুফলা করে দিই। কাজেই এখান থেকে বুঝে নাও, মৃত্যুর পর আমিই তোমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে দাঁড় করিয়ে দেবো।

## সূরা রূমের ৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

তারা কি দেখে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন? নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

ব্যাখ্যা : একটি সহীহ হাদীসে এ কথা এসেছে যে, আশ্চর্য হই! মুমিনদের ওপর আল্লাহর প্রতিটি সিদ্ধান্তই উত্তম হয়ে থাকে। মুমিন যখন সুখ-শান্তিতে শোকর আদায় করে; তখন এটাও তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে, তদ্রূপ সে বিপদে ধৈর্যধারণ করে; সেটাও তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে। কারণ, সে বিশ্বাস করে, আল্লাহই সবকিছুর মালিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। তিনি তাঁর নিজস্ব হিকমত—কর্মকৌশল অনুযায়ী সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি

কাউকে কম দেন, কাউকে বেশি দেন। কাউকে দারিদ্রে ও কষ্টে রাখেন, কাউকে প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যে রাখেন। জীবনের এই বৈচিত্র্যের মাঝেও মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

## সূরা রূমের ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ○

আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন ও পরে তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এ থেকে কোনো কিছু করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।

ব্যাখ্যা : মানুষ তার মায়ের পেট থেকে নগ্ন, অজ্ঞ, দৃষ্টিহীন, বধির ও শক্তিহীন হয়ে বের হয়ে আসে। অতঃপর আল্লাহই তাকে সবকিছু দান করেন। সম্পদ, মালিকানা, রুজি-রোজগার, ব্যবসা-বাণিজ্য। মোটকথা, অসংখ্য নেয়ামত দান করেন। দু'জন সাহাবীর ভাষ্য হলো, আমরা একদিন নবী কারীম সা.-এর দরবারে হাজির হলাম। ওই সময় নবীজী সা. কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরাও নবীজীর সেই কাজে সহযোগিতা করলাম। নবীজী সা. বললেন, দেখো! শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জীবিকা থেকে কেউ বঞ্চিত থাকে না। মানুষ পৃথিবীতে বস্ত্রহীন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় আসে। তার শরীরে তখন এক চিলতে কাপড়ও থাকে না। অতঃপর আল্লাহ তাআলাই তাকে জীবিকা দান করেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের পর তোমাকে মৃত্যু দেবেন। এরপর কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত করবেন। আল্লাহ ছাড়া তোমরা অন্য যে সকল মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করছো তাদের মধ্য থেকে কেউ এসব কর্মকাণ্ডের একটি কাজ করারও যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ তাআলাই একক স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও জীবন-মৃত্যুর মালিক। তিনিই কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের ওপর দণ্ড কার্যকর করবেন। তাঁর পবিত্র, মর্যাদা, সম্মান ও মহত্বপূর্ণ সত্তা এথেকে মুক্ত যে, কেউ তাঁর অংশীদার বা তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর সন্তান কিংবা বাবা-মা আছে। তিনি একক, অদ্বিতীয়। তিনি পিতা-মাতা ও সন্তান মুক্ত। তাঁর কেউ সমকক্ষ নেই।

## সূরা সাবার ১-২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ ؕ وَ هُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ○ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْهَا ؕ وَ هُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ ○

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক এবং আখেরাতেও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। তিনি জানেন ভূগর্ভে যা প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা নির্গত হয়; আর আসমান থেকে যা বর্ষিত হয় এবং তাতে যা ওঠে। আর তিনি পরম দয়ালু ও অতিশয় ক্ষমাশীল।

ব্যাখ্যা : যেহেতু দুনিয়া ও আখেরাতের সকল নেয়ামত ও রহমত আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। গোটা পৃথিবীর শাসক তিনিই। কাজেই সকল প্রশংসা ও গুণগানের একমাত্র তিনিই যোগ্য। তিনিই একক উপাস্য। অন্য কেউ উপাসনার উপযুক্ত নয়। তাই দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই প্রাপ্য। রাজত্ব কেবলই তাঁরই। তাঁর কাছেই সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে। জমিন ও আসমানে যা কিছু আছে সবই তাঁর অধীনস্থ। প্রত্যেকেই তাঁর গোলাম; তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। সবার ওপর হস্তক্ষেপ তাঁরই। যেমনটি এ আয়াতে এসেছে যে, وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ।

আখেরাতে একমাত্র তাঁরই গুণগান উচ্চকিত হবে। তিনি স্বীয় কাজ-কর্ম ও তকদীরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষমতাবান। তিনি এমন সচেতন যার কাছে কোনো জিনিস লুক্কায়িত নয়। তাঁর থেকে অতি ক্ষুদ্র বস্তুও আড়াল নয়। তিনি তাঁর কাজে প্রজ্ঞাবান। যিনি স্বীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে সচেতন। জমিনে যতোগুলো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে, যতোগুলো বীজ বপন করা হয় তাও তিনি জানেন। জমিন থেকে যা উত্থিত হয়; অঙ্কুরিত হয় তাও তিনি জানেন। তাঁর নিয়ন্ত্রিত, প্রশস্ত ও সীমাহীন জ্ঞান থেকে কোনো কিছুই অদৃশ্য নয়। প্রতিটি জিনিসের হিসাব, বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত। আসমান থেকে যে বৃষ্টি হয় তার প্রতিটি ফোঁটার হিসাবও তাঁর জানা আছে। বান্দার ইলম থেকে নেক আমল ইত্যাদি আকাশে পৌঁছে, তাও আল্লাহ জানেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর এতো দয়ালু যে, বান্দা নিজেও তাঁর ওপর এ পরিমাণ দয়াবান না। একারণে তিনি তাদের গুনাহ সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তাদের ওপর দ্রুত শাস্তি কার্যকর করেন না, বরং তাদের অবকাশ দেন– যেন তারা তাওবা করে, মন্দাভ্যাস ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। বান্দার অশ্রু মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কাজেই তাওবাকারী ধিকৃত হয় না আর তাওয়াক্কুলকারী ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।

## সূরা সাবার ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ○

তারা কি তাদের সামনে ও পেছনে, আসমান ও জমিনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশ থেকে এক খণ্ড (আযাব) তাদের ওপর নিপতিত করব; অবশ্যই তাতে রয়েছে আল্লাহমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য নিদর্শন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহই সেই মহান স্রষ্টা– যিনি চতুর্দিক বেষ্টনকারী আকাশ ও সর্ববিস্তৃত জমিন সৃষ্টি করেছেন। আপনি যেখানেই যান, না আকাশ আপনার পিছু ছাড়বে আর না জমিনের এই বিছানা। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে এ আয়াতে– وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ○ وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ○ 'আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম।'[১]

এ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তোমরা তোমাদের সামনে-পেছনে, ডানে-বামে তাকাও বিস্তৃত আকাশ ও প্রশস্ত জমিন দেখতে পাবে। যিনি এতো বড় সৃষ্টির স্রষ্টা, যিনি এতো শক্তিধর কুদরতের অধিকারী, তিনি কি তোমাদের মতো ছোট মাখলুককে একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন? তিনি তো সক্ষম, ইচ্ছা করলে তোমাদের জমিনে ধসিয়ে দিতে পারেন, কিংবা আকাশ ভেঙ্গে তোমাদের ওপর ফেলে দিতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমরা জুলুম ও গুনাহের কারণে শাস্তির উপযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এবং ক্ষমা যে, তিনি তোমাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন।

যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, চিন্তাশীল এবং যার মধ্যে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল অন্তর আছে; সে তো এই বিশাল নিদর্শন দেখার পর ওই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কুদরতের ব্যাপারে সন্দেহ করতেই পারে না যে, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে। যিনি আকাশের মতো বিস্তৃত শামিয়ানা ও জমিনের মতো গালিচা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্যে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা এমন কি কঠিন কাজ? যিনি প্রথমবার হাড্ডি, গোশত ও চামড়া সৃষ্টি করেছেন,

---

১. সূরা যারিয়াত : ৪৭-৪৮।

সেগুলো পঁচে গলে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ে যাওয়ার পর পুনরায় একত্র করে প্রতিস্থাপন করা তাঁর জন্যে এমন কি কঠিন কাজ? এ কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে যে,...أَوَلَيْسَ الَّذِي الخ —'যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? নি:সন্দেহে সক্ষম।'[২]

অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে- لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ○—'নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা অনেক দুরূহ ও কঠিন কাজ হলো আসমানসমূহ ও জমিনসমূহ সৃষ্টি করা। যদিও অধিকাংশ মানুষ না জানার ভান করে।'

## সূরা সাবার ২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّـآ اَوْ اِيَّـاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ○

বলুন, আসমানসমূহ ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দেন? বলুন, 'আল্লাহ'। আর নিশ্চয় হয় আমরা না হয় তোমরা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহর এ কথা প্রমাণিত যে, তিনিই একক স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। তিনিই উলুহিয়াতের একক অধিকারী। যে কথা তারাও স্বীকার করে যে, তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণকারী, জমিন থেকে শষ্য উৎপন্নকারী। তেমনিভাবে তাদের এটাও স্বীকার করা উচিত যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহই।

আল্লাহ আয়াতের শেষাংশে বলেন, যখন তোমাদের ও আমাদের মাঝে এতোটা বৈপরীত্ব, তাহলে অবশ্যই একদল হিদায়াতের ওপর ও অন্যদল গুমরাহির ওপর রয়েছে।

## সূরা ফাতিরের ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

সমস্ত প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই—যিনি ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহকরূপে নিযুক্তকারী, যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

---

২. সূরা ইয়াসীন : ৮১।

ব্যাখ্যা : সর্বাগ্রে কোনো ধরনের নমুনা ব্যতিরেকে আল্লাহ তাআলা নিজ পূর্ণাঙ্গ কুদরতে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন।

যাহ্হাক রহ. বলেন, فاطر শব্দের অর্থ স্রষ্টা। আল্লাহ তাঁর নিজের ও নবীদের মাঝে দূতিয়ালির কাজের জন্যে ফেরেশতাদের বানিয়েছেন, যারা পর বিশিষ্ট ও উড়তে সক্ষম। যেন দ্রুত আল্লাহর বার্তা নবী-রাসূলদের কাছে পৌঁছাতে পারেন। ফেরেশতাদের ডানা কারো দু'টি, কারো তিনটি, কারো চার-চারটে। কারো কারো এরচেয়ে বেশি সংখ্যক ডানা রয়েছে। সেমতে হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূল সা. মে'রাজের রজনীতে হযরত জিবরাঈল আ.-কে দেখতে পান। তাঁর শরীরে ছ' শ' ডানা ছিলো। একটি ডানা থেকে অন্য ডানার দূরত্ব ছিলো পূর্ব-পশ্চিমের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।

আয়াতের শেষাংশে এসেছে, আল্লাহ যখন যাকে ইচ্ছা বাড়িয়ে দেন। কাউকে এর চেয়ে অধিক সংখ্যক ডানা দেন। তিনি তাঁর মহাবিশ্বে যখন যা ইচ্ছা তাই করেন।

## সূরা ফাতিরের ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ উন্মুক্ত করলে কেউ তার বারণকারী নাই। আর তিনি কিছু বারণ করতে চাইতে কেউ তার উন্মুক্তকারী নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ যা চান তাই হয়ে থাকে। তাঁর চাওয়ার বাইরে কোনো কিছুই হয় না। তিনি যাকে দিতে চান কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না। তিনি যাকে দিতে চান না তাকে কেউ দিতে পারে না।

ইমাম মালিক রহ. বলেন, বৃষ্টি শুরু হলে হযরত আবু হুরায়রা রা. বলতেন, আমাদের ওপর 'ফতাহ' নক্ষত্র থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছে। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন। [ইবনে আবী হাতেম]

## সূরা ফাতিরের ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। তারপর আমি তা মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি তা দ্বারা ধরণীকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এভাবেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

ব্যাখ্যা : কুরআন কারীমে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে সাধারণত শুষ্ক জমিনকে সবুজ হওয়ার দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যেমনটি সূরা হজ সহ বেশ কিছু সূরায় লক্ষ্য করা যায়। এতে মানুষের জন্য পূর্ণ শিক্ষণীয় এবং মৃতকে জীবিত হওয়ার পূর্ণ প্রমাণ রয়েছে। যেই মাটি এতো দিন পূর্ণ শুষ্ক ও অনাবাদ হয়ে পড়েছিলো। যেখানে সবুজের নাম-গন্ধও ছিলো না। কিন্তু যখনই মেঘ আকাশে উঠে বৃষ্টি বর্ষণ করে, তখন শুষ্ক জমিন তাজা হয়ে জেগে ওঠে। যেখানে ইতঃপূর্বে একটি তৃণলতাও দেখা যায়নি, এখন যত দূর চোখ যায় শুধু সবুজের দৃষ্টিনন্দন সমাহার দেখা যায়। তদ্রূপ বনী আদমের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কবরের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকবে। একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হবে; কিন্তু আরশের নিম্নদেশ থেকে পানি বর্ষণ হতেই সমস্ত শরীর কবর থেকে উত্থিত হতে থাকবে, যেভাবে জমিনের বীজ থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে আসে।

সুতরাং বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, বনী আদমের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গেচুরে একাকার হয়ে যায়; কিন্তু তার মেরূদণ্ড ভাঙ্গে না। তা থেকেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। আবার এথেকেই পুনর্বিন্যাস করা হবে। এটিও আমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। এভাবেই মৃত্যুর পর জীবিত হবে। সূরা হজের তাফসীরে এ হাদীস আলোচিত হয়েছে যে, আবু রাযীন রা. একদিন নবী কারীম সা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! আল্লাহ তাআলা মৃতদেরকে কী ভাবে পুনর্জীবন দান করবেন? তাঁর সৃষ্টির মাঝে এ বিষয়ে কি প্রমাণ আছে? উত্তরে নবীজী সা. বলেন, আবু রাযীন! তুমি কি তোমার জনপদের আশপাশের জমিনের পাশ দিয়ে কখনও অতিক্রম করোনি যে, সেগুলো অনাবাদ ও শুষ্ক পড়েছিলো। আবার যখন অন্য সময় ওই জমিনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছো তখন কি দেখো নি যে, সেগুলো সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠেছে? আর সতেজতা প্রতিটি স্থানে দোল খাচ্ছে। আবু রাযীন রা. উত্তরে বলেন, অব্যশই দেখেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন তো অনেক সময়ই দেখা যায়। নবীজী বললেন, আল্লাহ তাআলাও এভাবে মৃতকে জীবিত করবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপন করতে চায় সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করে। তিনিই সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। দুনিয়া ও আখেরাতের তিনিই একক নৃপতি। সমস্ত ইজ্জত তাঁরই মালিকানাধীন।

অপর এক আয়াতে এসেছে, যারা সম্মান লাভের আশায় মুমিনদের রেখে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তারা কখনই সম্মান পাবে না। সম্মান একমাত্র আল্লাহর হাতে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'আপনাকে তাদের কথা যেন কখনই পীড়া না দেয়। সকল সম্মান আল্লাহ তাআলারই জন্য।'

অপর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

সম্মান আল্লাহরই জন্যে এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যে। যদিও মুনাফেক শ্রেণির লোকেরা তা জানে না।

## সূরা ফাতিরের ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۭ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۭ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

(হে লোকসকল!) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। আর কোনো দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাসও করা হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে 'কিতাবে'। নিশ্চয় তা আল্লাহর জন্য সহজ।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা তোমাদের আদিপিতা আদম আ.-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাঁর বংশপরিক্রমা প্রবহমাণ রেখেছেন নাপাক পানির মাধ্যমে। এরপর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় (অর্থাৎ নারী-পুরুষ আকারে)। এটিও তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি পুরুষদের জন্যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যা তাদের জন্যে শান্তি-সুখের উৎস। আল্লাহ প্রতিটি গর্ভবতীর গর্ভধারণ ও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ সম্পর্কে অবহিত। এমনকি গাছের প্রতিটি পাতার নড়াচড়া এবং অন্ধকারে পড়ে থাকা প্রতিটি শুষ্ক ও আর্দ্র জিনিস সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। পূর্ণ বৃত্তান্ত তাঁর কিতাবে লেখা আছে। যে কথা এ আয়াতে এসেছে যে, اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ 'সম্মান আল্লাহরই জন্যে এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যে। যদিও মুনাফেক শ্রেণির লোকেরা তা জানে না।'

উক্ত আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা এ কথা জানেন যে, কোন শুক্রাণুটি দীর্ঘ হায়াত পাবে। এ কথাও তাঁর কিতাবে লেখা আছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তির জন্যে দীর্ঘ জীবনের কথা লেখা আছে সে অবশ্যই ওই জীবন অতিবাহিত করবে। তার সেই দীর্ঘ জীবনের কথা আমার কিতাবে লেখা আছে। যার জন্যে আমি স্বল্প হায়াত বরাদ্দ করেছি, সে ওই বয়স পর্যন্তই পৌঁছবে, যার পূর্ণ বিবরণ আল্লাহ তাআলার প্রথম কিতাবে লেখা আছে। আল্লাহর জন্যে এ সবকিছু অত্যন্ত সহজ।

বয়স অসম্পূর্ণ হওয়ার এক অর্থ এটাও হতে পারে যে, ওই শুক্রাণুটি পূর্ণতা

প্রাপ্তির পূর্বেই ঝরে পড়ে। এ সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই অবগত। কিছু মানুষ একশ' বছরের হায়াত পায়। আবার কেউ জন্মের সময় মারা যায়। ষাট বছরের কম বয়সে মৃত্যুবরণকারীও অসম্পূর্ণ বয়সের। এ কথাও বলা হয়েছে যে, মায়ের পেটেই বয়সের কম-বেশির কথা লেখা হয়। সকর সৃষ্টিজীব একই বয়সের হয় না। কেউ দীর্ঘায়ুর আবার কেউ স্বল্পায়ুর হয়ে থাকে। আর এসবকিছুই আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ। তিনি যার জন্যে যেমন হায়াত লিখেছেন সে মতেই দৃশ্যমান হয়ে আসছে।

কেউ কেউ বলেন— তার অর্থ হলো, যে আয়ু লেখা হয়েছে এবং তন্মধ্য হতে যে পরিমাণ অতিবাহিত হয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ আল্লাহ জানেন এবং তা আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

## সূরা ফাতিরের ১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

সমুদ্র দু'টি এক নয়; একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়; আপরটির পানি লোনা ও খর। আর উভয়টি থেকে তোমরা খাও তাজা গোশ্ত (মৎস) এবং আহরণ কর অলঙ্কার যা তোমরা পরিধান কর। আর দেখ তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে। যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এ আয়াতে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টির কথা আলোচনা করে তাঁর বিশাল কুদরতের প্রমাণ করছেন। তিনি দু' ধরনের নদী সৃষ্টি করেছেন। একটিতে প্রবাহিত হচ্ছে পরিষ্কার টলটলে সুমিষ্ট ও উন্নত পানি। এই পানি জনপদের ভেতর দিয়ে, বন-জঙ্গলে রীতিমতো প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যদিকে আছে সুস্থির পানির সমুদ্র। যার পানি লবণাক্ত ও তেতো। তার ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছে বড় বড় নৌকা-জাহাজ।

উভয় প্রকার জলাধার থেকে তোমরা নানা প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করছো। আর তরতাজা গোস্ত তোমরা খাচ্ছো। অতঃপর সেখান থেকে আহরণ করো মূল্যবান হিরা-মুক্তা-মাণিক। এই নৌযানগুলো বাতাসের সাথে লড়াই করে নিয়ম অনুযায়ী পানিতে চলতে থাকে এবং সামনে এগিয়ে যায়, যেন তোমরা তা থেকে ভালো কিছু খুঁজে নিতে পারো। বাণিজ্যিক মাল-সামানা নিয়ে সফর করো। একদেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পারো। আল্লাহ বলছেন, তোমরা স্বীয় রবের শুকরিয়া আদায় করো, আমি এগুলোকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি। তোমরা এগুলোর মাধ্যমে সমুদ্র ও নদী-নালার মাধ্যমে উপকৃত হও। যথেচ্ছা

যেতে পারো। কুদরতের অধিকারী মহান আল্লাহ আসমান-জমিনের বিভিন্ন জিনিসকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বানিয়ে দিয়েছেন। এটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও বদান্যতা।

## সূরা ফাতিরের ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝

তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে; তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই। আর আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের কথা আলোচনা করছেন, তিনি রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দিনকে আলোকময় বানিয়েছেন। কখনও রাতকে দীর্ঘ করেন; কখনও দিনকে দীর্ঘ করেন। কখনও রাত-দিন উভয়কে সমান করে দেন। কখনও শীত, কখনও গরম দেন। তিনিই চন্দ্র, সূর্য এবং চঞ্চল ও সুস্থির তারকারাজিকে বশীভূত করে রেখেছেন। সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট বৃত্তে, নির্ধারিত সীমারেখায় প্রদক্ষিণ করে বেড়ায়। তিনি অসীম কুদরত ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী।

আল্লাহ এই ব্যবস্থপনা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। যা ধারাবাহিকভাবে চলছে এবং নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে চলতেই থাকবে। যেই আল্লাহ এতোকিছু করেছেন, তিনিই সত্যিকারর্থে উপসনার যোগ্য। তিনিই সবার প্রতিপালক। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নন। কাফের-মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের উপাসনা করে, চাই সে ফেরেশতা হোক না কেনো, সবই আল্লাহর সামনে নিরুপায় ও শক্তিহীন। খেজুরের বীচির ওপর যেই পাতলা আবরণ থাকে তারা এমন তুচ্ছ জিনিসও তৈরি করতে পারবে না। আসমান ও জমিনের অতি তুচ্ছ জিনিসেরও তারা মালিক নয়। আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা তোমাদের ডাক শুনতেই পায় না। তোমাদের এ সকল মূর্তির শ্রবণেন্দ্রীয় নেই যে, শুনতে পাবে। নিষ্প্রাণ বস্তু কি কারো কথা শুনতে পায়? আর যদি ধরেই নেই যে, এগুলো তোমাদের কথা শুনতে পায় তাহলে যেহেতু তাদের নিয়ন্ত্রণে কোনো জিনিস নেই, তাই তারা তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে না। কিয়ামতের দিন সেগুলো তোমাদের এই শিরক বেমালুম অস্বীকার করবে। সেদিন তারা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট দেখতে পাবে।

## সূরা ফাতিরের ২৭-২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ ۝ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۝

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তারপর আমি তা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উৎপাদন করি? আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ—শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছ। বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক অনন্য প্রকাশ হলো, তিনি একই প্রজাতির জিনিসের মাঝে রূপ বৈচিত্রের অবতারণা করেন। এই ধরুন, যেই বৃষ্টি ওপর থেকে বর্ষিত হয় সেই পানি দিয়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের ফল সৃষ্টি করেন। লাল, সবুজ, সাদা বর্ণের ফল বাগানে বাগানে থোকায় থোকায় ঝুলে থাকে। প্রতিটি ফলের স্বাদ যেমন ভিন্ন, ঘ্রাণও ভিন্ন। যেমনটি আল্লাহ অপর এক আয়াতে বলেছেন, وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ অর্থাৎ কোথাও আঙ্গুর, কোথাও খেজুর, কোথাও চাষাবাদ ইত্যাদি শোভা পাচ্ছে।

তদ্রূপ পাহাড়গুলোও এক রকম নয়। কোনোটি সাদা, কোনোটি লাল, কোনোটি কালো। কোনো পাহাড়ের ওপর দিয়ে একেবেকে পথ গেছে। কোনোটি লম্বাটে। কোনোটি অসমতল। এগুলো নিষ্প্রাণ সৃষ্টি। এবার আমরা প্রাণীদের দিকে তাকাবো। মানুষ, জীব-জন্তু ও চতুষ্পদ জন্তুদের দিকে তাকান সেখানেও কুদরতের বাহারি বৈচিত্র্য দেখতে পাবেন। আফ্রিকার বর্বর গোত্রের লোকেরা ঘোর কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে থাকে। রোমানরা হয় ধবধবে সাদা। আরবরা হয় মাঝারি রংয়ের। হিন্দুস্তানি লোকেরা অনেকটা তাদের কাছাকাছি বর্ণের হয়ে থাকে। কুরআন কারীম وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ الخ বলে সেদিকে ইশারা করেছে যে, তোমাদের ভাষার বিভিন্নতা, গাত্রবর্ণের বৈচিত্র্যও জ্ঞানীদের জন্যে কুদরতের অনন্য নিদর্শন।

এমনিভাবে চতুষ্পদ জন্তু সহ প্রাণীকুলের প্রতিটির রং-রূপ আলাদা। এমনকি একই প্রজাতির জন্তুগুলোর মাঝেও বাহারি রংয়ের প্রকাশ দেখা যায়। এমনকি একই জন্তুর শরীরে কয়েক ধরণের রং হয়ে থাকে। সুবহানাল্লাহ। সবই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিক্ষমতার অনন্য প্রকাশ।

মুসনাদে বায্যারে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করলো, হে

আল্লাহর রাসূল সা.! আল্লাহ কি রংয়ের মাঝে মিশ্রণও করেন? উত্তরে নবীজী বলেন, হ্যাঁ, তিনি এমনভাবে রঙ্গায়ণ করেন, যা কখনই ফেঁকাসে হয় না। তিনি লাল, হলুদ ও সাদা সহ বাহারি রংয়ের মিশ্রণ করেন।

এরপর রাসূল সা. আরো বলেন, আল্লাহকে যতোটা ভয় করা দরকার, তা কেবল আলেমরাই করেন। কারণ, তারা আল্লাহকে চেনেন ও জানেন। বাস্তবেই যে ব্যক্তির যতোটুকু আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে, তার অন্তরে আল্লাহর বড়ত্বের প্রভাবও ওই পরিমাণ হবে। যে ব্যক্তি জানে যে, আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ওপর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী সে প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে তারই সাচ্চা ইলম রয়েছে যে তার সত্তার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করে না। তাঁর কৃত হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করে এবং হারামকে হারাম হিসেবে বর্জন করে। তাঁর প্রতিটি নির্দেশের ওপর বিশ্বাস রাখে। তাঁর উপদেশ প্রতিপালন করে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার ও তাঁর কাছে প্রতিটি আমলের জবাবদিহিতার প্রতি বিশ্বাস রাখে।

ভয়ের মাঝেও এক ধরণের শক্তি থাকে; যা বান্দাকে আল্লাহর অবাধ্য হতে দেয় না। আলেম বলে ওই ব্যক্তিকে যে পর্দার আড়ালেও আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে উৎসাহী থাকে এবং তাঁর অসন্তোষজনক কর্মকাণ্ডকে বর্জন করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, কথা বেশি জানার নাম ইলম নয়; আল্লাহকে অধিক ভয় করার নাম ইলম। ইমাম মালেক রহ. বলেন, অধিক বর্ণনা করার নাম ইলম নয়; ইলম তো হলো একটি নূর– যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে ঢেলে দেন। হযরত আহমদ ইবনে সালেহ মিসরি রহ. বলেন, অধিক বর্ণনার নাম ইলম নয়; ইলম হলো, ওই জিনিসের অনুসরণ করা, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ফরয' করা হয়েছে। অর্থাৎ কিতাব, সুন্নাহ এবং যা সাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মাহ থেকে প্রাপ্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকেই অর্জন হয়।

বর্ণিত আছে, উলামা তিন প্রকার। ১. আলেম বিল্লাহ। ২. আলেম বি আমরিল্লাহ। ৩. আলেম বিল্লাহ ও বি আমরিল্লাহ। আলেম বিল্লাহ যেমন আলেম বি আমরিল্লাহ নয়; তদ্রূপ আলেম বি আমরিল্লাহ ও আলিম বিল্লাহও নয়। হ্যাঁ, আলেম বিল্লাহ ও বি আমরিল্লাহ হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে এবং হুদূদ ও ফারায়েয সম্পর্কে অবহিত। আলেম বিল্লাহ হলো ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভয় করে; কিন্তু হুদূদ ও ফারায়েয জানে না। আর আলেম বি আমরিল্লাহ হলো ওই ব্যক্তি যে হুদূদ ও ফারায়েয সম্পর্কে অবগত; কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর ভয়ডর নেই।

## সূরা ফাতিরের ৩৮-৩৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

إِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَ لَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَ لَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ۝

নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবগত। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। আর কাফিরদের কুফরী তাদের রবের কেবল ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

ব্যাখ্যা : এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ব্যাপক ও অসীম ইলম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে, আল্লাহ আসমান-জমিনের প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত। অন্তরের রহস্য ও বক্ষস্থিত ভাষ্য দিবালোকের ন্যায় অবগত। তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে নিজ নিজ আমল অনুপাতে বিনিময় দেবেন। তিনি তোমাদেরকে জমিনে একে অন্যের খলীফা বানিয়েছেন। কাফেরদের কুফুরির অশুভ পরিণতি খোদ তাদের ওপর পড়বে। তারা তাদের কুফুরিতে যে পরিমাণ বাড়বে, তাদের ওপর আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়বে। এর ফলে ক্ষতির পরিমাণও বাড়তে থাকবে। এর বিপরীতে মুমিনের অবস্থা হলো, তার বয়স যতো বাড়ে, নেক কাজও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। ফলে তার মর্যাদা উন্নীত হয় এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

## সূরা ফাতিরের ৪১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে এগুলো স্থানচ্যুত না হয়। আর এগুলো স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত আর কে এগুলোকে রক্ষা করবে? নিশ্চয় তিনি পরম সহনশীল, অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলাই সেই সত্য মা'বুদ– যাঁর কুদরত ও শক্তিমত্তার দলীল হলো, তাঁর হুকুমেই আসমান ও জমিন স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে সুস্থির আছে। এদিক-ওদিক হেলে পড়ে না। আল্লাহ আসমানকে জমিনের ওপর ভূপতিত হওয়া থেকে নিরোধ করছেন। আল্লাহর

নির্দেশেই আসমান ও জমিন সুস্থির আছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তাদেরকে স্বস্থানে সুস্থির রাখা, ভেঙ্গে পড়া থেকে রক্ষা করা ও তাদের পূর্ণ ব্যবস্থাপনাকে সঠিকভাবে পরিচালনা সম্ভব না। ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল আল্লাহ মাখলুককে নাফরমানি, অবাধ্যতা ও শিরক করতে দেখেও অবিরত ক্ষমা ও সংযম প্রদর্শন করে যাচ্ছেন। তাদের অবকাশ দিচ্ছেন। ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন। এমনকি ক্ষমাও করছেন।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এ আয়াতের তাফসীরে এ হাদীস এসেছে যে, নবী কারীম সা. একদিন মিম্বরে বসে সাইয়্যেদুনা মূসা আ.-এর একটি ঘটনা বয়ান করে ছিলেন। ঘটনাটি হলো, একদিন মূসা আ.-এর মনে এ খেয়াল এলো যে, আল্লাহ তাআলা কি কখনও ঘুমান না? তখন আল্লাহ তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। ওই ফেরেশতা তাঁকে তিনদিন পর্যন্ত ঘুমুতে দেয়নি। অতঃপর তাঁর দু' হাতে একটি করে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বললেন, গ্লাসগুলো সযত্নে রাখুন। যেন আপনার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে না যায়। মূসা আ. গ্লাস দু'টি হাতে নিয়ে তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু ঘুমের এতই প্রকোপ ছিলো যে, হাই আসতে লাগলো। কিছু ঝাঁকুনি এমনভাবে এলো যে, তিনি সাবধান হয়ে গেলেন এবং বোতল পড়তে দিলেন না। কিন্তু অবশেষে ঘুমই জয়ী হলো এবং বোতল হাত থেকে মাটিতে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি দু'টি বোতলকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, আল্লাহ তাআলা যদি ঘুমাতেন তাহলে আসমান ও জমিনকে কিভাবে সুরক্ষা করতেন।

## সূরা ফাতিরের ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۭ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ○

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে তারা দেখত, কেমন ছিলো তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম। অথচ তারা তো শক্তিতে ছিলো এদের চেয়েও প্রবল। আল্লাহ এমন নন যে, আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ করছেন, আপনি ওই অস্বীকারকারীদের বলুন, তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখো– তোমাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণতি হয়েছিলো? তাদের থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। তাদের শক্তিমত্তা ধুলিস্যাৎ হয়েছে। তাদের ধন-সম্পদ বরবাদ হয়েছে। তাদের সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়েছে। তাদের থেকে

আল্লাহর আযাব কেউ প্রতিহত করতে পারেনি। তারা হয়েছে নির্বংশ এবং হয়েছে সমূলে উৎপাটিত। তাদের সহযোগীরা তাদের বিন্দু পরিমাণ উপকার করতে পারেনি। তাদের উপাস্যগুলো তাদের কোনো কাজে আসেনি। তাদের কোনো স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

কারণ, আল্লাহর নির্দেশ প্রতিহত করার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি মহাবিশ্ব সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। তিনি যে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সক্ষম। তিনি যদি তাঁর বান্দাদেরকে নিজ নিজ গুনাহের কারণে পাকড়াও করতেন তাহলে আসমান ও জমিনের সকল অধিবাসী এতোদিন ধ্বংস হয়ে যেতো। জীব-জন্তু ও রিযিক পর্যন্ত উজাড় হয়ে যেতো। পৃথিবীর বুকে একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারতো না। কারণ, প্রতিটি প্রাণীকে তার নিজ নিজ আবাসস্থলেই আল্লাহর আযাব পৌঁছে যেতো। আল্লাহ তা করেন নি। তিনি আমাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। আমাদের ওপর আযাব স্থগিত রেখেছেন।

## সূরা ইয়াসীনের ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

তারা কি লক্ষ্য করেনি, তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, নিশ্চয় যারা তাদের কাছে ফিরে আসবে না।

ব্যাখ্যা : উদ্দেশ্য হলো, কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর আযাব দেখে আক্ষেপ করবে, কেনো তারা নবী-রাসূলদের অস্বীকার করেছে? কেনো তারা আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছে? পৃথিবীতে তাদের অবস্থা এমন ছিলো যে, যখনই তাদের কাছে কোনো রাসূল এসেছে, তারা চিন্তা-ভাবনা না করে মুখের ওপর তাঁকে অস্বীকার করেছে। তাঁদের সঙ্গে চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অপমান করেছে। তারা যদি একটুখানি চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে অবশ্যই বুঝতো, তাদের পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীদের কী দশা হয়েছিলো? রাসূলদের অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। তাদের ধুলোর ন্যায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে একজনও রক্ষা পায়নি, আর না আখেরাত [illegible] থেকে ফিরে আসতে পারবে।

## সূরা ইয়াসীনের ৩৩-৩৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○ وَ جَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ وَّ فَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ○ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَ مَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

আর মৃত জমিন তাদের জন্য একটি নিদর্শন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্যদানা। যা তারা খায়। আর তাতে আমি সৃষ্টি করেছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি ঝর্নাধারা। যাতে তারা তার ফল খেতে পারে, অথচ তাদের হাত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? পবিত্র ও মহান সে সত্তা— যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ ইরশাদ করেন, আমার অস্তিত্বের, অসাধারণ কুদরতের ও মৃতদেরকে জীবিত করার এটিও একটি নিদর্শন যে, মৃত জমিন যা অনাবাদী শুষ্ক পড়ে থাকে, যেখানে অঙ্কুর গজানো বা সবুজ-শ্যামল কোনো ঘাস ইত্যাদি হতো না। আমি তখন ওই জমিনে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং সেই মৃত জমিন সজীব হয়ে ওঠে। তার বুকে শষ্যের শীষগুলো দোল খেতে থাকে। চতুর্দিকে সবুজ আর সবুজের অনিন্দ্য সমারোহ চোখে পড়ে। সেখানে রংবেরং-এর ফুল-ফল শোভা পায়। আল্লাহ বলেন, আমিই সেই মৃত জমিনকে সজীব করেছি। সেখানে আমিই নানা রকমের শষ্য উৎপন্ন করি। ওই উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশ তোমরা নিজেরা ভক্ষণ করো, আর বাকিটা তোমাদের জন্তুগুলোকে খেতে দাও। আমি ওই মৃত জমিনের কোথাও খেজুর, কোথাও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি। সেখানে ঝরনা প্রবাহিত করি। যা বাগান ও ক্ষেত-খামারে এনে দেয় সবুজের সমারোহ। আমি এটা এজন্যে করি যে, যেন দুনিয়াবাসী ওই বাগানের গাছগুলো থেকে ফল খেতে পারে; যেন তারা ক্ষেত-খামার থেকে উপকৃত হতে পারে। এগুলোর মাধ্যমে যেন তারা তাদের অন্য প্রয়োজনগুলোও পূরণ করতে পারে।

এগুলো আল্লাহ তাআলার দয়া ও কুদরতের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। না তোমাদের মধ্যে সেগুলো উৎপন্ন করার ক্ষমতা আছে, না রক্ষা করতে পারবে, আর না তৈরি করতে পারবে। এগুলো একমাত্র মহান আল্লাহর কুদরতের প্রতিফল। তাঁরই দয়া ও অনুগ্রহের সাথে সাথে এসব তাঁর কুদরতের নিদর্শন। তারপরও তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় করছো না? আল্লাহ তাআলার অসংখ্য অগণিত নেয়ামত নিজের কাছে থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করো না। এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাগানের ফল যে খায় তার হাতের ঘ্রাণও তিনি পান।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কিরাআত অনুসারে আয়াতটির অর্থ হয়, কতোই না পবিত্র ও মহান সেই সত্তা, যিনি সমস্ত অনিষ্টতা থেকে পবিত্র এবং ওই আল্লাহ তাআলা যিনি জমিনের উৎপাদিত ফসল ও খোদ তোমাদেরকে

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন প্রাণীকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। যাদের কথা তোমরা জানো না। যে কথা অন্য আয়াতে এসেছে, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.—'আমি প্রতিটি জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'

## সূরা ইয়াসীনের ৩৭-৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ○ وَ الشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

তাদের জন্য রাত একটি নিদর্শন; আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-র নিয়ন্ত্রণ। আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মনযিলসমূহ, অবশেষে তা খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মত হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।

ব্যাখ্যা : এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌম কুদরতের একটি নিদর্শনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তা হলো, দিন-রাত পালাক্রমে আগমন ও প্রস্থান। দিন হয় আলোকময়, আর রাত হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا. —'তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে এদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে।' এখানেও বলেছেন, আমি দিনকে রাত থেকে সরিয়ে নিই। ফলে দিন সমাপ্ত হয় রাত চলে আসে এবং চতুর্দিক থেকে অন্ধকার ছেয়ে যায়।

শুধু সূর্যই নয়; বরং সমস্ত মাখলুক আরশের নিচেই থাকে। কারণ, আরশ সমস্ত মাখলুকের ওপরে; সবাইকে বেষ্টন করে আছে। আরশ গোলাকার নয়; যেমনটি কিছু দার্শনিক বলে থাকে। আরশ হলো, গম্বুজের মতো। যার নিচে পায়া রয়েছে। যাকে ফেরেশতাগণ বহন করে আছে। এই আরশ রয়েছে আমাদের মাথা বরাবর ওপরের জগতে। সূর্য যখন ঠিক মধ্যাহ্নের সময় তখন ঠিক যোহরের সময় হয়। ওই সময় সেটি আরশের খুব কাছাকাছি চলে আসে। এরপর সেটি যখন ঘুরতে ঘুরতে চতুর্থ বৃত্তে চলে আসে তখন সেটি ঠিক বিপরীত অবস্থানে চলে যায়। আর এটি হয় অর্ধরাতের সময়। তখন তার অবস্থান থাকে আরশ থেকে অনেক দূরে। অতঃপর সে সেজদা করে এবং

উদয়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে।

সহীহ্ বুখারীতে এসেছে, আবু যর রা. বলেন, 'একদিন আমি সূর্যাস্তের সময় নবী কারীম সা.-এর সাথে মসজিদে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেন, জানো সূর্য কোথায় অস্ত যায়? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। নবীজী সা. তখন বললেন, সূর্য আরশের নিচে গিয়ে আল্লাহকে সেজদা করে।' অপর হাদীসে এসেছে, আবু যর রা. একদিন নবী কারীম সা.-কে ওই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেন। তখন নবীজী বলেন, তাঁর নিবাস হলো আরশের নিচে।

মুসনাদে আহমদের হাদীসে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, সূর্য আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন তাকে অনুমতি দেয়া হয়। যেন তাকে বলা হচ্ছে, যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও। সূর্য তখন নিজ উদয়স্থল থেকে বের হয়। এটাই তার অবস্থানস্থল। এতোটুকু বলার পর নবীজী ওই আয়াতের প্রথম অংশ তেলাওয়াত করেন।

এক হাদীসে এ কথাও এসেছে যে, 'সেদিন খুব কাছে যেদিন সূর্য সেজদা করবে কিন্তু গ্রহণ করা হবে না। অনুমতি চাইবে কিন্তু অনুমতি দেওয়া হবে না। বরং বলা হবে, যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এটাই হলো এ আয়াতের ব্যাখ্যা'।

কেউ কেউ বলেন, مستقر (অবস্থানস্থল) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার চলার শেষ সীমা। সর্বোচ্চ উড্ডয়ন– যা গ্রীস্মকালে হয়। সর্বোচ্চ অবনমন– যা শীতকালে হয়। আরেকটি মত হলো, আয়াতে مستقر (অবস্থানস্থল) শব্দ দ্বারা তার পরিভ্রমণের সমাপ্তির কথা বলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন সূর্যের পরিভ্রমণ চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত হবে। তখন সে আলোহীন হয়ে পড়বে। এই পৃথিবী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয়, مستقر زماني (সময়কেন্দ্রিক অবস্থান)।

হযরত কতাদাহ রহ. বলেন, সূর্য নিজ مستقر (অবস্থানস্থল) অনুসারে চলে। অর্থাৎ সে তার সময় ও মাপকাঠি অতিক্রম করে না। গ্রীষ্ম ও শীতকালের জন্যে তার যেই সীমারেখা রয়েছে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলে। ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস রা.-এর কিরাআতে এ কথা এসেছে যে, সূর্যের স্থিরতা নেই। তা দিন-রাত আল্লাহর নির্দেশে পরিভ্রমণ করতে থাকে। না থামে আর না ক্লান্ত হয়। যেমন বলেছেন— আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে চন্দ্র-সূর্যকে এমনভাবে বশীভূত করে দিয়েছেন, সেগুলো না কখনও থামে না ক্লান্ত হয়। কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তাদের জন্যে এই পরিমাপ বানিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ্। আল্লাহ্ কর্তৃক সেগুলোর জন্যে পথপরিক্রমার নির্ধারণ এতোটাই অলঙ্ঘনীয় যে, পৃথিবীর কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবে না। আল্লাহর নির্দেশ এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ স্থগিত করতে পারবে না। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী। তিনি

প্রতিটি স্পন্দন ও পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত। তিনি স্বীয় ত্রুটিহীন হিকমতের মাধ্যমে সূর্যের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যার বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি পৃথিবীর কারো নেই।

যেই আল্লাহ সূর্যকে সকালবেলা উদিত করেন, সেই আল্লাহই রাতের বেলা সূর্যকে সরিয়ে নেন, যেন তোমাদের রাত্রিকালীন বিশ্রাম যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। এভাবে মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ চন্দ্র-সূর্যের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা চন্দ্রের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তার রয়েছে নিজস্ব গতিধারা। যদ্দারা মাসের হিসাব জানতে পারি, যেভাবে সূর্যের পরিভ্রমণের মাধ্যমে আমরা দিন-রাত বুঝতে পারি। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'লোকেরা আপনাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তখন উত্তরে বলুন, এতে রয়েছে সময় ও হজের মৌসুম চেনার ব্যবস্থা।' অপর আয়াতে এসেছে, 'আল্লাহ সূর্যকে ضيا (প্রখর আলো) ও চাঁদকে نور (সহনীয় আলো) দিয়েছেন। সেগুলোর কক্ষপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেন তোমরা বছরের ও বিভিন্ন হিসাব জানতে পারো।

এক আয়াতে এসেছে–

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً

আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। অতঃপর নিষ্প্রভ করে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করো এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

কাজেই সূর্যের প্রখর উজ্জ্বলতা তার সঙ্গেই বিশেষায়িত। চাঁদের উজ্জ্বলতাও এরই মধ্যে নিহিত, তার গতিপথও ভিন্ন। সূর্য প্রতিদিন উদয় ও অস্তগামী হয় তার নিজস্ব আলো বিকিরণ করে। তবে হ্যাঁ, তার উদয় ও অস্তাচলের স্থান গ্রীষ্ম ও শীতকালে ভিন্ন হয়ে থাকে। একই কারণে দিন-রাতের দৈর্ঘ কম-বেশ হয়ে থাকে। সূর্য হল দিবসের নক্ষত্র। চাঁদ হলো রাতের নক্ষত্র। প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন মানযিল বা কক্ষপথ রয়েছে। মাসের প্রথম রাতে উদিত হয় তখন সেটি বেশ ছোট হয়ে থাকে। তার আলো ক্ষীণ হয়। দ্বিতীয় রাতে ওই আলো আরেকটু বাড়ে। কক্ষপথও উন্নীত হয়। এভাবে তার ঊর্ধ্বারোহণ যতো বাড়ে আলোর পরিমাণও ততো বাড়ে। অবশেষে চৌদ্দ তারিখে সেটি পূর্ণ অবয়বে আত্মপ্রকাশ করে। তখন তার মাঝে স্নিগ্ধ আলোর পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এরপর সেটি কমতে শুরু

করে এবং ধীরে ধীরে কমতে কমতে এক পর্যায়ে খেজুরের শুকনো ডালের মতো চিকন হয়ে যায়। তারপর অস্ত যায়। প্রতিমাসে তার নতুন পর্ব শুরু হয়।

আরবদেশে চাঁদের আলোর ওপর ভিত্তি করে মাসের প্রায় প্রতিটি রাতের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন, প্রথম তিন রাতের নাম غُرَرْ। এরপরের তিন রাতের নাম نَفَلْ। এরপরের তিন রাতের নাম تِسْعٌ। কারণ, এ স্তরের শেষ রাতটি হলো নয় তারিখের রাত। এরপরের তিন রাতের নাম عَشَرَ। কারণ, এ স্তরের সূচনা হয়েছে দশম রাত থেকে। এরপরের তিন রাতের নাম بَيْضَ। এ রাতগুলোতে চাঁদের আলো শেষ রাত পর্যন্ত বজায় থাকে। এরপরের তিন রাতের নাম دَرَعْ। এ নাম রাখার কারণ হলো, ষোলো তারিখে চাঁদ খানিকটা দেরিতে উদিত হয়। ফলে রাতের প্রথমভাগে খানিকটা অন্ধকার থাকে। এরপরের তিন রাতের নাম, ظُلَمٌ। এরপরের তিন রাতের নাম حَنَادِسْ। এরপরের তিন রাতের নাম دَرَارِيْ। শেষ তিন রাতের নাম مُحَاقٌ। এ পর্বে এসে চাঁদ নিঃশেষ হয়ে যায় ও মাসও শেষ যায়।

আল্লাহ তাআলা চাঁদ-সূর্যের জন্যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। এটা মোটেও সম্ভব নয় যে, কেউ নিজের সীমা অতিক্রম করে এদিক-সেদিক বা আগ-পিছ হবে। পালাক্রমে তারা তাদের নির্দেশ মান্য করে চলে। হাসান রহ. বলেন, চাঁদ রাতের জন্যে নির্ধারিত। ইবনে মুবারক রহ. বলেন, চাঁদ পানির গেলাফের নিচে আশ্রয় নিয়ে থাকে। আবু সালেহ রহ. বলেন, একটির আলো অন্যটির আলোকে ধরতে পারে না। ইকরামা রহ. বলেন, রাতে সূর্য উদিত হতে পারে না। রাত দিনকে অতিক্রম করতে পারে। অর্থাৎ রাতের পরই রাত আসতে আসতে পারে না; মাঝখানে দিন আসবে। কাজেই সূর্যের কর্তৃত্ব দিনে এবং চাঁদের কর্তৃত্ব রাতে। রাতের প্রস্থান মানেই সূর্যের আগমন। এরা একটি অন্যটির পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। কিন্তু কখনই তাদের মাঝে সংঘর্ষ বাঁধবে না। কখনই বিশৃঙ্খলা দেখা যাবে না। এমন কখনই হবে না যে, শুধু দিনের পর দিনই আসছে বা এর উল্টো রাতের পর রাত আসছে। একটি আসছে অন্যটি যাচ্ছে। রাত-দিনের প্রতিটিই তার নিজস্ব সময়ে আসা-যাওয়া করে। সূর্য, চন্দ্র, দিবস ও রাত মহাশূন্যের নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে।

যায়েদ ইবনে আসম রহ. বলেন, আসমান ও জমিনের মাঝখানে কক্ষপথ রয়েছে। সেখানে এগুলো আসা-যাওয়া করে।

## সূরা ইয়াসীনের ৪১-৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ اٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ○ وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ○ وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ○ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো, অবশ্যই আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। আর তাদের জন্য অনুরূপ (যানবাহন) সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না। আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ না হলে এবং কিছু সময়ের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে।

**ব্যাখ্যা :** এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাঁর কুদরতের আরো কিছু নিদর্শন তুলে ধরেছেন যে, আমি সমুদ্রকে বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে সমুদ্রের বুকে নৌযানগুলো নিয়মিত চলাচল করছে। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম নৌযানটি ছিলো নূহ আ.-এর। যার ওপর আরোহণ করার মাধ্যমে তিনি নিজে ও তাঁর সঙ্গে ঈমানদারগণ বিশ্বগ্রাসী প্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিলো। ওই ভয়াবহ প্লাবনের কবল থেকে পৃথিবীর বুকে অন্য একটি মানুষও বাঁচতে পারেনি। আমি ওই সময় তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিলাম— যা একদম পরিপূর্ণ ছিলো। কেননা তার ভেতরে জীবন যাপনের সকল উপকরণ ছিলো এবং মানুষের পাশাপাশি পশু-পাখিও ছিলো। যা আল্লাহর নির্দেশে তাতে বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। সব প্রজাতির জীব-জন্তু এক জোড়া করে নৌযানে আশ্রয় পেয়েছিলো। এথেকে বুঝে আসে, নৌযানটি গাম্ভীর্যপূর্ণ, মজবুত ও প্রচণ্ড ভারবাহী ছিলো।

এই গুণগুলো সঠিকভাবে হযরত নূহ আ.-এর নৌকার সাথে যেমন তুলনা করা যায়; তদ্রূপ তোমরা যেন সহজে স্থলভাগে যাতায়াত করতে পারো; এ উদ্দেশ্যে আমি তোমাদেরকে স্থলভাগের যানবাহনও দিয়েছি। যেমন, উট যা তোমাদের জন্যে স্থলভাগে উপকারে আসে; যেভাবে নৌকা উপকারে আসে। তদ্রূপ অন্য চতুষ্পদ জন্তুও উপকারে আসে।

এর ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, নূহ আ.-এর নৌকা ছিলো একটি নমুনা। যা দেখে পরবর্তীতে তোমরা আরো অনেক নৌকা-জাহাজ তৈরি করেছো। এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً আয়াতের মাধ্যমে। অর্থাৎ যখন পানি প্লাবনের আকার ধারণ করলো তখন আমি তোমাদেরকে নৌকায়

উঠিয়ে দিলাম। যেনো এ নৌকাটি তোমাদের স্মরণীয় হয়ে থাকে। স্মরণকারীরা যা স্মরণ রাখবে। আমার এ অনুগ্রহের কথা তোমরা ভুলো না যে, আমি তোমাদেরকে সমুদ্র পার করিয়েছি। আমি তখন ইচ্ছা করলে সেখানেই তোমাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারতাম। পুরো নৌকা তলিয়ে যেতো। তখন তোমাদের সাহায্য করার মতো কেউ হতো না; আর তোমাদেরকে রক্ষা করার মতোও কাউকে পেতে না। এটা আমার রহমত যে, তোমরা স্থলভাগ ও জলভাগের দীর্ঘ সফর নির্বিঘ্নে, প্রশান্তিতে সম্পন্ন করতে পারছো। আমি এভাবেই তোমাদেরকে সর্বদিক থেকে নিরাপদ রাখি আমার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত কৃত একটি মেয়াদকাল পর্যন্ত।

## সূরা ইয়াসীনের ৭১-৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُونَ ○
وَ ذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَ مِنْهَا يَأْكُلُونَ ○ وَ لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ
مَشَارِبُ ؕ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ○

তারা কি দেখে না, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে আমি তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি? অতঃপর তারা এগুলোরই অধিকারী। আর আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এইগুলোর কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। আর তাদের জন্য এগুলোতে রয়েছে বহু উপকারিতা ও পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না?

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু প্রতিদান ও অনুগ্রহের কথা আলোচনা করেছেন। আল্লাহ নিজেই এ সকল জতুষ্পদ জন্তুগুলোকে সৃষ্টি করে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। একটি ছোট শিশুও উটের লাগাম ধরে হাঁকিয়ে নিতে পারে। উটের মতো সবল ও বৃহৎ জন্তুও শিশুর বশ্যতা স্বীকার করে। যদি একশ'টি উট সারিবদ্ধ থাকে আর একটি শিশু ডাক দেয় তাহলে সেগুলো সোজা চলতে থাকে। এই বশ্যতার গুণ ছাড়াও উটের সহায়তায় মানুষ দীর্ঘ পথের সফর বেশ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে। এই উট শুধু মানুষকেই নয়; তার জিনিস-পত্রও বহন করে নিয়ে যায়। উটের গোশত মানুষ ভক্ষণ করতে পারে। এর বাইরে উটের গায়ের পশম ও চামড়া প্রভৃতি থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে। উটের দুধ পান করা যায়। এছাড়াও অনেক উপকারে আসে। আল্লাহ যখন এক উটের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এতোগুলো উপকার ও সহজতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তখন কেনো আমরা সেই পরমহিতৈষী, প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহর শোকর আদায় করবো না? কাজেই আমাদের উচিত হলো, আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবো; তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস করবো এবং তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় কাউকে শরীক করবো না।

## সূরা ইয়াসীনের ৭৪-৭৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ○ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ○

তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছে এই আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু এসব ইলাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়, বরং এগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতসমূহে মুশরিকদের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন করা হয়েছে। তারা মনে করে, তারা যেসকল গায়রুল্লাহর উপাসনা করে সেগুলো অবশ্যই তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে; তাদের আয়-উপার্জনের বরকত [সমৃদ্ধি] বয়ে আনবে; আল্লাহর নৈকট্যলাভের ক্ষেত্রে এই উপাস্যগুলো সহায়ক হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, তারা তাদের যে কোনো প্রকার সহায়তা করতে অক্ষম; এই উপাস্যগুলো অন্যের উপকার করা তো দূরের কথা, তার নিজের কোনো উপকার করতেও সক্ষম নয়। এই মূর্তিতো নিজের শত্রুর আক্রমণ থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। কেউ এসে যদি ভেঙ্গেচুরে চলে যায় ওরা তখন কিছুই করতে পারে না। এমনকি মুখ ফুটে টু শব্দ পর্যন্ত করতে পারে না। কিয়ামতের দিন যখন প্রত্যেকের হাতে নিজ আমলনামা থাকবে ওই নিদারুন মুহূর্তে স্বীয় ইবাদতকারীদের সামনে ওই মূর্তিগুলো অক্ষম-নির্জীব পড়ে থাকবে। তখন মুশরিকদের লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের ষোলকলা পূর্ণ হবে।

হযরত কতাদাহ রহ. বলেন, ওই মূর্তিগুলো তার অনুসারীদের ন্যূনতম কোনো উপকারও করতে পারে না। এতদসত্ত্বেও ওই নির্বোধ মুশরিকরা সেগুলোর সামনে নতজানু হয়ে পড়ে থাকে। এই মূর্তি তাদের কোনো উপকার করতে পারে না; কোনো ক্ষতির সম্মুখিন হলে তা প্রতিরোধও করতে পারে না। তারপরও ওরা মূর্তির জন্যে নিজেদের সঁপে দেয়। এমনকি মূর্তির বিরুদ্ধে কারো কোনো মন্তব্য শোনার ধৈর্যও ওদের নেই। কিছু শোনামাত্রই রাগান্বিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। হে নবী সা.! আপনি কাফেরদের এ সকল প্রলাপের কারণে মন খারাপ করবেন না। তাদের ভেতর-বাইর সম্পর্কে আমাদের কাছে স্পষ্ট। সময় ঘনিয়ে এসেছে। শিগগিরি আমি তাদের থেকে হিসেব কষে বদলা নেবো।

## সূরা ইয়াসীনের ৭৭-৮০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ○ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ○ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ○ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ○

মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে যায়। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা পেশ করে, অথচ সে তার নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, 'কে অস্তিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে'? বলুন, 'সেগুলোর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই সম্যক পরিজ্ঞাত।' যিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমাদের জন্য অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা থেকে প্রজ্বলিত কর।

ব্যাখ্যা : ধিকৃত নরাধম উবাই ইবনে খলফ একদিন স্বহস্তে একটি পুরাতন ভঙ্গুর নষ্ট হাড্ডি নিয়ে এলো এবং ওই হাড্ডি দুই আঙ্গুল দ্বারা পিষতে পিষতে যখন গুড়ো হয়ে উড়ছিলো তখন নবী সা.-কে বলতে লাগলো 'আপনি না বলেন, এই হাড্ডিকে আল্লাহ জীবিত করবেন?' উত্তরে নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহ তোকে ধ্বংস করবেন। এরপর পুনরুজ্জীবিত করবেন। সবশেষে হাশরের ময়দান থেকে তোকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' যারাই পরকাল অস্বীকার করবে তাদের জন্যে এটাই উচিত উত্তর। অর্থাৎ এ জাতীয় লোকগুলো কেনো নিজের জন্ম নিয়ে ভাবে না। আল্লাহ তাকে অতি তুচ্ছ এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ তার কোথাও কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। তারপরও তারা কী ভাবে আল্লাহর কুদরতের দিকে আঙ্গুল তুলছে? এ জাতীয় ভাষ্য কুরআনের আরো অনেক আয়াতে উঠে এসেছে। যেমন, أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء এবং إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ مَّهِينٍ ইত্যাদি।

মুসনাদে আহমদে এসেছে, একদিন নবী কারীম সা. হাতের তালুতে থুথু ফেলে সেখানে আঙ্গুল রেখে বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেন– হে আদমসন্তান! তোমরা কি আমাকে অক্ষম করতে পারবে? অথচ আমি তোমাকে এ ধরনের বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর যখন তোমাকে উপযুক্ত করেদিলাম এবং সামান্য বল ও শক্তি দিলাম তখন তুমি সম্পদ কুক্ষিগত করা শুরু করে দিলে। এখন তুমি তোমার সম্পদ অসহায়-দরিদ্রদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখছো। কিন্তু যখন মৃত্যুমুখে পতিত হবে তখন তুমিই বলতে শুরু করবে, আমি এখন আমার সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিচ্ছি। বলো, এখন তোমার ওই

সদকা দেয়ার সময় কোথায়? মোটকথা, এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি মানুষ তর্কবাজিতে অত্যন্ত পারঙ্গম। অবলীলায় সে মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে। সে আল্লাহ তাআলার কুদরত থেকে দৃষ্টি তুলে রাখে। অথচ আল্লাহই আসমান-জমিনসহ তামাম মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যদি চিন্তা-ভাবনা করে দেখতো তাহলে সুবিশাল সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিরহস্যের কথা বাদ দিয়ে খোদ নিজের জন্মতত্ত্বকে সে কুদরতের একটি বিশাল নিদর্শনই মনে করতো। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সে তো বুদ্ধি বিবেকের চোখে পট্টি বেধে রেখেছে। তাদের উত্তরে বলে দাও যে, এই নষ্ট হওয়া হাড্ডিগুলো যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই এগুলোকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাড্ডিগুলো একত্র করা আল্লাহর পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

মুসনাদে আহমদে আরেকটি হাদীসে এ কথা এসেছে যে, একবার হযরত হুযায়ফা রা.-কে উকবা ইবনে উমর রহ. বললেন, আপনি আমাদেরকে রাসূল সা. থেকে শোনা কোনো একটি হাদীস শোনান। তখন তিনি বললেন, নবী কারীম সা. ইরশাদ করেছেন, একব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার ওয়ারিসদের অসিয়ত করলো, আমার মৃত্যুর পর তোমরা প্রচুর লাকড়ি সংগ্রহ করবে। সেগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে আমার লাশ তাতে পুড়িয়ে ভস্ম বানিয়ে ফেলবে। অতঃপর সেই ভস্মগুলো সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দেবে। তার মৃত্যুর পর ওয়ারিসরা তার এই অন্তিম ইচ্ছা বাস্তবায়ন করলো। তখন আল্লাহ তাআলা সেই ভস্মগুলো একত্র করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। তখন আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি এ কাজটি কেনো করলে? উত্তর দিলো, আপনার ভয়ে। আল্লাহ এ উত্তর শুনে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, লোকটি বলেছিলো, আমার ভস্মের কিছু অংশ বাতাসে উড়িয়ে দেবে। কিছু অংশ সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে নির্দেশ করে তার সব ভস্মগুলো একত্র করালেন। তদ্রূপ বাতাসকে নির্দেশ করে একত্র করালেন। এরপর আল্লাহর নির্দেশে তার পুনরুজ্জীবন হলো।

আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ এ বিষয়টির ওপর আলোচনা করেছেন, আল্লাহর কুদরত এতোটাই ব্যাপক যে, তিনি যেকোনো মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন। যখন ইচ্ছা যে কারো অবয়ব বদলে ফেলতে পারেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তোমরা লক্ষ্য করো, পানির সাহায্যে আমি যখন গাছ বড় করি তখন সেটি একসময় সবুজ-শ্যামল হয়ে ফসলে ভরে যায়। কিছু দিন পর সেই গাছটিকে শুষ্ক বানিয়ে তা থেকে আগুন বের করি। বলো, কোথায় সেই আর্দ্রতা ও ঠাণ্ডা আর কোথায় শুষ্ক ও উষ্ণতা। কাজেই কোনো জিনিস আমার পক্ষে দুরূহ নয়। শুষ্ককে আর্দ্র করা, আর্দ্রকে শুষ্ক করা, জীবিতকে মৃত করা, মৃতকে জীবিত করা– এগুলো আমার কাছে খুবই সহজ কাজ।

কিছু মুফাসসির বলেন, এখানে আরবের এক বিশেষ প্রজাতির গাছ উদ্দেশ্য। 'মারখ' ও 'আফার' নামে গাছগুলো এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। এই গাছগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, যখন তার সবুজ ডালার একটির সঙ্গে অপরটির ঘর্ষণ হয় তখন সেখানে বিদ্যুৎচমকের মতো আগুন জ্বলে ওঠে। এ কারণেই আরবদের মাঝে একথাটি প্রচলিত রয়েছে যে, لِكُلِّ شَجَرٍ نَارٌ وَاسْتَمْجَدَ الْمَرْخُ وَالْعَفَارُ. 'আঙ্গুর বৃক্ষ ব্যতিরেকে অন্য সকল গাছের মাঝে আগুনের উপাদান রয়েছে।'

## সূরা ইয়াসীনের ৮১-৮৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۙ وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনিই মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী। তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তিনি উহাকে বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম কুদরতের কথা আলোচনা করে বলেছেন, তিনি আসমানসমূহ সহ অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন। জমিন ও তার গর্ভস্থ সকল বস্তুও তিনি এককভাবে সৃষ্টি করেছেন। যিনি এতো বড় কুদরতের অধিকারী, তাঁর পক্ষে মানুষের মতো এতো ছোট প্রাণী সৃষ্টি করা অসম্ভব– এ কথা কখনই যৌক্তিক হতে পারে না। যেমনটি এ আয়াতে বলেছেন যে, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ الخ... 'নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা অনেক দুরূহ ও কঠিন কাজ হলো আসমানসমূহ ও জমিনসমূহ সৃষ্টি করা। যদিও অধিকাংশ মানুষ জানে না।'

এখানেও এ কথা বলেছেন যে, আল্লাহ যদি সুবিশাল ও সুবিস্তৃত আসমান ও জমিন সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে কি তিনি মানুষের মতো এতো দুর্বল মাখলুক সৃষ্টি করতে পারেন না? আর যেহেতু তিনি সেই ক্ষমতা রাখেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাদেরকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করবেন। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তার জন্য পুনর্বার সৃষ্টি করা অত্যন্ত সহজ কাজ। যেমনটি এ আয়াতে বলেছেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ

بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতেও সক্ষম? বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৩]

তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই অস্তিত্ব দানকারী। পাশাপাশি তিনি বিচক্ষণ ও আপাদমস্তক অর্থাৎ সমস্ত কিছু সম্পর্কে অবহিত। তিনি কিছু করতে চাইলে শুধু নির্দেশ দেওয়াই যথেষ্ট হয়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন– হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই গুনাহগার। তবে আমি যাকে ক্ষমা করি তার কথা ভিন্ন। কাজেই তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি অঙ্গীকার করেছি, আমি অবশ্যই ক্ষমা করবো। তোমরা সবাই দরিদ্র, কিন্তু আমি যাকে ধনী বানাই। আমি দানশীল। আমি মর্যাদাবান। আমি সক্ষম। আমি যা ইচ্ছা বাস্তবায়িত করি। আমি এক কথায় যে কাউকে পুরস্কারও দিতে পারি। তদ্রূপ যে কাউকে শাস্তিও দিতে পারি। আমি কোনো কিছু বাস্তবায়িত করতে চাইলে শুধু বলি– 'হয়ে যাও'। সঙ্গে সঙ্গে সেটি হয়ে যায়। তিনিই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তা যিনি সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে মুক্ত। যিনি আসমান ও জমিনের নিরঙ্কুষ নৃপতি; যার হাতে আসমান ও জমিনের সকল চাবিকাঠি; যিনি সবার স্রষ্টা; যিনি প্রকৃত ক্ষমতাবান ও নির্দেশকারী তাঁর কাছেই কিয়ামত দিবসে সবাইকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। তিনিই নেয়ামতদাতা ও ন্যায়বিচারক আল্লাহ; যিনি তোমাদেরকে শাস্তি ও প্রতিদান দেবেন।

## সূরা সাফ্ফাতের ৫-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ○ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ ○

তিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক এবং প্রতিপালক সকল উদয়স্থলের। নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজির সৌন্দর্যে সুশোভিত করেছি।

**ব্যাখ্যা :** এখানে এ কথা আলোচিত হয়েছে যে, তোমাদের সকলের একক সত্য উপাস্য হলেন আল্লাহ। তিনিই আসমান, জমিন ও তন্মধ্যকার সকল বস্তুর মালিক ও নিয়ন্ত্রক। তিনিই আকাশে চন্দ্র, সূর্য ও তরকারাজিকে বশীভূত করে রেখেছেন। যা পূর্ব দিগন্ত থেকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত

---

৩. সূরা আহকাফ : ৩৩।

হয়। অন্য আয়াতে এসেছে, رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ —'শীত ও গ্রীষ্মের উদয়াচল ও অস্তাচলের ভিন্ন ভিন্ন জায়গার রব তিনিই।'

দ্বিতীয় আয়াতে দুনিয়ার আকাশে যে সকল সৌন্দর্য দর্শকের চোখে পড়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আকাশের নক্ষত্রের আলো এবং সূর্যের আলো পৃথিবীকে আলোকিত করে। যে কথা অন্য আয়াতে এভাবে এসেছে, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا الخ —'আমি দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুসজ্জিত করেছি।'

## সূরা যুমারের ৫-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিন দ্বারা এবং দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিয়মাধীন করেছেন তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলছে। জেনে রাখ, তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে, অতঃপর তিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ; তোমাদের প্রতিপালক, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছো?

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলাই প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবার একক মালিক। সবার একচ্ছত্র শাসক ও সবার ভাগ্যনিয়ন্তা। দিবস-রজনীর পালাবদলের কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। তাঁরই নির্দেশে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় দিবস-রজনী একটি অন্যটির পেছনে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। না কোনোটা আগে চলে যায়, আর না কোনোটা পেছনে রয়ে যায়। চন্দ্র-সূর্যকে তিনিই বশীভূত করে রেখেছেন। তারা নিজেদের পরিভ্রমণ যথানিয়মে পূর্ণ করে। কিয়ামত পর্যন্ত এ

নিয়মের ন্যূনতম ব্যত্যয় হবে না। তিনি সম্মানের অধিকারী এবং বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কর্ণধার। তিনিই গুনাহগারের গুনাহ ক্ষমা করেন। অপরাধীরা অনুশোচনার জন্যে তাঁরই আশ্রয় নেয়। তিনি তোমাদের সবাইকে একই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আদম আ. থেকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ লক্ষ্য করে দেখো যে, তোমাদের পরস্পরের মাঝে কতো ভিন্নতা। গাত্রবর্ণ, কণ্ঠস্বর, ভাষা ও উপস্থাপনশৈলীর ক্ষেত্রে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা আদম আ. থেকেই তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি অন্য আয়াতে এসেছে যে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء —'হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।'[৪]

সূরা আন'আমে এসেছে–ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ— 'সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার।'[৫]

অর্থাৎ ভেড়া, বকরি, গাভী ও উট। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃজঠরে। যেখানে তোমরা সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছো। প্রথমে শুক্র, এরপর জমাট রক্ত, এরপর গোশতপিণ্ড, এভাবে পর্যায়ক্রমে শরীরের ভেতরে হাড্ডি, রগ ও মেরুদণ্ড এবং সবশেষে রুহ দেওয়া হয়। লক্ষ্য করো, আল্লাহ কতো নিপূণ স্রষ্টা! তিন ধরনের অন্ধকারের ভেতর তিনি তোমাদের ভ্রূণগুলোকে জন্মপরিক্রমার ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলো অতিক্রম করিয়েছেন। তিন ধরনের অন্ধকার বলতে প্রথমত জরায়ুর অন্ধকার। এরপর ভ্রূণের উপরস্থ পাতলা আবরণ। তৃতীয়ত পেটের অন্ধকার। যেই আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মহান আল্লাহ। তিনি সবার প্রতিপালক। সবার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নেই। আফসোসের বিষয় হলো, আজ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি না জানি কোথাও উধাও হয়ে গেছে; যে কারণে আল্লাহকে ছেড়ে গায়রুল্লাহর উপাসনা করছে।

---

৪. সূরা নিসা : ১।

৫. সূরা আন'আম : ১৪২।

## সূরা যুমারের ২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

আপনি কি দেখেন নি, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর জমিনে তা প্রস্রবন হিসেবে প্রবাহিত করেন এবং তা দ্বারা নানান ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা তা দেখতে পাও হলুদ বর্ণের। এরপর তিনি তা খড়কুটায় পরিণত করেন। এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।

ব্যাখ্যা : জমিনের ওপর যতো পানি রয়েছে তা মূলত আকাশ থেকে বর্ষিত। যেমনটি আল্লাহ ইরশাদ করেন, আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি। ওই পানি জমিন শোষণ করে নেয় এবং তা পানি মাটির ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। সেই পানিকে আল্লাহ ফাক-ফোকর ভেদ করে ঝরণার মাধ্যমে বের করেন এবং মাটির ওপরে উঠে। এভাবে ঝরনা সৃষ্টি হয়। যে পানি মাটির সংস্পর্শে এসে লবণাক্ত হয়ে যায়, সেটা লবণাক্তই থাকে। তদ্রূপ বৃষ্টির পানি বরফের আকৃতিতে পাহাড়ে জমে। যা পাহাড় শোষণ করে। অতঃপর সেখান থেকে স্রোতধারা বইতে শুরু করে। পানির সেই স্রোত একসময় নদী-নালা, খাল-বিলে প্রবাহিত হয়ে শস্যক্ষেতের পাশ দিয়ে বইতে শুরু করে। সেই পানিতে সিঞ্চিত হয়ে ক্ষেতগুলো সবুজ হয়ে ওঠে। পানির সাহায্যে মাঠে-ময়দানে নানা বর্ণ, নানা গন্ধ ও আকৃতির ফুল-ফল ও ফসল উৎপন্ন হয়।

একসময় সেই শষ্যক্ষেতও ফ্যাকাশে হতে শুরু করে। তখন ধীরে ধীরে ফসলের গা থেকে সবুজ রং পরিবর্তন হয়ে হলুদ, তামাটে বর্ণ চলে আসে। ফসলগুলো তখন পেকে ওঠে। শুকিয়ে যায়।

প্রকৃতির এই জীববৈচিত্র্যের মাঝে কি আমাদের জন্যে শিক্ষা নেই? তারা কি দেখতে পায় না, এমনভাবে পৃথিবীও— আজ যাকে যুবক ও সুন্দর দেখতে পাচ্ছে একদিন সে বুড়ো হয়ে কুৎসিত হয়ে যাবে। আজ এক ব্যক্তি যুবক শক্তিশালী, কাল সে-ই বৃদ্ধ হয়ে চেহারা-সুরত নষ্ট হয়ে যাবে এবং দূর্বল হয়ে পড়বে। একসময় সে হারিয়ে যাবে মৃত্যুর গহ্বরে। বুদ্ধিমান তারাই যারা পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখে। উত্তম সেই ব্যক্তি যার শেষ পরিণতি উত্তম হয়।

## সূরা যুমারের ৩৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমানসমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ– আল্লাহ আমার কোনো অনিষ্ট করতে চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তাওয়াক্কুলকারীগণ আল্লাহর ওপরই তাওয়াক্কুল করে।

ব্যাখ্যা : হে নবী! কাফের-মুশরেকরা আপনাকে গায়রুল্লাহর ভয় দেখাচ্ছে। নিতান্ত অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির কারণেই তারা এসব করছে। আল্লাহ যাকে গুমরাহ করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। তদ্রূপ আল্লাহ যাকে পথ দেখিয়েছেন তাকে কেউ পথচ্যুত করতে পারে না। আল্লাহই সর্বোচ্চ সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী। তার ওপর ভরসাকারীদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারীকে কখনই বঞ্চিত হতে হয় না। আল্লাহর চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কেউ নেই। কাজেই তারচেয়ে অধিক প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতাও অন্য কারো নেই। যারা আল্লাহর কুফুরি করবে, শিরক করবে, তাঁর রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করবে তিনি নির্ঘাত তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।

এ আয়াতে আল্লাহ মুশরিকদের আরো অজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। তারা আল্লাহকে একক স্রষ্টা স্বীকার করার পরও বিভিন্ন মিথ্যা উপাস্যদের উপাসনা করে। যারা বিন্দু পরিমাণ লাভ-ক্ষতির মালিক না। যাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার মতো কোনো ক্ষমতাই নাই।

হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহকে স্মরণ করো। তিনি তোমার হিফাযত করবেন। আল্লাহকে স্মরণ রাখো তুমি সবসময় তাঁকে তোমার পাশে পাবে। সুদিনের সময় আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করো দুর্দিনে তিনি তোমার উপকারে আসবেন। কিছু চাইলে আল্লাহর কাছেই চাও। সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁরই শরণাপন্ন হও। এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করবে, যদি গোটা দুনিয়া মিলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত যদি না হয়ে থাকে তাহলে তারা তোমার বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না। এর বিপরীতে পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তি যদি তোমার কোনো উপকার করার ইচ্ছা

করে আর তা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে মঞ্জুর না হয়ে থাকে তাহলে কখনই তারা উপকার করতে পারবে না। ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। কলম তুলে নেয়া হয়েছে। অনুগ্রহ ও বিশ্বাস নিয়ে নেক কাজে নিমগ্ন থাকো। বিপদে ধৈর্য ধারণ করো, অনেক সাওয়াব পাবে। ধৈর্যের সঙ্গেই আল্লাহর সাহায্য। দুঃখ-বেদনার সঙ্গেই আনন্দ ও স্বস্তি রয়েছে। প্রতিটি কাঠিন্যের ভেতরে রয়েছে সহজলভ্য পথ।' [ইবনে আবী হাতেম]

আপনি বলে দিন— আমার জন্যে এক আল্লাহই যথেষ্ট। প্রত্যেক ভরসাকারীই আল্লাহর পবিত্র সত্তার ওপরই ভরসা করে থাকে। যেমন, হযরত হুদ আ. স্বজাতিকে উত্তর দিয়েছিলেন। যখন তারা বলেছিলো, হে হুদ! আমরা মনে করি– আমাদের কোনো প্রভুর অভিশাপে তোমার জীবনে মন্দত্বের ছাপ পড়েছে। উত্তরে তিনি বলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি। তোমরাও সাক্ষী থেকো, আমি তোমাদের সকল মিথ্যা উপাস্য থেকে মুক্ত। তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যতো অনিষ্ট করা সম্ভব; করো। আমাকে এতোটুকুন সুযোগও দিয়ো না। শোনো, আমার তাওয়াক্কুল আমার রবের ওপর। যিনি মূলতঃ তোমাদের সকলের রব। ভূপৃষ্ঠের বুকে যতো ধরনের প্রাণী রয়েছে তাদের সবার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আমার আল্লাহর হাতে। নিশ্চয়ই তিনি সহজ-সরল পথের ওপর রয়েছেন।

## সূরা যুমারের ৪২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

আল্লাহই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু হয় নাই তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে চিন্ত াশীল সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ বলেন, আমি প্রতিটি বস্তুর ওপর যখন যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করি। বান্দার মৃত্যু দু'ভাবে হয়। একটি হলো ওফাতে কুবরা বড় মৃত্যু। তখন আমার প্রেরীত ফেরেশতারাই তোমাদের রূহ কবয করে নিয়ে আসে। দ্বিতীয় হলো, ওফাতে সুগরা বা ছোট মৃত্যু। সেটি হলো ঘুম। তখনও তোমাদের রূহ আমার কবযায় থাকে। এ কথা অন্য আয়াতে এভাবে ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ○ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ○

তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা কিছু করো তা তিনি জানেন। অতঃপর দিবসে তিনি তোমাদেরকে পুনর্জাগরিত করেন যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। আর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন। তিনিই স্বীয় বান্দাদের ওপর পরাক্রমশালী এবং তিনি তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রেরণ করেন। অতঃপর যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না।[৬]

এ দু' আয়াতে আল্লাহ প্রথমে ছোট মৃত্যুর কথা আলোচনা করেছেন। এরপর বড় মৃত্যুর কথা বলেছেন। এখানে এর উল্টো প্রথমে বড় মৃত্যুর কথা বলেছেন। এরপর বলেছেন ছোট মৃত্যুর কথা। আলোচনার সূত্র ধরে বুঝে আসে যে, আমাদের রূহগুলো 'মালায়ে আ'লা' বা ঊর্ধ্বাকাশে একত্র হয়। অবশ্য সালাফ বা পূর্ববর্তীদের কারো কারো অভিমত হলো, মৃত্যুর সময় মুর্দাদের এবং ঘুমের সময় জীবিত লোকদের রূহগুলো কবয করে নেয়া হয়। অন্যদের রূহগুলোকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মৃতদের রূহ আল্লাহ তাআলা জমা রাখেন আর জীবিতদের রূহ ফেরত দেন। কখনই এর ব্যত্যয় ঘটে না।

যারা এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত তারা এই কথার মধ্যেই আল্লাহ তাআলার প্রচুর প্রমাণাদি পেয়ে যায়।

## সূরা যুমারের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

বলুন, হে আল্লাহ! আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনি আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে।

ব্যাখ্যা : মুশরিকদের ব্যক্তিসত্তার মাঝে তাওহীদের প্রতি যে প্রবল বিদ্বেষ ও শিরিকের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম থাকে। সে কথা আলোচনা করে আল্লাহ প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা.-কে বলেছেন, আপনি শুধু একক অদ্বিতীয় মহান আল্লাহকেই ডাকবেন। যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। তিনি এগুলো এমন সময় সৃষ্টি

---

৬. সূরা আন'আম : ৬০-৬১।

করেছেন যখন এগুলোর কোনো নমুনা বা এ জাতীর অন্য কোনো সৃষ্টি ছিলো না। আল্লাহ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ভেতর ও বাইরের সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। ওই সকল লোক যে সমস্ত মতবিরোধ আপনাকে নিয়ে করে তার সব কিছুরই ফয়সালা ওই দিন হবে, যেদিন তারা কবর থেকে উত্থিত হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে।

## সূরা যুমারের ৬২-৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। আসমান ও জমিনের চাবি তাঁরই কাছে। আর যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্যাখ্যা : সমস্ত প্রাণী ও জড় পদার্থের স্রষ্টা আল্লাহ। কর্তৃত্বকারী আল্লাহ তাআলা একাই। প্রতিটি বস্তু তাঁর অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রিত। সবার কারিগর ও দায়িত্বশীল তিনিই। সমস্ত কাজের নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে। তিনিই জমিন ও আসমানের সকল চাবি ও কোষাগারের একক মালিক। সকল প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও গুণগানের যোগ্য তিনিই। প্রতিটি বস্তুর ওপর ক্ষমতা তাঁরই। কাজেই যারা আল্লাহকে অস্বীকার করবে, অবাধ্য হবে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে চরম ক্ষতি।

## সূরা যুমারের ৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

তারা আল্লাহর যথাযোগ্য সম্মান করে না। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র ও মহান। তারা যাদের শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে।

ব্যাখ্যা : মুশরিকরা সত্যিকারর্থে আল্লাহর যথাযথ সম্মান ও মূল্যায়ন জানেই না। এ কারণেই তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যদের শরীক করছে। অথচ আল্লাহর চেয়ে অধিক সম্মানিত, ক্ষমতাবান, সক্ষম ও বড়ত্বের অধিকারী কেউ নেই। আর না কেউ তাঁর সমকক্ষ আছে। আলোচিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে কুরাইশি কাফেরদের সম্পর্কে। তারা যদি আল্লাহর যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা জানতো তাহলে কখনই এভাবে অস্বীকার করতো না। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে সবার ওপর কর্তৃত্বশীল মেনেছে সেই আল্লাহর যথাযথ

সম্মান করেছে। এর বিপরীতে যার এ বিশ্বাস নেই সে আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করেনি।

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে এসেছে, ইহুদিদের এক মহা পণ্ডিত রাসূল সা.-এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, আমরা এ লেখা পেয়েছি যে, আল্লাহ তাআলা সাত আসমান এক আঙ্গুলের ওপর রাখবেন। সাত জমিন আরেক আঙ্গুলের ওপর রাখবেন। সমস্ত গাছপালা তৃতীয় আঙ্গুলের ওপর রাখবেন। পানি, মাটি চতুর্থ আঙ্গুলের ওপর রাখবেন। অবশিষ্ট সকল মাখলুককে পঞ্চম আঙ্গুলে রাখবেন। এরপর বলবেন, 'আমিই মহাবিশ্বের একক মালিক। আমিই একক বাদশাহ। নবী কারীম সা. তার এ কথার সততার ওপর হেসে ফেললেন। ঠোঁটের ফাঁক গলে নবীজীর সামনের দু'পাটি দাঁত ফুটে ওঠলো। এরপর তিনি আলোচিত আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করলেন।

মুসনাদের হাদীসে অনেকটা কাছাকাছি ভাষ্য এসেছে যে, তার কথা শুনে নবী কারীম সা. হাসলেন। ওই সময় আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন। রেওয়ায়েতে এসেছে— ইহুদি লোকটি যখন তার আঙ্গুলগুলো দেখাচ্ছিলো তখন প্রথমে সে তর্জনী [শাহাদাত] আঙ্গুল দেখিয়েছিলো। অবশ্য ওই রেওয়ায়েতে চার আঙ্গুলের উল্লেখ এসেছে। সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়েতে এসেছে— আল্লাহ তাআলা জমিনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবেন। আসমানকে তাঁর ডান মুঠোর ভেতরে নিয়ে নেবেন। এরপর বলবেন, 'আমিই একক বাদশাহ। জমিনের রাজা-বাদশাহরা আজ কোথায়?' মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে— সেদিন জমিনগুলো আল্লাহর এক আঙ্গুলের ওপর হবে। আসমান হবে ডান হাতের মুষ্ঠিতে। এরপর বলবেন, 'আমিই একক বাদশাহ'।

মুসনাদে আহমদে এসেছে, নবী কারীম সা. একদিন মিম্বারে বসে এ আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন আর হাত আগে-পিছে দোলাচ্ছিলেন। এরপর বলেন, 'আল্লাহ সেদিন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বয়ান করে বলবেন, আমি পরাক্রমশালী। আমি অহংকারী। আমি অধিপতি। আমি সম্মানিত। আমি দয়াবান।' এ কথাগুলো বলার সময় নবীজী এতো বেশি দুলছিলেন যে, আমাদের শঙ্কা হচ্ছিলো— তিনি মিম্বার সমেত পড়ে যেতে পারেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর রা. হাদীসটি বর্ণনা করার সময় পুরো দৃশ্য অভিনয় করে দেখিয়েছেন যে, ওই কথাগুলো বলার সময় নবীজী এভাবে দুলছিলেন। আর বলছিলেন, আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিনসমূহকে নিজের মুঠোর ভেতর নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ। ওই সময় তিনি আঙ্গুলগুলো বারবার খুলছিলেন আর বন্ধ করছিলেন। এ সময় তিনি এ পরিমাণ দুলছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গোটা মিম্বারও দুলছিলো। আমার ভয় করছিলো, তিনি হয়তো পড়ে যেতে পারেন। বাযযারের বর্ণনায় এসেছে,

নবীজী সা. যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করেন ওই সময় তিনি মিম্বার সহ দুলছিলেন। এ সময় তিনি তিনবার সামনে-পেছনে আসা-যাওয়া করেন।

তাবরানী রহ.-এর মু'জামে কাবীরের মাঝে এ হাদীসটি এসেছে যে, নবী কারীম সা. একদিন এক দল সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন, 'আজ আমি তোমাদেরকে সূরা যুমারের শেষ তিনটি আয়াত শোনাবো। এ আয়াতগুলো শুনে যদি কারো অশ্রুশিক্ত হয় তাহলে সে জান্নাতী। তখন তিনি এ আয়াত থেকে শুরু করে সূরা শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। তখন আমাদের মধ্য কারো চোখে অশ্রু চলে আসে। কারো চোখে আসেনি। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কান্না করার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনো ভাবেই কান্না আসেনি। নবীজী তখন বললেন, 'আচ্ছা! আমি আবার পড়ছি। কারো চোখে যদি অশ্রু না আসে তাহলে সে যেন কান্নারত চেহারা বানিয়ে কৃত্রিমভাবে কাঁদে।'

এক হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দাদের কাছে তিনটি বিষয় লুকিয়ে রেখেছি। তারা যদি সেগুলো দেখতে পেতো তাহলে কখনই অনিষ্ট করতো না— ১. যদি আমি পর্দা তুলে নিতাম আর তারা আমাকে দেখতে পেতো তাহলে আমাকে তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করতো। তারা জানতো যে, আমি আমার সকল মাখলুকের সঙ্গে কী আচরণ করি। যখন আমি তাদের কাছে আসবো এবং আসমানসমূহকে আমার মুষ্ঠির ভেতরে নিয়ে নেবো, সবগুলো জমিনকে অপর মুষ্ঠির ভেতর তুলে নেবো আর বলবো, আমিই বাদশাহ। আছে কি আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাজাধিরাজ? ২. এরপর আমি তাদের জান্নাত দেখাবো। সেখানে কল্যাণের যতোগুলো আয়োজন আছে তা তাদের সামনে তুলে ধরবো। তারা তখন নিশ্চয়ই পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে দেখে নেবে। ৩. আমি তাদেরকে জাহান্নাম দেখাবো। তারা যখন সেখানকার মর্মন্তুদ শাস্তি দেখবে তখন তাদের নির্ঘাত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই এগুলোকে লুকিয়ে রেখেছি এ উদ্দেশ্যে যে, আমি জানতে চাই— তারা কী ভাবে আমাকে চেনে? কেননা আমি এগুলো তাদের জানিয়ে দিয়েছি।

## সূরা যুমারের ৭৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ تَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

আপনি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবেন, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সঙ্গে এবং বলা হবে সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

ব্যাখ্যা : যখন আল্লাহ তাআলা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের ফলাফল শুনিয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবার অবস্থাও বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং সেখানে স্বীয় ন্যায় নিষ্ঠার প্রমাণও দিয়ে দিয়েছেন। ওই আয়াতে আল্লাহ বলছেন, কিয়ামতের দিন ওই সময় তোমরা দেখবে— ফেরেশতারা আরশের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা অনবরত আল্লাহর প্রশংসা, তাসবীহ, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বয়ান করতে থাকবে। ওই সময় সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ ও ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা হয়ে যাবে। আল্লাহর এই ন্যায্য ও দয়াভরা ফয়সালার ওপর মহাবিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বস্তু তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও গুণগান করতে থাকবে। ওই সময় প্রতিটি প্রাণী ও জড় পদার্থের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকবে— اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। এভাবে ওই সময় প্রত্যেক স্থল ও জলভাগের প্রাণীরাও আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করবে।

## সূরা মুমিনের ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ○

তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ থেকে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিযিক, আর আল্লাহ অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, মানুষ বলবে— হে আল্লাহ! আমরা প্রথমে মৃত ছিলাম। আপনি আমাদের জীবন দিয়েছেন। এরপর আপনি আমাদের মৃত্যু দিয়েছেন। অতঃপর আপনি আমাদের পুনর্জীবিত করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি অবশ্যই যা চান তাই করতে সক্ষম। আমরা আমাদের গুনাহের কথা স্বীকার করি। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। এখন আপনি আমাদের নিষ্কৃতির কোনো পথ বের করে দিন। অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠান। নিশ্চয়ই এটি আপনার পক্ষে সম্ভব। আমরা দুনিয়াতে ফিরে অবশ্যই পূর্বের মতো অনাচার ও বদ আমল করবো না। যদি করি তাহলে আমরা সন্দেহাতীতভাবে নিকৃষ্ট জালেম প্রমাণিত হবো।

তাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে, এখন দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ নেই। কারণ হলো, দ্বিতীয়বার যদি তোমাদেরকে পাঠানোও হয়, তোমরা পুনরায় সেই কাজগুলো করবে যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছিলো। তোমাদের অন্তরগুলো বক্র হয়ে গেছে। এখন আর তোমরা সত্য গ্রহণ করবে না। সবসময় সত্যের বিরুদ্ধাচরণই করবে। পৃথিবীতে তোমাদের অবস্থা ছিলো, যখনই একক আল্লাহর কথা আসতো তখন তোমাদের অন্তরে

কুফরি ছেঁয়ে যেতো। আর হ্যাঁ, যখন আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা হতো তখন তোমরা তা বিশ্বাস করে নিতে। তোমাদের সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরে গেলে ঠিক এ কাজই তোমরা পুনরায় করবে। কাজেই প্রজ্ঞাবান আল্লাহ— যার প্রতিটি সিদ্ধান্ত ন্যায়নিষ্ঠ। যিনি কখনও কারো ওপর জুলুম করেন না। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন, যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন। যাকে ইচ্ছা দয়া করেন, যাকে ইচ্ছা দণ্ডিত করেন। সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কারো কোনো অংশিদারিত্ব নেই। আল্লাহ অবশ্যই মানুষের ওপর তাঁর কুদরত প্রকাশ করেন। আল্লাহর তাওহীদের অসংখ্য-অগণিত নিদর্শন জমিন ও আসমানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেই নিদর্শনসমূহ থেকে পরিষ্কার ফুটে ওঠে যে, তিনিই সবার স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই সবার মালিক। সবার পালনকর্তা ও হিফাযতকারী তিনিই। তিনি আসমান থেকে তোমাদের ওপর জীবিকা অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যা পেয়ে জমিনে নানা ধরনের শষ্য, ফসল, বিচিত্র স্বাদের ফল-ফলাদি সৃষ্টি হয়। অথচ পানিও এক জমিনও এক। যা থেকে আল্লাহ তাআলার কুদরতের পরিষ্কার নিদর্শন প্রকাশ পায়। সত্য এটাই যে, এথেকে কেবল শিক্ষা, নসিহত ও হিতোপদেশ গ্রহণ করার তৌফিক তাদেরই হয় যাদের মাঝে একান্ত আল্লাহমুখী অন্তর রয়েছে।

## সূরা মুমিনের ২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ أَثَارًا فِى الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

এরা কি জমিনে বিচরণ করে না? তাহলে দেখত—তাদের পূর্বে যারা ছিলো তাদের পরিণতি কি হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিলো এদের অপেক্ষায় শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর। অতঃপর আল্লাহ তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের পাপাচারের কারণে। আর তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করারও কেউ ছিলো না।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে নবী! যেসকল কাফের আপনার রিসালাত অস্বীকার করছে তারা কি আশপাশের অঞ্চলগুলো প্রদক্ষিণ করে পূর্ব যুগের ওই সকল কাফিরদের পরিণতি দেখে না, যারা আপনার পূর্ববতী নবী-রাসূলদের অস্বীকার করেছিলো। যারা ছিলো এদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী শরীর-স্বাস্থ্যের অধিকারী। যাদের আকাশচুম্বী ভবনগুলোর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তাদের ভবনগুলো এ সকল কাফেরদের ভবনের চেয়েও অনেক মজবুত। ওই সকল কাফের অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি হায়াত লাভ করেছিলো। কিন্তু যখন তাদের ওপর তাদের গুনাহ ও কুফরীর কারণে আল্লাহর

আযাব নেমে আসে তখন তাদের ওই শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য তাদের কোনো উপকারে আসেনি। পৃথিবীর কোনো শক্তি আল্লাহর ওই আযাব প্রতিহত করতে পারেনি। তারা সবাই মিলে বিপর্যয় এড়ানোর কোনো উপায় বের করতে পারেনি।

তাদের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসার অন্যতম কারণ ছিলো, তাদের কাছেও তাদের রাসূল স্পষ্ট দলীল ও পরিষ্কার যুক্তি নিয়ে এসেছিলো। এরপরও তারা কুফরী করেছে। যার কারণে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন। তাদের ওই অশুভ পরিণতি পৃথিবীর সকল কাফেরদের জন্য চরম শিক্ষা। শেষ কথা হলো, আল্লাহই সর্বাধিক শক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা ও মর্মন্তুদ আযাব নিক্ষেপকারী।

## সূরা মুমিনের ৬১-৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ۝ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ۫ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝ كَذٰلِكَ یُؤْفَكُ الَّذِیْنَ كَانُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ۝ اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ هُوَ الْحَیُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাতকে এবং আলোকোজ্জ্বল করেছেন দিনকে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে? যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তাদেরকে এভাবেই বিপথগামী করা হয়। আল্লাহই তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আসমানকে করেছেন ছাদ। আর তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দর এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযিক। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহ কত মহান; তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকেই ডাকো। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।

ব্যাখ্যা : আলোচিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহের কথা আলোচনা করেছেন, তিনি রাতকে বিশ্রাম ও শান্তির আলয় বানিয়েছেন এবং দিনকে উজ্জ্বল আলোকময় বানিয়েছেন। যেন সকলেই কাজ-কর্ম, ভ্রমণ, রুটি-রুজির সন্ধান করতে পারে। সারাদিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তি রাতের স্বস্তীদায়ক ঘুমের মাধ্যমে যেন দূর হয়ে যায়। মাখলুকের ওপর আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। যদিও অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, আর এই আরাম ও শান্তির বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুতকারী তিনিই একমাত্র আল্লাহ যিনি সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নন। কারণ, তিনি ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টিজীবের প্রতিপালন ও অভিভাবকত্ব করে না। এতদসত্ত্বেও তোমরা কেনো গায়রুল্লাহর ইবাদত করো? তোমরা যে সকল মূর্তি-প্রতিমার উপাসনা করো, সেগুলো নিজেই মাখলুক। কোনো কিছুই সে সৃষ্টি করে নাই, বরং এগুলোকে তোমরা তোমাদের নিজ হাতে তৈরি করেছো।

অতীত যুগের মুশরিকরাও এভাবে পথভ্রষ্টের ন্যায় দলীল-প্রমাণ ছাড়া গায়রুল্লাহর ইবাদত করতো। তারা তাদের রিপুর দাস হয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণকারী সকল দলীল-প্রমাণ অবলীলায় অস্বীকার করতো। আর মূর্খতাকে পুঁজি করে পথভ্রষ্ট ও উদভ্রান্ত হয়ে চলতো। অথচ আল্লাহ তোমাদের জন্যে জমিনকে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন; গালিচার মতো জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন; এই জমিনের ওপর তোমরা অনায়াসে তোমাদের জীবন অতিবাহিত করতে পারছো; জমিনকে সুস্থির রাখার জন্যে আল্লাহ সেখানে পেরেকের মতো পাহাড় গেঁথে দিয়েছেন। তিনি তোমাদের মাথার ওপর আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন। এই আকাশ তোমাদের জন্যে সর্বোত নিরাপদ। আল্লাহ তোমাদেরকে চমৎকার অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দেহের প্রতিটি সংযোগস্থলকে যথাযথ আকারে, দৃষ্টিনন্দন করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদেরকে দিয়েছেন যথোপযুক্ত উচ্চতা, সুঢৌল অঙ্গসৌষ্ঠব ও মনোহরী চেহারা। তোমাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে পরিচ্ছন্ন এবং সুস্বাদু খাবার ও সুপেয় পানীয় দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জমিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন, লজ্জাস্থানের আবরণ হিসেবে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়েছেন। কাজেই সঠিক অর্থে আল্লাহই তোমাদের খালেক-মালেক তথা রিযিক দাতা। তিনিই রব্বুল আলামীন। যেমন, সূরা বাকারায় ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاء

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ○

হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের সেই পালনকর্তার ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। অতএব, তোমরা জেনে-শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ করো না।[৭]

এখানেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরে বলেন, 'আল্লাহই তোমাদের একক রব। তিনি গোটা জাহানেরই রব। তিনি অত্যন্ত বরকতময়। তিনিই শ্রেষ্ঠত্বের, পবিত্রতার, বড়ত্বের ও বুযুর্গির অধিকারী। তিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। তিনি মৃত্যুহীন, মরণ তাঁকে কখনই স্পর্শ করতে পারবে না। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অপ্রকাশ্য। পৃথিবীর কোনো সত্তা তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করতে পারবে না। তাঁর সমকক্ষ ও স্থলাভিষিক্ত কেউ নেই।

## সূরা মুমিনের ৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত দ্বারা। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বের করে আনেন শিশুরূপে। যেন তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপণীত হও। আর তোমাদের কেউ কেউ এর পূর্বেই মারা যায়। যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে নবী! আপনি ওই সকল মুশরিকদের বলে দিন– আল্লাহ ছাড়া যে কারো ইবাদত থেকে নিজের বান্দাদেরকে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্তা উপাসনার উপযুক্ত না। দ্বিতীয় আয়াতে তিনি এর ওপর অনেক বড় দলীল পেশ করে বলছেন, সেই একক সত্তাই তোমাদেরকে মাটি থেকে, তারপর বীর্য থেকে, তারপর জমাট রক্তপিণ্ড ও মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে মায়ের পেট থেকে শিশু আকারে ভূমিষ্ঠ করেছেন। বলো, কে তোমাদেরকে এতোগুলো স্তর অতিক্রম

---

৭. সূরা বাকারা : ২১-২২।

করিয়ে পৃথিবীতে এনেছেন? সেই আল্লাহ-ই তোমাদেরকে শিশু থেকে যুবকে পরিণত করেছেন। তিনিই যুবক থেকে পরবর্তীতে তোমাদেরকে বৃদ্ধে পরিণত করবেন? এই কাজগুলো আল্লাহ সম্পন্ন করেছেন একটি বিশেষ প্রক্রিয়া ও সুচারু ব্যবস্থাপনায়। তারপরও তোমরা কতোটা অকৃতজ্ঞ যে, সেই আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে অংশীদার বানাচ্ছো! তোমরা কি দেখো না, অনেকে তার আগেই উধাও হয়ে যায় অর্থাৎ অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই নষ্ট হয়ে মায়ের গর্ভ থেকে পড়ে যায়। কেউ শৈশবে, আর কেউ যৌবনে মারা যায়। কেউ মাঝবয়সে, পৌঢ়ত্বের আগেই পৃথিবী থেকে পরপারে পাড়ি জমায়। এ কারণেই আল্লাহ অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন, 'আমি মায়ের পেটে যতক্ষণ চাই অবস্থান করাই'। এখানে ইরশাদ করেছেন, 'আর যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও। আর যাতে তোমরা অনুধাবন কর।' অর্থাৎ তোমরা যেন নিজ জীবনের এই পরিবর্তনগুলো দেখে এ কথার ওপর ঈমান আনাসন করো যে, পার্থিব এই জীবনের পরে তোমাদেরকে নতুন আরেকটি জীবনের জন্যে দাঁড়াতে হবে। কাজেই আল্লাহই তোমাদের জীবন-মৃত্যুর একক সিদ্ধান্তদাতা। তিনি ছাড়া অন্য কেউ বাঁচা-মারার ক্ষমতা রাখে না। তাঁর কোনো নির্দেশ, সিদ্ধান্ত, কর্ম সম্পাদন ও কোনো ইচ্ছাকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না। তিনি যা চান তা-ই হয়ে থাকে। আর যা চাইবেন না তার হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই।

## সূরা মুমিনের ৭৯-৮১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○ وَ لَكُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوْا عَلَیْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَ عَلَیْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ○ وَ یُرِیْكُمْ اٰیٰتِهٖ ۫ فَاَیَّ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ○

আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা কতকের ওপর আরোহণ করতে পারো আর কতক তোমরা ভক্ষণ করতে পারো। আর এতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক উপকারিতা এবং তোমরা নিজেদের অন্তরে যে প্রয়োজন অনুভব করো, ওগুলো দ্বারা তা যেন পূর্ণ করতে পারো। ওগুলোর ওপর আর নৌযানের ওপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান। সুতরাং, তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

ব্যাখ্যা : উট, গাভী, বকরি জাতীয় প্রাণীগুলোকে আল্লাহ মানুষের বিভিন্ন উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। এগুলোকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এগুলোর গোশত খাওয়া যায়। যেমন ধরুন, এই উট একাধারে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা যায়, দুধ পান করা যায়। উপরন্তু এ উটের সাহায্যে দূর-দূরান্তে

সফর করা যায়। গরুর গোশত খাওয়া যায়, দুধ পান করা যায়, ক্ষেতে হালচাষ করা যায়। বকরির গোশত খাওয়া যায়, দুধ পান করা যায় এবং এগুলোর শরীরের পশম দিয়ে বিভিন্ন উপকারী জিনিস তৈরি করা যায়। এ জাতীয় আরো কিছু কথা সূরা আন'আম, সূরা নাহল সহ বিভিন্ন সূরায় আলোচিত হয়েছে। এখানেও আল্লাহ সেগুলোর বিভিন্ন উপকারীতাকে আমাদের ওপর তাঁর ইহসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই পৃথিবীর বিভিন্ন মাখলুকাতের মাঝে, মহাবিশ্বের নানা প্রান্তে, বিশ্বচরাচরের বিভিন্ন অণু-পরমাণুতে; এমনকি খোদ তোমাদের সত্তার মাঝে আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। সত্য এটাই যে, অগণিত সেই নিদর্শনের মধ্য হতে একটি নিদর্শনকেও তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না।

## সূরা মুমিনের ৮২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ اَشَدَّ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিলো? তারা জমিনে ছিলো তাদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে তাদের চেয়ে অধিক প্রবল। অতঃপর তাদের কর্ম তাদের কোনো কাজে আসেনি।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী যুগের সেই লোকদের কথা আলোচনা করছেন যারা নবী-রাসূলদের অস্বীকার করেছে। সাথে সাথে তাদের যেই অশুভ পরিণতি হয়েছিলো, সে কথাও তুলে ধরেছেন। অথচ গায়ে-গতরে তারা তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিলো। সংখ্যায় ছিলো অধিক। তাদের দালানকোঠা, স্মৃতিচিহ্ন ইত্যাদিও তোমাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ছিলো। সম্পদ-প্রাচুর্য্যে তারা তোমাদের চেয়ে ঢের এগিয়েছিলো। শিক্ষণীয় হলো, এসব শক্তি-সামর্থ্য, উপায়-উপকরণ তাদের কোনো উপকার বয়ে আনতে পারেনি। কেউ আল্লাহর আযাব প্রতিহত করতে পারেনি। ঠেকিয়ে রাখতেও পারেনি। আসলে তারা জাতীয় শাস্তির যথোপযুক্তই ছিলো।

## সূরা হা-মীম সেজদার ৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۚ وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِىْ ۙ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ○

কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো ফল আবরণ মুক্ত হয় না, কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে আহবান করে বলবেন, আমার শরীকেরা কোথায়? তখন তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামত কখন আসবে, সে কথা তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানে না। গোটা মানবসম্প্রদায়ের সর্দার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.-কে যখন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এক সর্দার হযরত জিবরাঈল আ. কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে এ বিষয়ে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে অধিক অবহিত নয়'। এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কিয়ামতের দিন-ক্ষণ জানে না।

আল্লাহ এরপর বলেন, পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তাআলার জ্ঞানাধীন। এমনকি কোন ফলটি মুকুল থেকে বেরিয়েছে, কোন মহিলা সন্তান জন্ম দিয়েছে, কোন ভ্রূণটি এখনও মাতৃগর্ভে রয়েছে— সব তথ্য আল্লাহ জানেন। জমিন ও আসমানের কোনো তুচ্ছাতি তুচ্ছ বস্তু আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়। গাছ থেকে কোন পাতাটি এই মাত্র ঝরলো, প্রতিটি প্রাণীর গর্ভে কী আছে, গর্ভের ভেতর ভ্রূণটি এখন কোন স্তরে আছে, তার প্রতিটি বৃদ্ধি-হ্রাস সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবহিত। তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুর সঠিক পরিমাণের পূর্ণ ও হালনাগাদ তথ্য রয়েছে। বয়সের বাড়া-কমার পূর্ণ খতিয়ান তাঁর জানা রয়েছে। আল্লাহ তাআলার পক্ষে কোনো কাজ কষ্টকর নয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার তামাম মাখলুকাতের সামনে মুশরিকদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা যাদেরকে আমার সঙ্গে অংশীদার করতে তারা আজ কোথায়? উপাস্যগুলো উত্তর দেবে—'আমরা তো তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমাদের মধ্য থেকে আজ কেউ একথা স্বীকার করবে না যে, তোমার কোনো অংশীদার আছে।' একথা বলে তাদের সেই মিথ্যা উপাস্যগুলো সটকে পড়বে। মুশরিকদের উপকার করতে একটি উপাস্যকেও এগিয়ে আসতে দেখা যাবে না। যারা তাদের উপকারে আসবে তারা তখন বুঝতে পারবে, আজ তাদের আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো পথই খোলা নেই।

## সূরা হা-মীম সেজদার ৫৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব, বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটাই (কুরআন) সত্য। তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত?

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এ আয়াতে বলেন, কুরআন কারীম সত্য হওয়ার ওপর তাদের আশপাশে পৃথিবীর চতুর্প্রান্তে অসংখ্য দলীল ও সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশ পাবে। মুসলমানদের বিজয়ের ধারাবাহিকতা শুরু হবে। তাদের হাতে পৃথিবীর কর্তৃত্ব আসবে। পৃথিবীর সকল ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠবে। বদর ও মককার বিজয়ের নিদর্শন খোদ তাদের নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে যে, তারা জনসংখ্যায় ও রণসজ্জায় সজ্জিত সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী হবে। তারপরও মুষ্ঠিমেয় হকপন্থি মুসলমান তাদের উলট-পালট করে দেবে।

সম্ভাব্য, এ আয়াতের আরেক উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিদর্শন খোদ মানুষের নিজের মধ্যেই বিদ্যমান। মানব শরীরের কাঠামো, গঠন-বিন্যাস, ভিন্ন ভিন্ন আচরণ ও বৈশিষ্ট্য, স্বতন্ত্র গাত্রবর্ণ ও রং-রূপ ইত্যাদি মহান স্রষ্টার সৃষ্টিনৈপুণ্যের অনন্য স্মারক। যা সারাক্ষণ তাদের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে। এমনকি এককভাবে প্রত্যেকের নিজ শরীরেই নিদর্শন রয়েছে। তার এই শরীরের চড়াই-উতরাই বিভিন্ন স্তর ডিঙ্গিয়ে এসেছে। শৈশব, তারুণ্য, যৌবন, বার্ধক্য, সুস্থতা-অসুস্থতা, অভাব-স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি গুণাগুণ তথা জীবনসংগ্রামের এই বৈচিত্র্যগুলোও আল্লাহর নিদর্শন। মোটকথা, ভেতরে-বাইরে-সর্বখানে আল্লাহর কুদরতের এতো অজস্র অগণিত নিদর্শন রয়েছে যে, আল্লাহর কথা সত্য স্বীকার করার জন্যে মানুষ বাধ্য। আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর এগুলোই যথেষ্ট সাক্ষী। আল্লাহ তাঁর প্রতিটি বান্দার কথা ও কাজ-কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।

## সূরা শূরার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○

আসমানসমূহে এবং জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। তিনিই সমুন্নত, সুমহান।

ব্যাখ্যা : জমিন ও আসমানে যতো ধরনের সৃষ্টিজীব রয়েছে তারা সবাই আল্লাহর গোলাম। তাঁর মালিকানাধীন। তাঁর বশীভূত, নিয়ন্ত্রণাধীন ও তাঁর

সামনে অক্ষম। আল্লাহই শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারী। অহংকার কেবল আল্লাহকেই শোভা পায়। তিনি সুউচ্চ ও মহিয়ান। আল্লাহর বড়ত্ব ও বিশালতার বোঝা আসমানের পক্ষেও বহন করা সম্ভব নয়। ফেরেশতাগণ আল্লাহর বড়ত্বের কারণে সারাক্ষণ কম্পমান থাকেন। এ কারণে তারা সর্বক্ষণ আল্লাহর মহিমা ও গুণগান গায়। তারা পৃথিবীবাসীর জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করছে। যেমনটি অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ الخ—'যেসকল ফেরেশতা আরশ বহন করেন এবং যারা তার আশ-পাশে থাকেন তারা প্রতিনিয়ত নিজ রবের তাসবীহ ও হামদ বয়ান করেন। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস প্রগাঢ়। তারা ঈমানদারদের জন্যেও ইসতিগফার করেন। বলুন, হে আমাদের রব! আপনি আপনার রহমত ও জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিটি বস্তু বেষ্টন করে আছেন। কাজেই যারা তাওবা করে ও আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদের ক্ষমা করুন। তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। অতঃপর ইরশাদ করেন, জেনে নাও– আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল।'

## সূরা শূরার ১১-১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা; তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তু থেকেও সৃষ্টি করেছেন তাদের জোড়া। এভাবেই তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন। কোনো কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। আসমান ও জমিনের চাবি তাঁরই নিকট; তিনি যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক প্রশস্ত করেন এবং পরিমিত করেন; নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞাতা।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ আমাদের রব। যিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। তাঁর ওপরই আমি তাওয়াক্কুল করি। আমি আমার সকল কাজ তাঁর ওপর সোপর্দ করি। সর্বক্ষণ তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। তিনি আসমান, জমিন ও তন্মধ্যকার প্রতিটি সৃষ্টিজীবের খালেক—স্রষ্টা। আমাদের ওপর তাঁর অন্যতম দয়া হলো, তিনি আমাদের প্রত্যেকের জীবনসঙ্গিনী করেছেন আমাদের অনুরূপ আকৃতি ও একই প্রজাতি থেকে। এভাবে প্রতিটি প্রাণীর জীবনসঙ্গী চয়ন করেছেন তারই গোত্র ও প্রজাতি থেকে। আট প্রজাতির চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তাদের প্রতিটি স্বগোত্র থেকে জোড়া পেয়েছে। একই বৈশিষ্ট্যের

অধিকারী করে আমাদের সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনাদিকাল থেকে অব্যাহত চলে আসছে। যার ওপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ও যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনে একই ধারাবাহিকতা চলে আসছে।

বাগাভী রহ. বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো, জরায়ুর ভেতর সৃষ্টি করা। কেউ বলেন, পেটের ভেতর সৃষ্টি করা। কেউ বলেন, একই পদ্ধতি সারা পৃথিবীতে প্রচলিত হওয়া। মুজাহিদ রহ. বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো বংশবিস্তার। এটাই বাস্তব সত্য যে, আল্লাহর মতো স্রষ্টা দ্বিতীয়জন নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয় ও অনুপম। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। আসমান ও জমিনের সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহর হাতে। উদ্দেশ্য হলো, মহাবিশ্বের একক মালিক ও নিয়ন্তা আল্লাহ। তিনিই একক বিচারক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশস্ত জীবিকা দান করেন। যাকে ইচ্ছা অস্বচ্ছল করেন। তাঁর কোনো কাজ প্রজ্ঞাহীন নয়। তিনি কোনো অবস্থাতেই কারো ওপর জুলুম করেন না। তাঁর সুবিস্তৃত জ্ঞান সৃষ্টিজীবের প্রত্যেককেই বেষ্টন করে আছে।

### সূরা শূরার ২৮-২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ هُوَ الَّذِیْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَ یَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَ هُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیْدُ ○ وَ مِنْ اٰیٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَثَّ فِیْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَ هُوَ عَلٰی جَمْعِهِمْ اِذَا یَشَآءُ قَدِیْرٌ ○

তারা নিরাশ হয়ে পড়লে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই অভিভাবক, প্রশংসিত। তাঁর অন্যতম নিদর্শন আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এগুলোকে একত্র করতে সক্ষম।

ব্যাখ্যা : অতঃপর বর্ণনা করেন, মানুষ রহমতের বৃষ্টির অপেক্ষা করতে করতে একসময় আশাহত হয়ে যায়। তাদের সেই তীব্র প্রয়োজন ও কঠিন বিপদের সময় আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি। তখন তাদের নৈরাশ্য ও খরা কেটে যায়। আমার রহমত চতুর্দিকে ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে। একবার এক ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে নিবেদন করলো, হে আমীরুল মুমিনীন! তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এখন মানুষ তো বৃষ্টির ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেছে। তখন উত্তরে তিনি বললেন, যাও এখন। বৃষ্টি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই হবে। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

وَهُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیْدُ অর্থাৎ সৃষ্টিজীবের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে। তাঁর প্রতিটি কাজ প্রশংসনীয়। সৃষ্টিজীবের ভালোমন্দের ব্যাপারে তিনি ছাড়া আর কে

জানবে। তাদের কল্যাণের কথা আল্লাহর জানা আছে। কাজেই আল্লাহর কোনো কাজ কল্যাণ থেকে মুক্ত নয়।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর বড়ত্ব, কুদরত ও আধিপত্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, এই আসমান ও জমিন তাঁরই সৃষ্টি। তন্মধ্যকার প্রতিটি মাখলুকও তাঁর সৃষ্টি। ফেরেশতা, মানুষ, জিন জাতি ও বিভিন্ন প্রজাতির যে সকল প্রাণী পৃথিবীর চতুর্প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে একই ময়দানে একত্রিত করবেন। তখন তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে। ওই দিন সবার সাথে ন্যায়সঙ্গত বিচার করবেন।

## সূরা শূরার ৩২-৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ مِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ○ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আরো রয়েছে সমুদ্রে চলাচলকারী পর্বতমালার মতো জাহাজসমূহ। তিনি যদি চান বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। ফলে জাহাজগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে গতিহীন হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতের নিদর্শন মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন; তিনি সমুদ্রকে বশীভূত করে রেখেছেন। যেন এর ওপর দিয়ে অনায়াসে জাহাজ চলাচল করতে পারে। সমুদ্রের বুকে ভাসমান বড় বড় জাহাজগুলোকে এমন মনে হয় যেন জমিনে উঁচু উঁচু পাহাড়। যেই বাতাস জাহাজগুলোকে একদিক থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে ওই বাতাসও আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ চাইলে বাতাস থামিয়ে দিতে পারেন। তখন জাহাজের পালগুলো অকেজো হয়ে যেতো। জাহাজ থেমে যেতো। কুদরতের এই অপূর্ব ব্যবস্থাপনার মাঝে ওই সকল লোকের জন্যে রয়েছে শিক্ষা যারা বিপদে ধৈর্য ও সুসময়ে শোকরে অভ্যস্ত। তাদের জন্য তো খুবই শিক্ষণীয় বিষয়, তারা আল্লাহ তাআলার এই সুবিশাল কুদরত ও তাঁর সীমানাহীন রাজত্বের এই নিদর্শনগুলো দেখে অনায়াসে বুঝে নিতে পারবে।

বাতাসের প্রবাহ বন্ধ করার মাধ্যমে সমুদ্রের বুকে জাহাজগুলোকে থামিয়ে দেওয়া যেমন আল্লাহর পক্ষে অত্যন্ত সহজ; তদ্রূপ পাহাড় সমান জাহাজগুলোকে মুহূর্তেই পানির গভীরে ডুবিয়ে দেওয়াও আল্লাহর পক্ষে সম্ভব। আল্লাহ ইচ্ছা করলে, জাহাজের যাত্রীদেরকে তাদের গুনাহের কারণে সেখানেই ডুবিয়ে দিতে পারেন। এমনিতেই আল্লাহ মানুষের অসংখ্য গুনাহ এড়িয়ে যান। আল্লাহ যদি তাদেরকে তাদের কৃত গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন তাহলে

তিনি মুহূর্তেই তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু অনিঃশেষ দয়া ও করুণার কারণে আল্লাহ তাদের পাকড়াও না করে সমুদ্রের এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে পৌঁছে দিচ্ছেন।

মুফাসসিরীনে কেরাম এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওই বাতাসকে তাদের প্রতিকূলে প্রবাহিত করতে পারতেন। তীব্র ঝঞ্ঝাবহ ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করতে পারতেন। যা জাহাজগুলোকে সঠিক পথে চলতেই দিতো না। জাহাজের নাবিকরা তখন জাহাজকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো না। দেখা যেতো, তারা যাবে এক পথে; কিন্তু বাতাস জাহাজকে নিয়ে যাচ্ছে অন্য পথে। তখন তারা দিশাহীন সমুদ্রে ঘুরপাক খেতে থাকতো এবং এক সময় জাহাজের আরোহীরা ধ্বংসের মুখে পড়তো। মোটকথা, আল্লাহ যদি বাতাস বন্ধ করে দেন তখনও মানুষ অক্ষম হয়ে যেত। আর যদি বাতাসের গতি বাড়িয়ে দেন তবুও তা অকার্যকর হয়ে যেত। কিন্তু তা না করে তিনি সম্পূর্ণ দয়াবশতঃ বাতাসের প্রবাহ জাহাজ পরিচালনার অনুকূলে প্রবাহিত করেছেন। যার ফলে আজ মানুষ জাহাজের মাধ্যমে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর সফর সম্পন্ন করতে পারছে। নিজেদের নানা উদ্দেশ্য পূর্ণ করার সুযোগ পাচ্ছে।

পানিরও একই অবস্থা। যদি বৃষ্টি বর্ষণ পুরোপুরি থেমে যায়, খরা দেখা দেয় তাহলে গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। তদ্রূপ যদি প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ হয় তখন অতি বৃষ্টির কারণে কোনো শষ্য উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ পাবে না। এটাও পৃথিবীর ধ্বংস ডেকে আনবে। প্লাবন দেখা দেবে। এক পর্যায়ে আমাদের বাড়ি-ঘর ধসে পড়বে। কাজেই এটা মহান আল্লাহর অনেক বড় দয়া যে, তিনি প্রয়োজন অনুপাতে পানির যোগান দিচ্ছেন। যেখানে বেশি পানি প্রয়োজন সেখানে বেশি বর্ষণ করছেন। যেখানে পানির প্রয়োজন কম সেখানে কম বর্ষণ করছেন।

অতঃপর আল্লাহ বলছেন, যারা আমার কথা মানে না, যারা ঝগড়াটে, তারাও এ জাতীয় বিষয়গুলো অস্বীকার করতে পারবে না। তারাও মানতে বাধ্য যে, এগুলো আমার কুদরতের বাইরে নয়। আমি যদি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাই তাহলে তারা কখনই আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। প্রতিটি জিনিস আমার কুদরত ও সক্ষমতার অধীনস্থ।

## সূরা শূরার ৪৯-৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا ۚ وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলাই আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, একক অধিপতি ও শতভাগ নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি যা চান করেন। যা চান না করেন না। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি ইচ্ছা হলে কাউকে শুধু কন্যা সন্তান দান করেন যেমন হযরত লূত আ.-কে দিয়েছেন। আবার যাকে ইচ্ছা শুধু পুত্র সন্তান দান করেন যেমন হযরত ইবরাহীম আ.-কে দিয়েছেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা ও পুত্র উভয় সন্তান দান করেন যেমন, প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা.-কে দিয়েছেন। আবার যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন, যেমন হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিমাস সালাম। এখানে মোট চার প্রকার হলো। কাউকে শুধু ছেলে সন্তান দিয়েছেন। কাউকে শুধু মেয়ে সন্তান দিয়েছেন। কাউকে দু'ধরনের সন্তানই দিয়েছেন। কাউকে কিছুই দেননি।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন হলেন সর্বজ্ঞানী। তিনি জানেন, কার কী প্রাপ্য। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি যেমন ইচ্ছা তারতম্য করতে পারেন। কাজেই আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আ.-এর জন্মের সময় যে কথাটি বলেছিলেন, 'আমি তাকে লোকদের জন্যে নিদর্শন বানিয়েছি' এ আয়াতে সে কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের ব্যাপ্তির ওপর এই আলামত দিচ্ছেন যে, আমি মাখলুককে চার পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছি। আদমকে সৃষ্টি করেছি শুধু মাটি থেকে। তাঁর জন্মের জন্যে বাবা-মার কোনোটারই প্রয়োজন পড়েনি। হাওয়াকে সৃষ্টি করেছি শুধু পুরুষ থেকে। বাকি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছি বাবা-মায়ের মাধ্যমে। শুধু ঈসাকে সৃষ্টি করেছি নারীর মাধ্যমে। সেখানে কোনো পুরুষ ছিলো না। অর্থাৎ তাঁর জন্মের মাধ্যমে চারটি সুরত পূর্ণতা পেলো।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কুদরতের ব্যাপ্তি কতো ব্যাপক। সন্তানও দিচ্ছেন চার সুরতের কোনো একটিকে। আবার সন্তান জন্মও দিচ্ছেন চার সুরতের কোনো একটিতে। এখানেও চার, ওখানেও চার। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর প্রকাশ।

## সূরা যুখরুফের ৯-১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ○ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○ وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ○ وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَ الْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ○ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ○ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ○

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন— আসমানসমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহই কেবল এগুলো সৃষ্টি করেছেন। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বানিয়েছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন চলার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো। আর যিনি আসমান থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমি তা দ্বারা মৃত জনপদ সঞ্জীবিত করি। এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে। আর যিনি সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও জন্তু, যাতে তোমরা আরোহণ করো, যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির থাকতে পার। তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করো যখন তোমরা এর ওপর স্থির হয়ে বসো; আর বলবে, পবিত্র-মহান সেই সত্তা, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। যদিও আমরা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলাম না। আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে নবী! আপনি যদি মুশরিকদের জিজ্ঞেস করেন তাহলে তারা এ কথা স্বীকার করবে যে, জমিন ও আসমানের স্রষ্টা আল্লাহ। তারা আল্লাহ তাআলার তাওহীদ জানা সত্ত্বেও ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে অন্যদের শরীক করে। আল্লাহই এককভাবে জমিনকে শয্যা বানিয়েছেন। তিনি জমিনকে সুস্থির ও ভারসাম্যপূর্ণ বানিয়েছেন বলে তোমরা তার ওপর চলাফেরা-ওঠাবসা করতে পারছো। অথচ এ জমিন নিজেই পানির ওপর ভাসছে। আল্লাহ মজবুত পাহাড়ের সাহায্যে এ জমিনকে সুস্থির রেখেছেন। আল্লাহ জমিনের বুকে তোমাদের জন্যে চলার পথ করে দিয়েছেন। যার ফলে তোমরা এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করতে পারছো।

আল্লাহ্ আসমান থেকে তোমাদের ওপর এ পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ করেন যা তোমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। এই বৃষ্টির পানির বদৌলতে শষ্যক্ষেত ও বাগ-বাগিচা সবুজ-সতেজ হয়ে ওঠে। সেখান থেকে তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর পান করার কাজে আসে। অতঃপর ওই পানি দ্বারা খরা পিড়িত জমিনকে পরিবর্তন করে উর্বর করে দেন। সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন রকমের ফুলে-ফলে ভরপুর হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ এখানে মৃত জমিনকে জীবিত করার মাধ্যমে এ কথার প্রমাণ করেছেন যে, তিনি অনেকটা এভাবেই মৃত মানুষকে জীবিত করবেন। বলেন, এভাবে তোমাদেরকেও কবর থেকে বের করা হবে।

আল্লাহ্ প্রতিটি প্রাণী সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তোমাদের উপকারের জন্যে বিভিন্ন ধরনের জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্র অতিক্রম করার জন্যে জাহাজ এবং স্থলভাগ অতিক্রম করার জন্যে তিনিই যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা যানবাহন হিসেবে যেসকল পশু ব্যবহার করো প্রয়োজনের সময় সেগুলোর গোশতও তোমরা ভক্ষণ করো। সেগুলোর মধ্য থেকে অনেকগুলো তোমাদেরকে দুধ দেয় এবং তোমরা ভারি ভারি বোঝাও বহন করাও। সফরের সময় তোমরা নিজেরা সেগুলোর ওপর আরোহণ করো। ফলে তোমাদের সফর উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কাজেই তোমাদের দায়িত্ব হলো তোমরা যখন ওই সকল বাহনের ওপর চেপে বসবে তখন অবশ্যই তোমাদের রবের এই নেয়ামতের কথা স্মরণ করবে যে, তিনি কেমন শক্তিশালী প্রাণীগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তখন পাঠ করবে–

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ، وَ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ○

পবিত্র-মহান সেই সত্তা যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। যদিও আমরা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলাম না। আর নিশ্চয়ই আমরা (মৃত্যুর পর) আমাদের রবের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী।

পৃথিবীর ওপর এই সংক্ষিপ্ত সফর ও অল্প সময়ের আসা-যাওয়া দেখে পরকালের দীর্ঘ সফরের কথা স্মরণ করো। দুনিয়াতে যদি সংক্ষিপ্ত সফরের জন্যে পাথেয় লাগে তাহলে কেনো পরকালের দীর্ঘ সফরের জন্যে পাথেয় লাগবে না? মনে রাখবে, সর্বোত্তম পাথেয় হলো আখেরাতের পাথেয়।

এর পাশাপাশি আল্লাহ্ দুনিয়াবী পোশাক-পরিচ্ছেদের কথা বলে পরকালের পোশাকের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ পোশাক।

## সূরা যুখরুফের ৮৪-৮৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ هُوَ الَّذِیْ فِی السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِی الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَ هُوَ الْحَكِیْمُ الْعَلِیْمُ ○ وَ تَبٰرَكَ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۚ وَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ وَلَا یَمْلِكُ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُوْنَ ○ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰی یُؤْفَكُوْنَ ○

তিনিই ইলাহ নভোমণ্ডলে এবং তিনিই ইলাহ ভূমণ্ডলে; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। কত মহান তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর সার্বভৌম অধিপতি; কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা আহবান করে তাদের সুপারিশের ক্ষমতা নেই; তবে তারা ছাড়া যারা জেনে-শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়। আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তবু তারা কী ভাবে বিমুখ হয়?

ব্যাখ্যা : এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে অধিকতর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে যে, জমিন ও আসমানের সকল মাখলুকাত তাঁরই ইবাদত করে। তাঁর সামনে সবাই নত ও অক্ষম। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী। যেমনটি অন্য আয়াতে এসেছে যে, জমিন ও আসমানে আল্লাহই একক রব। গোপনে ও প্রকাশ্যে তথা তোমাদের প্রতিটি আমল সম্পর্কে তিনি জানেন। তিনি সবার স্রষ্টা ও মালিক। তিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। সবাইকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। সবার ওপর তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতা। তিনি সর্বাধিক বরকতময়। তিনি যে কোনো প্রকার ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি সবার মালিক। শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার তিনিই অধিকারী। তাঁর নির্দেশ কেউ অমান্য করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা কেউ বদলাতে পারে না। প্রতিটি ব্যক্তির ওপর তাঁর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ। প্রতিটি কাজ তাঁর কুদরতের অধীনস্থ। কিয়ামতের সঠিক দিন-ক্ষণ তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। সমস্ত মাখলুক তাঁর সকাশেই প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি তখন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে এ কথা বলেছেন, কাফেররা যেসকল মিথ্যা উপাস্যের পূজা করে, যাদেরকে সুপারিশদাতা মনে করে তাদের কেউই সুপারিশ করতে অগ্রসর হবে না। তাদের কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি সত্যের অনুসারী হবে, ন্যায়নিষ্ঠ হবে, আল্লাহর পরিচয় ও ইলমের উত্তরাধিকারী হবে, এমন প্রজ্ঞাবান দূরদর্শী ব্যক্তিগণ কিয়ামতের ময়দানে সৎলোকদের জন্যে

সুপারিশ করতে পারবেন।

চতুর্থ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের স্রষ্টা কে? তারা স্বীকার করবে, আল্লাহ তাআলাই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আফসোসের বিষয় হলো, তোমরা এক আল্লাহকেই 'স্রষ্টা' স্বীকার করো; অথচ ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে অন্যদের শরীক করো! যারা নিতান্তই অক্ষম ও শক্তিহীন! তোমরা কেনো বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করো না যে, যখন তিনি একাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তাহলে আমরা কেনো অন্যদের উপাসনা করবো? তাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা এতো বেশি বেড়ে গেছে, এই সরল কথাটুকুও তাদের ইহজীবনে বুঝে আসে না! এমনকি কেউ তাদেরকে বোঝালেও তারা বুঝে না। তাই বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, এটুকু স্বীকার করার পরও কেনো অন্ধ হয়ে যাও।

## সূরা জাসিয়ার ৩-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○

নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং যে জীব জন্তু ছড়িয়ে রয়েছে তাতে নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্ববাসীদের জন্যে। আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ আসমান থেকে যে পানি বর্ষণ করেন তারপর তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে সে জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যারা বোঝে। এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি যথাযথভাবেই তোমার নিকট তেলাওয়াত করছি। অতএব, তারা আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে?

ব্যাখ্যা : এ সকল আয়াতে আল্লাহ স্বীয় মাখলুকদেরকে এ কোথা বোঝাচ্ছেন যে, তারা যেন কুদরতের নিদর্শনসমূহের ওপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করে। আল্লাহর নেয়ামতসমূহ জানে, আত্মস্থ করে। এরপর সেগুলোর শোকর আদায় করে। তারা যেন দেখে, আল্লাহর কুদরত কতো বিশাল ও ব্যাপক!! যিনি আসমান-জমিন ও বিভিন্ন প্রজাতির মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতা, জ্বিন, মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু, পাখি, বন্যপ্রাণী, হিংস্র প্রাণী, কীট-প্রতঙ্গ তিনিই

সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্রের মাঝে অগণিত অসংখ্য প্রাণী তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনের পর রাত ও রাতের পর দিন নিয়ে আসেন। রাতের অন্ধকার ও দিনের উজ্জ্বলতা একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি প্রয়োজন অনুপাতে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আয়াতে এসেছে, 'আকাশ থেকে রিযিক'। এখানে 'রিযিক' দ্বারা বৃষ্টি উদ্দেশ্য। কারণ, বৃষ্টির মাধ্যমেই খাদ্য উৎপন্ন হয়। শুষ্ক জমিন সবুজ হয়ে জমিনে বিভিন্ন ধরনের শষ্য সুশোভিত হয়ে ওঠে। দখিনা, পশ্চিমা বাতাস, প্রকৃতির আর্দ্রতা ও শুষ্কতা, দিন-রাতের পালাবদল শুধু আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। কিছু বাতাস বৃষ্টি উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিছু বাতাস মেঘমালাকে পানি বানিয়ে দেয়। কিছু রূহের খাদ্য যোগায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন কাজে এই বাতাস জোরালো ভূমিকা রাখে। প্রথমে আল্লাহ বলেন, এর মাঝে ঈমানদারদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

অতঃপর যারা বিশ্বাস রাখে এবং যারা জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন তাদের জন্য। যেমন– আয়াতে বলেছেন, لَّاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ—'মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী।' দ্বিতীয় আয়াতে বলেছেন, لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ—'তাতে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে জাতির জন্য যারা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে।' পরবর্তী আয়াতে বলেছেন, لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ—'সে জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যারা বোঝে।' মূলতঃ এখানে একটি সম্মানজনক অবস্থা থেকে আরেকটি সম্মানজনক অবস্থার দিকে উন্নতি হয়েছে। সূরা বাকারার এ আয়াত إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ এর মাঝেও অনুরূপ ঘটেছে।

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে আবী হাতেম রহ. একটি দীর্ঘ নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। সেখানে মানবসম্প্রদায়কে চার ধরনের মিশ্রণ থেকে সৃষ্টি করার কথা এসেছে। উদ্দেশ্য হলো, কুরআন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুস্পষ্টভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, ওই কুরআনের আয়াতগুলো আপনার ওপর তেলাওয়াত করা হচ্ছে। যা তারা শুনতে পাচ্ছে। তবুও না তারা ঈমান আনছে॥ না কুরআন অনুযায়ী আমল করছে। তাহলে বলুন, তারা আর কোন জিনিসের ওপর ঈমান আনবে?

## সূরা জাসিয়ার ১২-১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁরই আদেশক্রমে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যেন তোমরা

শোকর আদায় করতে পারো। আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু নেয়ামতের কথা আলোচনা করেছেন যে, তিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রকে বশীভূত করে দিয়েছেন। যার ফলে তার ওপর দিয়ে এখন তোমরা নিজ ইচ্ছামতো সফর সম্পন্ন করতে পারছো। নৌযানের ওপর বড় বড় বোঝা ও যাত্রী বহন করে এক দেশে থেকে অন্য দেশে অনায়াসে যাতায়াত করছো। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করছো। আর এজন্য তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় করে উপকৃত হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করো।

এর বাইরে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে আসমানে অসংখ্য উপকারী জিনিস যেমন— চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র এবং জমিনেও অসংখ্য উপকারী জিনিস যেমন— পাহাড়, নদী-নালা তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছেন। এগুলো তোমাদের ওপর আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহের যৎসামান্য বহিঃপ্রকাশ। এ কারণেই ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কাছে যতো নেয়ামত রয়েছে তার সবই মহান আল্লাহর দান'। আর এখনো তোমরা কোনো কষ্টের সময় আল্লাহ তাআলার কাছেই কান্নাকাটি করো।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, প্রতিটি জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এজন্যেই আল্লাহর অন্যতম সিফাতি নাম হলো, المعطي—দানকারী। কাজেই পৃথিবীর বুকে যতো ধরনের জিনিস রয়েছে তার সমুদয় মহান আল্লাহর দান। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে, আল্লাহর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করে, সবকিছু তাঁর পক্ষ থেকেই আসে।

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করলো, মাখলুক কোন জিনিস থেকে তৈরি? উত্তরে তিনি বলেন, নূর, আগুন, অন্ধকার ও মাটি থেকে। এরপর বলেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে যদি দেখো তাহলে তাঁকেও এ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করো। ওই লোক আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছে এসে ওই প্রশ্নটি পেশ করলো। ইবনে আব্বাস রা. উত্তরে সে কথাই বললেন যা ইবনে উমর রা. বলেছিলেন। এরপর তিনিও বললেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, এই জিনিসগুলো কিসের তৈরি? লোকটি ফিরে এসে শেখানো প্রশ্নটি পেশ করলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাকে এ আয়াত পড়ে শোনালেন। বুঝা গেলো, চিন্তাশীলদের জন্যেও এর মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।

## সূরা জাসিয়ার ৩৬-৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَ لَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ. وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আসমানসমূহের রব, জমিনের রব ও জগতসমূহের রব। আর আসমানসমূহ ও জমিনে গৌরব-গরিমা তাঁরই; তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা : ইরশাদ হয়েছে যে, সকল প্রশংসা আসমান-জমিন ও তন্মধ্যকার প্রতিটি জিনিসের মালিক আল্লাহ তাআলার জন্যে। যিনি গোটা জাহানের পালনকর্তা। আসমান ও জমিনের ওপর তাঁর বড়ত্ব, রাজত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অধিষ্ঠিত। তিনি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁর সামনে প্রতিটি জিনিস ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। সবাই তাঁর কাছে মুখাপেক্ষী।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, বড়ত্ব আমার পাজামা। আর অহংকার আমার চাদর। যে ব্যক্তি এ দু'টির কোনো একটি আমার কাছ থেকে নিতে চাইবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। অর্থাৎ গর্ব ও অহংকারকারী ব্যক্তি জাহান্নামী হবে। তিনি যোগ্য ও প্রভাবশালী। তাঁকে কেউ পরাজিত করার ক্ষমতা রাখে না। না কেউ তাঁকে কোনো বিষয়ে বাঁধা নিষেধ করতে পারে। তিনি প্রজ্ঞাবান। তাঁর কোনো কথা বা কাজ, তাঁর দেয়া শরীয়তের কোনো মাসআলা, তাঁর লেখা তাকদীরের কোনো বিচক্ষণতা থেকে খালি নয়। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নেই। আর না আল্লাহ ব্যতীত কেউ সেজদা পাওয়ার উপযুক্ত।

## সূরা আন'আমের ১-৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○ وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ○

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তবুও কাফিররা তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায়। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে তারপর নির্ধারণ করেছেন একটি কাল। আর তাঁর কাছে আছে একটি নির্দিষ্ট কাল, তবুও তোমরা সন্দেহ করো। আসমান ও জমিনে তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনিই জানেন এবং যা তোমরা অর্জন কর তাও জানেন।

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তাআলা নিজের প্রশংসা করে বলেন, তিনিই আসমান ও জমিনসমূহ সৃষ্টি করেছেন। আসলে এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাদেরকে প্রশংসা করার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন। তিনি দিনের আলো ও রাতের অন্ধকারকে বান্দাদের জন্যে অত্যন্ত উপকারী অভিহিত করেছেন। দেখার বিষয় হলো, আয়াতের মাঝে نُور শব্দটিকে একবচন ও ظُلُمَاتٌ শব্দটিকে বহুবচন আনা হয়েছে। এর কারণ হলো, অভিজাত জিনিস একবচনই ব্যবহৃত হয়। যেমন, অপর আয়াতে এসেছে-عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآئِلِ। আরেক আয়াতে এসেছে- وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ। লক্ষ্য করুন, ডান বোঝাতে يَمِيْنٌ শব্দ একবচন এসেছে। অথচ شَمَائِلْ এসেছে বহুবচন। সত্যপথ বোঝাতে سَبِيْلٌ শব্দ একবচন এসেছে। অথচ বিভ্রান্ত পথ বোঝাতে এসেছে سُبُلَ বহুবচন। আল্লাহ বলছেন, এরপরও কিছু লোক কুফরী করে এবং আল্লাহর সঙ্গে সমকক্ষ ও অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলে, আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। আদতে আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র।

পরবর্তী আয়াতে বলেন, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদম মাটির তৈরি। মাটিই তাঁর শরীরে গোশত-হাড্ডির আকার ধারণ করেছে। পরবর্তীকালে তাঁর সন্তানরাই পৃথিবীর প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে ছড়িয়েছে। আদম আলাইহিস সালাম তাঁর আয়ুষ্কাল সম্পন্ন করার পর নির্দিষ্ট সময়ে ইনতিকাল করেন। أَجَلٌ বা নির্দিষ্ট মেয়াদ দুই প্রকার। একটি হলো, أَجَلٍ خَاصْ—প্রতিটি মানুষের আয়ু। অপরটি হলো أَجَلٍ عَامْ—পুরো দুনিয়ার বয়স। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে পরকাল সূচিত হওয়ার বা আখেরাতের দুয়ারে আসার সময় পর্যন্ত।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ রহ. বলেন, প্রথম أَجَلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়ার মেয়াদকাল। আর أَجَلٍ مُسَمًّى দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের আয়ু- যা তার মৃত্যুর মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। যেন তা আল্লাহ তাআলার এই বাণী থেকে আহরিত। বাণীটি হলো, وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفَّاكُمْ অর্থ হলো, তিনি রাতে তোমাদের মৃত্যু দান করেন আর দিনের বেলা তোমরা যা করো তা তিনি জানেন। আর রাতের বেলায় তো তোমরা গভীর ঘুমে ডুবে যাওয়ার কারণে কোনো কাজ করতেই পারো না। যা রূহ কবয করার আকৃতিতে হয়। এরপর কখন তোমরা ঘুম থেকে জেগে তোমাদের সাথী-সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসবে তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। যেমনটি অন্য আয়াতে এসেছে, 'এ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।' এ জাতীয় ভাষ্য কুরআন কারীমের অপর এক আয়াতে এভাবে এসেছে, 'হে নবী! তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তা কবে সংঘটিত হবে? আপনি কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত নন। এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই জানেন।

আলোচিত আয়াতের শেষাংশে এসেছে, তোমরা কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দিহান। যেই আল্লাহ আসমান ও জমিনসমূহ সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদের গোপন কথাগুলোও জানেন। প্রকাশ্য কথাগুলোও জানেন। আর তোমরা যা কিছু করো প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত।

## সূরা আন'আমের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّ جَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

তারা কি দেখে না, আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি? যাদেরকে জমিনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেভাবে তোমাদেরকেও প্রতিষ্ঠিত করিনি। আর তাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম। অতঃপর তাদের পাপের কারণে তাদের ধ্বংস করেছি এবং তাদের পর অন্য সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ কাফেরদের বোঝাচ্ছেন ও ভয় দেখাচ্ছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী ও অধিক সংখ্যক ছিলো। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও তোমাদের চেয়ে বেশি ছিলো। তাদের রাজত্বের পরিধিও অধিক বিস্তৃত ছিলো। তারপরও তাদের ওপর আযাব নেমে এসেছিলো। তোমরাও ওই ধরনের আযাবের মুখোমুখি হতে পারো। তোমরা কি দেখোনি, আমি ইতঃপূর্বে কতোগুলো জাতিকে ধ্বংস করেছি। যারা ছিলো প্রচুর ক্ষমতা, শক্তি ও বিত্তের অধিকারী। তাদের মতো শান-শওকত তোমাদের নেই। আমি আকাশ থেকে তাদের প্রতি এতো পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি যে, তাদের কখনই দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে হয়নি। আমি তাদেরকে দিয়েছি বাগান ও ঝরনা। আমি তাদের জন্যে এতো সব আয়োজন করেছিলাম মূলত তাদেরকে অবকাশ দেওয়ার জন্যে। এরপর আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম ও গুনাহের কারণে ধ্বংস করেছি এবং তাদের স্থানে অন্য জাতি-গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। কাজেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারাও এখন ধূসর অতীত হয়ে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে। এমনও হয়েছে যে, তাদের পরবর্তীকালের কিছু গোষ্ঠীও তাদের মতো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। যার ফলে আমি তাদেরকেও ধ্বংস করেছি। অতএব, হে লোকসকল! ওই বিষয়ে তোমরাও সতর্ক থাকো, যেন তোমাদেরও ওই অবস্থার সম্মুখীন হতে না হয়। তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া আল্লাহর পক্ষে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। তোমরা যেই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করছো তিনি তো পূর্ববর্তী যুগের রাসূলদের চেয়েও অধিক সম্মানিত। তোমাদের ওপর

এখনও যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব আসেনি; এটি শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেরই কারণ।

## সূরা আন'আমের ১৭-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই। আর যদি কোনো মঙ্গল করেন তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আর তিনিই তাঁর বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা বলেন, আমিই লাভ-ক্ষতির অধিপতি। আমি আমার সৃষ্টিজীবের মাঝে যেমন ইচ্ছা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমার বিচক্ষণতাকে না কেউ পেছনে ফেলতে পারে। না আমার সিদ্ধান্ত প্রতিহত করার ক্ষমতাও কারো আছে। আল্লাহ যদি কারো ক্ষতি করতে না চান তাহলে কেউ সেটিকে বাস্তবায়িত করতে পারবে না। তদ্রূপ তিনি যদি কারো জন্যে কল্যাণের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে কেউ তা প্রতিহত করতে পারবে না। যেমনটি এ আয়াতে এসেছে যে, مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنۢ بَعْدِهٖ। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন তা যেমন কেউ প্রতিহত করতে পারে না। তদ্রূপ তিনি যদি কারো ওপর থেকে রহমত তুলে নেন তাহলে পরবর্তীতে তা কেউ দিতে পারবে না। এ কারণেই আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ অর্থাৎ ওই আল্লাহ– যার সামনে সবাই অবনত শির। তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর বিজয়ী। তাঁর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার সামনে সবাই তুচ্ছ। তাঁর প্রতিটি কাজ প্রজ্ঞাপূর্ণ। তিনি জানেন, কোন বস্তুটি কোথায় আছে। তিনি তাকেই দান করেন যে ওই দানের উপযুক্ত। আর যদি কাউকে না দিতে চান তাহলে বুঝতে হবে সে এর উপযুক্ত না। যদি কারো কাছ থেকে কিছু নিয়ে নেন বুঝতে হবে– সে তার যোগ্য ছিলো না।

## সূরা আন'আমের ৫৯-৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ؕ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَ هُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

আর তাঁর কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবিসমূহ। তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না। জমিনের অন্ধকারে কোনো শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। আর তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা করো তিনি তা জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দিনে পুনরায় জাগিয়ে তোলেন, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অনন্তর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তোমরা যা করো তিনি তোমাদেরকে সে বিষয়ে অবহিত করবেন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার কাছে গায়বের চাবি রয়েছে। যার কারণে তিনি ছাড়া অন্য কেউ গায়বের কথা জানে না।

নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন, গায়ব বলতে পাঁচটি বিষয় উদ্দেশ্য। এক. কিয়ামতের সঠিক দিন-ক্ষণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। দুই. কখন বৃষ্টি ঝরবে, তিন. গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে, চার. প্রতিটি ব্যক্তি আগামীকাল কী কাজ করবে, পাঁচ. কার কোথায় মৃত্যু হবে। এগুলো একমাত্র আল্লাহই জানেন।

উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, জিবরাঈল আ. একদিন গ্রাম্যলোকের আকার ধারণ করে নবী কারীম সা.-এর সামনে আসেন এবং তাঁকে ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। নবী কারীম সা. উত্তরের এক পর্যায়ে বলেন, পাঁচ জিনিসের কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। অতঃপর এ আয়াত তেলাওয়াত করেন— إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الخ।

এরপর ইরশাদ করেন, وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ—'তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে।' অর্থাৎ জমিন ও আকাশের পরমাণুগুলোও আল্লাহর কাছে লুকায়িত নয়। আমরা মানুষ হিসেবে হয়তো পৃথিবীর অনেক কিছু দেখতে পাই না। কিন্তু আল্লাহ সেগুলো পরিষ্কার দেখতে পান।

এরপর ইরশাদ করেন, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا—'তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না।' আল্লাহ তাআলা যখন জড়পদার্থের প্রতিটি নড়াচড়ার কথা জানেন তখন তিনি কেনো প্রাণীজগতের নড়াচড়া বিশেষত জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড ও চাঞ্চল্যের কথা জানবেন না। অবশ্যই জানেন। যেমনটি তিনি বলেছেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ—জল-স্থলের প্রতিটি গাছের জন্যে একজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। যিনি ওই গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ার বিবরণ লিখে রাখেন। লাওহে মাহফুযের সংরক্ষিত পাতায় ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি কথা, সরল-বক্র কথা, জমিনের অন্ধকার গহ্বরে লুকায়িত প্রতিটি অণু-পরমাণুর কথা বিশদাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। শুধু গাছ নয়; প্রতিটি রেণুর ওপরও দায়িত্বশীল ফেরেশতা পর্যবেক্ষণ করছে যে, কখন তা সতেজ হয়েছে এবং কখন তা শুকিয়ে ঝরে পড়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রথমে দোয়াত সৃষ্টি করলেন, এরপর কাষ্ঠফলাকার 'লাওহ' সৃষ্টি করলেন। দুনিয়ার বুকে যা কিছু ঘটবে তা সেখানে লিপিবদ্ধ করালেন। কী ধরনের মাখলুক সৃষ্টি হবে? হালাল রিযিক খাবে না হারাম রিযিক খাবে? নেক আমল করবে না বদ আমল করবে— তার সমুদয় বর্ণনা লেখে দিয়েছেন।

আমর ইবনুল আস রা. বলেন, তৃতীয় জমিনের নিচে ও চতুর্থ জমিনের ওপরে যে জান্নাত রয়েছে সেগুলো তোমাদের সামনে প্রকাশিত হওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু দেখা গেলো, সেগুলোর মাঝে যেই প্রোজ্জ্বল আলো রয়েছে তা দুনিয়াবাসী কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার অনেকগুলো সিলমহর রয়েছে। প্রতিটি সিলমহরের ওপর একজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন তার কাছে একজন ফেরেশতার মাধ্যমে এ নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, তোমার দায়িত্বে যেই সিলমহরটি রয়েছে সেটির হিফাযত করো।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তিনি রাতের বেলা ঘুমের মাধ্যমে মানুষকে মৃত্যু দেন এবং এটা ছোট মৃত্যু। আরবীতে বলে 'ওফাতে আসগর'। যেমন, অপর আয়াতে ইরশাদ করেছেন, يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ—'হে ঈসা আমি তোমাকে মৃত্যু দেবো এবং আমার কাছে উঠিয়ে আনবো।'[৮]

অন্য আয়াতে বলেছেন, اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى—'আল্লাহ্ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার

৮. সূরা আলে ইমরান : ৫৫।

নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে।'[৯]

এ আয়াতে দু'ধরনের মৃত্যুর কথা বলেছেন। একটি হলো মওতে কুবরা—বড় মৃত্যু। অপরটি মওতে সুগরা—ছোট মৃত্যু। এরপর আল্লাহ বলেন, তিনি রাতের সময় তোমাদের মৃত্যু দেন। তখন তোমরা কোনো কাজ-কারবার করতে পারো না। কিন্তু দিনের বেলা বিভিন্ন কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকো। আল্লাহ তোমাদের সারাদিনের কর্মকাণ্ড জানেন। এ বাক্যটির মাধ্যমে বুঝে আসে, আল্লাহর জ্ঞান মাখলুককে কতোটা সর্বোতভাবে বেষ্টন করে আছে। রাতের সময়টি হলো বিশ্রামের। আর দিন হলো কর্মচাঞ্চল্যের সময়। যেমনটি অপর এক আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ○—'তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান।'[১০]

অপর আয়াতে ইরশাদ করেছেন, وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ○—'তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'[১১]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ○ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا○—'রাত্রিকে করেছি আবরণ। দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়।'[১২]

এ কারণেই আলোচিত আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তিনি রাতে তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন আর দিনের বেলা তোমরা যেসকল কাজ করো তিনি তা জানেন। তিনিই বাহ্যিক মৃত্যুর পর তোমাদেরকে দিবসের শুরুতে পুনরায় জাগিয়ে তোলেন। নবী কারীম সা. ইরশাদ করেছেন, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে একজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে তখন ফেরেশতা তার রূহ নিয়ে আল্লাহর কাছে চলে যায়। আল্লাহ যদি বলেন, আটকে রাখো তাহলে সে রূহ রেখে দেয়। অন্যথায় তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়। وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ—এর এটাই ব্যাখ্যা।

এরপর আল্লাহ বলেন, প্রতিটি ব্যক্তির নির্দিষ্ট জীবনকাল সম্পন্ন হওয়ার পর তার রূহ আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাকে

---

৯. সূরা যুমার : ৪২।
১০. সূরা রা'দ : ১০।
১১. সূরা কসাস : ৭৩।
১২. সূরা নাবা : ১০-১১।

জানিয়ে দেন, সে কী আমল নিয়ে এসেছে। এরপর তাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান প্রদান করেন। নেককাজের জন্যে পুরস্কার ও বদকাজের জন্যে শাস্তি প্রদান করেন।

আল্লাহ বলেন, وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ—'আর তিনিই তাঁর বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান।' অর্থাৎ তিনি প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি সত্তার ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর সামনে সবাই নতশির। আল্লাহ মানব সম্প্রদায়ের প্রতিটি সদস্যের ওপর একজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত রেখেছেন। প্রতিটি মুহূর্তে ফেরেশতা তার হিফাযত করে চলেছে। যেমনটি অন্য আয়াতে বলেছেন, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ—'তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে তারা ওদের হেফাযত করে।'[১৩]

অন্যত্র বলেছেন, إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ। অপর আয়াতে বলেছেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ। এ আয়াতসমূহের ভাষ্য এটাই যে, যখন তোমাদের মধ্য হতে কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন আমার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ফেরেশতা তার রূহ কবয করে নিয়ে আসে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মালিকুল মওতের সহায়তার জন্যে আরো অনেক ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। যারা শরীর থেকে রূহ টানতে থাকে। রূহ যখন কণ্ঠনালীর কাছাকাছি চলে আসে তখন মালিকুল মাওত তা কবয করেন। আল্লাহ বলেন, তারা এ দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের শিথিলতা করে না। এরপর তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে সেই রূহ পৌঁছে দেন। উল্লেখ্য, নেককার লোকদের রূহ 'ইল্লিয়্যীন'-এ রাখা হয়। আর বদকার লোকদের রূহ রাখা হয় 'সিজ্জীন'-এ। এটি জাহান্নামেরই একটি স্তর। আল্লাহ আমাদেরকে এথেকে বাঁচিয়ে রাখুন। এরপর ফেরেশতাগণ সেই রূহগুলোকে আল্লাহ তাআলার কাছে পাঠিয়ে দেন।

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীস উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হুরায়রা রা.। নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন, মরণশয্যায় শায়িত ব্যক্তির কাছে ফেরশতাগণ আগমন করেন। যদি সে নেককার হয় তবে তাঁরা বলেন, হে পবিত্র আত্মা! তুমি এসে যাও। তুমি পবিত্র দেহের ভেতরে ছিলে। দুনিয়া থেকে প্রশংসিত অবস্থায় ফিরে এসো। তোমাকে জান্নাতের রূহ ও ঈমানের সুসংবাদ দিচ্ছি। আল্লাহ তোমার ওপর অসন্তুষ্ট নন'। যখন তাঁরা ক্রমাগত এ কথা বলতে থাকেন তখন রূহ দেহ থেকে বেরিয়ে আসে। ফেরেশতাগণ তা নিয়ে আকাশে উঠে যান। তাদের জন্যে আকাশের

---

১৩. সূরা রা'দ : ১১।

দরজাগুলো খুলে যায়। জিজ্ঞেস করা হয়, কে? উত্তরে বলা হয়, অমুকের রূহ। তখন আকাশের ফেরেশতারা বলেন, 'মারহাবা! হে পবিত্র আত্মা! তুমি পবিত্র দেহে ছিলে। তোমার জন্যে সুসংবাদ'। শেষ পর্যন্ত তারা ওই রূহকে নিয়ে ওই আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যান যেখানে আল্লাহ তাআলা রয়েছেন।

এর বিপরীতে যদি মরণশয্যায় শায়িত ব্যক্তি অসৎ ও পাপী লোক হয় তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে নিকৃষ্ট দেহের ভেতরে থাকা নিকৃষ্ট প্রাণ! তুমি লাঞ্ছিত অবস্থায় বেরিয়ে এসো। তোমাকে গরম পানি ও রক্ত-পুঁজের দুঃসংবাদ। এই গরম পানি ও রক্ত-পুঁজ ছাড়াও তোমার জন্যে অন্য শাস্তি ও রয়েছে।' বারবার বলার পর যখন তা বেরিয়ে আসে তখন তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ আকাশে উঠে যান। আকাশের দরোজা খুলে দেয়া হয়। তখন জিজ্ঞেস করা হয়, কে? উত্তরে বলা হয়, অমুক। তখন ফেরেশতা বলেন, হে নিকৃষ্ট প্রাণ! তোমার ওপর লা'নত বর্ষিত হোক। তোমার জন্যে আকাশের দরোজা খোলা হবে না। তখন ওই রূহকে তার কবরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

এর আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, ثُمَّ رُدُّوْا অর্থাৎ সমস্ত মাখলুককে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ তখন তাদের ওপর ন্যায়নিষ্ঠ নির্দেশ জারি করবেন। যেমনটি অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ○ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ○ —'নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীগণকে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে একত্র করা হবে'।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ○ —'আমি তাদের সকলকেই ওঠাবো। কাউকেই ছাড়বো না এবং আমি তাদের কারও ওপর অত্যাচার করবো না।'

আল্লাহই সত্য রব। হুকুম শুধু তাঁরই চলবে। তিনি সবার কাছ থেকে অতি দ্রুত হিসেব গ্রহণ করবেন।

## সূরা আন'আমের ৬৩-৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ○ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ○

বলুন, কে তোমাদেরকে নাজাত দেন স্থল ও সমুদ্রের যাবতীয় অন্ধকার থেকে? যখন তোমরা কাতরভাবে ও গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় বিনয় করো'। 'আমাদেরকে তা থেকে নাজাত দিলে, আমরা

অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো। বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে তা হতে এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট হতে পরিত্রাণ করেন। তারপরও তোমরা তাঁর শরীক করো। বলুন, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করতে অথবা একদলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদন গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম। দেখো, আমি কী ভাবে বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি, যাতে তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহের বিবরণ দিয়ে বলেন, আমি তাদেরকে স্থলভাগ ও জলভাগের অন্ধকার থেকে কী ভাবে উদ্ধার করি। বান্দা যখন সমুদ্রের ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে যায়, তার ওপর দিয়ে প্রতিকূল বাতাস প্রবাহিত হয় ওই সময় সে বিশেষভাবে শুধু আল্লাহকেই নির্দিষ্ট করে আহ্বান করে। যেমনটি এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلاَّ إِيَّاهُ—'যখন 'সমুদ্রে তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয় তখন সমস্ত অংশীদারকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকো।'

অপর আয়াতে বলেন, 'তিনি সেই আল্লাহ– যিনি জলে ও স্থলে তোমাদেরকে ভ্রমণ করিয়ে থাকেন। যখন জাহাজ উত্তম ও অনুকূল বাতাসে চলতে থাকে তখন তোমরা আনন্দিত হও। আর যখন প্রতিকূল ঝঞ্ঝাবাতাস প্রবাহিত হয় এবং চতুর্দিক থেকে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ে তখন তোমাদের মনে এ বিশ্বাস জন্মে যে, মৃত্যু তোমাদেরকে বেষ্টন করে ফেলেছে, তখন তোমরা পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহকেই ডাকো আর বলো– হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করেন আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'[১৪]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'বলো তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, আল্লাহ্ তাআলার সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।'[১৫]

আলোচিত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ বলছেন, স্থলভাগ ও জলভাগের অন্ধকার থেকে কে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন? যাঁকে তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে ডেকে ডেকে বলো– যদি আপনি আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দান

---

১৪. সূরা ইউনুস : ২২।

১৫. সূরা নামল : ৬৩।

করেন তবে আমরা আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হবো'। হে রাসূল সা.! আপনি তাদেরকে বলুন– আল্লাহই তোমাদেরকে এ সকল বিপদ-আপদ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে থাকেন। অথচ তোমরা খুশিমনে প্রতিমাগুলোকে তাঁর শরীক বানিয়ে নিচ্ছো! আল্লাহ তোমাদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ করতে পূর্ণ সক্ষম। যেমনটি সূরা ইসরায় ইরশাদ করেছেন, 'যখন সমুদ্রে তোমাদের ওপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহবান করে থাক তাদেরকে তোমরা ভুলে যাও। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছো যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘুর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্যে কোনো কর্মবিধায়ক পাবে না। অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্যে মহা ঝটিকা প্রেরণ করবেন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না।'[১৬]

এখানে মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে।

মুজাহিদ রহ. বলেন, এখানে উম্মতে মুহাম্মাদিকে সতর্ক করা হয়েছে।

আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে প্রাসঙ্গিক কিছু হাদীস উল্লেখ করবো। বুখারী রহ. বলেন, يَلْبِسَكُمْ-এর অর্থ হলো, তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর কলহে লিপ্ত হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এ ধরনের শাস্তিতে ফেলতে পারেন।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, যখন عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ অর্থাৎ 'আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। এরপর تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ এর সময়ও বলেন, أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ অর্থাৎ 'আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। অতঃপর যখন অবতীর্ণ হয় أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا তখন বলেন, هٰذِهِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ অর্থাৎ এটি অপেক্ষাকৃত সহজ'।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে এসেছে, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ذٰلِكَ অর্থাৎ 'এথেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। অতঃপর مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ শুনে বলেন, أَعُوْذُ بِاللهِ অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। অতঃপর

---

১৬. সূরা ইসরা : ৬৬-৬৯।

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا শুনে বলেন, এটা সহজতর বটে'। ওই সময় নবীজী সা. ইচ্ছা করলে এথেকে আশ্রয় চাইতে পারতেন।

হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, এ আয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'এটা অবশ্যই হবে; যদিও এখন পর্যন্ত হয়নি'।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে আমরা বনী মু'আবিয়ার মসজিদে উপস্থিত হই। রাসূলুল্লাহ সা. মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকাত নামায আদায় করেন। আমরাও নবীজীর সঙ্গে নামায আদায় করি। এরপর তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন। মুনাজাত শেষ করে বলেন, আমি আল্লাহর কাছে তিনটি আবেদন করেছি। ১. আমার উম্মত যেন ফেরাউনদের মতো পানিতে ডুবে ধ্বংস না হয়। ২. আমার উম্মত যেন দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে ধ্বংস না হয়। ৩. তাদের পরস্পরে যেন গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি না হয়। আল্লাহ প্রথম দু'টি আবেদন মঞ্জুর করেছেন; কিন্তু তৃতীয়টি মঞ্জুর করেননি।

জাবির ইবনে উতাইক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের একটি গ্রামের নাম বনু মু'আবিয়া। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এই মসজিদে রাসূলুল্লাহ সা. কোথায় নামায আদায় করেছেন, তা কি তুমি জানো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তাঁকে একটি কোণার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, ওখানে নামায আদায় করেছেন। তিনি আমাকে তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে নবীজী কোন তিনটি জিনিসের জন্যে দোয়া করেছিলেন, তা কি তুমি জানো?' আমি বললাম, জি, জানি। নবী কারীম সা. দোয়া করেছিলেন– কোনো শত্রু যেন আমার উম্মতের ওপর বিজয়ী না হয়। তারা যেন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ধ্বংস না হয়। এ দু'টি দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। তৃতীয়ত এ দোয়াও করেছিলেন, তারা যেন পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। আল্লাহ এ দোয়া মঞ্জুর করেন নি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, তুমি যথার্থ বলেছো। সেমতে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে যুদ্ধ লেগেই থাকবে।

মু'আয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে হাজির হলাম। তখন আমাকে বলা হলো, এইমাত্র চলে গেছেন। আমি নবীজীর খোঁজে বের হলাম। যেখানেই গেলাম শুনতে পেলাম, তিনি এই মাত্র এখান থেকে চলে গেছেন। অবশেষে আমি তাঁকে একটি স্থানে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। আমিও তাঁর সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামাযের পর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আপনি আজ এতো দীর্ঘ সময় নিয়ে কেনো নামায আদায় করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ভয় ও আগ্রহের

নামায আদায় করেছি। অতঃপর নবী সা. তাকে নিয়ে তিনটি দোয়ার আলোচনা করলেন।

বনী যাহরার গোলাম খাব্বাব ইবনে আরত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সা.-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূল সা.-এর পেছনে সারা রাত নামাযে রত ছিলাম। তিনি নামায শেষে সালাম ফেরানোর পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আজ এতো দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়েছেন। ইতঃপূর্বে কোনোদিন আমি আপনাকে এতো লম্বা সময় ধরে নামায পড়তে দেখিনি। উত্তরে নবীজী বললেন, হ্যাঁ, এটি ছিলো আশা ও আকাঙ্ক্ষার নামায। নামায শেষ করে আমি আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ের আবেদন করেছিলাম। বর্ণনাকারী অতঃপর পূর্ণ হাদীস উপস্থাপন করেন।

শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ আমার জন্যে পূর্ব-পশ্চিমকে তথা গোটা মহাবিশ্বকে নিকটবর্তী করে দিয়েছেন। আমার উম্মত এগুলোর মালিক হবে। আমাকে দু'টি ধনভাণ্ডার দেয়া হয়েছে। যার একটি সাদা ও অপরটি লাল। (স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাণ্ডার)। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম, এর পাশাপাশি আমার উম্মত যেন সর্বব্যাপক দুর্ভিক্ষের শিকার না হয় এবং কোনো শত্রু যেন তাদের ওপর এমনভাবে বিজয়ী না হয় যে, তাদের গণহারে হত্যা করবে, ধ্বংস করবে। তৃতীয় আর তাদের মধ্যে যেন জোটবদ্ধ না হয়ে যায় যে, পরস্পরে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুহাম্মদ! আমি যেই ভাগ্য চূড়ান্ত করে দিয়েছি তা অবশ্যই হবে। আমি তোমার প্রথম দু'টি চাওয়া মঞ্জুর করলাম। কিন্তু তোমার উম্মত একে অপরের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। হত্যা করবে ও বন্দী করবে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'আমার যদি নিজের উম্মতের ওপর ভয় হয়, তাহলে সেটা হবে পথভ্রষ্ট ইমাম ও নেতৃবর্গকে। আমার উম্মতের মধ্যে একবার যদি তরবারি ওঠে তাহলে তা আর কখনই নামবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানি চলতে থাকবে।

নাফে' ইবনে খালেদ খুযা'য়ী রহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সা.-এর একজন সম্মানিত সাহাবী, বৃক্ষতলে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিযওয়ানে তিনি অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেছিলেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সা. নামায আদায় করলেন। ওই সময় লোকেরা তাঁকে ঘিরে রেখেছিলো। তিনি তখন হালকাভাবে নামায আদায় করলেন; যদিও রুকু' সিজদাগুলো পূর্ণভাবেই আদায় করেছিলেন; কিন্তু তাঁর নামাযের বৈঠকটি ছিলো খুবই দীর্ঘ। এমনকি আমরা পরস্পরে ইঙ্গিতে বলাবলি করছিলাম যে,

সম্ভবত তাঁর ওপর ওয়াহি অবতীর্ণ হচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ সা. নাকচ করে দিয়ে বললেন, না। আজ আমি ভয় ও আশার নামায আদায় করেছি। অতঃপর তিনি ওই তিনটি দোয়ার কথা বললেন, যা পূর্ববর্তী হাদীসগুলোতে অতিবাহিত হয়েছে। তখন আমি বললাম, এ হাদীসটি কি আপনার পিতা রাসূল সা. থেকে শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূল সা.-এর মুখ থেকেই শুনেছেন। হাতের এই দশ আঙ্গুলের সমান অর্থাৎ দশবার শুনেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এ দোয়া করেছি, তিনি যেন আমার উম্মতকে চারটি জিনিস থেকে দূরে রাখেন। সেমতে আল্লাহ তন্মধ্য হতে দু'টি জিনিস থেকে তাদের হিফাযত করেছেন। বাকি দু'টি থেকে করেননি। আমি দোয়া করেছিলাম, আমার উম্মতের ওপর যেন আকাশ থেকে পাথরবৃষ্টি না হয় এবং তারা যেন ফেরাউনদের মতো ডুবে না মরে। তারা যেন দলে দলে বিভক্ত না হয় এবং তারা যেন একে অপরের বিরুদ্ধে আত্মকলহে লিপ্ত না হয়। মহান আল্লাহ পাথরবৃষ্টি না হওয়া ও ডুবে না মরার দোয়া কবুল করেছেন; তবে দলে দলে বিভক্ত না হওয়া ও পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না হওয়ার দোয়া কবুল করেননি।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়– قُلْ هُوَ الْقَادِرُ তখন নবী কারীম সা. উঠে ওযূ করেন এবং এ দোয়া চাইতে থাকেন– হে আল্লাহ! আমার উম্মতের ওপর যেন ওপর ও নিচ থেকে আযাব অবতীর্ণ না হয়। তাদের মধ্যে যেন দলাদলি সৃষ্টি না হয়। তারা যেন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। তখন জিবরাঈল আ. এসে নিবেদন করলেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তাআলা আপনার উম্মতকে আসমান থেকে আযাব নেমে আসা ও জমিন ভেদ করে আযাব বের হওয়া থেকে নিরাপদ ঘোষণা করেছেন। আসমানি আযাব দ্বারা উদ্দেশ্য পাথরবৃষ্টি। আর পায়ের নিচ থেকে উদ্গত আযাব দ্বারা উদ্দেশ্য, জমিনে ধসে যাওয়া। এখানে যে চারটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে তন্মধ্য হতে দু'টি প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি এবং তাদের দু'দলের মাঝে আত্মকলহ। আর আকাশ থেকে পাথরবৃষ্টি ও জমিনে ধসে যাওয়ার আযাব থেকে উম্মতে মুহাম্মাদিকে সবসময় নিরাপদ রাখা হয়েছে।

এ আয়াত প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. মসজিদে অথবা মিম্বারে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতেন, হে লোকসকল! তোমাদের ওপর আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যদি আকাশ থেকে আযাব নেমে আসে তবে কারও রক্ষা নেই। যদি পায়ের নিচ থেকে আযাব উদ্গত হয় তাহলে তোমাদেরকে জমিনে ধসিয়ে ধ্বংস করা হবে। আর যদি তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে একে

অপরের বিরুদ্ধে হানাহানি করো তাহলে সেটা হবে সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলতেন, এ আয়াতে عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ দ্বারা দুষ্ট নেতাদের বোঝানো হয়েছে। আর تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ দ্বারা বোঝানো হয়েছে দুষ্ট খাদেম ও নিকৃষ্ট অনুসারীদেরকে। অথবা এর দ্বারা আমির ও গরিবদেরকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর রহ. বলেন, অপর আয়াতে এ অভিমতের শুদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেখানে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ .... فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ○—'তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে। না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের ওপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিলো আমার সতর্কবাণী।'[১৭]

যায়েদ ইবনে আসলাম রহ. বলেন, যখন আয়াত অবতীর্ণ হয় هُوَ الْقَادِرُ তখন নবী কারীম সা. বলেন, 'আমার পরে তোমরা এমনভাবে কাফের হয়ে যেয়ো না যে, তরবারি দিয়ে একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দেবে। তখন উপস্থিত লোকেরা বললো, আমরা তো সাক্ষী দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। (এরপরও কি আমরা এমন কাজ করবো?) রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, হ্যাঁ। তখন উপস্থিত একজন বললো, আমরা যদি সঠিক অর্থে মুসলমান হই তাহলে কখনই এটা সম্ভব নয় যে, আমরা একে অপরের রক্তপাতে মেতে উঠবো!' সে প্রেক্ষাপটে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়– وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ—'হে নবী! আপনার সম্প্রদায় একে অস্বীকার করছে; অথচ এটি প্রমাণিত সত্য। আপনি বলে দিন– আমি তোমাদের উকিল হয়ে আসেনি। প্রতিটি সংবাদ প্রকাশের একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। অতি শিগ্‌গির তোমরা বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হবে।

## সূরা আন'আমের ৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَ یَوْمَ یَقُوْلُ كُنْ فَیَكُوْنُ ؕ
قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَ لَهُ الْمُلْكُ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ؕ وَ
هُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ○

তিনিই, আসমানসমূহ ও জমিন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি বলেন, 'হও' তখনই হয়ে যায়। তাঁর কথাই যথার্থ। আর যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে সেদিনের কর্তৃত্ব তো তাঁরই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বিষয়ে সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়,

---

১৭. সূরা মুলক : ১৬-১৭।

অধিক অবহিত।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ আসমান ও জমিনকে ভারসাম্য রক্ষা করে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এগুলোর অধিপতি ও নিয়ন্ত্রক। কিয়ামতের দিন তিনি শুধু كُن বা হও বলবেন। আর তখনই চোখের পলকে সবকিছু দ্বিতীয়বার অস্তিত্ব লাভ করবে। একথা আরো কিছু আয়াতে ইরশাদ হয়েছে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ—'আজ রাজত্ব কার? আজ রাজত্ব প্রবল পরাক্রমশালী একক আল্লাহরই।' অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا.—'সেদিন পরম দাতা ও দয়ালুর রাজত্ব হবে। ওই দিনটি কাফেরদের জন্যে হবে অত্যন্ত কঠিন দিন।'

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, হযরত ইসরাফীল আ. শিঙ্গা মুখে মাথানত করে অপেক্ষা করছেন, কখন শিঙ্গায় ফুৎকারের নির্দেশ চলে আসে। হাদীসে এসেছে, নবী কারীম সা. সাহাবীদের নিয়ে বসেছিলেন। ইত্যবসরে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করার পর صُور বা শিঙ্গা সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি তা হযরত ঈসরাফীল আ.-কে প্রদান করেন। তিনি তা মুখে লাগিয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি আরশের দিকে তাকিয়ে আছেন এ অপেক্ষায় যে, কখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার হুকুম চলে আসে। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! صُور কী জিনিস? উত্তরে তিনি বললেন, তা হচ্ছে শিঙ্গা। জিজ্ঞেস করলাম, সেটা দেখতে কেমন? বললেন, আকারে অনেক বড়। ওই আল্লাহর কসম– যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন! তার বিস্তৃতি হচ্ছে আকাশ ও জমিনের সমান। তাতে তিনবার ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারটি হবে ভয় ও সন্ত্রাস সৃষ্টির ফুৎকার। দ্বিতীয় ফুৎকার সবাইকে বেহুঁশ করে ফেলবে। তৃতীয় ফুৎকারের সময় সবাই আল্লাহর সামনে এসে হাজির হবে। আল্লাহ যখন প্রথম ফুৎকারের নির্দেশ দেবেন তখন পৃথিবীর সকল মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ যাকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবেন তার অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। দ্বিতীয় ফুৎকারের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত প্রথম ফুৎকার চলতেই থাকবে। থামবে না। যেমনটি আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,وَمَا يَنْظُرُ هٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ—'কেবল একটি ভীষণ ধ্বনির অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলারও অবকাশ থাকবে না।'[১৮]

শিঙ্গার ফুৎকারটি হবে ভীষণ ও উচ্চ শব্দ। যার ফলে পাহাড় মেঘের ন্যায় উড়তে থাকবে। জমিন হেলতে দুলতে থাকবে। যেভাবে সমুদ্রে বিপর্যস্ত নৌকাকে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা চারদিক থেকে আঘাত করতে থাকে এবং যেভাবে প্রবল বাতাস ছাদে ঝোলানো লণ্ঠনকে এদিক-ওদিকে দোলাতে থাকে। অন্য

---

১৮. সূরা সোয়াদ : ১৫।

আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ—'যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী; সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহ্বল হবে।'[১৯]

লোকেরা মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। মায়েরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কথা ভুলে যাবে। গর্ভবতী মহিলাদের বাচ্চা প্রসব হয়ে যাবে। আতঙ্কের তীব্রতায় ছেলেরা মুহূর্তেই বৃদ্ধে পরিণত হয়ে যাবে।

প্রাণ বাঁচাতে শয়তানগুলো পৃথিবীর নানা প্রান্তে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ফেরেশতাগণ তাদেরকে প্রহার করতে করতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। একে অপরকে ডাকতে থাকবে; কিন্তু আল্লাহ ছাড়া সেদিন কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না। মানুষ যখন প্রচণ্ড আতঙ্কে সন্ত্রস্ত; এমন সময় ভূপৃষ্ঠের চারপাশের কোণা ফাটতে থাকবে। তখন এমন ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে যে, ইতঃপূর্বে কখনও তা দেখা যায়নি। চতুর্দিকে অভাবনীয় ব্যাকুলতা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। ওই সময়ের কথা আল্লাহই ভালো জানেন।

সবাই তখন আকাশের দিকে তাকাবে। তারা দেখতে পাবে, আকাশের টুকরোগুলো শূন্যে উড়ছে। তারকাগুলো খসে পড়ছে। চাঁদ-সূর্য কালো রূপ ধারণ করেছে। রাসূল সা. বলেন, মৃত লোকেরা কিছুই জানতে পারবে না।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আল্লাহ তাআলা যখন বলবেন,

فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

অতঃপর আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে।[২০]

এ আয়াতে আল্লাহ কাদের ভীত-বিহ্বল না হওয়ার কথা বলেছেন? রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তারা হলেন শহীদ। আত্মন্ধ ও ভয়ভীতি তো জীবিত লোকদের হয়ে থাকে। আর শহীদেরা যদিও জীবিত; কিন্তু তারা অবস্থান করবে আল্লাহর নিকট। আল্লাহই তাদের আহারের ব্যবস্থা করেন। সেদিন ভয়-আতঙ্ক থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন। কেননা এটি হচ্ছে আল্লাহর আযাব। যা অবতীর্ণ হয় অসৎ লোকদের ওপর। এ কথাই অন্য আয়াতে আল্লাহ এভাবে ইরশাদ করেছেন, تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ-এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, সেদিন প্রত্যেক দুগ্ধবতী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। গর্ভবতী মহিলাদের প্রত্যেকেরই গর্ভপাত হয়ে যাবে। আল্লাহ যতোদিন চাইবেন ততোদিন তারা এ আযাবে লিপ্ত থাকবে। এ অবস্থা হবে বেশ দীর্ঘ।

---

১৯. সূরা নাযিয়াত : ৬-৮।

২০. সূরা নামল : ৮৭।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইসরাফীল আ.-কে অজ্ঞানকারী ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ করবেন। ফলে সমস্ত আকাশবাসী ও জমিনবাসী অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ যাকে চাইবেন সে স্বাভাবিক থাকবে। মৃত্যুর ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার কাছে এসে বলবে, হে আল্লাহ! সবাই মারা গেছে। আল্লাহ যদিও জানেন; তারপরও জিজ্ঞেস করবেন, কে অবশিষ্ট আছে? উত্তরে ফেরেশতা বলবে, আপনি আছেন। আপনার তো কখনই মৃত্যু হবে না। আর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও জীবিত আছে। জিবরাঈল, মিকাঈল আর আমি অবশিষ্ট আছি।

আল্লাহ বলবেন, জিবরাঈল ও মীকাঈলের তো মৃত্যু হওয়া উচিত। তখন আরশ বলে ওঠবে– হে আমার রব! জিবরাঈল ও মীকাঈল মৃত্যুবরণ করবেন? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলবেন, 'কথা বলো না। আরশের নিচে যা আছে তাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যুবরণ করতে হবে'। মৃত্যুর ফেরেশতা পুনরায় নিবেদন করবে– 'হে আল্লাহ! জিবরাঈল ও মীকাঈল মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করবেন, 'এখন আর কে বাকি আছে? তিনি উত্তরে বলবেন, বাকি আছেন আপনি, আপনার তো মৃত্যু নেই। আর আমি ও আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ। তখন আল্লাহ বলবেন, 'আরশ বহনকারীদেরও তো মৃত্যুবরণ করতে হবে'। তারাও মৃত্যুবরণ করবেন। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, 'আর কে বাকি আছে?' আযরাঈল আ. বলবেন, 'আপনার তো মৃত্যু নেই, আর আমি।' আল্লাহ তাআলা তখন ইসরাফিলের নিকট থেকে শিঙ্গা নেওয়ার জন্যে আরশকে হুকুম করবেন এবং ইরসাফিল আ.-কে বলবেন, 'তুমিও আমার মাখলুক। সুতরাং তুমিও মৃত্যুবরণ করো।' তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবেন। ওই সময় অবশিষ্ট থাকবেন এক আল্লাহ। যিনি অমুখাপেক্ষী। যার কোনো সন্ত ান নেই এবং যিনি কারও সন্তান নন। এরপর আসমান ও জমিন ভাজ করে ফেলা হবে। যেভাবে রেজিস্ট্রি খাতা ভাঁজ করা হয়। তিন-তিনবার খোলা হবে ও ভাঁজ করা হবে। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, আমি জাব্বার (সর্বশক্তিমান ও বিজয়ী)। আমি জাব্বার। আমি জাব্বার। এরপর তিনবার উচ্চস্বরে বলবেন, 'আজকের দিনে রাজত্ব কার? কেউ উত্তর দেবে না। কারণ, উত্তর দেওয়ার মতো কেউ নেই। তিনি নিজেই উত্তরে বলবেন, 'আজকের দিনে আল্লাহরই রাজত্ব। যিনি একক, প্রবল ও পরাক্রান্ত।'

অতঃপর আল্লাহ দ্বিতীয় জমিন ও আসমান সৃষ্টি করবেন। এদু'টোকে ছড়িয়ে দেবেন ও দীর্ঘ করবেন। এ দু'টোর মাঝে তখন কোনো বক্রতা বা ত্রুটি থাকবে না। তারপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মাখলুকের প্রতি এক ভীষণ শব্দ হবে। তখন নতুনভাবে সৃষ্ট জমিনে সবাই পূর্বের অবস্থার মতো হয়ে যাবে। যারা জমিনে ছিলো তারা জমিনেই থাকবে। যারা বাইরে ছিলো তারা বাইরে

থাকবে। অতঃপর আরশের নিচ থেকে আল্লাহ্ পানি বর্ষণ করবেন। আকাশকে তিনি পানি বর্ষণের নির্দেশ দেবেন। চল্লিশদিন পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। এমনকি তাদের ওপর পানির উচ্চতা বারো গজ উঁচু হবে। তারপর তিনি দেহগুলোকে নির্দেশ দেবেন, তখন ওগুলো জমিন থেকে এমনভাবে বিকশিত হতে থাকবে যেভাবে চারাগাছ ও শাক-সবজি অঙ্কুরিত হয়। যখন দেহগুলো পূর্বের মতো পরিপূর্ণ হয়ে ওঠবে তখন সর্বপ্রথম আরশের ফেরেশতাদের জীবিত করা হবে। আল্লাহ্ তাআলা ইসরাফীল আ.-কে শিঙ্গা নিয়ে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ করবেন। তিনি তা নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ্ জিবরাঈল ও মীকাঈল আ.-কে জীবিত করবেন। এরপর অপরাপর আত্মাগুলোকে ডাক দেওয়া হবে। মুসলমানদের আত্মাগুলো নূরের মতো চমকাতে থাকবে। আর কাফেরদের আত্মাগুলো অন্ধাকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। ওই সবগুলো আত্মাকে নিয়ে শিঙ্গার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

তখন আল্লাহ্ হযরত ইসরাফীল আ.-কে নির্দেশ করবেন, পুনরুত্থানের জন্যে শিঙ্গায় ফুৎকার দাও। অতঃপর পুনরুত্থানের জন্যে শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তখন আত্মাগুলো এমন তীব্রবেগে ছোটাছুটি করে বেরিয়ে আসবে যেভাবে মৌমাছিরা আসমান ও জমিনকে ছেয়ে ফেলে। এরপর আল্লাহ্ আত্মাগুল্লাকে দেহের ভেতর প্রবেশ করার নির্দেশ দেবেন। তখন দুনিয়ার সমস্ত রূহ বা আত্মা নিজ নিজ দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করবে। নাকের ছিদ্রপথ দিয়েও রূহ দেহের মধ্যে প্রবেশ করবে। সাঁপে কাটা ব্যক্তির শরীরে যেভাবে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর জমিন ক্রমাগত ফাটতে শুরু করবে এবং মানুষ উঠে উঠে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হতে থাকবে। রাসূল সা. বলেন, 'সর্বপ্রথম আমার কবর খোলা হবে। সবাই আল্লাহর দিকে হাঁটতে শুরু করবে। কাফেররা বলবে, 'এদিনটিকে বড় কঠিন দিন মনে হচ্ছে'। সবাই তখন উলঙ্গ ও খাৎনাবিহীন থাকবে। তারা একই স্থানে সমবেত হবে। এভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় সত্তর বছর কেটে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা তখন না কারো দিকে তাকাবেন, না কোনো ফয়সালাও করবেন। লোকেরা শব্দ করে কাঁদতে থাকবে। এক পর্যায়ে তাদের অশ্রু শেষ হয়ে আসবে। তখন তাদের চক্ষু থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। শরীরের ঘামে তারা সবাই ভিজে যাবে। এতো প্রচুর পরিমাণে ঘাম নির্গত হবে যে, সেই ঘামের পানিতে তাদের থুতনি পর্যন্ত ডুবে থাকবে। সবাই তখন পরস্পরে বলাবলি করবে যে, কাউকে সুপারিশের জন্যে আল্লাহর কাছে পাঠানো হোক। যেন আল্লাহ্ মীমাংসা করে দেন। এক পর্যায়ে তারা পরস্পরে বলাবলি করবে, পিতা আদম আ. ছাড়া কে এমন আছেন– যিনি আল্লাহর সামনে কথা বলার সাহস রাখেন। আল্লাহ্ তাঁকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন ও তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকেছেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে কথা

বলেছেন। পরামর্শ মুতাবেক সবাই আদম আ.-এর কাছে আসবে এবং তাঁর সামনে নিজেদের আগমনের হেতু পেশ করবে। তিনি তখন তাদের সুপারিশ মঞ্জুর করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন। বলবেন, 'আমি এর যোগ্য নই।'

অতঃপর তারা পৃথকাকারে একেকজন নবীর কাছে যাবে। যার কাছেই যাবে তিনিই অস্বীকার করবেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি তখন যাবো এবং 'ফাহাস'-এর ওপর সেজদায় পড়ে যাবো। আবু হুরায়রা রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ফাহাস কী? উত্তরে নবীজী বলেন, ফাহাস হচ্ছে আরশের সামনের অংশ। তখন আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠাবেন। সে আমাকে আমার বাহু ধরে ওঠাবে। তখন আল্লাহ আমাকে সম্বোধন করে বলবেন, তুমি কী বলতে চাও? আমি নিবেদন করবো, হে আমার রব! আপনি অঙ্গীকার করেছেন, আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেবেন। সেই অধিকার আমাকে দিন এবং লোকসকলের ফয়সালা করুন। আল্লাহ তখন সায় দিয়ে বলবেন, ঠিক আছে। আপনি সুপারিশ করুন। আমি লোকসকলের মধ্যে ফয়সালা করবো।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমি তখন ফিরে এসে লোকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাবো। আমরা সবাই দাঁড়াতেই হঠাৎ আকাশ থেকে এক ভীষণ শব্দ হবে। আমরা তখন ঘাবড়ে যাবো। পৃথিবীতে যে পরিমাণ মানুষ ও জ্বিন আছে তার দ্বিগুণ সংখ্যক ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। তারা জমিনের নিকটবর্তী হবেন। তাদের নূরের উজ্জ্বলতায় গোটা জমিন আলোকিত হয়ে ওঠবে। তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, 'আপনাদের মাঝে কি মহান আল্লাহ আছেন?' তারা উত্তরে বলবেন, না; তবে তিনি এইতো চলে আসবেন।

দ্বিতীয়বার আসমান থেকে আরেকদল ফেরেশতা অবতরণ করবেন। তাদের সংখ্যা হবে পূর্বের ফেরেশতাদের সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ। জ্বিন ও মানব থেকেও তারা সংখ্যায় দ্বিগুণ হবে। তাঁদের আলোয় জমিন অত্যাধিক আলোকিত হয়ে ওঠবে। তারা দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, আল্লাহ কি আপনাদের মধ্যে রয়েছেন? তারা বলবে, না; তবে তিনি শিঘ্রই এসে পড়বেন। অতঃপর তৃতীয়বার এরচেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক ফেরেশতা অবতরণ করবেন। তখন মহাপ্রতাপশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ মেঘের রাজকীয় ছত্র লাগিয়ে আটজন ফেরেশতা দ্বারা নিজ আরশে আরোহণ করে আগমন করবেন। অথচ এখন তাঁর আরশ চারজন ফেরেশতা বহন করে আছেন। তাদের পা জমিনের সর্বশেষ স্তরের তলায় রয়েছে। আসমান ও জমিন হচ্ছে তাদের দেহের অর্ধাংশের জায়গায়। আল্লাহ তাআলার আরশ তাদের কাঁধের ওপর রয়েছে। তাদের মুখে সবসময় আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ উচ্চারিত হতে থাকবে। তারা বলতে

থাকবেন—

سُبْحَانَ ذِي الْعَرْشِ وَالْجَبَرُوْتِ، سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ يُمِيْتُ الْخَلاَئِقَ وَلاَ يَمُوْتُ، سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ قُدُّوْسٌ قُدُّوْسٌ، سُبْحَانَ رَبِّنَا الْأَعْلٰى، رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ، سُبْحَانَ رَبِّنَا الْأَعْلٰى، الَّذِيْ يُمِيْتُ الْخَلاَئِقَ وَلاَ يَمُوْتُ.

অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিজ কুরসির ওপর উপবেশন করবেন। ঘোষণা আসবে– হে জ্বিন ও মানবসম্প্রদায়! তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পর থেকে অদ্যাবধি আমি নীরব ছিলাম। তোমাদের কথা শুনে এসেছি। তোমাদের কাজকর্ম দেখে এসেছি। এখন তোমরা নীরব থাকো। তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ আমলের প্রতিবেদন পাঠ করে শোনানো হবে। যদি তা ভালো প্রমাণিত হয় তবে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর যদি মন্দ হয় তবে নিজে নিজেকেই তিরস্কার করবে।' অতঃপর আল্লাহ জাহান্নামকে নির্দেশ করবেন। তখন সেখান থেকে একটি ঘোর কালো বর্ণের আকৃতি দেখা যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে বলিনি, তোমরা শয়তানের উপাসনা কর। কারণ, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শুধু আমারই ইবাদত করবে। কারণ এটাই সরল পথ। এই শয়তান তোমাদের অনেককেই পথচ্যুত করেছে। তোমাদের কি বুদ্ধি ছিলো না? এটা সেই জাহান্নাম– যার অঙ্গীকার তোমাদের দেয়া হয়েছিলো এবং যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে। সুতরাং হে পাপীর দল! তোমরা এখন নেককারদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।[২১]

এ কথা বলে আল্লাহ উম্মতসমূহকে পৃথক করে দেবেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'হে নবী! আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতের কাছে আমলনামা থাকবে এবং আজ নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। এরপর আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিজীবের ফয়সালার কাজ শুরু করে দিবেন। জ্বিন ও মানবসম্প্রদায়ের ফয়সালা পরে হবে। এর আগে আল্লাহ হিংস্র ও চতুষ্পদ জন্তুর বিচারকাজ শুরু করবেন। এমনকি দুনিয়াতে অত্যাচারকারী শিংবিশিষ্ট ছাগলের অত্যাচারের প্রতিশোধও অন্য ছাগলের মাধ্যমে গ্রহণ করাবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি জন্তুগুলোকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা মাটি হয়ে যাও। এদেখে কাফেররা বলবে, 'হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। তাহলে এ শাস্তি থেকে বাঁচতে পারতাম।' অতঃপর বান্দাদের বিচারকাজ শুরু হবে। সর্বপ্রথম হত্যা ও খুনের

---

২১. সূরা ইয়াসীন : ৬০-৬৪।

মামলাগুলো উত্থিত হবে। সর্বপ্রথম ওই সকল নিহত ব্যক্তিবর্গ আসবে যাদেরকে আল্লাহর পথে হত্যা করা হয়েছিলো। আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীকে নির্দেশ করবেন। সে তখন নিহত ব্যক্তির মাথা ওঠাবে। ওই মাথা তখন বলবে, হে আল্লাহ! একে জিজ্ঞেস করুন, কেনো সে আমাকে হত্যা করেছিলো? তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন (যদিও আল্লাহ নিজেই তার কারণ জানেন) কেনো তাকে হত্যা করেছিলে? ওই গাজি তখন বলবে, হে আল্লাহ! আপনার মর্যাদা ও আপনার নামের খাতিরে হত্যা করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি সত্য বলেছো।' সে সময় তার মুখমণ্ডল সূর্যলোকের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকবে। ফেরেশতাগণ তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবেন।

অনুরূপ অপরাপর নিহতগণও নিজ নিজ নাড়িভুঁড়ি মাথায় করে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন, কেনো হত্যা করা হয়েছিলো? তারা উত্তরে বলতে বাধ্য হবে, নিজের নাম ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন– ধ্বংস হয়ে যাও। মোটকথা, প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির মোকাদ্দমা পেশ করা হবে এবং বিচার হবে। প্রতিটি অত্যাচারের প্রতিশোধ অত্যাচারী থেকে নেওয়া হবে। যে অত্যাচারীকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন শাস্তি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা রহমত বর্ষণ করবেন। তারপর সমস্ত মাখলুকের বিচারকাজ শুরু হবে। পৃথিবীতে যে যতো ভাবে অত্যাচার করেছে, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। এমনকি যে ব্যক্তি দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করতো আর বলতো, দুধ খাঁটি, তাকেও শাস্তি দেওয়া হবে। আর ক্রেতাকে তার পুণ্য দেওয়া হবে।

এ জাতীয় কাজগুলো যখন সম্পন্ন হবে তখন এক ঘোষক এসে ঘোষণা করবে। যার ঘোষণা সমস্ত মাখলুক শুনতে পাবে। সে বলবে– 'প্রতিটি দলের উচিত যেন নিজ নিজ মাবুদের কাছে চলে যায় এবং তার আঁচল আঁকড়ে ধরে।' তখন এমন কোনো মূর্তিপূজারী থাকবে না, যার সামনে তার মূর্তি লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে না থাকবে। ওইদিন একজন ফেরেশতা হযরত উযায়ের আ.-এর রূপ ধরে আসবেন। আরেকজন ফেরেশতা আসবেন হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আ.-এর রূপ ধরে। তখন ইহুদিরা হযরত উযায়ের আ.-এর পেছনে চলে আসবে। আর খ্রিস্টানরা চলে আসবে হযরত ঈসা আ.-এর পেছনে। তখন তাদের এই কল্পিত মাবুদ তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। তখন তারা স্বগতোক্তি করে বলবে, 'যদি ওরা আমাদের প্রকৃত মাবুদ হতো তাহলে আমাদেরকে কখনই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতো না।' তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। এখন শুধু মুমিনরাই বাকি থাকবে। তাদের মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছামত পরিবর্তিত আকৃতিতে তাদের কাছে এসে বলবেন, 'হে লোকসকল! সবাই নিজ নিজ মাবুদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

তোমরা পৃথিবীতে যাদের ইবাদত করতে এখন তাদের সঙ্গে মিলিত হও।' তখন মুনাফিক-মুমিন এককণ্ঠে বলবে, আল্লাহর শপথ! আল্লাহই আমাদের মাবুদ ছিলেন। আমরা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে মেনে নেইনি। এরপর আল্লাহ তাদের পাশ থেকে সরে যাবেন। অতঃপর তিনি আসল সুরত ও জাঁকজমকের সঙ্গে তাদের সামনে উপস্থিত হবেন। এর আগে যতোক্ষণ ইচ্ছা তিনি তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন। তিনি তাদের সামনে এসে পুনরায় বলবেন, 'হে লোকসকল! সবাই নিজ নিজ মাবুদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তোমরা পৃথিবীতে যাদের ইবাদত করতে এখন তাদের সঙ্গে মিলিত হও।' তারা বলবে– আল্লাহর শপথ! তিনি ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই। আমরা শুধু তারই ইবাদত করেছি।' তখন আল্লাহ তাদের সামনে নিজ পায়ের গোছা খুলে দেবেন। যার বিশালত্ব দেখে তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, তিনিই তাদের মাবুদ। তখন সকল মুমিন সেজদায় পড়ে যাবে। এর বিপরীতে মুনাফিকরা পিঠের দিকে চিৎপটাং পড়ে যাবে। তারা কিছুতেই সেজদার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকতে পারবে না। তাদের পিঠ গাভীর পিঠের মতো সোজা থাকবে। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ করবেন, ওদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দাও। তখন তাদের সামনে পুলসিরাত এসে পড়বে। যা হবে তরবারির ধারের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম। মাঝে-মধ্যেই সেখানে আঁকড়া, কাঁটা থাকবে। পাশাপাশি সেটি হবে অত্যন্ত পিচ্ছিল ও বিপদজনক। এটির নিচে আরেকটি সেতু থাকবে। যা মূল পুলসিরাত থেকে অধিক পিচ্ছিল হবে। নেককার লোকেরা চোখের পলকে পুলসিরাত পাড়ি দেবে। তাদের পাড়ি দেওয়া এতো দ্রুততার সঙ্গে হবে যে, মনে হবে– বিদুৎ চমকালো বা প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হলো বা দ্রুতগামী ঘোড়া ছুটে গেলো। বা কোনো দৌড়বিদ ছুটে গেলো। কিছু লোক অক্ষত অবস্থায় পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে পরিত্রাণ পাবে। কিছু লোক আহত হবে। বহু লোক কর্তিত শরীরে জাহান্নামে পড়ে যাবে।

অতঃপর জান্নাতীদেরকে যখন জান্নাতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে তখন তারা বলবে, 'আমাদের জন্যে কে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে'? তারা আদম আ.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সুপারিশের আবেদন জানাবে। উত্তরে তিনি নিজের পাপের কথা উল্লেখ করে বলবেন, 'আমার এর যোগ্যতা নেই। তোমরা নূহ আ.-এর কাছে যাও। তাঁকে আল্লাহর প্রথম রাসূল বলা হয়।' লোকেরা তখন নূহ আ.-এর কাছে যাবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, 'আমার তো এ কাজের যোগ্যতা নেই। তোমরা ইবরাহীম আ.-এর কাছে যাও। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজ বন্ধু বলেছেন।' তারা তাঁর কাছে যাবে। তিনিও নিজের দোষের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা মূসা আ.-এর কাছে যাও। আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁর ওপর তাওরাত নাযিল

করেছেন।' তারা তখন মূসা আ.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সুপারিশের জন্যে আবেদন করবে। তিনি নিজের হত্যার অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, 'আমি এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা ঈসার কাছে যাও। তিনি আল্লাহর রূহ ও তাঁর কালেমা।' ঈসা আ. বলবেন, 'না, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা মুহাম্মাদ সা.-এর কাছে যাও।' রাসূলুল্লাহ সা. বলবেন, 'তখন লোকেরা আমার কাছে আসবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে শাফা'আতের অধিকার দিয়েছেন এবং এ মর্মে অঙ্গীকার করেছেন। আমি তখন জান্নাতের দিকে যাবো। জান্নাতের দরোজায় করাঘাত করবো। জান্নাতের দরোজা খুলে যাবে। আমাকে সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে। জান্নাতে প্রবেশ করে আমি আল্লাহ তাআলার দিকে দৃষ্টিপাত করবো এবং সেজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন তাহমীদ ও তামজীদ (প্রশংসা ও গুণগান)-এর অনুমতি দান করবেন; যা তিনি ইতঃপূর্বে কাউকে শেখান নি। তখন তিনি বলবেন, 'হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। সুপারিশ করো। তোমার সুপারিশ অবশ্যই গৃহীত হবে। তোমার আবেদন মঞ্জুর হবে।' আমি তখন মাথা তুলবো। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, 'কী বলতে চাও'? আমি বলবো, 'হে আমার রব! আপনি আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দিয়েছেন। জান্নাতীদের ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। তারা যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। তখন তিনি বলবেন, 'ঠিক আছে। অনুমতি দেয়া হলো। এ লোকগুলো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।'

নবী কারীম সা. বলেন, 'আল্লাহর শপথ! পৃথিবীতে তোমরা তোমাদের বাসস্থান ও স্ত্রীদেরকে যেভাবে চিনতে তারচেয়েও তাড়াতাড়ি তোমরা তোমাদের জান্নাতের বাসস্থান ও স্ত্রীদের চিনতে পারবে। প্রত্যেক জান্নাতীকে বাহাত্তরজন স্ত্রী দেওয়া হবে। এর মধ্য হতে দু'জন হবে বনী আদম থেকে। বাকি সত্তরজন হবেন হূর। ওই সত্তরজনের ওপর এই দু'জনের প্রাধান্য ও সম্মান বেশি হবে। কেননা, এই সতী সাধ্বী মহিলারা পৃথিবীতে আল্লাহর অধিক ইবাদত করেছে।

জান্নাতী পুরুষ প্রথম যেই স্ত্রীর কাছে যাবে তাকে দেখতে পাবে যে, সে ইয়াকুত নির্মিত ঘরে মণিমুক্তার অলঙ্কার পরে সোনার সিংহাসনে বসে আছে। তার পরনে থাকবে মসৃণ সবুজ রেশমের তৈরি সত্তর জোড়া জান্নাতী পোশাক। সে যখন তার কাঁধের ওপর হাত রাখবে তখন তার বক্ষের ওপরে কাপড়, দেহ ও মাংস ইত্যাদি ভেদ করে বক্ষের অপর দিকে তার নিজ হাতের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাবে। জান্নাতী স্ত্রীর শরীর এতোটাই স্বচ্ছ হবে যে, তার পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাবে। মনে হবে, তোমরা ইয়াকুত পাথরের তৈরি ছুরি দেখছো। জান্নাতী পুরুষের মন হবে স্ত্রীর জন্যে আয়না। তদ্রূপ স্ত্রীর মন হবে পুরুষের জন্যে আয়না। তারা একে অন্যের কাছে এসে ক্লান্তি বোধ করবে না। জান্নাতী ব্যক্তি প্রতিবার তার স্ত্রীকে কুমারী পাবে। তারা একে

অপরের বিরুদ্ধে অক্ষমতার অভিযোগ করবে না। মিলনের গভীর সুখাচ্ছন্ন সেই মুহূর্তে অজ্ঞাত কণ্ঠ থেকে এ কথা ভেসে আসবে, 'আমি জানি, এখানে তুমি কারো প্রতি বিরক্ত হবে না। তোমার কারণেও কেউ বিরক্ত হবে না। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মন ভরবে না। কিন্তু তোমার তো আরো অনেক স্ত্রী রয়েছে'। তখন সে এই স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পালাক্রমে অন্য স্ত্রীর কাছে যাবে। যার কাছেই যাবে সেই বলবে, 'আল্লাহর শপথ! জান্নাতে আমার চেয়ে বেশী সুন্দর আর কেউ নেই। আমার কাছে তোমার চেয়ে অতিপ্রিয়ও কেউ নেই।'

এর বিপরীতে জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন আগুন কারও পা পর্যন্ত পৌঁছবে। কারও পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত, কারো জানু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত, কারও মুখমণ্ডল বাদ দিয়ে গোটা দেহে পৌঁছবে। কেননা মুখমণ্ডলের ওপর আগুনকে হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'আমি আল্লাহ তাআলাকে বলবো– হে আমার রব! আমার উম্মতের জাহান্নামীদের ব্যাপারে আমার শাফা'আত মঞ্জুর করুন।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'তুমি তোমার যে সকল উম্মতকে চেনো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নাও।' ফলে কোনো উম্মতই অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর সাধারণ শাফা'আতের অনুমতি দেওয়া হবে। তখন প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক শহীদ নিজ নিজ শাফা'আত পেশ করবেন। ওই সময় আল্লাহ বলবেন, 'যার অন্তরে এক স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নাও। তারপর বলবেন, 'এক স্বর্ণমুদ্রার দুই তৃতীয়াংশ ঈমান থাকলেও তাকে বের করো।' এরপর বলবেন, 'এক স্বর্ণমুদ্রার এক তৃতীয়াংশ ঈমান থাকলেও তাকে বের করো। এক চতুর্থাংশ থাকলেও তাকে বের করো। এক কীরাত বরাবর হলেও তাকে বের করো। এমনকি এক শস্যদানা সমপরিমাণ ঈমান থাকলেও তাকে বের করো।' তখন যারা আল্লাহর জন্যে জীবনে কোনো ধরনের কল্যাণকর কাজ করেছে তাকেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। তখন শাফা'আতের যোগ্য হওয়ার মতো একজনও জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ তাআলার এই ব্যাপক দয়া ও করুণা দেখে শয়তানের লোভ হবে, কেউ যদি আজ তার জন্যে সুপারিশ করতো!

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'শুধু আমার পালাই রয়ে গেছে। আমি হলাম সবচেয়ে বড় দয়ালু।' এ কথা বলে তিনি জাহান্নামের ভেতর নিজ হাত রাখবেন। সেখান থেকে এমন অসংখ্য জাহান্নামীকে বের করে আনবেন, যারা ইতোমধ্যে পুড়ে কয়লার মতো ঘোর কালো হয়ে গেছে। জান্নাতের মাঝে 'নাহরে হায়ওয়ান' নামে একটি নদী রয়েছে। তাদেরকে সেই নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা এমনভাবে নতুন জীবন লাভ করবে যেভাবে জলাশয়ের

ধারে উদ্ভিদ গজায়। এ ধরনের উদ্ভিদ রোদ পেলে সবুজ আকার ধারণ করে আর ছায়ায় থাকলে হলুদ হয়ে যায়। ওই সাবেক জাহান্নামীরা তখন সবুজ উদ্ভিদের মতো সুন্দর আকার ধারণ করবে। তাদের কপালে লেখা থাকবে الجَهَنَّمِيُّون عُتَقَاءُ الرَّحْمٰن। — আল্লাহর আযাদকৃত জাহান্নামী। তাদের কপালের এই চিহ্ন দেখে জান্নাতবাসীরা তাদেরকে চিনতে পারবে যে, তারা কিছু নেক কাজ করেছিলো। কপালের এই লেখা নিয়ে তারা কিছু কাল জান্নাতে বসবাস করবে। তারপর তারা আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন করবে, তাদের কপালের ওই লেখাটি যেন মুছে দেওয়া হয়। তখন তা মুছে দেয়া হবে।

## সূরা আন'আমের ৯৫-৯৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

নিশ্চয়ই আল্লাহ শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন। তিনিই মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। তিনিই আল্লাহ, সুতরাং তোমরা ফিরে যাবে? তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান। তিনি সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য। এসবই সর্বজ্ঞ মহাপরাক্রমশালীর নির্ধারণ। আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তারকারাজি, যাতে তোমরা এ দ্বারা পথপ্রাপ্ত হও স্থল ও জলের অন্ধকারে। নিশ্চয়ই আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন, তিনি জমিনের ভেতরে বপনকৃত দানা ওপরে এনে অঙ্কুরিত করেন এবং এ থেকে বিভিন্ন ধরনের সবজি ও বর্ধনশীল উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন। যার প্রতিটির রং, আকৃতি ও ডাঁটা ভিন্ন। فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوٰى-এর তাফসীরে এসেছে, আল্লাহ প্রাণহীন জিনিস থেকে প্রাণযুক্ত জিনিস অর্থাৎ উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন। আবার প্রাণযুক্ত জিনিস থেকে সৃষ্টি করেন প্রাণহীন জিনিস। যেমন, তিনি জীবন্ত উদ্ভিৎ থেকে সৃষ্টি করেন বীজ ও দানার মতো প্রাণহীন জিনিস। এ কথাই অন্য আয়াতে এভাবে বলেছেন, وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ—'তাদের জন্যে এটিও একটি নিদর্শন যে, আমি নির্জীব জমিন সঞ্জীবিত করেছি এবং তা থেকে শস্য

উৎপন্ন করেছি, ফলে তারা তা থেকে আহার করে থাকে।[২২]

কেউ বলেন এর দ্বারা প্রাণহীন ডিম থেকে জীবন্ত মুরগি সৃষ্টি করা বোঝানো হয়ে.ছে। কিংবা এর বিপরীত। কেউ বলেন এর দ্বারা পাপাচারীর ঔরষে সৎ সন্তানের জন্ম ও সৎ ব্যক্তির ঔরষে পাপাচারী সন্তানের জন্মলাভের কথা বোঝানো হয়েছে। কেননা সৎ ব্যক্তি জীবিত তুল্য ও পাপী ব্যক্তি মৃত তুল্য। এ ছাড়াও আরও বহু অর্থ হতে পারে।

বলা হয়, এ সকল সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একক কর্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। যাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে যাচ্ছো? সত্য থেকে কেনো মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? কেনো তোমরা গায়রুল্লাহর উপাসনা করছো? আলো ও অন্ধকারের তিনিই স্রষ্টা। সেমতে আল্লাহ পরস্পর বিপরীতমুখী জিনিসগুলো সৃষ্টি করে স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এজন্যেই তিনি বলেন, তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনকে চিরে বের করে থাকেন। বিশ্রামের জন্যে রাত সৃষ্টি করেছেন যেন সকল প্রাণী তাতে শান্তি ও আরাম লাভ করতে পারে। ইরশাদ করেছেন, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى অর্থাৎ শপথ দিনের আলোর ও রাতের– যখন তা প্রশান্ত হয়। অন্যত্র বলেছেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ○ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى অর্থাৎ শপথ রাতের– যখন তা আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং শপথ দিনের– যখন তা আলোকিত হয়ে ওঠে। অপর আয়াতে বলেছেন, وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ○ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا অর্থাৎ শপথ দিবসের– যখন তার আলো দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং শপথ রাতের– যখন তার অন্ধকার গোটা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

হযরত সুহাইব রূমী রা. অধিক রাত্রিজাগরণ করতেন। সেই অভিযোগ করে তাঁর স্ত্রী বলেন, আল্লাহ তাআলা সবার জন্যে রাত বানিয়েছেন আরাম ও বিশ্রাম করতে; তবে সুহাইব রা.-এর জন্যে নয়। কেননা, তাঁর যখন জান্নাতের কথা স্মরণ হয় তখন তিনি অতি আগ্রহী হয়ে সারা রাত জাগতেন এবং গভীর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন পূর্ণ রজনী। আবার যখন তাঁর জাহান্নামের কথা স্মরণ হয় তখন তাঁর চোখ থেকে ঘুম উড়ে যায়। ইবনে আবী হাতেম রহ. এটি বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ রীতিনীতি ও নিয়ম-শৃঙ্খলার ওপর চলমান রয়েছে। এদু'টির গতিবিধিতে সামান্যতম পরিবর্তনও হয় না, এদিক-ওদিক যায় না; প্রতিটির কক্ষপথ নির্ধারিত রয়েছে। গ্রীষ্মে ও শীতে ওগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে চলে। এই শৃঙ্খলিত নিয়মের কারণেই দিন ও রাতের সময় কমে ও বাড়ে। এ কথাই আল্লাহ অন্য আয়াতে এভাবে বলেছেন,

---

২২. সূরা ইয়াসীন : ৩৩।

'তিনিই সেই আল্লাহ যিনি সূর্যকে দীপ্তিময় বানিয়েছেন, চাঁদকে কোমল আলো দান করেছেন এবং হ্রাস-বৃদ্ধির মনযিল নির্ধারণ করেছেন।' অন্য আয়াতে বলেন, 'সূর্যের সাধ্য নেই চাঁদকে স্পর্শ করার। রাতের সাধ্য নেই দিনের পূর্বে আসার। প্রতিটিই একেকটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করছে।' তিনি অন্যত্র বলেন, 'সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি তাঁর আদেশ পালনে সদা নিয়োজিত। আল্লাহ আরও বলেন, 'এটি তাঁরই নির্ধারিত পরিমাণ, তিনি মহাপরাক্রান্ত ও জ্ঞানময়।' কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। কেউ তাঁর অগোচরে থাকতে সক্ষম নয়। চাই তা আসমান-জমিনের অণু পরিমাণ জিনিসই হোক না কেনো।

আল্লাহ তাআলা যেখানেই রাত-দিন ও সূর্য-চন্দ্র সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন সেখানেই তিনি বাক্য শেষ করেছেন– عزيز ও عليم শব্দ দ্বারা। এখানেও সেই রীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইরশাদ করেছেন, وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا الخ—'তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়। সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে এবং তার নিবাসের দিকে যায়। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহ্ তাআলার স্থায়ীত্বের মাপকাঠি।[২৩]

যখন মহান আল্লাহ সূরা হামীম আস সেজদার সূচনালগ্নে জমিন, আসমান ও এদু'টির মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন বলেন, 'আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করে রেখেছি এবং এই প্রদীপই পৃথিবীর নিরাপত্তায় কাজে আসে। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তাআলার ব্যবস্থাপনা।[২৪]

আলোচিত আয়াতসমূহের তৃতীয়টিতে আল্লাহ বলেন, 'আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তারকারাজি, যাতে তোমরা এ দ্বারা পথপ্রাপ্ত হও স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে।' এখানে আল্লাহ বলেছেন, এই তারকাগুলো প্রথমত আকাশের সৌন্দর্য, দ্বিতীয়ত এগুলো দ্বারা শয়তানদেরকে তাড়ানো হয়। তৃতীয়ত এগুলোর মাধ্যমে জল ও স্থলভাগের অন্ধকারে পথ চেনা যায়।' পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, তারকারাজি সৃষ্টির পেছনে উপরিউক্ত তিনটি উদ্দেশ্যই নিহিত। আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কেউ যদি মনে করে, এর বাইরে আরও উদ্দেশ্য রয়েছে তবে সে ভুল বুঝেছে এবং কুরআনের আয়াতের ওপর অতিরঞ্জন করেছে।

শেষাংশে আল্লাহ বলেন, আমি প্রমাণসমূহ পূর্ণ বিশদাকারে বর্ণনা করে দিয়েছি, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে এবং সত্য চিনে অসত্য বর্জন করে।

---

২৩. সূরা ইয়াসীন : ৩৭-৩৮।

২৪. সূরা হামীম আস সেজদা : ১২।

## সূরা আন'আমের ৯৮-৯৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ هُوَ الَّذِیْ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّفْقَهُوْنَ ○ وَ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَیْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَّ جَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ الزَّیْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّ غَیْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْۤا اِلٰی ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَ یَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكُمْ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ○

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তোমাদের জন্য রয়েছে আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। অবশ্যই অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আর তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমি এ দ্বারা উৎপন্ন করি সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। অনন্তর আমি তা থেকে বের করি সবুজ ডাল-পালা; আমি তা থেকে বের করি ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা। আর খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে (বের করি) ঝুলন্ত থোকা। আর (তা দ্বারা উৎপন্ন করি) আঙ্গুরের বাগান এবং সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন যয়তুন ও ডালিম। দেখো তার ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং তার পাকার প্রতি। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ বলেন, তিনি তোমাদেরকে অভিন্ন আত্মা তথা হযরত আদম আ. থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি তিনি সূরা নিসার সূচনায় বলেছেন, 'হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাঁদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।' অন্যত্র বলেছেন, 'অতঃপর তোমরা স্থিতি লাভ করো। এরপর তোমাদেরকে অন্যত্রে সোপর্দ করা হয়।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সহ প্রমূখ বলেন, مُسْتَقَرٌّ শব্দ দ্বারা মায়ের গর্ভ বোঝানো হয়েছে। আর مُسْتَوْدَعٌ শব্দ দ্বারা পিতার ঔরষ বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, مُسْتَقَرٌّ শব্দ দ্বারা দুনিয়ায় অবস্থানের কথা বোঝানো হয়েছে ও مُسْتَوْدَعٌ শব্দ দ্বারা আখেরাতকে বোঝানো হয়েছে। সাঈদ ইবনে জুবায়র রা. বলেন, এ দু'টো হচ্ছে দুনিয়ার মাতৃগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে অবস্থান ও মৃত্যুর পরের অবস্থান। হাসান বসরী রহ. বলেন, মৃত্যুর পর আমল বন্ধ হয়ে যাওয়াকে مُسْتَقَرٌّ বলে। আর আখেরাতের জগতকে مُسْتَوْدَعٌ

বলে। প্রথম আয়াতই সঠিকতম। আল্লাহ বলছেন, আমি বুঝমান লোকদের জন্যে সমস্ত কথা কতোইনা স্পষ্ট করে বর্ণনা করি।

মহান আল্লাহ বলেন, তিনিই সেই আল্লাহ যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। যা বরকতময়। যার সাহায্যে তিনি বান্দাদের জন্যে রিযিকের ব্যবস্থা করেন। মাখলুকের সাহায্য করেন। এই পানির দ্বারাই তিনি সব ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন। যেমনটি তিনি অন্যত্র বলেছেন, পানি দ্বারাই সমস্ত জিনিস জীবন লাভ করেন। এর মাধ্যমেই ভূমির শস্য ও সবুজ গাছ-গাছালি উৎপন্ন হয়। ওই গাছগুলোতে আবার দানা ও ফল হয়। আল্লাহ বলেন, গাছ-গাছালি থেকে আমি এমন দ্বানা বের করি যা একটি অপরটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। এগুলোকে 'গুচ্ছ' বলা হয়। খুরমা গাছে গুচ্ছযুক্ত শাখা থাকে। যা একটি অপরটির সঙ্গে গুটিশুটি হয়ে জড়িয়ে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো ছোট ছোট খুরমা গাছ– যেগুলোর গুচ্ছ মাটির সঙ্গে লেগে থাকে।

এরপর আল্লাহ বলেন, আমি জমিনে আঙ্গুরের বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছি। এখানে আল্লাহ শুধু খুরমা ও আঙ্গুরের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা হিজাযের অধিবাসীরা এদু'টো ফলকেই সর্বোত্তম মনে করে। শুধু তাই নয়; গোটা বিশ্বের কাছেও এদু'টি ফল সর্বোত্তম। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহের কথা আলোচনা করেছেন, এই খুরমা ও আঙ্গুর ফল দ্বারা তোমরা মদ তৈরি করে থাকো। নিজেদের জন্যে ভালো ভালো খাবার তৈরি করে থাকো। আল্লাহ আরও বলেন, 'জমিনে আমি খুরমা ও আঙ্গুরের বাগান বানিয়েছি।' তিনি বলেন, 'আমি জয়তুন ও আনারের বাগানও বানিয়েছি। যা পাতা ও আকৃতির দিক থেকে পরস্পরে সাদৃশ্যপূর্ণ; কিন্তু ফল, আকৃতি, স্বাদ ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।' আল্লাহ বলেন, 'যখন ফল পেকে যায় তখন সেই ফলের দিকে গভীরভাবে দেখো'। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কুদরত নিয়ে চিন্তা করো, তিনি কী ভাবে সেগুলোকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। অথচ ফল ধরার পূর্বে এ গাছগুলোও নিরেট জ্বালানী কাঠ ছিলো। অতঃপর এই কাঠ থেকে আল্লাহ খুরমা, আঙ্গুর ও বিভিন্ন ফল সৃষ্টি করেন। যেমনটি তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, ' জমিনে ঘন ঘন গাছপালা এবং আঙ্গুর ও ফসলের বাগানের মধ্যে যা গুচ্ছদারও হয় আবার গুচ্ছহীনও হয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। কিন্তু স্বাদে একটি অন্যটির চাইতে খুবই উৎকৃষ্ট।

এজন্যেই আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন, 'হে লোকসকল! এগুলো আল্লাহর ব্যাপক কুদরত ও প্রজ্ঞাময়তার প্রমাণ বহন করছে। যা ঈমানদার লোকেরাই বুঝতে পারে। তারা তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সত্যতা স্বীকার করে।'

## সূরা আন'আমের ১০০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَ بَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

তারা জিনকে আল্লাহর শরীক করে; অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশত মনগড়াভাবে নির্ধারণ করেছে তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র—মহিমান্বিত! এবং তারা যা বলে তিনি তা থেকে ঊর্ধ্বে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে মুশরিকদের কথার অপনোদন করেছেন। তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে অংশীদার করে এবং শয়তানের উপাসনা করতে শুরু করে। এখানে যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, তারা তো মূর্তিপূজা করতো। তাহলে শয়তানের উপাসনা অর্থ কি? উত্তর হলো, তারা মূর্তিদের পূজা করে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আনুগত্যের কারণে। যেমনটি আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন,

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا .... وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا.

তারা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে, অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে তাদেরকে পূজা করে। তারা তো শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে। শয়তান বলেছিলো— হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাদের এক বড় অংশকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবো; তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো; তাদের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করবো; তারা গবাদি পশুর কান কেটে দেবে; আমি তাদের এরূপ করতেই আদেশ করবো যেন তারা তোমার বানানো আকৃতিকে বিরূপ করে। যে আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পড়ে। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ আর কিছু নয়।[২৫]

আরও বলেছেন, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا—'অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তোমাদের উচিত ছিলো আমার আদেশকে শক্ত করে ধরা।[২৬]

হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর বাবাকে বলেছিলেন, 'হে আমার পিতা, তুমি

---

২৫. সূরা নিসা : ১১৭-১২০।

২৬. সূরা কাহাফ : ৫০।

শয়তানের ইবাদত করছো। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য।

অন্য আয়াতে এসেছে, 'হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে দেইনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।[২৭]

কুরআনের ভাষায় ফেরেশতাগণ কিয়ামতের দিন বলবেন, 'আপনি পবিত্র, আপনি আমাদের অভিভাবক, (তারা আমাদেরকে আল্লাহর মেয়ে বলে পূজা করে) তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই, বরং তারা তো আসলে শয়তানকে পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী।'[২৮]

এ কারণেই আল্লাহ আলোচিত আয়াতে বলেছেন, ওই মুশরিকরা শয়তানকে আল্লাহ তাআলার অংশীদার বানিয়ে দিয়েছে। অথচ শয়তানদেরকেও আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেছেন। তাহলে তারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাঁর মাখলুকের কী ভাবে পূজা করে। যেমনটি হযরত ইবরাহীম আ. বলেছিলেন, 'তোমরা স্বহস্ত নির্মিত পাথরের পূজা করতে শুরু করেছ। অথচ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।'[২৯] কাজেই তোমরা অন্য সবকিছুর উপাসনা ছেড়ে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করো। অতঃপর বলেন, 'তারা অজ্ঞতাবশত মনগড়াভাবে নির্ধারণ করেছে তার জন্য পুত্র ও কন্যা সন্তান।' এখানে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী সম্পর্কে পথভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। তারা কাউকে আল্লাহর পুত্র বানায়। যেমন, ইহুদিরা বলে– উযায়ের আল্লাহর পুত্র। অথচ তিনি একজন পয়গম্বর মাত্র। খ্রিস্টানরা ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলে। আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে। এ সকল জালেমরা যে সব কথা বলে বেড়াচ্ছে আল্লাহ তার থেকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। এর ব্যাখ্যা হলো, তারা তাঁদেরকে ইবাদতে শরীক করেছে। অথচ আল্লাহ এককভাবে তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন কারো কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা বা অংশিদারিত্ব ছাড়াই। তাহলে তারা বাস্তবতা না জেনে এ ধরনের অবান্তর কথা কেনো বলছে? তারা আসলে আল্লাহর বড়ত্ব সম্পর্কে অবহিত নয়। মহান আল্লাহর কোনো ধরনের পুত্র-কন্যা ও স্ত্রী থাকতে পারে না। এ কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, এ ধরনের অবান্তর, অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক কথা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

---

২৭. সূরা ইয়াসীন : ৬০-৬১।

২৮. সূরা সাবা : ৪১।

২৯. সূরা সোফ্ফাত : ৯৫-৯৬।

## সূরা আন'আমের ১০১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা। কী ভাবে তাঁর সন্তান হবে অথচ তাঁর কোনো সঙ্গিনী নেই! আর তিনি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।'

**ব্যাখ্যা :** তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। بديع–আবিষ্কারক। আসমান ও জমিনের কোনো অনুরূপ মডেল তাঁর সামনে ছিলো না। একারণেই বিদ'আতকে বিদ'আত বলা হয়। কারণ, অতীত যুগে তার অনুরূপ কোনো দৃষ্টান্ত হতো না। মানুষ কোনো কাজকে নিজের পক্ষ থেকে আবিষ্কার করে ছওয়াবের কাজ মনে করতে থাকে। যেখানে আল্লাহর স্ত্রী নেই, সেখানে কী করে তাঁর সন্তান হয়। সন্তান হওয়ার জন্যে একই শ্রেণির বিপরীত লিঙ্গের দুটি সত্তার মিলন অপরিহার্য্য। আল্লাহর শ্রেণি হওয়ার মতো কোনো সত্তা হতে পারে না। যেমনটি আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন, 'তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। এটি নির্জলা মিথ্যা কথা। তিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কী করে তাঁর মাখলুক তাঁর স্ত্রী হয়। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। কাজেই তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই, তাহলে আল্লাহর সন্তান তাঁর দৃষ্টান্ত কি করে হতে পারে। মহান আল্লাহর সত্তা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

## সূরা আন'আমের ১০২-১০৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ○ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো। আর তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। দৃষ্টি তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না; কিন্তু তিনি আয়ত্ব করেন সকল দৃষ্টি। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

**ব্যাখ্যা :** তিনি তোমাদের রব। যিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই একক উপাস্য। কাজেই তোমরা তাঁর ইবাদত করো। তাঁর একত্মবাদ স্বীকার করো। তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি ও মাতা-পিতা নেই। তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই। তিনি প্রতিটি বস্তুর হিফাযতকারী ও সংরক্ষণকারী। তিনিই সুষ্ঠু পরিচালক। তিনিই রিযিক দান করেন। রাত-দিন তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে

কোনো চর্মচক্ষু দেখতে পায় না। এর এক ব্যাখ্যা হলো, আমরা যদিও পরকালে আমাদের চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখতে পাবো; কিন্তু দুনিয়াতে তাঁকে দেখা কখনই সম্ভব নয়। এ কথা বিভিন্ন মুতাওয়াতির হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। যেমন এক হাদীসে হযরত আয়েশা রা. বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, নবী কারীম সা. আল্লাহকে দেখেছেন সে মিথ্যাবাদী। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এর বিপরীত কথা বর্ণিত রয়েছে। তিনি এখানে رؤيت-কে স্থান-কাল থেকে শর্তহীন রেখেছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন, নবী কারীম সা. তাঁর অন্তর্চক্ষু দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে দু'বার দেখেছেন।

ইবনে উয়াইনা রহ. বলেন, দুনিয়াতে চক্ষুগুলো তাঁকে দেখতে পাবে না। অন্যদের মতে এর ভাবার্থ হলো, চোখ ভরে কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না। কাজেই পরকালে মুমিনরা যে আল্লাহকে দেখবে, তা এর আওতায় পড়বে না। কেননা পরকালে তাদের আল্লাহকে দেখা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'সেদিন ঈমানদারদের চেহারা উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হবে। তারা নিজ রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।'[৩০]

এর বিপরীতে কাফেরদের সম্পর্কে বলেন, 'কখনও নয়। এরা সেদিন তাদের প্রতিপালক থেকে প্রতিরুদ্ধ থাকবে।'[৩১] অর্থাৎ তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে না। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মুমিনদের জন্যে আল্লাহ তাআলার দর্শনলাভের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে না। মুতাওয়াতির হাদীস থেকেও এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মুমিনরা পরকালে আল্লাহর দীদার লাভ করবে। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা এ সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। আল্লাহ আমাদেরকেও সেই তাওফীক দিন। আমীন!

এ আয়াতে খোদ 'দীদার'-কে নাকচ করা হয়নি। নাকচ করা হয়েছে 'ইদরাক' [পরিবেষ্টন]-কে। এ শব্দটির অনেকগুলো ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন, এর এক অর্থ হলো, আল্লাহর হাকীকত বা মৌলিকত্ব জানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তাঁর হাকীকত জানা সম্ভব নয়। কাজেই মুমিন যদিও আল্লাহর দিদার পাবে; কিন্তু তাঁর হাকীকত জানবে না। কেননা এটি তার জ্ঞানসীমার অনেক ঊর্ধ্বে। এর উদাহরণ হলো, আমরা সবাই আকাশে পরিষ্কার চাঁদ দেখি। কিন্তু ওই চাঁদের হাকীকত বা মৌলিকত্ব কী? তার সত্তা কেমন? তা উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আল্লাহ তাআলা বেমিসাল বা নিরুপম। ইবনে উলাইয়্যাহ রহ. বলেন, আল্লাহকে দেখতে না পাওয়া দুনিয়ার মধ্যে

---

৩০. সূরা কিয়ামাহ : ২২-২৩।

৩১. সূরা মুতাফফিফীন : ১৫।

নির্দিষ্ট। অর্থাৎ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলাকে চোখ দ্বারা দেখা যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কারও দৃষ্টি আল্লাহকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। ইকরামা রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'মানুষের চোখ আল্লাহকে পরিবেষ্টন করতে পারে না'-এর অর্থ কী? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা কি আকাশ দেখতে পাও না? উত্তর এলো, হ্যাঁ, দেখতে পাই। তিনি তখন প্রশ্ন করেন, এক দৃষ্টিতে কি গোটা আকাশটাকে দেখতে পাও? মোটকথা, আল্লাহর সত্তাকে মানবীয় দৃষ্টিগুলো বেষ্টন করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুমিনদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হবে এবং তারা তাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তারা তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারবে না।' এই আয়াতের তাফসীরে এ হাদীস এসেছে, 'যদি সমস্ত মানুষ, জ্বিন, শয়তান ও ফেরেশতাদেরকে একটি সারিতে দাঁড় করানো হয়, তবুও তাদের বৃত্ত আল্লাহকে পরিবেষ্টন করতে পারবে না।'

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী কারীম সা. আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন। তখন তাঁকে এ প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ কি বলেননি, 'দৃষ্টিসমূহ আল্লাহকে পরিবেষ্টন করতে পারবে না'? উত্তরে তিনি বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নূর। আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ যদি তাঁর সমস্ত নূর সহকারে জ্যেতির্ময় হন তাহলে মানবচক্ষু কখনই তাঁকে দেখতে সক্ষম হবে না।

কেউ কেউ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন, কোনো জিনিস আল্লাহর সামনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা নিদ্রা যান না। নিদ্রা আল্লাহর পক্ষে শোভনীয় নয়। তিনি মিযান—দাঁড়িপাল্লা প্রস্তুত রেখেছেন। দিবসের আমলগুলো রাতের পূর্বে এবং রাতের আমলগুলো দিবসের পূর্বে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তাঁর পর্দা হলো নূর বা আগুন। যদি ওই নূর বা আগুনের পর্দা সরে যায় তাহলে তাঁর জ্যোতি সারা দুনিয়াকে জ্বালিয়ে দেবে।

পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবাদিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে বলেছিলেন, হে মূসা ! কোনো জীবন্ত সত্তা আমার জ্যোতি পেয়ে জীবিত থাকতে পারে না। আর প্রতিটি শুষ্ক জিনিস ধ্বংস না হয়ে থাকতে পারে না।' আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি যখন পাহাড়ের ওপর আমার জ্যোতি বিচ্ছুরিত করলাম তখন পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে গেলো এবং মূসা আ. অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তিনি বলেন উঠলেন, سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ. —'আপনি পূতপবিত্র। আপনার কাছে তাওবা করছি। আমি হচ্ছি সর্বাগ্রে ঈমানদার।'

আলোচিত আয়াতে 'ইদরাক' শব্দটি বিশেষ অর্থবোধক। যা বিশেষ প্রেক্ষাপটে প্রজোয্য। এখানে কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাওয়া নাকচ করা হয়নি। সেদিন তিনি নিজ মুমিন বান্দাদের সামনে নিজ জ্যোতি প্রকাশ

করবেন। তাঁর জ্যোতি, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য তাঁর নিজের ইচ্ছামাফিক হবে। মানবীয় চোখগুলো তা পুরোপুরি অবলোকন করতে পারবে না। এ কারণেই আয়েশা রা. দুনিয়ায় দেখার সম্ভাবনাকে নাকচ করে পরকালে আল্লাহর দর্শন লাভের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এ আয়াতটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। কাজেই এখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য দেখতে পারাকে নাকচ করা হয়েছে। কারণ, এ কাজ কোনো মানুষ বা ফেরেশতার পক্ষে সম্ভব নয়।

আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ বলেন, وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ—'আর তিনি চক্ষুসমূহকে আয়ত্ব করেন। কেননা তিনিই বনি আদমের চোখগুলো সৃষ্টি করেছেন। কাজেই কেনো তিনি তা পরিবেষ্টন করতে পারবেন না? ইরশাদ করেছেন, أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ' —'যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত'।[৩২]

কখনও কখনও أبصار শব্দ দ্বারা مبصرون বোঝানো হয়। অর্থাৎ দর্শকরা তাঁকে দেখতে পাবে না। তিনি হচ্ছেন, لطيف অর্থাৎ কোনো বিষয় বের করার ব্যাপারে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী। তিনি خبير অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর ঠিকানা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। যেমন, লোকমান আ. সন্তানকে উপদেশ দেয়ার সময় বলেছিলেন, يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ...إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ —'হে বৎস, কোনো বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।'[৩৩]

## সূরা আন'আমের ১০৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

নিশ্চয়ই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসেছে। সুতরাং কেউ তা দেখলে তা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে। আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর আমি তোমাদের সংরক্ষক নই।

ব্যাখ্যা : بصائر শব্দের অর্থ, দলীল প্রমাণাদি, নিদর্শনাবলী। যা কুরআন কারীমে রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ সা. পেশ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তার সাথে এ কাজ করবে তার উপকার নিজেই ভোগ করবে। এ কথাই অন্য আয়াতে এভাবে এসেছে, 'যে ব্যক্তি হিদায়াত অনুসরণ করবে সে তার

---

৩২. সূরা মুলক : ১৪

৩৩. সূরা লোকমান : ১৬।

নিজের উপকারের জন্যেই করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে তার পথভ্রষ্টতার অপকার তার ওপরই বর্তাবে।' নবী সা. বলেছেন, যে অন্ধ হয়ে থাকবে, সে তার ক্ষতি নিজেই করবে। অন্য আয়াতে এসেছে, 'চোখগুলো অন্ধ হয় না; অন্ধ হয় বক্ষস্থিত অন্তরগুলো। আমি তোমাদের ওপর প্রহরী নই। আমি শুধু প্রচারক মাত্র। হিদায়াত আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন।

## সূরা আন'আমের ১৪১-১৪২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّ غَیْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَ الزَّیْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّ غَیْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَ اٰتُوْا حَقَّهٗ یَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَ لَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ۝ وَ مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّ فَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ۝

তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন বাগানসমূহ যার কিছু মাচায় তোলা হয় আর কিছু তোলা হয় না এবং খেজুর গাছ ও শস্য, যার স্বাদ বিভিন্ন রকম, যায়তুন ও ডালিম যার কিছু দেখতে একরকম, আর কিছু ভিন্ন রকম। তোমরা তার ফল আহার কর, যখন তা ফলদান করে এবং ফল কাটার দিনেই তার হক প্রদান করো। আর অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। আর পশুর মধ্য থেকে কিছু বোঝা বহনকারী ও কিছু ক্ষুদ্রাকৃতির পশু সৃষ্টি করেছেন। তোমরা আহার করো তা থেকে, যা আল্লাহ তোমাদেরকে রিযিকস্বরূপ দিয়েছেন এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা। শস্য, ফল-ফলাদি এবং ওই সকল প্রতিদান– যার ওপর এই মুশরিকরা হস্তক্ষেপ করে এবং নিজের ভ্রান্ত ধারণা থেকে তাদেরকে বণ্টন করে কোনোটাকে হালাল ও কোনোটাকে হারাম সাব্যস্ত করে। এগুলো আল্লাহর সৃষ্টিকৃত জিনিস। একেক ফলের একেক ধরন। কিছু জমিনের ওপর মাচায় হয় আবার কিছু মাচাবিহীন হয়ে থাকে। معروشات হচ্ছে এমন গুল্মলতা– যার ওপর পর্দার আবরণ রয়েছে। যেমন, আঙ্গুর। غير معروشات হচ্ছে বনবাদাড়ের ফলদার বৃক্ষের ফল। এগুলোর কোনোটি একরকম; কোনোটি ভিন্ন রকমের হয়। অর্থাৎ দেখতে একরকম; কিন্তু স্বাদে ভিন্ন। যখন গাছগুলোর ফল পেকে ওঠে তোমরা সেগুলো খাও। এর ফসল কাটার সময় সেখান থেকে গরিবদের দেওয়ার যে হক রয়েছে, তাও আদায়

করে দাও। وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ—কেউ এর দ্বারা ফরয যাকাত উদ্দেশ্য বলেছেন। উৎপাদিত শস্য ও ফল-ফলাদি পরিমাপ করার সময়ই সেই হক আদায় করতে হবে। পূর্বে মানুষ এ হক আদায় করতো না। ইসলামী শরিয়ত এজন্যে একদশমাংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর বাইরে যেটা শীষ বা গুচ্ছ থেকে খসে পড়বে সেটাও মিসকিনদের হক।

নবী কারীম সা. বলেন, যার খেজুর দশ ওয়াসাকের বেশি হবে সে যেন একটা গুচ্ছ মিসকিনদের জন্যে মসজিদে ঝুলিয়ে দেয়। হাসান বসরী রহ. বলেন, এটা হচ্ছে শস্য বা ফলের সদকাহ বা যাকাত। এই যাকাত ছাড়াও গরিবদের জন্যে অতিরিক্ত হক রয়েছে। শস্য কাটার সময় সেই অতিরিক্ত হক আদায় করতে হয়। যা যাকাতের বাইরে। সেদিন যদি মিসকীন এসে যায় তবে অবশ্যই তাদেরকেও কিছু না কিছু প্রদান করা উচিত। তিনি বলেন, ফসল কাটার দিন কমপক্ষে এক মুষ্টি করে দেবে। এর বাইরে যা গুচ্ছ থেকে ঝরে পড়েছে সেটাও মিসকিনদেরই হক।

ইবনে জুবাইর বলেন, যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে এ বিধান ছিলো যে, মিসকিনদের জন্যে এক মুষ্টি পরিমাণ, জীব-জন্তুর জন্যে চারা-ভুষি ও গুচ্ছ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া গুলোও ছিলো মিসকিনদের হক। আল্লাহ ওই সকল লোকদের ভর্ৎসনা করেছেন যারা ফসল কাটা ও মাপার সময় গরিবদেরকে সেখান থেকে দান করতো না। যেমন সূরা কালাম-এর জনৈক বাগান মালিকের আলোচনা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ... وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদের। যখন তারা শপথ করেছিল সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, ইনশাআল্লাহ্ না বলে। তখন রাতেই ওই ক্ষেতের ওপর দিয়ে এমন ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায় যে, সমস্ত ক্ষেত ধ্বংস করে দেয়। আর তারা সকাল পর্যন্ত নিদ্রায় ছিলো। ফলে সমস্ত ক্ষেতই যেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। অতঃপর তারা যখন সকালে ওঠে, তখন একে অপরকে ডেকে বলতে লাগলো– তোমরা যদি শষ্য আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল ক্ষেতে চলো। অতএব তারা চললো এবং ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলো যে, অদ্য যেন কোনো গরীব-মিসকীন চলে না আসে। সুতরাং তারা সকালেই লাফিয়ে লাফিয়ে দ্রুত রওয়ানা হলো। অতঃপর যখন তারা নিজেদের বাগান দেখলো তখন বলতে লাগলো, আমরা পথ ভুল করে মনে হয় অন্যের বাগানে চলে এসেছি। আবার তখনই বলতে লাগলো– না, বাগান তো আমাদেরই। কিন্তু কথা হলো, আমাদেরকে এই বাগান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে এক উত্তম ব্যক্তি বলল— আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ তাআলার

পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেনো? তারা বলল— আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎর্সনা করতে লাগল। তারা বলল— হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা সীমাতিক্রমকারী ছিলাম। আশ্চর্য হওয়ার কি আছে— আমাদের পালনকর্তা এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দান করবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তনশীল। দুনিয়ার শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি তো আরও গুরুতর; শর্ত হলো একটু ভাবতে হবে।

অন্যত্র ইরশাদ করেন, যখন ফল পেকে যায় তখন সেই ফল ভক্ষণ করো। ফসল কাটার সময় গরিবদেরকে তাদের হক প্রদান করো। সীমালংঘন করো না। অর্থাৎ খাওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা অতিরিক্ত ভক্ষণ বিবেক-বুদ্ধি ও দেহের জন্যে ক্ষতিকর। তাইতো ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা খাও, পান করো; কিন্তু অপচয় করো না।' সহীহ বুখারীতে এসেছে, 'তোমরা বাড়াবাড়ি ও অহংকার ত্যাগ করে খাও, পান করো ও পরিধান করো।'

এরপর বলেছেন, وَ مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّ فَرْشًا —'আর চতুষ্পদ জন্তু থেকে (কিছুকে সৃষ্টি করেছেন) বোঝা বহনকারী ও ক্ষুদ্রাকৃতির।' অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের বোঝা বহন ও সফরের সময় বাহনের কাজ দেয়। যেমন, উট। আর فرش শব্দ দ্বারা ছোট ছোট গৃহপালিত জন্তু অথবা খর্বাকৃতির উট বোঝানো হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, حمولة শব্দ দ্বারা উট, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা সহ সবধরনের ভারবাহী পশু বোঝানো হয়েছে। আর فرش শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাগল। আবদুর রহমান ইবনে যায়দের অভিমত হলো, حمولة হচ্ছে আরোহণ করার জন্তু। আর فرش হচ্ছে যেসকল পশু যবেহ করে গোশত খাওয়া হয় বা দুধ পান করা হয়। বোঝা বহনের কাজে বকরি ব্যবহৃত হয় না। তবে এর গোশত খাওয়া হয় এবং এর পশম দিয়ে কম্বল ও বিছানা তৈরি করা হয়। এটাই তার অর্থ যা আবদুর রহমান রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, সেটাই সঙ্গত। আল্লাহ্ তাআলার বাণীতে এর সত্যয়ন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, [৩৪] أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ .... وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ —'তারা কি দেখে না, আমি এই জিনিস তাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যে আমি আমার নিজ হাতের তৈরি বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক। আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে।'

---

৩৪. সূরা ইয়াসীন : ৭১-৭২।

অন্যত্র বলেন, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ... وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ[৩৫] —'এই জন্তুদের মাঝে তোমাদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। এগুলোর রক্ত থেকে তৈরি দুধ তোমরা পান করো। এটা খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্যে এটা কতই না সুস্বাদু। এগুলোর লোম ও পশম তোমাদের জন্যে পোশাকের কাজ দেয়। এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনেও তোমরা সেগুলো ব্যবহার করে থাকো।'

অন্যত্র বলেন, তিনিই আল্লাহ– যিনি তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুগুলো সৃষ্টি করেছেন। যার কতগুলোর ওপর তোমরা আরোহণ করো। কতোগুলোর গোশত ভক্ষণ করো। তোমাদের জন্যে সেগুলোতে আরো অনেক উপকার রয়েছে। তোমরা সেগুলোর মাধ্যমে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে থাকো। সেগুলোর ওপর আরোহণ করো। জাহাজ ও নৌকার ওপর তোমাদের বোঝা চাপিয়ে থাকো এবং সওয়ার হও। আল্লাহ তোমাদের কাছে অসংখ্য নিদর্শন উপস্থাপন করেছেন। বলো, তোমরা তাঁর কোন কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে?

আল্লাহ বলেছেন, كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ যে ফল-ফলাদি, ফসল, চতুষ্পদ জন্তু দান করেছেন সেগুলো তোমরা ইচ্ছা হলে খাও। এগুলো আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। এগুলোকে তিনি তোমাদের রিযিক বানিয়েছেন। কাজেই তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক ও তার কার্যাবলী অনুসরণ করো না। যেমনটি মুশরিকরা করে থাকে। তারা আল্লাহর কিছু কিছু রিযিক নিজেরাই নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছে। হে লোকসকল! শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অর্থাৎ তোমরা একটু চিন্তা করলেই তার শত্রুতা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠবে। সুতরাং তোমরাও শয়তানকে নিজেদের শত্রু বানিয়ে নাও। শয়তান তার তাগুতি বাহিনী নিয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ চালায়, যেন তোমরা জাহান্নামীদের কাতারে শামিল হও। হে বনি আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফেতনায় ফেলতে না পারে। যেভাবে ইতঃপূর্বে সে ফেতনাবাজি করে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিলো। তাঁদের দেহ থেকে পোশাক সরিয়ে ফেলেছিলো। ফলে তাঁরা আবরণশূন্য হয়ে পড়ে।' আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা কি আমাকে ছেড়ে শয়তান ও তার বংশধরকে বন্ধু বানাবে? অথচ তারা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অত্যাচারীদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত জঘন্য বিনিময়।' এ জাতীয় আলোচনা কুরআন কারীমের অনেকগুলো স্থানে বিবৃত হয়েছে।

---

৩৫. সূরা গাফের : ৭৯-৮১।

## সূরা আন'আমের ১৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِیْ مَآ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের ওপর মর্যাদাবান করেছেন। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

**ব্যাখ্যা :** ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা একের পর এক ভূপৃষ্ঠে বসতি স্থাপন করে এসেছো। একদলের পর অপর দল স্থলাভিষিক্ত হয়েছো। যেমনটি অন্য আয়াতে বলেছেন, 'আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশতাদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দিতাম। অন্য এক জায়গায় বলেছেন, 'এই জমিনকে তিনি তোমাদের একের পর এক পর্যায়ক্রমে প্রদান করেছেন। অন্যত্র বলেন, 'আমি জমিনে আমার প্রতিনিধি বানাতে চাই। আরো বলেছেন, অতি শীঘ্রই তোমাদের পরওয়ারদেগার তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর এটা দেখবেন, তার পর তোমরা এসে কি কৃতিত্ব দেখিয়েছো?'

আল্লাহ বলেন, তিনি একজনের ওপর অন্যজনের মর্যাদা প্রদান করেছেন অর্থাৎ জীবিকা, চরিত্র, সৌন্দর্য্য, সমতা, দৃশ্য, দৈহিক গঠন, রং ইত্যাদিতে একজনকে অপরজনের তুলনায় কমবেশি দিয়েছেন। যেমন এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন, 'আমি তাদের পার্থিব জীবনে তাদের পারস্পরিক জীবিকা বণ্টন করেছি এবং কারো মর্যাদা কারো থেকে বেশি দিয়েছি।' কেউ ধনী, কেউ গরিব, কেউ মালিক, কেউ ভৃত্য। মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, 'ভেবে দেখো, কী ভাবে আমি একের ওপর অন্যকে প্রাধান্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকি; তবে পার্থিব জীবনের মর্যাদার তুলনায় পরকালীন মর্যাদা অনেক মূল্যবান ও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।'

অন্য আয়াতে বলেন, 'মর্যাদার এই ভিন্নতার উদ্দেশ্য হলো, তোমাদেরকে পরীক্ষা করা।' অর্থাৎ ধনীকে ধন-সম্পদ দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে সে ধন-সম্পদের শোকর কী ভাবে আদায় করেছে, গরিবকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, নিজের দরিদ্রের ওপর ধৈর্যধারণ করেছিল কি না?

আবু সাঈদ খুদরি রা. থকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন— দুনিয়া

হচ্ছে, সবুজ-শ্যামল। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করার মাধ্যমে দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন, এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি দেখবেন– তোমরা কিরূপ আমল করো। হে লোকসকল! তোমরা দুনিয়া ও নারীদেরকে ভয় করো। ভয় করো প্রথম ফেতনা যা বনী ইসরাঈলের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিলো। সেটা নারীদেরই সম্পর্কিত ছিলো।'

এরপর বলেন, إِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। অর্থাৎ পার্থিব জীবন চোখের পলকে শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে; তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

এ আয়াতে একদিকে ভয় দেখানো হয়েছে, অন্যদিকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এভাবে যে, আল্লাহর হিসাব ও শাস্তি সত্বর এসে যাবে। যারা আল্লাহর অবাধ্য ও রাসূলের বিরুদ্ধাচারী হবে তাদের পাকড়াও করা হবে। এর বিপরীতে যারা আল্লাহকে বন্ধু বানাবে আল্লাহ তাদের বন্ধু, তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী হবেন। غفور ও رحيم এ দু'টি গুণ কুরআন কারীমের অসংখ্য স্থানে সর্বদা একসঙ্গে এসেছে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের রব নিজ বান্দাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করার ব্যাপারে বড় ক্ষমাশীল; কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন'। আরেক জায়গায় এসেছে, 'হে নবী! আমার বান্দাদের বলে দিন– আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আমার শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন।'

কুরআন কারীমে ترغيب—ভীতি প্রদর্শন ও ترهيب—উৎসাহ প্রদান। এ দু'টি শব্দ খুববেশি ব্যবহার হয়েছে। কখনও আল্লাহ জান্নাতের গুণাগুণ বর্ণনা করে বান্দাদের উৎসাহ দিয়েছেন, আবার কখনও জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি ও কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। আবার কখনও এ দু'টোকে একসঙ্গে আলোচনা করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, আমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে উঠিয়ে এনে গুনাহগারদের থেকে দূরে রাখা।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যদি মুমিন জানতো আল্লাহর শাস্তি কতোটা কঠিন তাহলে সে কখনই জান্নাতের লোভ করতো না। সে বলতো, আল্লাহ যদি আমাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেন সেটাই আমার জন্যে যথেষ্ট। এর বিপরীতে কাফের যদি জানতো, আল্লাহর রহমত কতোটা ব্যাপক তাহলে সে কখনই জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। অথচ কাফের জান্নাতের যোগ্য নয়। আল্লাহ রহমতকে একশো টুকরো করে সেখান থেকে মাত্র এক ভাগ সমস্ত মাখলুকের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন। ওই এক ভাগ রহমত পাওয়ার কারণেই আজ মানুষ ও জীব-জন্তু একে অপরের ওপর দয়া করে। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ রহমত আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এ বর্ণনা থেকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে, আল্লাহর রহমত কতো ব্যাপক!

নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা মাখলুক সৃষ্টি করার পর তাঁর কিতাব 'লওহে মাহফূয'-এ (যা তাঁর কাছে সংরক্ষিত) একথা লিখে দিয়েছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী। সেই রহমতের একাংশের বরকতেই গাভী, উষ্ট্রি সহ প্রভৃতি জীব-জন্তু নিজেদের শাবককে পায়ে পিষে না। কোনো কারণে পায়ের নিচে শাবক যদি চলেও আসে তখন 'মা' সাবধানতা অবলম্বন করে।

## সূরা আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

নিশ্চয়ই তোমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে তাদের একে অপরকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজী— যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলেছেন যে, তিনিই আসমান-জমিন সৃষ্টিকারী। যা কুরআন কারীমে অনেকবার আলোচনা এসেছে, তিনি মাত্র ছয়দিনে আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন। ওই ছয়দিন হচ্ছে রোববার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। শুক্রবারেই সমস্ত মাখলুক একত্র হয়। ওইদিন আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়। দিনগুলোর ব্যপ্তি নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, সেগুলো কি পৃথিবীর দিনগুলোর সমান ছিলো, না এক হাজার বছরের সমান ছিলো?

বাকি থাকলো শনিবার। এ দিনে কোনো কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টিকার্যক্রম এদিন বন্ধ ছিলো। এ কারণেই আরবীতে শনিবারকে يوم السبت বলা হয়। سبت এর অর্থ, কর্তন।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সা. আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তাআলা শনিবারে জমিন সৃষ্টি করেন। রবিবার পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেন। সোমবারে গাছপালা সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবারে প্রিয়-অপ্রিয় জিনিসগুলো সৃষ্টি করেন। বুধবারে নূর সৃষ্টি করেন। বৃহস্পতিবারে সমস্ত জীব-জন্তু সৃষ্টি

করেন। আদম আ.-কে সৃষ্টি করেন শুক্রবারের শেষাংশে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে।' এ হাদীস থেকে বুঝে আসে, সপ্তাহের সাত দিনেই সৃষ্টিকার্যক্রম চলেছে। অথচ আলোচিত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, 'ব্যস্ততার দিনের সংখ্যা ছিলো ছয়।' এ ছয়দিনের ব্যস্ততার পর আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর সমাসীন হন। এই জায়গায় নানা পণ্ডিত নানা মত ব্যক্ত করেছেন। কল্পনার ঘোড়া দাবড়ে বেড়িয়েছেন। এ ব্যাপারে আমরা শুধু পূর্বসূরীদের অভিমত গ্রহণ করবো। অর্থাৎ ইমাম মালিক, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী, লাইস ইবনে সা'দ, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াই রহ. সহ নতুন পুরাতন ইমামগণ যে মত ব্যক্ত করেছেন তার অনুসরণ করবো। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, আমরা বিশ্বাস করি– আল্লাহ আরশে সমাসীন হয়েছেন। তবে সেই সমাসীন ও অধিষ্ঠানের এমন কোনো বিবরণ আমরা দাবী করবো না, যার সঙ্গে মাখলুকাতের সমাসীন সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। বা সাদৃশ্যের আকিদা মস্তিষ্কে চলে আসে। আল্লাহর গুণাবলি এ ধরনের সাদৃশ্য থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। মোটকথা আল্লাহ যা বলেছেন তা কোনো ধরনের খেয়াল, কল্পনা ও সন্দেহ ছাড়াই মেনে নিতে হবে। কোনো ধরনের আপত্তি তোলা যাবে না। কেননা আল্লাহ কোনো বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নন। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। যেমনটি ইমাম বুখারী রহ.-এর উসতায নাঈম ইবনে হাম্মদ আল খুযায়ী রহ. সহ প্রমুখ মুজতাহিদগণ বলেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনো মাখলুকের সামঞ্জস্য করে সে কুফরী করার অপরাধে অপরাধী হলো। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা নিজেকে যেসব গুণেগুণান্বিত করেছেন, তা যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সেও কাফির হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. যেসব বৈশিষ্ট্যে বা গুণে তাঁকে ভূষিত করেন নি, সেসব গুণে তাঁকে ভূষিত করাকেই 'তাশবীহ বা সাদৃশ্য স্থাপন করা' বলা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে এমন সিফাত সাব্যস্ত করে যা স্পষ্টরূপে কুরআনের কোনো আয়াত বা রাসূলের কোনো হাদীসে বর্ণিত রয়েছে আর তার মাধ্যমে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ পায় বা তাঁর সত্তাকে যে কোনো প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত করা হয় সে সঠিক কাজ করেছে।'

আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ বলেন, তিনি রাতের অন্ধকার দিবসের আলো দিয়ে এবং দিবসের আলো রাতের অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দেন। আর দিবস ও রজনী প্রতিটি একটি অন্যটিকে খুব দ্রুত অনুসরণ করছে। অর্থাৎ একটি শেষ হতেই অপরটি ত্বড়িত গতিতে এসে উপস্থিত হয়। বিদায় ও প্রস্থানের মাঝখানে কোনো বিরতি নেই। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ... وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○ 'আর রাত তাদের জন্য একটি নিদর্শন; আমি তা থেকে দিনকে সরিয়ে নিই, ফলে তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা

মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-র মূলনীতি। আর চাঁদের জন্য আমি গন্তব্য নির্ধারণ করে রেখেছি। অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মতো হয়ে যায়। সূর্যের জন্য অসম্ভব চাঁদ থেকে অগ্রসর হওয়া, আর রাতের জন্য অসম্ভব দিনকে অতিক্রম করা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে চক্কর খেতে থাকে।[৩৬]

এজন্যেই আল্লাহ বলেছেন, يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. —'রাতকে আড়াল করেন দিনের মাধ্যমে। রাত দিনকে খুঁজতে চলে আসে। সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি তাঁর আদেশের বশ্য।' এ কারণেই বলেছেন, أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ —'জেনে রাখো, তিনিই একক স্রষ্টা ও নির্দেশদাতা।' تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ —'বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ কতোইনা বরকতময়'। আরও বলেছেন, تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا —'কতোইনা বরকতময় সেই সত্তা যিনি আকাশে বিভিন্ন গন্তব্য বানিয়েছেন।'

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি নেক আমল করে আল্লাহর শোকর আদায় করলো না; বরং নিজের প্রশংসা করলো সে কুফরী করলো। তার থেকে তার আমল ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি মনে করবে, আল্লাহ নিজের কোনো হুকুমত বা ক্ষমতা অন্যের কাছে স্থানান্তর করেছেন সেও কুফরী করলো। কেননা আল্লাহ বলেছেন, أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ। দোয়ায় মাসূরার মাঝে এভাবে দোয়া করতে বলা হয়েছে-

اللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ، أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ.

'হে আল্লাহ! সকল রাজ্য ও রাজত্ব এককভাবে আপনার। সকল প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য। সবক'টি বিষয় আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। আমি আপনার কাছে সকল কল্যাণ প্রার্থনা করি। আপনার কাছেই সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই।'

---

৩৬. সূরা ইয়াসীন : ৩৭-৪০।

## সূরা আ'রাফের ৫৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاۗءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

'আর তিনিই তাঁর রহমতের পূর্বে সুসংবাদরূপে বাতাস প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তা ঘন মেঘ ধারণ করে, তখন আমি তা মৃত ভূমির দিকে চালাই, ফলে তার দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর এর দ্বারা উৎপাদন করি প্রত্যেক প্রকারের ফল। এভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।'

ব্যাখ্যা : পূর্বের আয়াতগুলোতে এ আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে যে, আল্লাহই আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন; তিনিই নির্দেশদাতা ও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক। পাশাপাশি তাঁর কাছে কী ভাবে দোয়া চাইতে হয়, সে পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় এখানে তিনি বলছেন, আল্লাহই সবার একক রিযিকদাতা। মৃত ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন তিনিই পুনরুজ্জীবিত করবেন। বাতাস তিনিই প্রেরণ করেন যা পানি বর্ষণকারী মেঘমালাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। যেমনটি অন্য আয়াতে বলেছেন, ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات —'বাতাস বৃষ্টির সুসংবাদ দেয়।'

আল্লাহ বলেন, بين يدي رحمته এখানে رحمت শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য বৃষ্টি। যেমনটি অন্য আয়াতে বলেছেন, 'আর তারা নিরাশ হয়ে পড়ার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন।' অন্যত্র বলেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহর রহমতের প্রতি লক্ষ্য রাখো, তিনি কী ভাবে (শুকিয়ে) মরে যাওয়ার পর জমিনকে পুনর্জীবিত করেন। এভাবে তিনি মৃতকে পুনর্জীবন দান করেন। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপরই সক্ষম।

এরপর বলেন, حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا —'বাতাস যখন ভারী মেঘ ধারণ করে।' অর্থাৎ তাতে অধিক পানি থাকে, যা জমিনের নিকটবর্তী হয়। বলেন, سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ —'তখন আমি মৃত ও শুষ্ক জমিনকে পানিতে ভরে দিই।' যেমন ইরশাদ করেছেন, وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا 'তাদের জন্যে এটিও একটি নিদর্শন যে, আমি নির্জীব জমিনকে সঞ্জীবিত করেছি।'[৩৭]

এজন্যেই ইরশাদ করেছেন, فَأَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى —'আমি যেভাবে মৃত জমিন জীবিত করি তদ্রূপ দেহগুলোকে মাটি হয়ে যাওয়ার পরও কিয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করবো'। ওই সময় আল্লাহ আসমান

৩৭. সূরা ইয়াসীন : ৩৩।

থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। অনবরত চল্লিশ দিন জমিনে বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকবে। তখন মানবদেহগুলো নিজ নিজ কবর থেকে এমনভাবে উঠতে থাকবে যেভাবে জমিন থেকে দানা অঙ্কুরিত হয়। কুরআনে এ জাতীয় ভাষ্য সম্বলিত অনেকগুলো আয়াত রয়েছে। এগুলোকে তিনি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ এ উদ্দেশ্যে যে, হয়তো তোমরা এর থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করবে।

## সূরা আ'রাফের ১৮৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

তারা কি লক্ষ্য করে না, আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি? আর (এর প্রতি যে) হয়তো তাদের নির্দিষ্ট সময় নিকটে এসে গেছে? সুতরাং তারা এরপর আর কোন্ কথার প্রতি ঈমান আনবে?

**ব্যাখ্যা :** ইরশাদ হচ্ছে, আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা কি এ কথা ভেবে দেখে না যে, আকাশ, জমিন ও তন্মধ্যকার প্রতিটি বস্তুর ওপর আমার কিরূপ ক্ষমতা রয়েছে। তাদের উচিত ছিলো, এগুলো সম্পর্কে গভীর চিন্তা করা ও শিক্ষা নেওয়া। তাহলেই তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতো যে, এই সমস্ত কিছু একমাত্র তাঁরই। যাঁর কোনো সমকক্ষ বা অনুরূপ সত্তা নেই। তিনিই ওই কথার উপযুক্ত যে, ইবাদত ও একনিষ্ঠতা শুধু তাঁরই জন্য উপযুক্ত। তাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হলো, তারা রাসূল সা.-কে সত্য নবী হিসেবে মেনে নেবে; তাঁর অনুসরণ করবে; প্রতিমাগুলো ছুড়ে ফেলে দেবে এবং এ ভয় করবে যে, মৃত্যু সন্নিকটে। সুতরাং যদি কুফরীর ওপর মৃত্যু হয় তাহলে তারা মর্মন্তুদ শাস্তির উপযুক্ত।

এরপর আল্লাহ বলেন, এতো ধমকি-হুমকির পর বলো আর কী বাকি আছে, যা পেলে তোমরা ঈমান আনবে? এ ধমকিগুলো তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। তারা যদি এই অহি ও কুরআনকে সত্য স্বীকার না করে যা মুহাম্মদ সা. পেশ করেছেন, তবে তারা আর কোন কথা সত্য বলে স্বীকার করবে?

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, মে'রাজের রজনীতে আমি যখন সপ্ত আকাশে পৌঁছি তখন ওপরদিকে বজ্রধ্বনী ও বিদ্যুৎচমক দেখতে পেলাম। তখন আমি এমন গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের পেট মটকার মতো ফুলে আছে। পেটের ভেতর অসংখ্য সাপ গিজগিজ করছে। যা

বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো। আমি জিবরাঈল আ.-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি জানালেন, এরা হচ্ছে সুদখোর। অতঃপর আমি প্রথম আকাশে নামতেই নিচেরদিকে তাকাই, তখন এক ঝাপসা ধোঁয়াচ্ছন্ন দেখতে পেলাম। খুব চেচামেচি শোরগোল শোনা যাচ্ছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এটা কী? তিনি বলেন, এরা ওই শয়তান। যারা আড়াল সৃষ্টি করার জন্যে মানুষের চোখের সামনে ঘোরাঘুরি করে। যেন, মানুষ জমিন ও আসমানের রাজত্বে উঁকি-ঝুকি দিতে না পারে। যদি শয়তানরা আড়াল সৃষ্টি না করতো তাহলে মানুষ আকাশের বিস্ময়কর ব্যাপারগুলো দেখতে পেতো।'

## সূরা আ'রাফের ১৮৯-১৯০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○ فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করে। অতঃপর যখন সে তার সঙ্গিনীর সাথে মিলিত হলো, তখন সে হালকা গর্ভ ধারণ করল এবং তা নিয়ে অনায়াসে চলাফেরা করতে থাকল। অতঃপর গর্ভ যখন ভারী হলো, তখন উভয়ে তাদের রব আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলো, 'যদি আপনি আমাদেরকে সুসন্তান দান করেন তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে এক সুসন্তান দান করলেন, তখন তাদেরকে তিনি যা প্রদান করেছেন সে বিষয়ে তারা তাঁর বহু শরীক নির্ধারণ করল। বস্তুত তারা যাদের শরীক করে আল্লাহ তাদের থেকে অনেক উর্ধ্বে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ বলছেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আদম আ.-এর বংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আদম আ. থেকেই তাঁর স্ত্রী হাওয়া সৃষ্ট হয়েছেন। তাঁদের দু'জনের মাধ্যমে বংশধারা বিস্তার লাভ করেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং এতো বৃদ্ধি করেছি যে, তোমরা জাতি ও গোত্রে পরিণত হয়েছো। এখন তোমাদের পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে জানা উচিত। আর আল্লাহ্ তাআলার কাছে তোমাদের মধ্য থেকে সে-ই সম্ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হবে, যে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করে।

ليسكن إليها এর অর্থ হলো, যেন একে অপরের মাঝে মিল মুহাব্বত বজায় থাকে। এজন্যেই বলেছেন, وجعل بينكم مودة ورحمة —'আল্লাহ তোমাদের অন্তরে পরস্পরে ভালোবাসা ও প্রীতি সৃষ্টি করেছেন।' দুই আত্মার মাঝে যে মোহাব্বত ও দয়া হয়ে থাকে, তা অন্য কোথাও এর চেয়ে অধিক হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন, 'যাদুকর যাদুর সাহায্যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে চিড় ধরানোর অপচেষ্টা করতে পারে।' মোটকথা, স্বামী যখন স্ত্রীর সঙ্গে একান্তভাবে মিলিত হয় তখন স্ত্রী প্রথমদিকে তার গর্ভাশয়ে একটি হালকা বোঝার অস্তিত্ব অনুভব করে। এটি হলো গর্ভের সূচনাকাল। এ সময় নারীর কোনো কষ্ট হয় না। কেননা এ গর্ভটি এখন সবেমাত্র মাংসপিণ্ড [নুতফাহ]। যা সবেমাত্র হালকা-পাতলা হয়েছে। ইবনে জারীর রহ. বলেন, ওই গর্ভ বহন করে সে সহজে ওঠাবসা করতে পারে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো, সূচনাকালে প্রত্যেক নারী তা নিয়ে সন্দিহান থাকে যে, সে গর্ভবতী কি-না? মোটকথা, কিছু দিন পর নারী যখন কিছুটা ভারী বোঝা অনুভব করতে থাকে। তখন সে তার গর্ভের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। ওই সময় পিতা-মাতা দু'জনই আল্লাহর কাছে এ কামনা করে, যদি তাদেরকে আল্লাহ একজন সুস্থ নিরাপদ সন্তান দান করেন তাহলে তা বড় দয়া হবে!

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এ সময় বাবা-মায়ের মনে এ ভয়ও থাকে, না জানি, কোনো পশুর আকৃতি বিশিষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ শরীরের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কেননা কখনও এরকম হয়ে থাকে।' হাসান বসরী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন— আল্লাহ যেন আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন। কেননা সন্তান হিসেবে পুত্রই সর্বাধিক উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মোটকথা, আল্লাহ যখন তাদেরকে সুস্থ-সুন্দর সন্তান দান করেন তখন তারা সেই সন্তানকে মূর্তি-প্রতিমার অংশ বানিয়ে ফেলে। অথচ এমন শিরক থেকে আল্লাহর সত্তা পুরোপুরি মুক্ত। মুফাসসিরগণ এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু হাদীস আলোচনা করেছেন, যা আমরা আলোচনা করবো। এ বিষয়ে আলোকপাত করবো। যা আমাদেরকে ইনশা-আল্লাহ সঠিক বিষয়ের দিকে পথ দেখাবে। আল্লাহর ওপরই নির্ভর করছি।

নবী কারীম সা. বলেন, হাওয়া আ. সন্তান প্রসব করার পর ইবলিস তাঁর কাছে হাজির হয়। তাঁর সমস্যা ছিলো, সন্তান হওয়ার পর জীবিত থাকতো না। তখন শয়তান তাঁকে পরামর্শ দিলো, তুমি তোমার সন্তানের নাম আবদুল হারিস রেখো, তাহলে সে জীবিত থাকবে। সুতরাং সন্তানের নাম আবদুল হারিস রাখা হলো আর সে জীবিত রইলো। এটি ছিলো শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা। কারণ, হারিস শয়তানেরই অপর নাম।

ইবনে জারীর রহ. বলেন, এটা আদম আ.-এর ঘটনা নয়; বরং অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘটনা। আর এও বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা কিছু মুশরিককে

বোঝানো হয়েছে। যারা এধরনের কাজ করে। কথিত আছে, এটি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাজ। কারণ, তারা নিজ সন্তানদেরকে নিজেদের রীতি-নীতি অনুসারে গড়ে তোলে। এ ব্যাপারে আরো কিছু হাদীসও রয়েছে। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, হাওয়া আ.-এর যখনই কোনো সন্তান জন্ম নিতো তাকে আল্লাহর ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো এবং তার নাম আবদুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ ইত্যাদি রাখা হতো। এ সন্তানগুলো মারা যেতো। অতএব আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর কাছে শয়তান উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য নাম রাখো তাহলে তারা বেঁচে থাকবে। অতঃপর যখন হাওয়া আ.-এর সন্তান হলো তখন তারা তার নাম রাখলেন, আবদুল হারিস। এ সম্পর্কেই আল্লাহ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ... الخ এর কথা বলেছেন। অবশেষে হাওয়া আ.-এর মনে সংশয় ছিলো যে, গর্ভে সন্তান আছে কি নেই? মোটকথা, যখন গর্ভ ভারী হয়ে গেলো তখন তারা দু'জনেই আল্লাহর নিকট দোয়া করলো, যদি তিনি সুস্থ-নিরাপদ জীবিত সন্তান দান করেন তাহলে আমরা বড় কৃতজ্ঞ হবো। তখন শয়তান তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, তোমরা কি জানো– তোমাদের কেমন সন্তান হবে? পশুর আকৃতির হবে, অথবা মানুষের? এভাবে সে তাদের সামনে একটি ভুল কথাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলো। আর প্রতারণা করাই হলো শয়তানের কাজ। ইতঃপূর্বে তাঁদের দু'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে মারা গিয়েছিলো। শয়তান তাদেরকে বোঝালো, তোমরা যদি আমার নামে তোমাদের সন্তানের নাম না রাখো তাহলে তোমাদের সন্তান না সুস্থভাবে জন্ম নিবে আর না জীবিত থাকবে। সুতরাং তারা তাদের সন্তানের নাম আবদুল হারিস রাখলেন। এ কারণে আল্লাহ বলেন, 'যখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রার্থনা অনুসারে সুস্থ-নিরাপদ সন্তান দান করলেন তখন তার নাম আবদুল হারিস রেখে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করলো। এ আয়াতগুলোতে এ কথাই আলোচিত হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, প্রথম গর্ভের সময় শয়তান এসে তাদেরকে ভয় দেখালো, আমাকে চিনতে পেরেছো? আমিই সে, যে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছি। এখন তোমরা আমার আনুগত্য করো, নচেৎ আমার কর্ম তৎপরতায় তার মাথায় শিং গজাবে; পেট ফুটো করে বেরিয়ে আসবে। এই হবে সেই হবে; মোটকথা তাদেরকে আতঙ্কিত করে দিলো। কিন্তু তাঁরা তার কথা গ্রহণ করলেন না। আল্লাহর কল্যাণে মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। এরপর দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ার পরও মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। এবার শয়তান এসে নিজেকে হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করলো। তখন তাঁদের মনে সন্তানের ভালোবাসা প্রভাব ফেললো। ফলে শয়তানের কথামতো তারা সন্তানের নাম রাখলেন, আবদুল হারিস'। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা বলেন, جَعَلَا لَهٗ

شُرَكَاءَ فِيمَا اٰتٰهُمَا 'তখন তাদেরকে তিনি যা প্রদান করেছেন সে বিষয়ে তারা তাঁর বহু শরীক নির্ধারণ করল।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে এই হাদীসটি অনুসরণ করে তাঁর একদল ছাত্রও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যাদের মাঝে মুজাহিদ রহ., সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ., ইকরামা রহ., কতাদা রহ. ও সুদ্দী রহ. রয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ ঘটনাটি আহলে কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা তো তা-ই বলবো, যা হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, এ আয়াতগুলোতে মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা নিজেদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যদের শিরক করে। এটি আদম ও হাওয়া আ.-এর ঘটনা নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ওই শিরক থেকে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।'

## সূরা ইউনুসের ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ। যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো। তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ বলেছেন, তিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। তিনি আসমান ও জমিনসমূহ মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। বলা হয়ে থাকে যে, ওই দিনগুলো ছিলো আমাদের দিনের মতোই। আবার এও বলা হয় যে, প্রতিটি দিন ছিলো হাজার বছরের সমান। এ বিষয়ে সামনে আলোচনা আসবে। এরপর তিনি আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হন। আরশ হচ্ছে, সমস্ত মাখলুকাতের মাঝে সবচেয়ে বড় মাখলুক। যা লাল চুনি পাথর [ইয়াকুত] পাথরে নির্মিত। এ অভিমতও পাওয়া যায় যে, আরশ হচ্ছে আল্লাহর একটি নূর। আল্লাহ হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টিজীবের পরিচালক, অভিভাবক ও যিম্মাদার। জমিন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও আল্লাহর পর্যবেক্ষণের আওতামুক্ত নয়। তাঁর একদিকের মনোযোগের কারণে অন্যদিকের মনোযোগ বাঁধাগ্রস্থ হয় না। কোনো বিষয় ভুলবশতঃ তাঁকে এড়াতে পারে না। পাহাড়, সাগর, জনপদ ও বনবাদাড়ের কোথাও কোনো বড় বিষয় সংঘটিত হলে সেটা তাকে কোনো ছোট বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে না। ভূপৃষ্ঠে

এমন কোনো প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ পালন করেন না। কোনো জিনিস নড়াচড়া করলে; কিংবা গাছ থেকে কোনো পাতা ঝরলেও তিনি তা জানতে পান। জমিনের অন্ধকারে কোনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু নেই, এমন কোনো শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু নেই যা সংরক্ষিত গ্রন্থ লাওহে মাহফুযে অর্থাৎ ইলমের কিতাবে বিদ্যমান নেই। যে সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 'তখন মুসলমানরা দেখতে পায় যে, একটি বড় দল এদিকে আসছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিলো, তারা যাযাবর। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা জ্বিন। এ আয়াতের কারণে আমরা শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।'

এরপর আল্লাহ বলেন, مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِه—'তার অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না।' অনুরূপ ভাষ্য অন্যান্য আয়াতেও এসেছে। যেমন, সূরা বাকারায় এসেছে–مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেন, ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ—'তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' অর্থাৎ ওই সকল লোক ইবাদতের জন্যে আল্লাহকেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। আর হে মুশরিকরা! তোমরা ইবাদতে আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যদেরকেও শরীক করে নিচ্ছো। অথচ তোমরা ভালো করেই জানো যে, আল্লাহই একক স্রষ্টা। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। এ কথা অন্য আয়াতেও এসেছে যে, আল্লাহ বলেন, 'তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো— তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে? তখন তারা স্বীকার করে বলবে, আল্লাহ'। 'তুমি যদি বলো, এই বিশাল আরশ ও সপ্তাকাশের রব কে? তারা তৎক্ষণাৎ বলবে, আল্লাহ। তখন তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো– তাহলে কেনো তোমরা এই আল্লাহকে ভয় করো না? কেনো তাঁর সঙ্গে অন্যদের শরীক করো?

## সূরা ইউনুসের ৫-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۭ مَا خَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ اِنَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ○

তিনিই সূর্যকে করেছেন উজ্জল আলোকময় এবং চাঁদকে করেছেন স্নিগ্ধ আলো বিতরনকারীরূপে। আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন মনযিলসমূহ, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং

(সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। নিশ্চয়ই রাত ও দিবসের বিবর্তনে এবং আসমানসমূহ ও জমিনে যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

**ব্যাখ্যা :** মহান আল্লাহ এ আয়াতে আলোচনা করেছেন যে, তিনি তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রমাণস্বরূপ বহু নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। সূর্যের কিরণ হতে বিচ্ছুরিত আলোকমালাকে তিনি তোমাদের জন্যে ضياء তথা দীপ্তি বানিয়েছেন। আর চন্দ্রের কিরণকে তোমাদের জন্যে নূর বানিয়েছেন। সূর্যের কিরণের সঙ্গে চন্দ্রের কিরণের অনেক পার্থক্য রয়েছে। দু'টোই কিরণ। কিন্তু একটির সঙ্গে অন্যটি মোটেই খাপ খায় না। দিবসে সূর্যের রাজত্ব আর রাতে চন্দ্রের কর্তৃত্ব। দু'টোই আসমানি কিরণ। বিস্ময়ের বিষয় হলো, আল্লাহ সূর্যের মনযিল নির্ধারণ করেননি; অথচ চাঁদের মনযিল নির্ধারণ করেছেন। মাসের এক তারিখের চাঁদ অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হয়। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আয়তন ও কিরণ– দু'টোই বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত সেটি পূর্ণ অবয়বে গোলাকার বৃত্ত ধারণ করে। এরপর আবার সেটির অবয়ব হ্রাস পেতে থাকে। পূর্ণ একমাস পর চাঁদ প্রথম অবস্থায় ফিরে যায়। সে কথাই আল্লাহ আলোচনা করে অন্য আয়াতে বলেন, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ—'চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে ছোট হতে হতে পুরাতন শুকনো খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।'[৩৮]

অন্য আয়াতে বলেন, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا —'তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ।'[৩৯] এ আয়াতে বলা হয়েছে, সূর্যের মাধ্যমে দিনের হিসাব পাওয়া যায়। আর চাঁদের আবর্তনের মাধ্যমে মাস ও বছরের হিসাব পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা এগুলোকে অর্থহীন সৃষ্টি করেননি; বরং বিশ্বজাহানের সৃষ্টির মাঝে এক মহৎ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। যা আল্লাহর ব্যাপক কুদরতের স্পষ্ট প্রমাণ। তিনি অন্য আয়াতে বলেছেন, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا —'আমি আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নাম।'[৪০] অন্যত্র বলেন,

---

৩৮. সূরা ইয়াসীন : ৩৯-৪০।

৩৯. সূরা আন'আম : ৬৯।

৪০. সূরা সোয়াদ : ২৭।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ الخ—'তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।'[৪১] আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা হলো, আমি দলিল- দস্তাবেজ স্পষ্টাকারে বর্ণনা করেছি যাতে বুদ্ধিমানরা অনুধাবন করতে পারে।

اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ-এর ব্যাখ্যা হলো, দিন ও রাতের পালাবদল হওয়া। তারা কখনই একে অন্যের ওপর জয়যুক্ত হয়ে স্থির থাকতে পারে না। যেমনটি আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন, يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا—রাত দিবসের ওপর ছেয়ে যায়। দিবস ছেয়ে যায় রাতের ওপর। সূর্য চাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধা কখনই সম্ভব নয়।' মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا—'সকাল হয়ে যায় এবং রাত নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়। আল্লাহ আসমান ও জমিনে যা সৃষ্টি করেছেন তা প্রমাণ করে, আল্লাহর ক্ষমতা কতই না ব্যাপক'। অন্য এক আয়াতে বলেছেন, وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ—'আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আল্লাহ কতই না নিদর্শন রয়েছে'। অন্য আয়াতে বলেন, قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ—'আপনি বলে দিন- আসমানসমূহ ও জমিনে কি কি নিদর্শন রয়েছে এবং ঈমানহীন সম্প্রদায়ের জন্যে সতর্ককারী নিদর্শনসমূহ কত প্রচুর রয়েছে'। আল্লাহ তাআলা এ কথাও বলেছেন যে, তারা কি আসমান ও জমিনে, তাদের সামনে ও পেছনে এদিক-ওদিক তাকায় না?' এই নিদর্শনসমূহ হচ্ছে ওই সকল লোকের জন্যে; যাদের মস্তিষ্ক রয়েছে এবং যারা আল্লাহ তাআলার শাস্তি ও আযাব থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়।'

## সূরা ইউনুসের ৩১-৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۖ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ○

বলুন, আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিযিক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে

৪১. সূরা মুমিনুন : ১১৫-১১৬।

সকল বিষয় পরিচালনা করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। সুতরাং, আপনি বলুন, তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না? অতএব, তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব। অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কোথায় তোমাদেরকে ঘোরানো হচ্ছে?

ব্যাখ্যা : আল্লাহ মুশরিকদের ওপর এ দলীল পেশ করছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর একত্ববাদ ও রুবুবিয়ত [প্রভুত্ব] স্বীকার করতে হবে। বলছেন, হে নবী! আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, কে তিনি– যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন? যিনি নিজের কুদরতে জমিন বিদীর্ণ করে তার ভেতর থেকে দানা, আঙ্গুর, নাশপাতি, যয়তুন, খেজুর, ঘন বাগান ও গুচ্ছযুক্ত ফল সৃষ্টি করেন? তাঁর সঙ্গে কি অন্য কোনো মাবুদ আছে? তারা অবশ্যই স্বীকার করবে, এগুলো শুধু আল্লাহরই কাজ। যদি তিনি রিযিক বন্ধ করে দেন তবে কে এমন আছে যে তা খুলতে পারবে? যিনি এই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, ইচ্ছা হলে তিনি তা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম। আপনি বলুন, এই দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও অন্যান্য মানবীয় শক্তিসমূহ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তাঁকে অসন্তুষ্ট করার মাধ্যমে এটা চাও যে, তিনি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে নেবেন? যিনি নিজ বিশাল কুদরতের প্রকাশ ঘটিয়ে মৃত থেকে জীবিত সৃষ্টি করেন, জীবিত থেকে মৃত বের করেন। বলুন, কে সমগ্র মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনা একাকী নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি নিজ ইচ্ছা অনুসারে কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সবাইকে আশ্রয় দেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না। তিনি সবার নিয়ন্ত্রক ও একচ্ছত্র শাসক। তাঁর নির্দেশের পর অন্য কারো নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তিনি যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞেস করবেন; কিন্তু তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা রাখে না। আসমান ও জমিনের সকল মাখলুক তাঁর অধীনস্থ। তাঁর মর্যাদা স্বতন্ত্র। আসমান ও জমিনের সকল রাজত্ব তাঁরই। ফেরেশতা, মানুষ ও জ্বিন সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর দাস। তিনি সবার রব। তাঁর ক্ষমতা সবার ওপর শতভাগ প্রজোয্য। এই কথাগুলো কাফের-মুশরিকরাও জানে। তারা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তা স্বীকারও করে। আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, এতদসত্ত্বেও তোমরা কেনো আল্লাহকে ভয় করো না? অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তোমরা কেনো তাঁকে ছেড়ে গায়রুল্লাহর উপাসনা করো? সত্যিকারার্থে রব তো তিনিই যার স্বীকারোক্তি তোমরা এখন করছো, তাহলে তো এককভাবে ইবাদতের উপযুক্ত তিনিই হলেন। সত্য বোঝার পরও তোমরা কী কারণে বিভ্রান্তির পথ ধরো? আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য সকল উপাস্য মিথ্যা। তাহলে তোমরা কেনো সত্যের উপাসনা ছেড়ে অসত্যের পূজা-অর্চনার ভ্রষ্ট পথ ধরছো? এ সকল দলীল-দস্তাবেজের ওপর ভিত্তি করে এটাই প্রমাণিত

হয়েছে, অর্থাৎ যেভাবে ওই মুশরিকরা কুফরী করেছে এবং কুফুরীর ওপর স্থির রয়েছে, তেমনই ভাবে তারা ওই কথা স্বীকারও করে নিয়েছে যে আল্লাহই প্রতিপালক, স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। গোটা মহাবিশ্বের ওপর তাঁর একক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনিই স্বীয় নবী-রাসূলদেরকে তাওহীদের বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন। কাজেই ওই সকল পথহারা লোকদের শেষ ঠিকানা যে জাহান্নাম হবে, এ কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

## সূরা ইউনুসের ৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ○

তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নাও এবং দিনকে করেছেন আলোকময়। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শনাবলী এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা শোনে।

ব্যাখ্যা : ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন যেন তারা দিনভর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর প্রশান্তিদায়ক বিশ্রাম নিতে পারে। অন্যদিকে জীবিকা অন্বেষণের পথ সহজ করার জন্যে আল্লাহ দিবসকে আলোকময় বানিয়েছেন। ফলে দিনে তারা সফর করতে পারে। এই আলোর আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। এইসব প্রমাণাদি শোনার পর শিক্ষা অর্জনকারীদের জন্যে অত্র আয়াতসমূহে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

## সূরা ইউনুসের ১০৬-১০৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি তা করো, তাহলে নিশ্চয় তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোনো প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা মঙ্গল দান করেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

ব্যাখ্যা : অবশ্যই তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ধরে নাও, তোমাদের মূর্তিগুলো বাস্তবে সত্যের ওপর আছে তাহলে তাদেরকে বলো আমার কোনো ক্ষতি করতে? মনে রাখবে, তাদের উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা নেই। লাভ-ক্ষতি প্রদানের ক্ষমতা শুধু এককভাবে আল্লাহর হাতে। হে নবী! কাফেরদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। একনিষ্ঠতার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হোন। শিরকের দিকে সামান্যতমও ঝুকবেন না। যদি আল্লাহ আপনাকে অনিষ্টতা ও ক্ষতির ভেতর বেষ্টন করে ফেলে তখন কে ওই বিপদ থেকে আপনাকে বের করবে? সর্বপ্রকার লাভ-ক্ষতি, কল্যাণ ও অনিষ্টতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, জীবনভর কল্যাণের অনুসন্ধিৎসু থাকবে এবং আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে চোখের সামনে রাখবে। আল্লাহর রহমতের মৃদুমন্দ হাওয়া যার গায়ে লেগেছে সেই পরম সৌভাগ্যবান। তিনি যাকে ইচ্ছা রহমত দান করে ঋদ্ধ করেন। আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করো যেন তোমার দোষ-ত্রুটিগুলো আড়াল করে দেন এবং তোমাকে যুগের বিপদাপদ ও অনিষ্টতার ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু। তোমার মধ্যে যে ধরনের গুনাহই থাকুক না কেনো– খাঁটি মনে তাওবা করো। এমনকি শিরক করলেও তাওবা করে নাও। আল্লাহ তার তাওবা অবশ্যই কবুল করবেন।

## সূরা হূদের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।

ব্যাখ্যা : জল-স্থলে ছোট-বড় যতো ধরনের মাখলুক রয়েছে, প্রত্যেকের রিযিকের যিম্মাদার আল্লাহ। তিনি সেগুলোর চলাফেরা, আসা-যাওয়া, স্থির থাকা এমনিক বসবাসের জায়গা, কোথায় মৃত্যু হবে ও মাতৃজঠরে অবস্থানের জায়গা পর্যন্ত জানেন। আর এই সমস্ত ঘটনা ওই কিতাব, যা আল্লাহ তাআলার কাছে আছে তাতে লেখা আছে। এবং ওই কিতাবেই তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ —আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই উম্মত। আমি কিতাবে

কোনো কিছু লিখতে অবশিষ্ট রাখিনি। এরা সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ الخ —'তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এ গুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। জঙ্গলে ও জলে যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন। যে পাতা গাছ থেকে ঝরে পড়ে তাও তিনি জানেন। জমিনের অন্ধকারে কোনো শস্যকণা এবং কোনো আর্দ্র ও শুষ্ক স্থানে এমন বস্তু নেই যে, তিনি জানেন না।

## সূরা হূদের ৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ وَّ كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ لَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُوْلَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ○

আর তিনিই আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তখন তাঁর আরশ ছিলো পানির ওপর, তোমাদের মধ্যে আমলে কে সর্বোত্তম তা পরীক্ষা করার জন্য। আর আপনি যদি বলেন, মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, কাফিররা প্রতিউত্তরে অবশ্যই বলবে, এতো শুধুই স্পষ্ট যাদু।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর সক্ষমতা রাখেন। মাত্র ছয় দিনে তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এর পূর্বে তাঁর আরশ ছিলো পানির ওপর। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সা. বলেন, হে বনূ তামীম! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো, আপনি তো আমাদেরকে অনেক সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এবার কিছু এনে দিন। নবীজী বললেন, হে ইয়ামানবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা গ্রহণ করছি। আপনি আমাদের শোনান– কী ভাবে মাখলুকের সূচনা হয়েছে? নবীজী সা. বলেন, সবার আগে ছিলেন আল্লাহ। তাঁর আরশ ছিলো পানির ওপর। তিনি লাওহে মাহফুযে প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে আলোচনা লিখেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে আল্লাহ ছিলেন। তাঁর পূর্বে কেউ ছিলো না। অপর বর্ণনায় এসেছে, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু ছিলো না। তাঁর আরশ ছিলো পানির ওপর। তিনি প্রতিটি জিনিসের বিবরণ লেখেন। অতঃপর আসমান-জমিন সৃষ্টি করেন। মুসলিম শরীফে এসেছে, জমিন ও আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা মাখলুকের তাকদীর লেখেন। তাঁর আরশ পানির ওপর ছিলো। সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে একটি হাদীসে কুদসী বর্ণিত রয়েছে, হে মানুষ! তুমি আমার রাস্তায় ব্যয় করো। আমি তোমাদেরকে দেবো। আরো বলেন, আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ। দিন-রাত

সার্বক্ষণিক ব্যয়ের কারণে সেখানে কোনো ধরনের সংকট সৃষ্টি হয় না। ভেবে দেখো, আসমান-জমিন সৃষ্টি করার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনি কী পরিমাণ দান করেছেন! এতদসত্ত্বেও তাঁর ডান হাতে যা ছিলো, সেখানে কোনো ধরনের কমতি হয়নি। তাঁর আরশ ছিলো পানির ওপর। তাঁর হাতে 'মীযান'—দাঁড়িপাল্লা রয়েছে। যা তিনি উঁচু ও নিচু করেন।

মুসনাদে এসেছে, আবু রাযীন লক্বীত ইবনে আমের মুনফিক উকাইলী রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করেন, মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের রব কোথায় ছিলেন? উত্তরে নবীজী বললেন, عماء [আমা]-এ ছিলেন। যার নিচেও বাতাস; ওপরেও বাতাস। এরপর তিনি আরশ সৃষ্টি করেন। মুজাহিদ রহ. বলেন, মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ ছিলো পানির ওপর। ওয়াহাব, যমরা, কতাদাহ, ইবনে জরীর সহ প্রমুখ অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। কতাদাহ রহ. বলেন, এখানে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, আসমান-জমিন সৃষ্টির পূর্বে তিনি কী ভাবে মাখলুক সৃষ্টির কাজ শুরু করেন। রবী' ইবনে আনাস রহ. বলেন, তাঁর আরশ পানির ওপর ছিলো। আসমান-জমিন সৃষ্টি করার পর তিনি ওই পানি দু'ভাগ করেন। অর্ধভাগ আরশের নিচে। এটাই 'বাহরে মাসজূর'।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আরশকে 'আরশ' বলা হয় উচ্চতার কারণে। সা'দ ত্বাঈ রহ. বলেন, আরশ লাল ইয়াকুত পাথর দিয়ে তৈরি। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা তেমনই ছিলেন, যেমনটি তিনি তাঁর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কারণ, ওই সময় অন্য কিছুই ছিলো না। শুধু ছিলো পানি। আর তার ওপর ছিলো আরশ। আরশের ওপর ছিলেন মহত্ত্ব, দয়া, মর্যাদা, সাম্রাজ্য, রাজত্ব, ক্ষমতা, জ্ঞান, সহিষ্ণুতা, করুণা ও নিয়ামতের অধিকারী আল্লাহ। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

এ আয়াত সম্পর্কে একবার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, পানি কিসের ওপর ছিলো? তিনি বলেন, বাতাসের পিঠের ওপর। এরপর বলেন, আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে। আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করো। মনে রেখো, তোমরা অর্থহীন সৃষ্টি হওনি। আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মাঝখানে যা আছে সেগুলোও অর্থহীন সৃষ্টি হয়নি। এ ধরনের কথা একমাত্র কাফেররাই বিশ্বাস করে। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে আগুনের দুর্ভোগ।

এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ الخ —'তোমরা কি মনে করো— আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? আর তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে না? আল্লাহ উচ্চ মর্যাদাবান। তিনি প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তিনি আরশের মালিক।'

আরেক আয়াতে এসেছে, 'আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।' এরপর বলেন, لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا—'যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে?' আল্লাহ এখানে 'উত্তম আমলকারী' বলেছেন; 'অধিক আমলকারী' বলেন নি। কারণ, উত্তম আমলের সংজ্ঞা হলো, যে আমলের মাঝে একনিষ্ঠতা রয়েছে; যা রাসূল সা.-এর শরীয়ত অনুসারে পালিত হয়েছে। এদু'টো বিষয়ের মধ্য হতে যদি কোনো একটিও না হয় তাহলে সেই আমল মূল্যহীন ও বৃথা।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ—'হে নবী! আর আপনি যদি বলেন, 'মৃত্যুর পর নিশ্চয় তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে', যেই আল্লাহ তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন তখন তারা পরিষ্কার বলে দেবে, আমরা তা মানি না। অথচ তারা এ কথা স্বীকার করে ও মানে যে, আল্লাহই জমিন-আসমান সৃষ্টি করেছেন। আর একথা স্পষ্ট যে, কোনো বিষয় উদ্ভাবন করতে প্রথমে যদি কষ্ট না হয় তাহলে দ্বিতীয়বার তা সৃষ্টি করতে কেনো তাঁর পক্ষে কষ্ট হবে? প্রথমটির তুলনায় তো আরও সহজ হবার কথা। এ কথাই অন্য আয়াতে এভাবে বলেছেন, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ—'তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্যে খুবই সহজ।' অন্য আয়াতে বলেন, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ—'তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অতঃপর পুনরুজ্জীবিত করা আমার জন্যে ততোটাই সহজ; যতোটা সহজ একটি প্রাণ সৃষ্টি করা।' অথচ মানুষ তা স্বীকার করতো না এবং এটিকে স্পষ্ট যাদু বলে অভিহিত করতো। তাদের অন্তরে কুফর ও শিরক বদ্ধমূল হয়ে আছে বলেই তারা ওই কথাকে জাদুর প্রভাব মনে বলে মনে করতো।

## সূরা রা'দের ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○

আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ স্থাপন করেছেন যা তোমরা দেখছো। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পার।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার পূর্ণ ক্ষমতা ও বিশাল সাম্রাজ্যকে দেখো, তিনি আসমানকে কোনো ধরনের স্তম্ভ ব্যতিরেকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। দেখো, জমিন থেকে আকাশ কতো উঁচুতে অবস্থিত! এতো বড় কাজটি তিনি শুধু 'আদেশ' করেই সম্পন্ন করেছেন। এই আসমানের শেষ কোথায় তা কেউ জানে না। গোটা মহাবিশ্বকে আকাশ বেষ্টন করে আছে। সবদিক থেকেই তা উঁচু। জমিন থেকে আকাশের দূরত্ব পাঁচশো বছরের পথ। প্রতিটি জায়গা থেকে তা সমান উঁচু। আসমানের পুরুত্ব ও ঘনত্বও পাঁচ শো বছরের রাস্তা। সেটির ওপর দ্বিতীয় আরেকটি আসমান এই নিম্নের আসমানকে বেষ্টন করে আছে। প্রথম আসমান থেকে দ্বিতীয় আসমানেরও অনুরূপ পাঁচশ' বছরের দূরত্বের পথ। এভাবে সমান দূরত্বে তৃতীয় আসমান, চতুর্থ আসমান, পঞ্চম আসমান, ষষ্ঠ আসমান ও সপ্তম আসমান অবস্থিত। এ কথা অন্য আয়াতে তিনি এভাবে বলেছেন, اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ তিনি আল্লাহ– যিনি সাত আসমান ও সমান সংখ্যক জমিন সৃষ্টি করেছেন।

হাদীসে এসেছে, সাত আসমান ও তন্মধ্যকার যা কিছু আছে সেগুলো আল্লাহর আরশের তুলনায় এমন, যেন বিশাল ময়দানে ছোট্ট পরিসরে কোনো সমাবেশ। আর কুরসি আরশের তুলনায় তদ্রূপ। আরশের পরিমাপ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। পূর্ববর্তী কিছু আলেমগণের অভিমত হলো, আরশ হতে জমিনের দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের রাস্তা। আর আরশ ইয়াকুত পাথরের তৈরি। কিছু মুফাসসির বলেন, আকাশের স্তম্ভ রয়েছে; কিন্তু তা দেখা যায় না। কিন্তু ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া রহ. বলেন, আসমান জমিনের ওপর গম্বুজের মতো স্থাপিত রয়েছে। অর্থাৎ তাতে কোনো স্তম্ভ নেই। কুরআন কারীমের উপস্থাপনাশৈলী এই অভিমতটিকে সত্যয়ন করে। বিশেষত وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ—'তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়।' অতএব খুঁটিহীন আকাশের এতো উঁচুতে এভাবে স্থাপিত হওয়া ও দাঁড়িয়ে থাকা আল্লাহর বিশাল কুদরতের পরিচয় বহন করে। যা তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছো।

উমাইয়া ইবনে আবুস সালত এ প্রসঙ্গে কিছু কবিতা লেখেছেন। তার কবিতা সম্পর্কে নবীজী সা. মন্তব্য করেছেন যে, 'তার কবিতা ঈমান এনেছে আর তার অন্তর কুফরী লালন করছে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ কবিতা যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রা.-এর কবিতা। যার মধ্যে আছে –

وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلِ مَنٍّ وَّرَحْمَةٍ
بَعَثْتَ إِلَى مُوسٰى رَسُولًا مُّنَادِيَا
فَقُلْتَ لَهُ فَاذْهَبْ وَهَارُونَ فَادْعُوَا

إِلَى اللهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًا
وَقُولَا لَهُ أَنْتَ رَفَعْتَ هٰذِهِ
بِلَا عَمَدٍ أَوْ فَوْقَ ذٰلِكَ بَانِيَا
وَقُولَا لَهُ آأَنْتَ سَوَّيْتَ وَسَطَهَا
مُنِيرًا، إِذَا مَا جَنَّكَ اللَّيْلُ هَادِيَا
وَقُولَا لَهُ مَنْ أَنْبَتَ الْحَبَّ فِي الثَّرٰى
فَيَصْبَحُ مِنْهُ الْعَشْبُ يَهْتَزُّ رَابِيًا
وَقُولَا لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدْوَةً
فَيُصْبِحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْأَرْضِ ضَاحِيَا
وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّهُ فِي رُءُوسِهِ
فَفِي ذٰلِكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيَا

আপনি সেই আল্লাহ– যিনি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে নিজ নবী মূসা আ.-কে হারুন আ. এর সাথে রাসূল বানিয়ে ফেরআউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এবং বলে দিয়েছিলেন যে ওই অহংকারী বাক্যব্যয়কারীকে বলুন– তুমি কি এই উঁচু আকাশ স্তম্ভ ছাড়া তৈরি করেছো? ফলে সেগুলো নিজেদের মতো করে সুস্থির আছে? এবং তুমিই কি আকাশের এমন আলোকবর্তিকা সৃষ্টি করেছো যা রাতের অন্ধকারে তোমাকে পথ দেখায়? তোমরা তাকে বলো– কে ঊষায় সূর্য প্রেরণ করেন– যার আলোয় জমিন আলোকিত হয়ে ওঠে? তোমরা তাকে বলো– কে মাটির বুকে বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গমন করেন? যা একসময় ফসলের মাঠে সবুজের সমারোহ ঘটিয়ে হিল্লোল সৃষ্টি করে? সেই গাছের লতায় পাতায় একসময় মুকুল দেখা দেয়, সেখান থেকে ফল বেরোয়? কুদরতের এই বিশাল নিদর্শন এক গভীর চিন্তাশীল মানুষের জন্য আল্লাহ যে আছে তা কি প্রমাণ করে না?

আয়াতে এসেছে, 'অতঃপর আল্লাহ আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন'। অবস্থা, তুলনা, সাদৃশ্য ইত্যাদি থেকে আল্লাহর সত্তা পূর্ণ পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে। চন্দ্র-সূর্য তাঁর নির্দেশেই আবর্তিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়কাল তথা কিয়ামত পর্যন্ত সেগুলোর এভাবেই আবর্তন চলতে থাকবে। যেমন, সূরা ইয়াসীনে ইরশাদ হয়েছে, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا—'সূর্য নিজ কক্ষপথে ভ্রমণ করছে'। এখানে مستقر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তা আরশের নিচে রয়েছে। যা জমিনের নিম্নদেশের সঙ্গে অন্য দিক থেকে মিলিত আছে। সমস্ত তারকা এখানে এসে

আরশ থেকে দূরে সরে যায়। কেননা বহু দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত সত্য কথা এটাই যে, তা গম্বুজাকৃতির। পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত আকারে আছে। অন্য আসমানের মতো সেটি পরিবেষ্টনকারী নয়। কেননা তার পায়া আছে। একদল বহনকারী ফেরেশতা তা বহন করছেন। গোলাকার ও ঘূর্ণায়মান আকাশের ক্ষেত্রে যা কল্পনা করা যায় না। কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরখ করে দেখে সে অবশ্যই উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। সকল প্রশংসা ও কৃতিত্ব আল্লাহর।

এখানে শুধু চন্দ্র ও সূর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এদু'টোই চলমান সাতটি গ্রহের মধ্যে বড় ও উজ্জ্বল। এ দু'টো যখন আল্লাহর বশীভূত তখন অন্যগুলো বশীভূত হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন, আল্লাহ বলেছেন, তোমরা চন্দ্র ও সূর্যের সেজদা করো না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, অন্য তারকাগুলোরও সেজদা করো না। যা অন্য আয়াতে স্পষ্টাকারে আলোচিত হয়েছে, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ الخ...—তিনি সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র– যা চলমানতায় আল্লাহর আদেশের অনুগামী। শোনো, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা ও আদেশ দান করা। আল্লাহ্, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে তাঁর একত্ববাদের ওপর অসংখ্য দলীল বিশদাকারে তুলে ধরেছেন। যেন তোমরা তাঁর তাওহীদে বিশ্বাসী হও এবং মেনে নাও যে, তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করার পর পুনরুজ্জীবিত করবেন।

## সূরা রা'দের ৩-৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

- وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ؕ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

তিনিই জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। আর জমিনে রয়েছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখণ্ড, আঙ্গুর-বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ, যেগুলোর মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদ্গত আর কিছু ভিন্ন ভিন্ন

মূল থেকে উদ্গাত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর আমি খাওয়ার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দিই। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা বোঝে।

ব্যাখ্যা : পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ ঊর্ধ্বজগত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি নিম্নজগত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ জমিনকে দৈর্ঘে-প্রস্থে বিস্তৃত করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনিই সেখানে মজবুত পাহাড় স্থাপন করেছেন। তিনিই সেখানে নদ-নদী ও ঝরনা প্রবাহিত করেছেন। যেন বিভিন্ন স্বাদের ও ধরনের ফল-ফুলের গাছগুলো ওই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়। আল্লাহ সেখানে জোড়ায় জোড়ায় ফল সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোর স্বাদ টক, মিষ্টি ইত্যাদি। দিন-রাত একইভাবে একের পর এক রীতিমতো উৎপন্ন হচ্ছে। একটি ফল বিদায় নিতেই অন্যটি চলে আসে। কাজেই স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সবখানেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর একক নিয়ন্ত্রণ। যে ব্যক্তি গভীর মনোযোগের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিনৈপুণ্য, কর্মকুশলতা ও প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিদর্শনগুলো দেখবে সে হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পারে। জমিনের টুকরোগুলো পরস্পরে মিলে মিশে আছে। সুতরাং আল্লাহর কী কুদরত! এক অংশ থেকে ফসল আবাদ হচ্ছে আর অন্য অংশ অনাবাদ পড়ে আছে। কোথাও মাটির রং লাল, কোথাও সাদা, কোথাও হলদেটে এবং কোথাও কালচে। কিছু মাটি পাথুরে। কোথাও নরম পলিমাটি। মাটির ওপর বয়ে যাওয়া পানির প্রবাহও একরকম নয়। কোথাও লবণাক্ত পানি। কোথাও সুমিষ্ট পানি। কিছু নদীর পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ। কোথাও পানির রং ভীষণ ঘোলাটে। মোটকথা, প্রকৃতির এই রূপবৈচিত্র্য মহান আল্লাহর কুদরতের অনিন্দ্য নিদর্শন। নীরবকণ্ঠে প্রকৃতি বলে, এই সুবিশাল প্রকৃতির একক স্রষ্টা আল্লাহ। যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, মহাপরাক্রান্ত, অংশীদারহীন একক সম্রাট। না তিনি ছাড়া আমাদের কোনো স্রষ্টা বা রব আছে। আর না আমাদের দ্বিতীয় কোনো প্রতিপালক বা উপাস্য আছে।

বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, কোথাও একটি গুঁড়ির মধ্যে অর্থাৎ বৃক্ষের এক কাণ্ডে একাধিক গাছের শাখায় খেজুর হয়ে থাকে আবার একটি কাণ্ডে খেজুরের ঝাড়ই হয়ে থাকে। صنوان ও غير صنوان (একই মূল থেকে উদ্গাত জোড় বৃক্ষ কিংবা জোড় শাখা অথবা কোনোটাই না) বলে এ কথাই বোঝানো হয়েছে। অন্য গুণীজনদের থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত রয়েছে। হাদীসেও অনুরূপ ব্যাখ্যা এসেছে। মোটকথা, ফল-ফলাদির পরস্পরে প্রচুর বৈচিত্র্য রয়েছে। এখানে প্রজাতির পার্থক্য আছে, প্রকারের পার্থক্য আছে। আছে রং, স্বাদ, গন্ধের পার্থক্য। গাছগুলোর পাতাও এক নয়। সতেজতার মাঝেও রকমফের রয়েছে। কোনোটা অতিমিষ্ট। কোনোটি সীমাহীন তেতো। কোনোটি

অত্যন্ত সুস্বাদু। কোনোটি চরম বিস্বাদ। কোনোটির গায়ের রং লাল, কোনোটির হলুদ, কোনোটির সাদা এবং কোনোটির গায়ের রং কালো। অনুরূপভাবে সতেজতার ক্ষেত্রেও পরস্পরে ভিন্নতা রয়েছে। প্রতিটি ফলের মাঝে স্বাতন্ত্র্য আছে; অথচ খাদ্য হিসেবে সবগুলোই এক। এই ফলগুলো মহান আল্লাহর কুদরতের অনুপম বৈচিত্র্যের প্রমাণ বহন করছে। সচেতন ও বুদ্ধিমান মানুষদের জন্যে এতে অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর কুদরতের চমৎকার নিদর্শন বহন করে। তিনি যা চান হয়ে যায়। জ্ঞানীদের জন্যে এ আয়াতগুলো ও এ নিদর্শনগুলোই যথেষ্ট।

## সূরা রা'দের ৮-৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ○ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ○

আল্লাহ জানেন প্রতিটি নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা বাড়ে ও কমে। তাঁর নিকট প্রতিটি বস্তুরই নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের জ্ঞানী; তিনি মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কাছে পৃথিবীর কোনো জিনিসই অজ্ঞাত নয়। সমস্ত জীবিত মাতৃজাতসমূহ; প্রাণী হোক কিংবা মানুষ; তাদের পেটের সন্তানের ও তাদের গর্ভের খবর আল্লাহই ভালো জনেন। তাদের পেটে কি আছে, অর্থাৎ ছেলে না মেয়ে, ভালো না মন্দ, সৎ না অসৎ, বাঁচবে না মরবে আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন। সেমতে ইরশাদ করেন, هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ الخ —'তিনি তোমাদের সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে আড়ালে থাকো।'[৪২]

অন্যত্র বলেন, يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ الخ—'তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক তিন তিনটি অন্ধকারে।'[৪৩]

আরো বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ الخ—'আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়।'[৪৪]

---

৪২. সূরা নাজম : ৩২।
৪৩. সূরা যুমার : ৬।
৪৪. সূরা মুমিনূন : ১২-১৪।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের সৃষ্টি তার মায়ের উদরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা হতে থাকে। এরপর চল্লিশ দিন জমাট রক্তের আকারে থাকে। চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ডের রূপে থাকে। এরপর মহান স্রষ্টা আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান। যাকে চারটি কথা লিখে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। তার রিযিক, তার বয়স, তার ভালো ও মন্দ হওয়া।' অন্য হাদীসে এসেছে, ওই সময় ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন– হে আমার রব! সে ছেলে হবে, না মেয়ে হবে? সৌভাগ্যবান হবে, না হতভাগা হবে? তার জীবিকা কী হবে? তার আয়ুষ্কাল কতোদিন হবে? আল্লাহ তখন বলে দেন এবং তিনি তা লেখে নেন।

নবী কারীম সা. অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন, গায়বের পাঁচটি বিষয় আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানে না। তাহলো, কিয়ামতের সঠিক দিন-ক্ষণ। দ্বিতীয়ত কখন বৃষ্টি ঝরবে, তৃতীয়ত গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে, চতুর্থত প্রতিটি ব্যক্তি আগামীকাল কী কাজ করবে, পঞ্চমত কার কোথায় মৃত্যু হবে। এগুলো একমাত্র আল্লাহই জানেন।

وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ—'এবং গর্ভাশয়ে যা কমে'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গর্ভ পড়ে যাওয়া। আর وَمَا تَزْدَادُ—'ও বাড়ে'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কী ভাবে তা পূর্ণ হয়, সে খবরও আল্লাহ তাআলাই জানেন। দেখা যায়, কোনো নারী পূর্ণ দশ মাস গর্ভ ধারণ করেন। কেউ ধারণ করেন নয় মাস। কারো গর্ভ বাড়ে, কারো গর্ভ কমে। নয় মাস থেকে বাড়া-কমার বিষয়টিও আল্লাহ তাআলার অবগতিতে রয়েছে।

যাহহাক রহ. বলেন, আমি দু' বছর মায়ের পেটে থেকেছি। আমি যখন জন্মগ্রহণ করি তখন আমার সামনের দু'টি দাঁত বেরিয়েছিলো।' আয়েশা রা. বলেন, গভর্ধারণের শেষ সময়কাল হচ্ছে দু' বছর। কমে যাওয়ার দ্বারা কারো মতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, গর্ভধারণের সময়কালের মধ্যে রক্ত আসা। আর বেড়ে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, গর্ভধারণের সময়কাল নয় মাসের অধিক হওয়া। মুজাহিদ রহ. বলেন, নয় মাসের পূর্বে যদি গর্ভবতীর রক্ত চলে আসে তাহলে গর্ভ নয় মাসের অধিক হয়ে যায়। ঋতুস্রাবের সময়কালের মতো। রক্ত আসার কারণে শিশুর উপকার হয়। আর রক্ত না এলে শিশু পূর্ণ ও বড় হয়।

মাকহূল রহ. বলেন, 'বাচ্চা তার মায়ের পেটে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ও শান্তিতে থাকে। মায়ের ঋতুস্রাবের রক্ত তার খাবারের যোগান দেয়। এই খাদ্য তার ভিতর অনাহুত ও নির্বিঘ্নে পৌঁছতে থাকে। এ কারণে গর্ভধারণের সময়কালে কোনো মহিলার ঋতুস্রাব হয় না। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন মাটিতে পড়া মাত্রই চিৎকার করতে থাকে। এই অপরিচিত জায়গায় সে আতংকিত হয়ে পড়ে। যখন তার নাভি কেটে দেয়া হয় তখন আল্লাহ তার খাদ্য মায়ের বুকে

পৌঁছে দেন। আর এখানেও সে কোনো ধরনের চেষ্টা-তদবীর ছাড়াই খাবার পেয়ে যায়। এরপর সে যখন খানিকটা বড় হয় তখন সে নিজের হাতে পানাহার করতে শেখে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর শুরু হয় জীবিকার জন্যে হা-পিত্যেশ। কোথাও রুজি প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা দেখলে প্রাণ হারানোর শঙ্কা থাকা সত্যেও পিছপা হয় না। হে বনি আদম! তোমার ওপর আফসোস ও বিস্ময়! যিনি তোমাকে মায়ের পেটে খাবার দিলেন, যিনি তোমাকে মায়ের কোলে খাবার দিলেন, যিনি তোমাকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত খাবার দিলেন; আজ তুমি সাবালক হয়ে বলতে শুরু করেছো– হায়! কোত্থেকে খাবার পাবো? মৃত্যু হোক বা মেরে ফেলা হোক। প্রাণের বিনিময়ে হলেও খাবার চাই। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন, وكل شيئ عنده بمقدار 'আল্লাহর কাছে প্রতিটি বস্তুর নির্দিষ্ট পরিমাপ রয়েছে।' বান্দার জীবিকা, হায়াত– সবই নির্ধারিত।

নবী কারীম সা.-এর এক কন্যা লোকমারফত সংবাদ পাঠালেন, আমার ছেলে মৃত্যুমুখে পতিত। এমতবস্থায় আপনি এখানে আসলে সেটা আমার জন্যে খুশির কারণ হবে।' নবীজী লোকটিকে বললেন, যাও! গিয়ে তাঁকে বলো, আল্লাহ যা নিয়ে নিবেন সেটা তাঁরই এবং যা দিয়ে দেবেন সেটাও তাঁরই। প্রতিটি বস্তুর সঠিক পরিমাপ তাঁর কাছে আছে। কাজেই তাকে বলে দাও– সে যেন সবর করে এবং আল্লাহর কাছে সাওয়াবের প্রত্যাশা জিইয়ে রাখে।' আল্লাহ সব কিছুই জানেন। যা বান্দার কাছে গোপন আছে এবং যা তার কাছে প্রকাশ্য আছে সবই। তাঁর কাছে কিছুই গোপন থাকে না। তিনি সবার চেয়ে বড়। তিনি সবার চেয়ে উচ্চ। প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে তিনি অবহিত। তাঁর সামনে সমস্ত মাখলুক অক্ষম। সমস্ত মস্তক তাঁর সামনে অবনত হয়ে আছে। সবাই তাঁর কাছে নিরূপায়।

## সূরা রা'দের ১০-১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ○ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ○

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে বিচরণ করে, তারা আল্লাহর জ্ঞানে সমান। মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন

করে। আর যখন আল্লাহ কোনো জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত করা যায় না এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর জ্ঞান সকল মাখলুককে বেষ্টন করে আছে। কোনো জিনিস তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। তিনি ক্ষীণ ও উচ্চ সব ধরনের শব্দই শুনতে পান। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। বান্দা কোনো কিছু লুকানোর চেষ্টা করুক, বা না করুক– আল্লাহর কাছে তা কখনই গোপন থাকে না।

আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহর শ্রবণ-ক্ষমতা পৃথিবীর প্রতিটি শ্রবণ শক্তিকে বেষ্টন করে আছে। আল্লাহর কসম! একদিনের ঘটনা। এক মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে আসে। ওই সময় সে এমনভাবে বলছিলো যে, আমি পাশে থাকা সত্ত্বেও ঠিকমত শুনতে পাইনি। তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন,قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا الخ —'ওই মহিলার সমস্ত কানকথা আল্লাহ শুনেছেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।'

কোনো ব্যক্তি যদি তার বাড়ির বেজমেন্টে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে তার বিবরণ আল্লাহ ততোটাই সুস্পষ্টভাবে জানেন, যেভাবে দিনের আলোয় প্রকাশ্যভাবে জনবহুল পথে চলাচলকারী ব্যক্তিটির কথা জানেন। যেমনটি ইরশাদ করেছেন أَلاَ حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ —'শোনো, তারা তখন কাপড়ে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে, তিনি তাও জানেন যা কিছু তারা চুপিসারে বলে আর প্রকাশ্যে বলে।'[৪৫] অন্যত্র বলেন,وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ —'বস্তুতঃ যে কোনো অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোনো অংশ থেকেই পাঠ করো কিংবা যে কোনো কাজই তোমরা করো অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর।'[৪৬]

এরপর বলেন, لَهُ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ —'মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে।' অর্থাৎ মানুষের হিফাযতের দায়িত্ব দিয়ে তাদের চতুর্দিকে ফেরেশতাদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তারা কষ্ট ও বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করে থাকেন। যেমন, একদল ফেরেশতা নিযুক্ত আছে বান্দার আমল পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে। তারা পর্যায়ক্রমে একের পর এক আসা-যাওয়া করেন। রাত ও দিনের জন্যে পৃথক পৃথক ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তদ্রূপ আমলনামা লেখার জন্যে মানুষের ডানে ও বামে দু'জন ফেরেশতা দায়িত্বরত আছেন। ডান দিকে ফেরেশতা বান্দার সাওয়াব ও বাম দিকের ফেরেশতা গুনাহের বিবরণ লেখেন। অনুরূপ দু'জন ফেরেশতা মানুষের সামনে ও পেছনে নিযুক্ত রয়েছে।

---

৪৫. সূরা হুদ : ৫।
৪৬. সূরা ইউনুস : ৬১।

তাদের দায়িত্ব হলো, বান্দার হিফাযত করা। কাজেই প্রতিটি মানুষ চারজন ফেরেশতার মাঝখানে অবস্থান করেন। আমল লিপিবদ্ধকারী দু'জন ডানে-বামে এবং হিফাযতকারী দু'জন ফেরেশতা সামনে পেছনে অবস্থান করছেন। আবার দিন ও রাতের সময় পৃথক পৃথক ফেরেশতা দায়িত্ব পালন করে।

যেমন, এক হাদীসে এসেছে, তোমাদের কাছে ফেরেশতারা দিনে-রাতে পর্যায়ক্রমে আসে। ফজর ও আসর নামাযের সময় উভয় দলের সাক্ষাৎ ঘটে। রাতে অতিবাহিতকারী ফেরেশতাগণ আকাশে উঠে যান। আল্লাহ যদিও বান্দাদের অবস্থা পুরোপুরি জানেন, তারপরও তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এসেছো? উত্তরে তারা বলে, আমরা যাওয়ার সময় যেমন তাদেরকে নামাযরত পেয়েছি। আসার সময়ও তাদেরকে নামাযরত ছেড়ে এসেছি।'

অন্য হাদীসে এসেছে, তোমাদের সঙ্গে এমন সঙ্গী আছেন যারা তোমাদের মল-মূত্র ত্যাগ ও যৌন সম্ভোগের সময় ছাড়া অন্য সময় তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। কাজেই তাঁদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাঁদেরকে সমীহ ও শ্রদ্ধা করা তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব।

আল্লাহ যখন বান্দার কোনো ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত নেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ভাষ্যমতে ওই মুহাফিয ফেরেশতা তা সম্পন্ন করে দেন। মুজাহিদ রহ. বলেন, প্রত্যেক বান্দার সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা রয়েছেন। যিনি তার ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় তাকে অনিষ্টকারী জ্বিন ও মানুষ, বিষধর প্রাণী ও অন্যান্য বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। প্রতিটি অনিষ্টতা প্রতিহত করেন। তবে আল্লাহ যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তবে তার কথা আলাদা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'মানুষ অনেকটা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো– যাদের চতুর্পাশে প্রহরী রয়েছে।' যাহহাক রহ. বলেন, 'মানুষ যদি শিরিকি কাজও করে, তারপরও আল্লাহ তার জন্যে রাজাদের মতো প্রহরার ব্যবস্থা রাখেন।' হতে পারে, এ কথার ব্যাখ্যা হলো, রাজা-বাদশাহগণ যেভাবে প্রহরীদের প্রহরায় অবস্থান করেন, তদ্রূপ প্রতিটি বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের প্রহরাধীন থাকে।

তাফসীরে ইবনে জারীরে এসেছে, সাইয়্যেদুনা উসমান রা. নবী কারীম সা.-এর দরবারে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দার সঙ্গে কতজন ফেরেশতা থাকেন? নবীজী সা. বলেন, একজন ফেরেশতা ডান দিকে থাকেন। যার দায়িত্ব বান্দার নেককাজ লেখা। আরেকজন বাম দিকে থাকেন। তার দায়িত্ব বান্দার গুনাহ লেখা। তবে ডানদিকের ফেরেশতা বাম দিকের ফেরেশতার দায়িত্বে থাকেন। যখন তুমি কোনো নেককাজ করো তখন ডান

দিকের ফেরেশতা একটি নেককাজের ওপর দশ নেকি লেখেন। এর বিপরীতে তুমি যদি কোনো গুনাহের কাজ করো তখন বামদিকের ফেরেশতা ডান দিকের ফেরেশতার কাছে তা লেখার অনুমতি প্রার্থনা করে। সে তখন বলে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। হতে পারে সে তাওবা-ইসতিগফার করে নেবে। এভাবে সে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে। ততোক্ষণে যদি বান্দা তাওবা না করে তখন সে ফেরেশতাকে বলে, 'এখন লিখে নাও। আল্লাহ আমাদেরকে তার থেকে পরিত্রাণ দিন। সে খুবই মন্দ সঙ্গী। সে আল্লাহর পরোয়া করেনি। আমাদের থেকেও লজ্জা করেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ—'সে যে কথাই উচচারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।'[৪৭] আর দু'জন ফেরেশতা তোমার আগে-পিছে রয়েছেন। আল্লাহ বলেন, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ—'মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের পর এক আগমনকারী প্রহরী'। আর একজন ফেরেশতা তোমার মাথার চুল ধরে আছেন। যখন তুমি আল্লাহর কাছে নম্রতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করো তখন তিনি তোমার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন। আর যখন তুমি আল্লাহর সামনে অবাধ্যতা ও অহংকার প্রকাশ করো তখন তিনি তোমাকে অক্ষম ও লাঞ্ছিত করে দেন। দু'জন ফেরেশতা তোমার ঠোঁটের ওপর আছেন। তুমি আমার ওপর যে দরূদ পাঠ করো তিনি তা সংরক্ষণ করেন। একজন ফেরেশতা তোমাদের মুখের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন; যেন সাপ জাতীয় কোনো ক্ষতিকর কিছু তোমার গলায় ঢুকে পড়ার সুযোগ না পায়। দু'জন ফেরেশতা তোমার চোখের ওপর আছেন। এভাবে প্রত্যেক আদমসন্তানের সঙ্গে দশজন করে ফেরেশতা রয়েছে। দিনের ও রাতের ফেরেশতা আলাদা। এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে বিশজন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। অন্যদিকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে ইবলিসের প্রাত্যহিক কসরত চলছে। রাতের বেলা ইবলিসের সন্তানরা এ কাজে ব্যস্ত থাকে।

মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আছে, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন জ্বিন ও একজন ফেরেশতা সঙ্গী রয়েছে। উপস্থিত লোকেরা প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গেও কি অনুরূপ রয়েছে? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার ওপর সাহায্য করেছেন। ফলে সে আমাকে ভালো ছাড়া অন্য কোনো কিছু বলে না। (মুসলিম শরীফ) এই ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করে। কা'ব রহ. বলেন, যদি বনি আদমের জন্যে প্রতিটি নরম ও শক্ত বস্তু খুলে যেতো তাহলে সে সব কিছু নিজ চোখে দেখতে পেতো। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই প্রহরী ফেরেশতাগণ মোতায়েন না হতেন যারা পানাহার ও লজ্জাস্থানের হিফাযতের দায়িত্ব পালন করে থাকেন; তাহলে

---

৪৭. সূরা ক্বাফ : ১৮।

আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে অবশ্যই ছিনিয়ে নেওয়া হতো।' আবু উমামা রহ. বলেন, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রহরী ফেরেশতা রয়েছেন। যারা তাকদীরের বিষয়গুলো ছাড়া সমস্ত বিপদ-আপদ বান্দাদের থেকে প্রতিহত করতে থাকে।

মুরাদ গোত্রের এক লোক হযরত আলী রা.-এর কাছে এসে দেখতে পেলো তিনি নামাযে মগ্ন রয়েছেন। নামায শেষে সে তাঁকে জানালো যে, 'মুরাদ গোত্রের লোকেরা আপনাকে হত্যার ফন্দি আঁটছে। কাজেই আপনি প্রহরী নিযুক্ত করুন'। তখন তিনি বললেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে প্রহরী হিসেবে দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন। তাকদিরে লেখা নেই এমন কোনো অনিষ্টতা মানুষের কাছে পৌঁছতে দেয় না। মনে রেখো, মৃত্যু হলো একটি মজবুত কেল্লা ও উৎকৃষ্ট ঢাল। কথিত আছে, তারা আল্লাহর নির্দেশেই তাকে রক্ষা করেন।

যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা যে ঝাড়ফুঁক করি তার কারণে কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির স্থগিত হয়? উত্তরে নবীজী সা. বলেন, এটিও তো আল্লাহরই নির্ধারিত।'

ইবনে আবী হাতেমে আছে, 'বনি ইসরাঈলের কোনো এক নবীর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি তথা প্রত্যাদেশ এলো, স্বজাতিকে বলে দিন– কোনো জনপদ বা কোনো ঘরের লোক যদি আল্লাহর অনুগত্য করতে করতে এক পর্যায়ে তাঁর অবাধ্যতা করতে শুরু করে দেয় তখন আল্লাহ তাদের থেকে আরামদায়ক জিনিসগুলো উঠিয়ে নিয়ে তাদের ওপর এমন জিনিস চাপিয়ে দেন যা তাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনে।' এর সত্যতা কুরআনের আয়াত থেকেও পাওয়া যায়, إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ —'আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা তখনই পরিবর্তন করেন যখন তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'

উমায়ের ইবনে আবদিল মালিক বলেন, কুফার মিম্বারে বসে আলী রা. আমাদের উদ্দেশে ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, 'আমি যখন চুপ থাকতাম তখন রাসূলুল্লাহ সা. কথা শুরু করতেন। আর যখন আমি জিজ্ঞেস করতাম তখন তিনি আমাকে উত্তর বলতেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমার সম্মান, প্রতিপত্তি ও উচ্চ আরশের শপথ! যেই জনপদ ও যেই ঘরের লোক প্রথমে আমার অবাধ্যতায় জড়িয়ে পড়েছিলো। অতঃপর তা ত্যাগ করে আমার আনুগত্যে লিপ্ত হয় তখন আমিও আমার শাস্তি ও কষ্ট তার থেকে সরিয়ে নিয়ে স্বীয় রহমত ও সুখ দিতে শুরু করি।'

## সূরা রা'দের ১২-১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ○ وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ○

'তিনিই ভয় ও আশা সঞ্চার করার জন্য তোমাদেরকে বিজলী দেখান এবং তিনি ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন। আর বজ্র তাঁর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতাগণও তাঁর ভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন। আর তারা আল্লাহ সম্বন্ধে ঝগড়া করতে থাকে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।'

**ব্যাখ্যা :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এক প্রশ্নকারীর উত্তরে বলেন, বিদ্যুৎ হচ্ছে পানি। মুসাফির তা দেখে আশু কষ্ট ও বিপদের ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়ে। আর বাড়িতে অবস্থানকারী ব্যক্তি বরকত লাভের আশায় অধিক জীবিকার লোভ করে। ওটাই ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করে– যা পানির ভারত্বের কারণে জমিনের কাছাকাছি চলে আসে। অতএব তার মধ্যে পানির ভারত্ব হয়ে থাকে। এরপর বলেন, বজ্রও আল্লাহর তাসবীহ [মহিমা] ও প্রশংসা বর্ণনা করে। অন্যত্রে আছে যে, প্রতিটি জিনিস আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে।

এক হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ তাআলা মেঘমালা সৃষ্টি করেন। যে নাকি ভালোভাবে কথা বলতে পারে এবং হাসে।' সম্ভবত কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য গর্জন করা আর হাসার দ্বারা উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ চমকিত হওয়া।

সা'দ ইবনে ইবরাহীম বলেন, আল্লাহ তাআলা মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘ থেকে ভালো বলতে পারে এবং ভালো হাসতে পারে এমন কেউ নেই। তার হাসি হলো বিজলি। আর তার কথা হলো গর্জন।

মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম বলেন, আমরা শুনেছি, বিদ্যুৎ হচ্ছে একজন ফেরেশতা। যার চারটি মুখ রয়েছে। একটি মুখ মানুষের মতো। অপরটি বলদের মতো। তৃতীয়টি গাধার মতো। আর চতুর্থটি বাঘের মতো। সে যখন লেজ নাড়ে তখন বিদুৎ চমকে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ সা. যখন বজ্রপাতের শব্দ শুনতেন তখন এই দোয়া পড়তেন– اَللّٰهُمَّ، لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ—'হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার ক্রোধ দ্বারা হত্যা করবেন না। আপনার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। সর্বাগ্রে আপনি আমাদের নিরাপদ রাখুন'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ—'পবিত্র সেই সত্তা যাঁর পবিত্রতার কথা বজ্রও বর্ণনা করে। হযরত আলী রা. বজ্রপাতের শব্দ শুনলে এ

দোয়া পড়তেন, سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ—'পবিত্র সেই সত্তা– যার পবিত্রতা তুমি বজ্রও বর্ণনা করেছো।

ইবেন আবী যাকারিয়া রহ. বলেন, যে ব্যক্তি বজ্রপাতের শব্দ শুনে سبحان الله وبحمده পাঠ করে তার ওপর বজ্রপাত হবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. বজ্রপাতের শব্দ শুনলে কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। আর বলতেন, سُبْحَانَ اللهِ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ—'পবিত্র সেই আল্লাহ– যাঁর প্রশংসায় বজ্রও মুখর এবং যাঁর ভয়ে ফেরেশতারাও প্রশংসামুখর।' তিনি বলতেন, এ আয়াতের মাঝে এবং এই শব্দের মাঝে পৃথিবীবাসীদের জন্যে চরম আতঙ্কের বিষয় রয়েছে।'

মুসনাদে আহমদে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, যদি আমার বান্দারা আমার পুরোপুরি আনুগত্য করতো তাহলে আমি রাতে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। দিনের বেলায় সূর্য দেদীপ্যমাণ রাখতাম। আর তাদেরকে বজ্রের ধ্বনি পর্যন্ত শোনাতাম না।'

তাবরানী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সা. বলেন, বজ্রপাতের শব্দ শুনে তোমরা আল্লাহর যিকির করবে। কেননা যিকিরকারীর ওপর বজ্রপাত হয় না।'

আয়াতের মধ্যাংশে আল্লাহ বলেন, وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ —'আর তিনি গর্জনকারী বজ্র পাঠান। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন।' এ কারণেই শেষ যুগে অধিক হারে বজ্রপাত হবে। মুসনাদে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় খুব বেশি বজ্রপাত হবে। এমনকি মানুষ স্বগোত্রের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, 'সকালে কার ওপর বজ্রপাত হয়েছে? তারা উত্তরে বলবে, অমুকের ওপর; অমুকের ওপর।'

আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে জনৈক ঔদ্ধত গোত্রপতিকে ডেকে আনার জন্যে পাঠান। লোকটি যখন উপস্থিত হয়ে বললো, 'রাসূলুল্লাহ সা. আপনাকে ডেকেছেন' তখন সে বললো, 'আল্লাহর রাসূল কে? আল্লাহ কে? আল্লাহ কি সোনার, না রূপার, না তামার'? বার্তাবাহক ফিরে এসে নবী সা.-এর কাছে একথা আলোচনা করলো যে, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম, এ লোকটি ভীষণ অহংকারী। আপনি তাকে ডাকবেন না।' রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'তুমি দ্বিতীয়বার তার কাছে গিয়ে অনুরূপ কথা বলো। বার্তাবাহক তার কাছে পুনরায় রাসূল সা.-এর ডাকার কথা জানালো। কিন্তু ওই পাপিষ্ঠ একই উত্তর দিলো। বার্তাবাহক রাসূল সা.-এর কাছে ফিরে এসে পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে তৃতীয়বার পাঠালেন। এবারও সে নবীজীর ডাকার কথা শুনে পূর্বের মতো উত্তর দিতে শুরু করলো। আর তখনই এক খণ্ড মেঘ এসে তার মাথার ওপর ছেয়ে

গেলো। একটু বজ্রধ্বনি হয়েই তার ওপর বজ্রপাত হলো। যার ফলে তার মাথা থেকে খুলি উড়ে গেলো। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ইহুদি রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে বলতে লাগলো, আল্লাহ কিসের তৈরি? তামা, মুক্তা, নাকি ইয়াকুত পাথরের? এ প্রশ্ন পূর্ণ করার পূর্বেই তার ওপর বজ্রপাত ঘটলো। তৎক্ষণাৎ সে ধ্বংস হলো। যার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কতাদাহ রহ. বলেন, বর্ণিত আছে, একলোক কুরআন কারীমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি অস্বীকার করে তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে তার ওপর নিপতিত হয়। লোকটি সেখানেই মারা যায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এ আয়াতের শানে নুযুলে আমের ইবনে তুফাইল ও আরবাদ ইবনে রবী'আ-এর ঘটনাও বর্ণিত হয়। এ দু'জন ছিলো তৎকালীন আরবের সরদার। তারা মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, আমরা আপনাকে নবী হিসেবে মেনে নেবো, কিন্তু এই শর্তসাপেক্ষে– আপনি আমাদেরকে নবুওয়াতের মাঝে আধাআধি শরীক করে নিবেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন অভিশপ্ত আমের বললো, খোদার কসম! আমি আরবের সবগুলো ময়দান সৈন্য দিয়ে ভরে ফেলবো। উত্তরে নবীজী সা. বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তোমাকে এই সময়ই দেবেন না। অতঃপর তারা দু'জন মদীনায় অবস্থান করতে লাগলো। উদ্দেশ্য ছিলো, সুযোগ পেলে রাসূল সা.-কে হত্যা করবে। ঘটনাক্রমে একদিন তারা সুযোগ পেয়ে গেলো। একজন তো সামনের দিকে এসে রাসূল সা. কে আলাপচারিতায় ব্যস্ত করে দিলো। অন্যজন উন্মুক্ত তারবারি হাতে পেছনে হাজির হলো। কিন্তু মহান আল্লাহ নবীজীকে তাদের এই অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করলেন। ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে মদীনা থেকে চলে গেলো এবং নিজেদের অন্তর জ্বালাকে ফুয়ায়ে ফুয়ায়ে জিয়ে রাখার জন্য আরবদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা শুরু করলো। হঠাৎ একদিন আরবাদের ওপর আকাশ থেকে বজ্রপাত হলো। ঘটনাস্থলেই সে ধ্বংস হয়ে গেলো। অন্যদিকে আমের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলো। এভাবে সেও ছটফট করতে করতে শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করলো। এই নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ওই আয়াতে কারীমা وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ অবতীর্ণ করেন। 'যার ওপর চান বজ্রপাত ঘটাতে পারেন। আরবাদের ভাই লাবীদ ছিলেন কবি। সে স্বরচিত কবিতার মাঝে ঘটনাটি খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছে।

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, আমের বলেছিলো– যদি মুসলমান হয়ে যাই তাহলে আমি কী পাবো? উত্তরে নবীজী সা. বলেন, 'অন্য মুসলমানদের যে অবস্থা তোমারও সেই অবস্থা হবে।' তখন সে বলে, তাহলে তো আমি আর

মুসলমান হবো না। আপনি যদি আমাকে মৃত্যুর পর আপনার স্থলাভিষিক্ত করেন তাহলে দীন কবুল করবো'। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, এ খেলাফত তোমার জন্যেও নয়; তোমার বংশের জন্যেও নয়। তবে তুমি মুসলমান হলে আমার বাহিনী তোমাকে সহায়তা করবে।' সে বললো, আমার তা প্রয়োজন নেই। নজদের বিশাল সেনাবাহিনী এখনো আমার অধীনে চলে। আপনি যদি আমাকে শহর-নগরের অধিপতি বানিয়ে দেন তাহলে আমি ইসলাম কবুল করবো। রাসূল সা. তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তারা দু'জন বেরিয়ে গেলো। বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমের বললো, খোদার কসম! আমি সৈন্য দিয়ে মদিনাকে চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলবো। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আল্লাহ তোমার এ অভিলাষ পূর্ণ হতে দেবেন না। তারা দু'জন পরস্পরে ষড়যন্ত্র করলো যে, একজন রাসূলুল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে থাকবে। অপরজন এ সুযোগে পেছন থেকে তাঁকে হত্যা করবে। তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো কেউ থাকবে না। বড়জোর এরজন্যে রক্তপণ শোধ করতে হবে। ষড়যন্ত্রমাফিক তারা আবার রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে ফিরে এলো। আমের নবীজীকে বললো, আপনি একটু এখানে আসুন। আমরা আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই'। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. উঠে এলেন এবং তার সঙ্গে চললেন। একটি দেয়ালের পাশে সে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলো। তিনি দাঁড়িয়ে তার কথা শুনছিলেন। মোক্ষম সুযোগ পেয়ে আরবাদ তরবারি বের করতে চাইলো; কিন্তু আল্লাহ তাআলা আরবাদের হাত অবশ করে দিলেন। ফলে কোনোভাবেই সে তরবারি বের করতে পারলো না। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হলো। রাসূল সা. পেছন দিকে তাকাতেই পরিস্থিতি বুঝে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ফিরে আসলেন। তারা তখন মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লো। হেরা 'রাকিম'-এর পাথুরে উপত্যকায় পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলো। সা'দ ইবনে মু'আয রা. ও উসাইদ ইবনে হুদাইর রা. সেখানে পৌঁছে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিলেন। তারা সেখান থেকে বের হয়ে 'রাকিম' জনপদে পৌঁছামাত্রই আরবাদের মাথার ওপর বজ্রপাত হলো। তৎক্ষণাৎ হতভাগার সেখানেই নিকৃষ্ট মৃত্যু হয়। আমের অবস্থা বেগতিক দেখে সেখান থেকে দ্রুত দৌড়ে পলায়ন করলো। কিন্তু 'খুরাইম' নামক স্থানে পৌঁছতেই সে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলো। অগত্যা সে বনু সালুল গোত্রের এক মহিলার বাড়িতে অবস্থান করলো। কখনও কখনও সে তার ঘাড়ে ফোঁড়ার ন্যায় গোলটিকে মৃধু চাপ দিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলতো, এটা তো এমন— যেমনটা উটের হয়ে থাকে। হায়! শেষ পর্যন্ত আমি কি সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে মারা যাবো? কতইনা ভালো হতো যদি নিজের ঘরে থাকতাম! অবশেষে তার আর তর সইলো না। একটি ঘোড়া চেয়ে নিয়ে তার ওপর আরোহণ করলো এবং বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলো। তার আর বাড়ি যাওয়া হয়নি। পথিমধ্যেই

এই হতভাগারও নিকৃষ্ট মৃত্যু হয়। ওই প্রেক্ষিতেই اَللّٰهُ اَعْلَمُ থেকে مِنْ وَّالٍ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। এতে যেমন নবীজীর হিফাযতের আলোচনা রয়েছে, তদ্রূপ রয়েছে আরবাদের ওপর বজ্রপাতের বর্ণনা।

আরো বলেন, এরা আল্লাহর ব্যাপারে বিবাদ করে। তাঁর বড়ত্ব ও একত্ববাদ অস্বীকার করে। অথচ আল্লাহ নিজের বিরোধীতাকারী এবং অস্বীকারকারীকে কঠিন শাস্তি দেবেন। যা সহ্য করার মতো নয়। সেমতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়–وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ الخ —'তারা জঘন্য চক্রান্ত করলো। আমিও উত্তম কৌশল অবলম্বন করলাম। অথচ তারা বুঝতেও পারলো না। এখন আপনি দেখুন, তাদের চক্রান্তের পরিণতি কী দাঁড়ায়? আমি তাদেরকে ও তাদের স্বজাতির সকলকে ধ্বংস করে দিলাম।'[৪৮] আল্লাহ আলোচিত আয়াতের শেষাংশে বলছেন, 'আল্লাহ কঠিন পাকড়াওকারী এবং তিনি ভীষণ শক্তিশালী।'

## সূরা ইবরাহীমের ৩২-৩৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ○ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ○ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۗ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ○

'তিনিই আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফলে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন এবং তিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে চলাচল করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে বিরামহীনভাবে এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। আর তোমরা যা চেয়েছো, তার প্রতিটি থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন এবং তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, তবে এর সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অধিক অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।'

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তাআলার অসংখ্য বিচিত্র নেয়ামতের দিকে তাকাও। তিনি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ ও মাটিকে দৃষ্টিনন্দন গালিচা বানিয়েছেন। আসমান

৪৮. সূরা নামল : ৫০-৫১।

থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে মাটি থেকে সুস্বাদু ফল-শস্য ও বাগান তৈরি করেদেন। তাঁর নির্দেশেই নৌযানগুলো পানির ওপর দিয়ে চলাচল করে। তাতে আরোহণ করে তোমরা এক তীর থেকে অন্য তীরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করো। তোমরা একস্থান থেকে অন্য স্থানে মাল-পত্র আনা-নেওয়া করো এবং উপকৃত হও। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করো। এগুলো আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপকারে লাগিয়ে রেখেছেন। তোমরা সেখান থেকে পানি পান করো, তদ্রূপ অন্যকেও পানি পান করাও। আর তা দ্বারা চাষাবাদ করো। গোসল ও কাপড় ধৌত করো। আরো বিভিন্ন ধরনের উপকার গ্রহণ করো। এই নদ-নদী নিয়মিত প্রবাহিত হচ্ছে। কখনও ক্লান্ত হচ্ছে না। চন্দ্র-সূর্যও তোমাদের উপকারী কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রয়েছে। নির্দিষ্ট গতিপথ ধরে নির্দিষ্ট স্থানে আবর্তিত হয়ে চলেছে। চাঁদ-সূর্যের পরস্পরে যেমন কখনই সংঘর্ষ হয় না, তদ্রূপ আগ-পিছও হয় না। দিন-রাত সেগুলো যথানিয়মে আসা-যাওয়া করছে। নক্ষত্রগুলো আল্লাহর নির্দেশের অধীনস্থ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন অত্যন্ত বরকতময়। তিনি কখনও দিনকে বড় করেন। আবার কখনও বড় করেন রাতকে । প্রতিটি জিনিসই তাঁর নিজস্ব কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা পরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিস জোগাড় করে দিচ্ছেন। তোমরা নিজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও বলার দ্বারা যেসব জিনিসের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলে, তিনি ওই সবকিছু তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। চাইলেও তিনি দেন, না চাইলেও দেন। তাঁর হাত কখনই স্থির থাকে না। অতএব বলোতো দেখি, তোমরা কী ভাবে তোমাদের রবের সকল নেয়ামতের শোকর আদায় করবে? তোমাদের পক্ষে তো সেগুলো গননা করাও অসম্ভব। তলক ইবনে হাবীব রহ. বলেন, 'বান্দার সাধ্য নেই যে, সে আল্লাহর হক আদায় করবে। আর আল্লাহর নেয়ামত গুণে শেষ করাও বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই হে লোকসকল! তোমরা সকাল-সন্ধ্যা ইসতিগফার পাঠ করতে থাকো।' সহীহ বুখারী শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. দোয়ায় বলতেন, হে আমার রব! সকল প্রশংসা ও গুণগানের তুমিই যোগ্য। আমাদের প্রশংসাগুলো কখনই যথেষ্ট নয়। আমরা যা পূর্ণ করতে পারবো না, তা থেকে বেপরোয়াও হতে পারবো না। আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন।

বায্যার গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষের জন্যে তিনটি করে রেজিস্ট্রি খাতা বের হবে। একটির মাঝে নেক আমলের বিবরণ লেখা থাকবে। অন্যটির মাঝে গুনাহের ফিরিস্তি থাকবে। আর তৃতীয়টির মাঝে আল্লাহর নেয়ামতের তালিকা থাকবে। তখন আল্লাহ্ তাঁর নেয়ামতসমূহের মধ্য হতে সবচেয়ে ছোট নেয়ামতটিকে বলবেন, ওঠো এবং নিজের বিনিময়ে তার নেকআমল থেকে নিয়ে নাও। দেখা যাবে ওই নেয়ামতের বিপরীতে তার

সমস্ত নেক আমল শেষ হয়ে গেছে। তারপরও ওই নেয়ামতটি একনিষ্ঠতার সঙ্গে বলবে, হে আল্লাহ! আমার মূল্য পূর্ণ উসূল হয়নি।' লক্ষ্য করুন, এখনও কিন্তু গুনাহের খাতা ওইভাবেই পৃথক রাখা আছে। এখনও তাতে স্পর্শ করা হয়নি। আর বাকী নেয়ামতসমূহের খাতাও ওইভাবে রাখা আছে। এরপর যদি বান্দার ওপর আল্লাহর দয়া ও করুণা হয় তাহলে তিনি তাঁর নেক আমলের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবেন। ফলে তার গুনাহসমূহ থেকে নেক আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি আমার নেয়ামতসমূহ তোমাকে কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই দান করলাম।'

বর্ণিত আছে, সাইয়্যেদুনা দাউদ আ. আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কী ভাবে আপনার শোকর আদায় করবো? এই শোকর করাটাও তো আপনার একটি নেয়ামত? উত্তরে আল্লাহ বলেন, হে দাউদ! এখন তো তুমি শোকর আদায় করে ফেলেছো। যখন তুমি এটা জেনে গেছো এবং স্বীকার করেছো যে, তুমি আমার নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করতে অক্ষম।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলার জন্যেই তো সমস্ত প্রশংসা। যাঁর অসংখ্য নেয়ামতসমূহের মধ্য হতে একটি নেয়ামতের শোকরও নতুন একটি নেয়ামত ছাড়া আমরা আদায় করতে পারি না। তখন ওই নতুন নেয়ামতের ওপরও পুনরায় শোকর ওয়াজিব হয়ে যায়। তারপর ওই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের তাওফিক যে আল্লাহ দিলেন, এর উপর শুকরিয়া আদায় করাও আবশ্যক হয়ে পড়ে। জনৈক কবি এ বিষয়টিকেই তার কবিতার মাঝে এভাবে প্রকাশ করেছেন–

لو كل جَارِحَة مني لهَا لُغَةٌ  تُثْني عَلَيكَ بما أولَيتَ مِنْ حَسنِ
لَكَانَ ما زَادَ شُكري إذ شَكَرت به  إليكَ أبلغَ في الإحسَان والمنَنِ

যদি দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রের বাকশক্তি থাকতো আর তা আপনার দেয়া প্রতিটি নিরুপম দানের শোকর আদায় করতো; তবুও যথাযোগ্য শোকর আদায় হতো না। বরং এই শোকর করাটাও নেয়ামতের সংখ্যা বৃদ্ধি করতো।

## সূরা হিজরের ১৬-২০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِيْنَ ○ وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ○ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ○ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ○ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ○

'আর আমি আসমানে স্থাপন করেছি কক্ষপথসমূহ এবং তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি দর্শকের জন্য। আর আমি তা সুরক্ষিত করেছি

প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে। কিন্তু গোপনে কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পিছু নেয়। আর জমিনকে আমি বিস্তৃত করেছি; তাতে সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছি এবং তাতে উৎপন্ন করেছি সকল প্রকার বস্তু সুনির্দিষ্ট পরিমাণে।'

ব্যাখ্যা : আর সুস্থির উঁচু আকাশ– যার বুকে শোভা পাচ্ছে অসংখ্য অগণিত তারকাপুঞ্জ, আর তা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। যে ব্যক্তি তা গভীর চিন্তা ভাবনার দৃষ্টি দিয়ে তাকাবে সে কুদরতের অসংখ্য বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় নিদর্শন দেখতে পাবে। 'বুরুজ' শব্দ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য নক্ষত্র। যেমনটি অন্য আয়াতেও এসেছে যে, تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا—'কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র।'[৪৯]

কেউ কেউ বলেন, এখানে উদ্দেশ্য চন্দ্র-সূর্যের মনযিল। আতিয়্যাহ রহ. বলেন, 'বুরুজ দ্বারা উদ্দেশ্য ওই স্থানগুলো যেখানে চৌকিতে প্রহরী নিয়োজিত রয়েছে। যেখান থেকে দুষ্ট ও অবাধ্য শয়তানদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা হয়। যাতে তারা ঊর্ধ্বজগতের ফেরেশতাদের কোনো আলাপচারিতা না শুনতে পায়। কেউ অগ্রসর হতে চাইলেই তার দিকে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড দ্রুত বেগে ধেয়ে আসে। কখনও ওই শয়তান তার নিচের শয়তানের কাছে শ্রুত কথা পৌঁছে দেওয়ার পূর্বেই উল্কার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়। কখনও এর বিপরীতও হয়। যেমনটি বুখারী শরীফের এক হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা আসমানে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন ফেরেশতারা পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে নিজেদের ডানা অবনত করে দেয়। অতঃপর যখন তাদের মন শান্ত হয়ে যায় তখন পরস্পরে বলাবলি করে, 'তোমাদের রব কী বলেছেন?' উত্তর আসে, 'তিনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান'। ফেরেশতাদের সেই আলাপচারিতা গোপনে শোনার জন্যে জ্বিনরা ওপরে ওঠে। তারা একজনের ওপর আরেকজন এভাবে ওপরে উঠতে থাকে।

হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত সফওয়ান রা. এ সময় তাঁর হাতের ইঙ্গিতের দ্বারা এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে একটিকে অপরটির ওপর রাখেন। কখনো দেখা যেতো, ওই শ্রবণকারী জ্বিন তার সঙ্গীর কানে শ্রুত কথা পৌঁছানোর পূর্বেই জ্বলন্ত উল্কার আঘাতে তাকে ধ্বংস করে দেয়া হতো। তখন সে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো। আবার কখনও এমন হতো, সে তার পরবর্তীজনকে, পরবর্তীজন তার নিচের জনকে, এভাবে ক্রমান্বয়ে নিচে নামতে নামতে জমিন পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। এভাবে তা গণক ও

---

৪৯. সূরা ফুরকান : ৬১।

যাদুকরদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। তারা একটি কথার সঙ্গে শতটা মিথ্যা কথা জুড়ে দিয়ে জনগণের মাঝে প্রচার করে বেড়ায়। যখন তাদের কারো এক-দু'টি কথা– যা ঘটনাক্রমে আসমান থেকে তাদের কাছে পৌঁছতে পেরেছে– বাস্তবে সত্য হয় তখন জনতার মাঝে তার বুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রখরতার চর্চা শুরু হয়ে যায়। তারা বলাবলি করে, দেখো, অমুক লোক অমুক দিন এ কথা বলেছিলো। তার সে কথা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য প্রমাণিত হয়েছে।'

পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ জমিনের কথা আলোচনা করেছেন যে, তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন, সম্প্রসারিত করেছেন, সেখানে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড় সৃষ্টি করেছেন, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা তৈরি করেছেন। তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন পরিমিতভাবে। প্রতিটি মৌসুমে তিনি প্রতিটি ভূখণ্ড ও প্রতিটি এলাকার অধিবাসীদের উপযোগী করে বিভিন্ন ফল-ফলাদি ও শাক-সবজি উৎপন্ন করেন। যা বাজারে রকমারি সমারোহ সৃষ্টি করে এবং জনগণের কাছে সুস্বাদু প্রমাণিত হয়। তিনি জমিনে বিভিন্ন ধরনের জীবিকার ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহর এমন কিছু সৃষ্টি রয়েছে, যাদের জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষের সরাসরি কোনো হাত নেই। যেমন, চতুষ্পদ জীব-জন্তু ও গোলাম-বাঁদী ইত্যাদি। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে বিভিন্ন প্রকারের জিনিস, নানা প্রকারের উপকরণ ও আরাম-আয়েশের নানা ব্যবস্থাপনা প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে আয়-উপার্জনের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। জীব-জন্তুকে তিনি তোমাদের সেবায় এমনভাবে বশীভূত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেমন সেগুলোর গোশত খেতে পারছো, তদ্রূপ সেগুলোর ওপর আরোহণও করতে পারছো। তিনি তোমাদের সুখ-শান্তির প্রয়োজনে দাস-দাসীর ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। এদের জীবিকার দায়িত্বও তোমাদের ওপর নয়। বরং তাদের রিযিকদাতা হচ্ছেন আল্লাহ। যিনি বিশ্বজগতের একক প্রতিপালক। ভেবে দেখো, তোমরা এগুলোর উপকার গ্রহণ করেছো; আর আহার দিচ্ছেন আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ! তাঁর মর্যাদা কতইনা উচ্চ।

## সূরা হিজরের ২১-২৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ اِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ○ وَ اَرْسَلْنَا الرِّیٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَیْنٰكُمُوْهُ ۚ وَ مَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِیْنَ ○ وَ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْیٖ وَ نُمِیْتُ وَ نَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ○ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِیْنَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِیْنَ ○ وَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ ○

'প্রতিটি বস্তুরই ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে আমার নিকট এবং আমি তা কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করি। আর আমি বায়ুকে

ঊর্বরকারীরূপে প্রেরণ করি অতঃপর আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করাই। তবে তোমরা এর সংরক্ষণকারী নও। নিশ্চয়ই আমি জীবিত করি ও মৃত্যু দান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। অবশ্যই আমি জানি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং অবশ্যই জানি পরবর্তীদেরকে। নিশ্চয়ই তোমার রব তাদেরকে একত্র করবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী।'

ব্যাখ্যা : আল্লাহই সকল জিনিসের একক মালিক। প্রতিটি কাজ তাঁর পক্ষে সহজ। তাঁর কাছে সকল বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। তিনি সেখান থেকে যখন যা ইচ্ছা পাঠিয়ে দেন। তিনিই তাঁর কর্মকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। বান্দার কল্যাণ কিসে, একমাত্র তিনিই তা জানেন। এটিও তাঁর মেহেরবানীর ওপর নির্ভর করে। নয়তো আল্লাহকে বাধ্য করার ক্ষমতা কারও নেই। হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেন, প্রতিবছর নিয়মিতই বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, তা বণ্টন করার ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। অতঃপর তিনি আলোচিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। হাকাম ইবনে উয়াইনাহ রহ. থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, বৃষ্টির সঙ্গে এই পরিমাণ ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় যে, সংখ্যায় তারা মানবজাতি ও জ্বিনজাতির সকল সদস্যের চেয়েও বেশি হবেন। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা কোথায় পড়ছে এবং এতে কী উৎপন্ন হচ্ছে, তারা তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

বাযযারে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহ তাআলার ভাণ্ডার হচ্ছে তাঁর কালাম বা কথা। তিনি যখনই বলেন, হয়ে যাও তা হয়ে যায়।' আল্লাহ বলেন, বাতাস প্রবাহিত করে আমি মেঘমালাকে পানি বোঝাই করে দিই। তখন সেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে। এই বাতাসকেই প্রবাহিত করে বৃক্ষসমূহকে সিক্ত করি। ফলে সেগুলোতে পাতা ও কুঁড়ি গজাতে থাকে। বাতাস প্রবাহিত করে তিনি আকাশে পানি উঠিয়ে মেঘমালাকে টইটুম্বর করে দেন। কিছু বাতাস এমন হয়, যা জমিনের ফসলের মধ্যে শক্তি জোগায়। কিছু বাতাস এমন যে, তা মেঘমালাকে একদিক থেকে অন্যদিকে ভাসিয়ে নেয়। কিছু বাতাস এমন হয়, যা মেঘমালাকে একত্র করে স্তরে স্তরে সজ্জিত করে। কিছু বাতাস এমন যে, তা মেঘমালাকে পানি দ্বারা বোঝাই করে দেয়। কিছু বাতাস এমন, যা গাছ-গাছালিকে ফলবতী হওয়ার যোগ্য করে তোলে।

ইবনে জরীরের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'দখিনা বাতাস জান্নাতী হয়। তার মাঝে মানুষের উপকার রয়েছে।' তার আলোচনা কুরআনে হয়েছে। মুসনাদে হুমায়দী গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, বাতাস সৃষ্টির সাত বছর পর আল্লাহ তাআলা জান্নাতে একটি নতুন বাতাস সৃষ্টি করেন। যা একটি দরজার মাধ্যমে সেটিকে থামিয়ে রেখেছেন। ওই বন্ধ দরজা দিয়েই তোমাদের নিকট

বাতাস পৌঁছে। যদি ওই দরোজাটি খুলে যায় তাহলে আসমান-জমিনের সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাবে। সেই বাতাসটিকেই তোমরা দখিনা হাওয়া বলে থাকো।'

অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের মিষ্টি পানি বর্ষণ করি। যেন তোমরা তা পান করো ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করো। আমি চাইলে সেই পানি তেতো ও লবণাক্ত বানাতে পারতাম। যেমনটি সূরা ওয়াকিয়ায় বলেছেন, যে মিষ্টি পানি তোমরা পান কর, ওই পানি মেঘ থেকে বর্ষণকারীও কি তোমরাই নাকি আমি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

অন্য আয়াতে এসেছে, 'তিনিই তোমাদের জন্য আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তোমরা তার রক্ষক নও। আমিই তা বর্ষণ করি। আমি যেখানে ইচ্ছা পৌঁছে দিই। যেখানে ইচ্ছা সংরক্ষণ করে রাখি। যদি আমি চাই মাটির নিচে ধসিয়ে দিতে পারি। এটা শুধু আমার দয়া যে, আমি তা বর্ষণ করি, সংরক্ষণ করি, মিষ্ট করি, স্বচ্ছ করি। যেন তোমরা নিজেরাও পান করতে পারো এবং জীব-জন্তুদেরও পান করাতে পারো, এগুলোর মাধ্যমে ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা তৈরি করতে পারো, নিজেদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করতে পারো। আমি মাখলুককে প্রথম সৃষ্টি করেছি এবং আমি সেগুলোর পুনর্জন্ম করতেও সক্ষম। সবকিছুকে আমি অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছি। একদিন সবাইকে বিলুপ্ত করবো। অতঃপর কিয়ামতের দিন সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবো। জমিন ও জমিনবাসীদের উত্তরাধিকারী আমিই। সবাইকে আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমার জ্ঞানের শেষ নেই। শুরু এবং শেষ আমার জ্ঞানাধীন। এখানে 'শুরু' দ্বারা উদ্দেশ্য আদম আ. এর সময় থেকে রাসুল সা. এর আগমন পর্যন্ত সময় আর পরের যুগ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসুল সা. এর আগমন থেকে শুরু করে আগত যুগের লোকজন।

মারওয়ান ইবনে হাকাম থেকে বর্ণিত রয়েছে, কিছু লোক কোনো কারণে মহিলাদের পেছনের কাতারে থাকতো। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হাদীসটি ইবনে জরীরে রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একজন অতীব রূপসী নারী নামায আদায় করতে আসতো। কিছু মুসলমান নামাযের সময় এ উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে যেত, যেন তাকে দেখতে না হয়। আবার কিছু লোক তার বিপরীত দিকে সরে আসতো। তারা সেজদারত অবস্থায় হাতের নিচ দিয়ে তাকে দেখতো। এ প্রেক্ষিতেই ওই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব রা.-এর সামনে আউন ইবনে আবদুল্লাহ যখন উল্লিখিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন তখন তিনি বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এটি নয়। বরং আয়াতে অগ্রবর্তীদের দ্বারা উদ্দেশ্য যারা ইতোমধ্যে মারা গেছেন। আর

পরবর্তীদের দ্বারা উদ্দেশ্য, যারা এখন জীবিত রয়েছে বা আগামীতে যারা জন্ম নেবে। তোমার প্রতিপালক তাদের সবাইকে একত্র করবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। এ কথা শুনে আউন রহ. বলেন, আল্লাহ আপনাকে তাওফীক ও উত্তম প্রতিদান দিন।

## সূরা হিজরের ২৬-২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ○

'অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে, কালচে কাদামাটি থেকে। আর ইতঃপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।'

ব্যাখ্যা : صلصال দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শুকনো মাটি। এ জাতীয় আয়াত হলো, خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ—'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে। এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে।'[৫০]

এ কথাও বর্ণিত রয়েছে যে, গন্ধযুক্ত মাটিকে حمأ বলা হয়। আর মসৃণ মাটিকে مسنون বলা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এটা হচ্ছে ভেজা মাটি।

আল্লাহ বলেন, আমি মানুষের পূর্বে জ্বিনজাতিকে ভস্মকারী আগুন থেকে সৃষ্টি করেছি। سموم বলা হয় আগুনের উষ্ণতাকে। আর حرور বলা হয় দিবসের উষ্ণতাকে। একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, পৃথিবীর আগুনের তেজ ওই আগুনের তেজের সত্তরভাগের একভাগ– যেই আগুন থেকে জ্বিনজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জ্বিন জাতি সৃষ্ট হয়েছে অতি উত্তম আগুনের শিখা থেকে। আমর ইবনে দীনার রহ. বলেন, তারা সূর্যের আগুন থেকে সৃষ্ট হয়েছে। বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে। আর জ্বিনজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে শিখাযুক্ত আগুন থেকে। আদম আ.-কে কী দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তো তোমাদের সামনে বর্ণিত। এই আয়াতে সাইয়্যেদুনা আদম আ.-এর সম্মান, আভিজাত্য এবং তাঁর সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত উপাদানের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

---

৫০. সূরা আর রহমান : ১৪-১৫।

## সূরা নাহলের ৩-৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

'তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথই, তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুক্র থেকে; অথচ সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।'

ব্যাখ্যা : আল্লাহই ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগত সৃষ্টি করেছেন। সুউচ্চকিত আকাশ ও দিগন্তবিস্তৃত জমিন সহ বিচিত্র এই সৃষ্টিজগত তিনিই সুনিপুণভাবে তৈরি করেছেন। আল্লাহ এগুলোকে অর্থহীন সৃষ্টি করেননি। তিনি নেককারদের পুরস্কার ও বদকারদের শাস্তি দেবেন। তিনি অন্য সকল উপাস্য ও মুশরিকদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে পূতঃপবিত্র এবং তাদের ওপর অসন্তুষ্ট। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি একক ও সবকিছুর স্রষ্টা। একারণে এককভাবে উপাসনার উপযুক্ত তিনিই। তিনি শুক্রানুর মাধ্যমে মানবজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। যা একফোঁটা পানি। অথচ এই শুক্র খুবই তুচ্ছ ও নগন্য বস্তু।

আল্লাহই যখন মানুষকে যথাযথ অবয়বে সৃষ্টি করেছেন; তখন সে অহংকারে লিপ্ত হয়, আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করে, রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে। অথচ সে একজন বান্দা মাত্র। তার দায়িত্ব ছিলো আল্লাহর বন্দেগিতে নিমজ্জিত থাকা। তা না করে সে হঠকারিতা করছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ ... وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا

তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। তারা ইবাদত করে আল্লাহ্ তাআলার পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফের তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী।[৫১]

সূরা ইয়াসীনে ইরশাদ করেন, أَوَلَمْ يَرَ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ ...وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.—'মানুষ কি দেখে না, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভূত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।'[৫২]

---

৫১. সূরা ফুরকান : ৫৪-৫৫।

৫২. সূরা ইয়াসীন : ৭৭-৭৯।

মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজাহ কিতাবে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের তালুতে থুথু ফেলে বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হে মানুষ! তুমি কী ভাবে আমাকে অক্ষম করবে; অথচ আমি তোমাকে এ জাতীয় জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছি। যখন তুমি পূর্ণ দেহের অধিকারী হলে, শারীরিক অবয়ব পূর্ণতা পেলো, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাড়ি-ঘর পেয়ে গেলে এখন তুমি নিজেও আমার পথ থেকে সরে যাচ্ছো, অন্যদেরকেও সে পথে যেতে বাঁধা দিচ্ছো! আবার যখন তোমার নিঃশ্বাস কণ্ঠনালীতে আটকে আসে তখন সেই তুমিই বলো– আমি এখন সদকা করছি, আল্লাহর রাহে খরচ করছি। মনে রেখো, তোমার দান-খয়রাতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।'

## সূরা নাহলের ৫-৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ○ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে শীত নিবারক উপকরণ ও বিবিধ উপকার। আর তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ কর। আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য যখন সন্ধ্যায় তা ফিরিয়ে আন এবং সকালে চারণে নিয়ে যাও। আর এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা ভীষণ কষ্ট ছাড়া পৌঁছতে সক্ষম হতে না। নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ যেসকল চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তা থেকে মানুষ বহুবিধ উপকার গ্রহণ করছে; আলোচিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন, উট, গাভী, বকরী। সূরা আন'আমের আয়াতে যার বিশদ বিবরণ হিসেবে আট প্রজাতির কথা বলা হয়েছে। সেগুলোর পশম থেকে গরম পোশাক তৈরি হয়, দুধ পান করা হয়, গোশ্ত খাওয়া হয়। সন্ধ্যায় যখন সেগুলো মাঠে বিচরণ শেষে, ভরা পেট ও টইটুম্বর স্তন নিয়ে উঁচু কুঁজ সম্বলিত জন্তুগুলো খোয়ারে ফিরে আসে তখন কতইনা ভালো লাগে। আবার যখন মাঠে বিচরণের জন্য সেদিকে যায় তখন কতইনা মায়া জাগে। এই জন্তুগুলো ভারী বোঝা এক শহর থেকে অন্য শহরে নিজের পিঠে বহন করে নিয়ে যায়। প্রাণীগুলো ছাড়া তোমাদের পক্ষে সেখানে পৌঁছানো কষ্টসাধ্য ছিলো। হজ, উমরা, জিহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ নানা

প্রয়োজনে সফর করার সময় তোমরা সেগুলোর ওপর আরোহণ করো। প্রাণীগুলো তোমাদের জিনিসপত্রও বহন করে নিয়ে যায়। অন্য আয়াতে এসেছে, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً الخ—'এবং তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুও শিক্ষণীয় বিষয়। আমিই তাদের পেট থেকে তোমাদের দুধ পান করাই এবং তা থেকে থেকে তোমাদের অনেক উপকারীতা পৌঁছাই। তাদের গোশ্ত খাও, তাদের ওপর আরোহণও করো। নদী পথে আরোহণ করার জন্য নৌকা বা জাহাজ আমি তৈরি করে দিয়েছি।[৫৩]

অপর আয়াতে বলেন, اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا الخ—'আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা কোনোটায় আরোহণ করতে পারো, কোনোটা ভক্ষণ করতে পারো। এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারো। আর যেন তাদের দ্বারা পূরণ করতে পারো মনের চাহিদা। তোমাদেরকে পানির জাহাজেও আরোহণ করিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে তাঁর অনেক নিদর্শনাবলীই দেখিয়েছেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?'[৫৪]

এখানেও তিনি নিজের এই নেয়ামতসমূহকে উল্লেখ করে বলেছেন, তিনিই তোমাদের রব– যিনি এই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করেছেন। তিনি তোমাদের ওপর পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। যেমনটি সূরা ইয়াসীনে বলেছেন, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ الخ—'তারা কি দেখে না, তাদের জন্যে আমি আমার নিজ হাতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে এগুলোর মালিক বানিয়ে দিয়েছি এবং এগুলোকে তাদের বাধ্য করে দিয়েছি যে, কতক তারা ভক্ষণ করবে আর কতক তারা বাহন বানাবে।[৫৫]

অন্য আয়াতে এসেছে, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ الخ—'এবং যিনি নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের জন্যে যানবাহনে পরিণত করেছেন। যাতে তোমরা তাদের পিঠে আরোহণ কর। অতঃপর তোমাদের পালনকর্তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো এবং বলো পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অথচ তোমাদের মধ্যে সেই সক্ষমতা ছিলো না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব।[৫৬]

---

৫৩. সূরা মুমিনূন : ২১-২২।
৫৪. সূরা গাফের : ৭৯-৮০।
৫৫. সূরা ইয়াসীন : ৭১-৭২।
৫৬. সূরা যুখরুফ : ১২-১৪।

## সূরা নাহলের ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَّالْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۭ وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ○

আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা জানো না।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর আরেকটি নেয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সৌন্দর্যের জন্যে, বাহনের প্রয়োজনে তোমাদের জন্যে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। এ সকল জন্তু সৃষ্টির পেছনে সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো মানুষের সেবা করা। এ কারণেই তিনি অন্য সব জন্তুর ওপর এগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, প্রথমদিকে ঘোড়ার মাঝে হিংস্রতা ও বন্যতা ছিলো। আল্লাহ তাআলা সাইয়্যেদুনা ইসমাঈল আ.-এর জন্যে ঘোড়াকে অনুগত করে দেন। ওয়াহাব রহ. ঈসরাঈলি বর্ণনা সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, দখিনা বাতাস থেকে ঘোড়া সৃষ্টি হয়।

রাসূলুল্লাহ সা.-কে উপহার হিসেবে একটি খচ্চর দেয়া হয়েছিলো। যা তিনি বাহন হিসেবে ব্যবহার করতেন। অবশ্য তিনি ঘোড়ার সঙ্গে মাদী গাধার মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছেন। নিষেধের কারণ হলো, যেন বংশপরম্পরা বাধাগ্রস্থ না হয়। হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রা. রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার অনুমতি হলে আমরা ঘোড়া ও মাদী গাধার মিলন ঘটিয়ে খচ্চর জন্মগ্রহণ করাই আর আপনি তা বাহন হিসেবে ব্যবহার করবেন। রাসূল সা. বললেন, 'এ জাতীয় কাজ অজ্ঞরাই করে থাকে।'

## সূরা নাহলের ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاۗىِٕرٌ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ○

আর সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়, কিন্তু পথগুলির মধ্যে কিছু আছে বক্র। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতেন।

ব্যাখ্যা : পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ দুনিয়ার পথ অতিক্রম করার বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখন দীনি পথ চলার উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। অর্থাৎ অনুভবযোগ্য বস্তুর আলোচনা থেকে আত্মবিশ্বাসী বস্তুর আলোচনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। কুরআন কারীমে এ জাতীয় প্রচুর আলোচনা বিদ্যমান। কোথাও হজ্বের সফরের সম্বলের কথা আলোচনা করে তাকওয়ার সম্বলের কথা আলোচনা করেছেন, যা আখেরাতে কাজে আসবে। বাহ্যিক পোশাকের আলোচনা করে তাকওয়ার পোশাকের আলোচনার

করেছেন। তদ্রূপ এখানেও চতুষ্পদ জন্তুর সাহায্যে দুনিয়ার কঠিন পথ ও দূর-দূরান্তের সফর অতিক্রম করা সম্পর্কে আলোচনা করে আখেরাতের ও দীনি পথ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে, এই সত্যপথই আমাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত করবে। এটাই আল্লাহর সরল পথ। এ পথেই চলো। অন্য পথে যেয়ো না। অন্যথায় পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

আল্লাহ বলেন, আমার কাছে পৌঁছানোর সরল পথ হলো ইসলাম। যা আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সেই সাথে অন্য পথগুলোর ভ্রষ্টতার কথাও বলে দিয়েছেন। কাজেই সঠিক পথ একটাই। যা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সা.-এর সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। অবশিষ্ট পথগুলো হচ্ছে ভুল পথ। মানুষের আবিষ্কৃত পথ। যেমন– ইহুদিবাদ, খ্রিস্টবাদ ও অগ্নিপূজারী ইত্যাদি।

এরপর আল্লাহ বলেন, হিদায়াত আদ্যোপান্ত আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তিনি চাইলে পৃথিবীর সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তখন ঈমানদার হয়ে যাবে। একই দীনের কর্মী হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের মধ্যকার মতানৈক্য বহালই থেকে যাবে। তবে যার ওপর আল্লাহ দয়া করেন। এ কারণেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব আল্লাহ তাআলার কথা ষোলোআনা পূর্ণ হবেই যে, আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নামকে মানব ও জ্বিন সম্প্রদায় দ্বারা পূর্ণ করবেন।

## সূরা নাহলের ১০-১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَ النَّخِيْلَ وَ الْاَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○

তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয় এবং তা থেকে জন্মে উদ্ভিদ, যাতে তোমরা জন্তু চরাও। তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সকল ফল-ফলাদি। নিশ্চয় তাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

ব্যাখ্যা : পূর্বের আয়াতে আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তু সহ অন্যান্য জীব-জন্তু সৃষ্টির অনুগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি তাঁর আরও কিছু অনুগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করছেন যে, তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যেই বৃষ্টি তোমাদের উপকারে আসে এবং তোমাদের উপকারে আসা জীব-জন্তুও ওই পানি থেকে উপকৃত হয়। পরিষ্কার, স্বচ্ছ, সুমিষ্ট, সুপেয় পানি তোমাদের পান করার কাজে আসে। আল্লাহ দয়া না করলে সমস্ত পানি লবণাক্ত ও তেতো করে দিতেন। এই সতেজ পানি থেকেই ঘাস উৎপন্ন হয়। যেই ঘাস তোমাদের

চতুষ্পদ জন্তুর আহার্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. সূর্য উদয়ের পূর্বে চতুষ্পদ জন্তু চরাতে নিষেধ করেছেন।

পরের আয়াতে বলেন, তোমরা আল্লাহর কুদরত দেখো। তিনি একই পানি থেকে ভিন্ন স্বাদ, ভিন্ন আকৃতি ও ভিন্ন ঘ্রাণের অসংখ্য ফল-ফুল তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, আল্লাহর একত্ববাদ জানার জন্যে এই নিদর্শনগুলোই যথেষ্ট। অন্য আয়াতে আল্লাহ এ কথাগুলো এভাবে বলেছেন, أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ الخ—'আল্লাহই আসমান-জমিন সৃষ্টিকারী, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ কারী, যার মাধ্যমে সবুজ-শ্যামলভরা বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করেছেন, যা সৃষ্টি করতে তোমরা অক্ষম ছিলে। এসব এর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য নেই। তারপরও মানুষ সত্য থেকে এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছে।[৫৭]

## সূরা নাহলের ১২-১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝

আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে, সূর্য ও চাঁদকে এবং তারকাসমূহও তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বোঝে। আর তিনি তোমাদের জন্য জমিনে যা সৃষ্টি করেছেন, বিচিত্র ধরণের বস্তু, নিশ্চয়ই তাতেও নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

ব্যাখ্যা : আলোচিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিভিন্ন নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ওই নেয়ামতগুলো দিন-রাত তোমাদের উপকারার্থে কাজ করছে। চন্দ্র-সূর্য নিয়মিত আবর্তিত হচ্ছে। তারকাগুলো রাতের অন্ধকারে তোমাদের আলো দিচ্ছে। প্রত্যেকের এমন পরিমাপ জায়গা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা থেকে সে না এদিক-ওদিক হতে পারে, না তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়। প্রতিটি নেয়ামত আল্লাহর কুদরতের অধীনে ও তাঁর প্রতাপের আনুগত্যে পরিচালিত হচ্ছে। আল্লাহ মাত্র ছয় দিনে আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশে দিবস ও রজনী নিয়মিত পালা বদল করে আসছে। আল্লাহর নির্দেশে চন্দ্র, সূর্য

---

৫৭. সূরা নামল : ৬০।

ও নক্ষত্র নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে। মহাবিশ্ব আল্লাহর সৃষ্টি। সেখানে শুধু আল্লাহর নির্দেশই বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন অত্যন্ত বরকতময়। যাদের মেধা ও মস্তিষ্ক রয়েছে তাদের জন্যে এর মাঝে আল্লাহর কুদরতের অসংখ্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।

আসমানি কুদরতের পর এখন তোমরা দৃষ্টি দাও জমিনের কুদরতের ওপর। দেখো, সেখানে প্রাণীজগত, খনিজ সম্পদ, উদ্ভিদ জগত, জড় পদার্থ সহ বিভিন্ন রং-রূপের অসংখ্য উপকারী জিনিস আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে জমিনে সৃষ্টি করে রেখেছেন। যারা আল্লাহ তাআলার নেয়ামসমূহ নিয়ে ভাবে এবং মূল্যায়ন করে তাদের জন্য এগুলো অবশ্যই অনেক বড় নিদর্শন।

## সূরা নাহলের ১৪-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ وَ اَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ اَنْهٰرًا وَّ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○ وَ عَلٰمٰتٍ ؕ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ○ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

আর তিনিই সে সত্তা, যিনি সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশ্ত খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার অলংকারাদি, যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি তাতে নৌযান দেখবে, পানির বুক চিরে চলছে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো। জমিনে তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে তোমাদের নিয়ে জমিন হেলে না যায় এবং নদ-নদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও। (দিনে) পথ-নির্দেশক চিহ্নসমূহও এবং (রাতে) তারকার সাহায্যে পথের নির্দেশ পায়। সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মত, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, তবে তার ইয়ত্তা পাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা নিজ মেহেরবানীর কথা তুলে ধরে বলেন, তিনি সমুদ্র ও নদ-নদীর ওপরও তোমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিয়েছেন। এ সমুদ্র তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ও গভীর জলের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের অনুগত।

তোমরা তার বুকে নৌযানে চড়ে এক তীর থেকে অন্য তীরে যাও। পানির গভীর থেকে মাছ তুলে এনে সেগুলোর তরতাজা গোশত তোমরা খাও। এই মাছ তোমাদের জন্যে সর্বাবস্থায় হালাল। যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধেনি তার জন্যে যেমন হালাল, তদ্রূপ ইহরাম অবস্থায়ও হালাল। জীবিত হোক বা মৃত, আল্লাহর পক্ষ থেকে তা হালাল। এছাড়াও তোমাদের জন্যে গভীর সমুদ্রে মূল্যবান পাথর ও মণিমুক্তা সৃষ্টি করে রেখেছেন। যা তোমরা সহজেই আহরন করতে পারো এবং সেগুলোকে গহনা হিসেবে ব্যবহারও করছো। অতঃপর সমুদ্রবক্ষে তোমাদের নৌযানগুলো বাতাসকে ডিঙিয়ে এবং পানিকে চিরে স্বীয় বাহুবলে ভেসে চলে যেতে সক্ষম হচ্ছো।

সাইয়্যেদুনা নূহ আ. সর্বপ্রথম নৌযানে আরোহণ করেছিলেন। তাঁকেই আল্লাহ তাআলা নৌযান তৈরির কৌশল শিখিয়ে ছিলেন। অতঃপর মানুষ এখন নিয়মিত বানিয়ে আসছে। সেই নৌযানে আরোহণ করে তারা বিশাল সমুদ্র অনায়াসে পাড়ি দিচ্ছে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পারছে। এভাবেই তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করতে পারছো। অতএব, তোমরা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করো এবং তা মূল্যায়ন করো।

মুসনাদে বায্যারে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা পশ্চিমের সমুদ্রকে বললেন, আমি আমার বান্দাদেরকে তোমার ওপর দিয়ে আরোহণ করাবো। তাদের সঙ্গে তুমি কী আচরণ করবে? সমুদ্র বললো, ডুবিয়ে দেবো। আল্লাহ বললেন, তোমার বিক্ষুব্ধতা তোমার পাড়েই থাক। আমি তাদেরকে আমার হাতে করে নিয়ে যাবো। তোমাকে অলঙ্কার ও নানাবিধ শিকার থেকে বঞ্চিত করবো। অতঃপর আল্লাহ পুবের সমুদ্রকেও একই কথা বললেন। সমুদ্র বললো, আমি নিজের হাতে তাদেরকে উঠিয়ে নেবো, যেভাবে মা তার সন্তানের খুব খবর রাখে আমিও তাদের সেরূপ খুব খবর রাখবো। অতএব তাকে আল্লাহ তাআলা অলংকারও দিয়েছেন শিকারও দিয়েছেন।

পরের আয়াতে আল্লাহ জমিন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তিনি স্থির থাকার জন্যে ও নড়াচড়া না করার জন্যে জমিনের বুকে মজবুত ও ভারী পাহাড় গেঁথে দিয়েছেন। যেন জমিন নড়াচড়া করার কারণে তার বসিন্দাদের কষ্ট না হয়ে যায়। যেমনটি অন্য আয়াতে বলেছেন, وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا। হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, জমিন সৃষ্টি করার পর দেখা গেলো— সেটি দুলছে। ফেরেশতারা পর্যন্ত মন্তব্য করলেন, এর ওপর কেউ স্থির থাকতেই পারবে না। সকাল বেলা দেখা গেলো, পাহাড় গেঁথে দেয়া হয়েছে এবং নড়চড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর ফেরেশতাদের এটাও জানা ছিলো না যে, পাহাড় কোন জিনিস দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। কায়েস ইবনে উবাদাহ রহ. থেকেও অনুরূপ বর্ণিত

রয়েছে। আলী রা. বলেন, জমিন বলেছিলো– হে আল্লাহ! আপনি আমার ওপর মানবজাতিকে আবাদ করবেন; যারা আমার পিঠের ওপর গুনাহ করবে ও অশ্লীলতার বিস্তার ঘটাবে। জমিন তখন কাঁপছিলো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা জমিনের বুকে অসংখ্য পাহাড় দিলেন। যা তোমরা এখন অবলোকন করছো। আর কিছু পাহাড় তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছো না।

এটাও আল্লাহর দয়া যে, তিনি নদী-নালা, ঝর্না ও সমুদ্র চতুর্দিকে প্রবাহিত করে দিয়েছেন। কিছু নদী প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী । কিছু নদী স্থির। কিছু নদী দীর্ঘ। কিছু নদী ছোট। কোথাও পানি কম, কোথাও বেশী। কোথাও একেবারে শুষ্ক পড়ে আছে। পাহাড়ে, জঙ্গলে, পাথুরে ভূমিতে অবিরাম এই ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে এবং অঝোর ধারায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করে দিচ্ছে। এই পানির দ্বারা মরুভূমিও উর্বর হয়ে উঠছে। এ সবই মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। না আল্লাহ ছাড়া কোনা উপাস্য আছে, না তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত। তিনিই রব, তিনিই মা'বুদ। তিনিই পথ নির্মাণ করে দিয়েছেন। পাহাড়ে, জঙ্গলে, জনপদে, বিরান ভূমিতে সব জায়গায়ই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের রাস্তা বিদ্যমান। মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে আসতে পারছে। কোথাও সংকীর্ণ রাস্তা, কোথাও আবার প্রশস্থ রাস্তা, কোনোটা সহজ কোনোটা কঠিন। আরো অনেক নিদর্শন তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন- পাহাড়ে টিলা ইত্যাদি আছে। যেখানে উঠে জল ও স্থলের পথিক, মুসাফিররা পথ জেনে নিতে পারে। আর যারা পথ হারিয়ে ফেলেছে তারা সঠিক পথে আসতে পারে। পথনির্দেশের জন্যে তারকাও রয়েছে। রাতের অন্ধকারে সেগুলোর আলোতেই আমরা আমাদের পথের দিশা খুঁজে নিতে পারছি; দিক-নির্ণয় করতে পারছি। মালেক রহ. বলেন, এ আয়াতে نُجُوم শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য পাহাড়।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। মানুষ আল্লাহকে ছাড়া যে সকল জিনিসের উপাসনা করছে সেগুলো একেবারেই নিকৃষ্ট। সেগুলো কোনোকিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তাআলাই সবকিছুর স্রষ্টা। আর এটা বাস্তব যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি কিছুতেই সমান হতে পারে না। তাহলে সমানভাবে তাদের উপাসনা করা কি অন্যায় নয়? এতোটা উন্মাদ হওয়া কতটা অমানবিক!

সর্বশেষ আল্লাহ তাঁর নেয়ামতের প্রাচুর্য ও সংখ্যাধিক্যের ওপর আলোকপাত করে বলেন, তোমাদের পক্ষে সেগুলো গণনা করাও সম্ভর নয়। তোমাদের ওপর আমার বর্ষিত নেয়ামত এতো প্রচুর যে, তোমরা সেগুলো গুণে শেষ করতে পারবে না। এরপরও আল্লাহ তোমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করেন। আল্লাহ যদি তোমাদের কাছ থেকে শুধু তাঁর নেয়ামতের শোকরও দাবী করেন তোমরা তা পূরণ করতে পারবে না। আর যদি সেগুলোর বিনিময় চান তাহলে তো সেটা

আরও অসম্ভব। শোনো! যদি তিনি তোমাদের সবাইকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেটা অন্যায় হবে না। কিন্তু তিনি তা করবেন না। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তোমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করেন। তোমাদের ত্রুটিগুলো এড়িয়ে যান। কোনো বান্দা যদি তাওবা-ইসতিগফার এবং আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আল্লাহমুখীও হয় তাহলে আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু। তিনি তাওবার পর পুনরায় আযাব দেবেন না।

## সূরা নাহলের ১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ○

আর আল্লাহ জানেন তোমরা যা গোপন রাখো এবং যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করো।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবটাই জানেন। তাঁর কাছে দু'টোই সমান। তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে কিয়ামতের দিন তার আমলের বিনিময় দান করবেন। নেককাজকারীকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। অন্যায়কারীকে সাজা দেবেন। লোকেরা যেসকল মিথ্যা উপাস্যের কাছে নিজেদের প্রয়োজন আব্দার করছে সেগুলোর কোনো কিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। ওরা নিজেরাই সৃষ্ট। যেমনটি সাইয়্যেদুনা ইবরাহীম খলীল আ. স্বজাতিকে বলেছিলেন, أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ○ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ○—'তোমরা তাদের উপাসনা করো– যাদেরকে তোমরা নিজেরাই গড়ছো। সত্যিকারর্থে তোমাদের ও তোমাদের সকল কর্মকাণ্ডের একক স্রষ্টা আল্লাহ। তোমরা যেই গায়রুল্লাহর উপাসনা করো সেগুলো নির্জীব জড়। সেগুলোর মাঝে কোনো প্রাণ নেই। সেগুলো দেখতে, শুনতে ও উপলব্ধি করতে পারে না। সেগুলো এ কথাও জানে না যে, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তাহলে কী ভাবে তোমরা সেগুলোর কাছ থেকে ছাওয়াব ও উপকারের আশা রাখো? এ আশা তো আল্লাহর কাছে করা দরকার। যিনি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি মহাবিশ্বের একক স্রষ্টা।

## সূরা নাহলের ৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

আর আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা শোনে।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ বলছেন, যেভাবে বৃষ্টি পেলে মৃত জমিনও জীবিত হয়ে ওঠে

তদ্রূপ এই কুরআনের ওপর আমল করলে মৃত অন্তরও জেগে ওঠবে। যারা কথা শোনার যোগ্যতা রাখে ও যাদের উপলব্ধি শক্তি রয়েছে তারা অবশ্যই এথেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

## সূরা নাহলের ৬৬-৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ○ وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

'আর নিশ্চয়ই চতুষ্পদ জন্তুতে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা। তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে তোমাদেরকে আমি দুধ পান করাই, যা খাঁটি এবং পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর। আর তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর থেকে মাদক ও উত্তম রিযিক গ্রহণ করো। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা বোঝে।'

ব্যাখ্যা : উট, গাভী, বকরি ইত্যকার প্রাণীকূল আল্লাহ তাআলার কুদরত ও প্রজ্ঞার অন্যতম নিদর্শন। চতুষ্পদ জন্তুগুলোর পেটের ভেতর যে ময়লা-নর্দমা থাকে, তা থেকে আল্লাহ তোমাদের জন্যে অত্যন্ত সুস্বাদু, সুপেয় দুধ পান করাচ্ছেন। প্রাণীর পেটের ভেতরে যে রক্ত, গোবর ইত্যাদি আছে, তা থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ তোমাদের জন্য দুধ বের করে দিচ্ছেন। না তার শুভ্রতায় কোনোপ্রকার প্রভাব ফেলতে পেরেছে, আর না স্বাদে ও মিষ্টতায়। খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছানোর পর সেখান থেকে রক্ত ছুটে যায় রগগুলোর দিকে। দুধ পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট স্থান স্তনে। আর প্রস্রাব ছুটে যায় মূত্রথলিতে। মল বহির্গমন পথে গিয়ে জমা হয়। এগুলো একটি অন্যটির সাথে মিশ্রিতও হয় না আর অদল-বদলও হয় না। ফলে খাঁটি ও নির্ভেজাল দুধ আমরা পান করতে পারছি। যা আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত।

ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, তোমরা যে মদ বানাচ্ছো তা হারাম। যদি সেটা অন্যভাবে পান করো তাহলে হালাল। যেমন– শুকনো খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি। নবীজ অর্থাৎ খেজুরের তাজা নির্যাস শরবত বা সিরকা বানিয়ে অথবা অন্যভাবে খাও। অতএব, যাদের বুদ্ধি রয়েছে তারা আল্লাহর কুদর ও শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বকে ওই সমস্ত জিনিস এবং নেয়ামতসমূহ থেকেও উপলব্ধি করতে পারবে। বাস্তবতা হলো, মানবজাতির মহামূল্যবান অলংকারই হচ্ছে জ্ঞান-বুদ্ধি বা আকল। আর এই আকল অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে শরীয়ত নেশা জাতিয় মদ এই উম্মতের জন্যে হারাম করে দিয়েছে। এই নেয়ামতের আলোচনা সূরা ইয়াসীনে এভাবে এসেছে, وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيْلٍ وَأَعْنَابٍ

الخ—'আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্ঝরিণী। যাতে তারা তার ফল খায়। এসব কিন্তু তারা তাদের নিজ হাতে সৃষ্টি করেনি। তারপরও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? পবিত্র ওই সত্তা; যিনি জমিনের ফসলের মধ্যে এবং খোদ মানুষের মাঝে এবং ওই সমস্ত মাখলুকের মাঝে যাদেরকে মানুষ জানেও না, প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৫৮]

## সূরা নাহলের ৬৮-৬৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, 'নিবাস বানাও পাহাড়ে ও গাছে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। অতঃপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে আহার করো এবং তুমি তোমার পালনকর্তার সহজ পথে চল। তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন এবং যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

ব্যাখ্যা : আলোচিত 'অহি' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য– হিদায়াতের ইলহাম ও নির্দেশনা। আল্লাহর পক্ষ থেকে মৌমাছিদের এ কথা বোঝানো হয়েছে, তারা পাহাড়-পর্বত ও গাছগাছালির ছাদে মৌচাক তৈরি করবে। এই দূর্বল প্রাণীর ঘর দেখুন, কতো মজবুত, দৃষ্টিনন্দন। কী ভাবে যে এমন নির্মান কৌশল অবলম্বন করেছে। এরপর আল্লাহ মৌমাছিকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, ওরা ফুল, ফল ও ঘাস-পাতার রস আহরণ করে বেড়াবে। যথেচ্ছা উড়ে চলে যাবে। কিন্তু ফিরে আসার সময় তারা ঠিকই নিজেদের মৌচাকে পৌঁছে যায়। মৌচাকটি চাই হোক না উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বা গভীর জঙ্গলের গাছে অথবা জনাকীর্ণ জনপদের বহুতল বিশিষ্ট উঁচু ভবনে বা বিরান মরুপ্রান্তরের জীর্ণ বাড়িতে। না সে পথ ভুলে যায় আর না পথহারা হয়ে তাদের মৌচাক খুঁজে বেড়াতে হয়। চাই যতদূরেই উড়ে যাক না কেনো, নিজের চাকে ফিরে এসে তার বাচ্চা ডিমে এবং মধুর মধ্যে সে ঠিকই পৌঁছে যায়। নিজের ডানার সাহায্যে মোম তৈরি করে এবং নিজের মুখের সাহায্যে মধু সঞ্চয় করে।

---

৫৮. সূরা ইয়াসীন : ৩৪-৩৬।

আবু ই'আলা মূসেলীর গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, মাছির বয়স হয় চল্লিশ দিন। মৌমাছি ছাড়া অন্য সব মাছিরা আগুনে থাকবে।'

মধু সাদা, হলদে, লাল তথা বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে। ফল, ফুল ও মাটির রংয়ের ভিন্নতার কারণেই মধুর এই বিভিন্ন রং হয়ে থাকে। মধুর যেমন বাহ্যিক সৌন্দর্য রং ও চমক রয়েছে, তদ্রূপ এর মাঝে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধকও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা অনেক রোগ থেকে আরোগ্য দান করেন।

সেমতে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাইয়ের ডাইরিয়া হয়েছে। বললেন, তাকে মধু পান করাও।' সে বাড়ি ফিরে তাকে মধু পান করালো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তার অসুখ তো আরও বেড়ে গেছে। নবীজী সা. বললেন, 'যাও তাকে মধু পান করাও। সে ফিরে গিয়ে আবার তাকে মধু পান করালো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে সে ওই কথাই বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তার ডাইরিয়া আরো বেড়ে গেছে। নবীজী বললেন, 'আল্লাহ তাআলা সত্যবাদী। তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। তুমি যাও, আবার তাকে মধু পান করাও।' তৃতীয়বার মধু খাওয়ানোর দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহে আরোগ্য লাভ করলো।'

চিকিৎসকদের একাংশের অভিমত হলো, সম্ভবত লোকটির পেটে প্রচুর আবর্জনা ছিলো। মধুর উষ্ণতার কারণে সেগুলো হজম হতে থাকে। ফলে সেগুলো বেরিয়ে যেতে থাকে। দাস্তের পরিমাণ বেড়ে যায়। গ্রাম্য লোকটি এটাকেই রোগবৃদ্ধি মনে করে নবীজীর কাছে একের পর এক অভিযোগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সা. প্রতিবারই তাকে মধু পান করাতে বলেছেন। এতে আবর্জনাগুলো তীব্রবেগে বেরোতে থাকে। আবার মধুর দেয়ার কারণে তার পেট পরিষ্কার হয়ে যায় ও বিপদ থেকে মুক্তি পায় এবং আল্লাহর দয়ায় পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ফলে নবীজী সা.-এর সেই কথায় আল্লাহ যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা পূর্ণ হলো।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূল সা.-এর মিষ্টি ও মধু প্রিয় ছিলো। 'তিন বস্তুর মাঝে আরোগ্য রয়েছে। শিঙ্গা লাগানো, মধুপান ও তপ্ত লোহার সেঁকের মাধ্যমে দাগ নেওয়া। কিন্তু আমি আমার উম্মতকে দাগ নিতে নিষেধ করছি।' বুখারী শরীফে বর্ণিত আরেক হাদীসে এসেছে, 'তোমাদের অষুধগুলোর মধ্য হতে কোনোটিতে যদি আরোগ্য থাকে তবে সেগুলো হলো শিঙ্গা লাগানো, মধুপান ও আগুনের মাধ্যমে দাগ লাগানো। যে রোগের জন্যে যেটা উপযুক্ত। তবে আমি দাগ লাগানোকে পসন্দ করি না।' মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 'আমি তা পসন্দ করি না; বরং এটি আমার অপ্রিয়।' ইবনে মাজাহ শরীফের বর্ণনায় এসেছে, 'মধু ও কুরআন– তোমরা এ দু'টি

আরোগ্যদানকারীকে অবশ্যই মূল্যায়ন করবে।'

**উপকারিতা :** ইবনে জরীরে এসেছে, আলী রা. বলেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি রোগমুক্তি চায়; তাহলে সে যেন কুরআনের কোনো আয়াত সহীফায় লিখে তা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নেয়। অতঃপর স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু অর্থ তার সন্তুষ্টি সহকারে চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে মধু কিনে তা পান করে নেয়। এর মধ্যে কয়েক কারণে আরোগ্য লাভ হয়।

আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ —'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করেছি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত।'[৫৯] অন্য আয়াতে বলেন,وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا—' আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি।'[৬০] আরও ইরশাদ করেন, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا—' তারা যদি খুশী হয়ে মহরের অংশ থেকে তোমাদেরকে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।'[৬১] মধুর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ—'এতে মানুষের জন্যে রয়েছে আরোগ্য।'

ইবনে মাজাহ শরিফে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সকালে মধু চেটে নেয় তার ওপর কোনো বড় বিপদ আসে না'। ইবনে মাজাহর অপর বর্ণনায় এসেছে, তোমরা سَنى ও سَنوت ব্যবহার করো। কেননা এতে سام ব্যতীত প্রতিটি রোগের অষুধ রয়েছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, سام মানে কী? নবীজী বললেন, মৃত্যু। سنوت এর অর্থ شبت বলা হয় এবং মানুষেরা বলে سنوت মধু; যা ঘী-এর ভাণ্ডারে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, سنوت বলা হয় ঘী-এর মটকায় রাখা মধুকে। কবিদের কবিতার মাঝেও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ বলেন, মাছির মতো দুর্বল প্রাণী তোমাদের জন্যে মধু ও মোম তৈরি করা, বিনা বাঁধায় যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ানো, বাসস্থান চিনতে ভুল না করা ইত্যকার বিষয়গুলোর মাঝে তোমাদের জন্যে চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে। এতে চিন্তাশীল ও ভাবুক মনের অধিকারী লোকদের জন্যে আমার বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। তোমরা এথেকে আল্লাহ তাআলার মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশীল, সর্বোজ্ঞ, দয়ালু ও করুণাময়ী হওয়ার প্রমাণ অর্জন করতে পারো।

---

৫৯. সূরা ইসরা : ৮২।
৬০. সূরা কাফ : ৯।
৬১. সূরা নিসা : ৪।

## সূরা নাহলের ৭০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ ۙ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

'আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তোমাদের অনেকে এমনও আছে, যাকে একেবারে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত করা হয়, যাতে তার জ্ঞান লাভের পরেও সবকিছু অজানা হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।'

**ব্যাখ্যা :** সকল বান্দার ওপর এককভাবে আল্লাহ তাআলারই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনিই তাদেরকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। এরপর তিনিই তাদের মৃত্যু ঘটাবেন। কাউকে তিনি এতো দীর্ঘ জীবন দান করেন যে, সে পুনরায় শিশুদের মতো দুর্বল হয়ে পড়ে। সাইয়্যেদুনা আলী রা. বলেন, পঁচাত্তর বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর মানুষের সাধারণত এমনই দশা হয়ে থাকে। তখন তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায় ও জ্ঞান কমতে থাকে। এক পর্যায়ে সে জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞদের মতো হয়ে যায়।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. এ দোয়া করতেন, أعوذ بك من البخل والكسل، والهرم وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات—'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কার্পণ্য, অক্ষমতা, বার্ধক্য, ভীষণ পৌঢ়ত্ব, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা ও জীবন-মৃত্যুর ফেতনা থেকে।

যুহাইর ইবনে আবু সালমা তাঁর জগদ্বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'মু'আল্লাকা'-এর মাঝে এই বয়সটিকে দুঃখ ও কষ্টের ভাণ্ডার ও উৎস ভাগাড় অভিহিত করেছেন।

## সূরা নাহলের ৭১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

আর আল্লাহ রিযিকের ক্ষেত্রে তোমাদের কতককে কতকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন; কিন্তু যাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তারা তাদের রিযিক দাস-দাসীদের ফিরিয়ে দেয় না। (এই ভয়ে যে,) তারা তাতে সমান হয়ে যাবে। তবে তারা কি আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে?

**ব্যাখ্যা :** মুশরিকদের অজ্ঞতা ও কুফরীর আলোচনা হচ্ছে। আল্লাহ বলছেন,

তারা জানে, তাদের ওই উপাস্যগুলো আল্লাহর বান্দা; এতদসত্ত্বেও তারা সেগুলোর উপাসনা করে। সেমতে তারা তাদের হজ্জ আদায় করার সময় বলতো لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ إِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ.—'হে আল্লাহ! আমরা উপস্থিত হয়েছি তোমার আহ্বানে। তোমার কোনো শরীক নেই; সেই শরীক ব্যতিরেকে যার তুমিই মালিক; এবং তার মালিকানায় যা কিছু আছে তুমি তারও মালিক।'

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে বলেন, তোমরা যখন তোমাদের নিজেদের সম্পদ থেকে অংশ দিতে চাও না, তাদেরকে তোমাদের সমান অধিকার দাও না; তাহলে কোন যুক্তিতে আমার গোলামদেরকে আমার সঙ্গে শরীক করছো? একই ভাষ্য আলোচিত হয়েছে অন্য আরেকটি আয়াতে। ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ। তোমরা যখন তোমাদের গোলামদেরকে তোমাদের সম্পদে, তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে তোমাদের শরীক বানানো ঘৃণা করো তাহলে কেনো আমার গোলামদেরকে আমার খোদায়িত্বের মাঝে অংশীদার মনে করছো? আল্লাহর জন্যে এমন জিনিস পসন্দ করা; যা তোমরা নিজেদের জন্যেও পছন্দ করো না– এটাও আল্লাহর নেয়ামতের অস্বীকৃত। এ হলো মিথ্যা উপাস্যদের প্রকৃত উদাহরণ। তোমরা যদি তোমাদের গোলাম থেকে আলাদা হও; তাহলে আল্লাহও তো এই মিথ্যা উপাস্যদের থেকে আলাদা। এটি কতো বড় অকৃতজ্ঞতা যে, তোমাদের এই ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা এককভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন; অথচ উপাসনার ক্ষেত্রে তোমরা তাঁর সঙ্গে অন্যদের সংযুক্ত করছো!

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হযরত আবু মূসা আশ'আরী রা.-কে লেখা একটি চিঠিতে বলেন, 'নিজ উপার্জনের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। আল্লাহ তাআলা একজনকে অন্যজন থেকে বেশী ধনবান বানিয়ে রেখেছেন। এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা যে, তিনি দেখতে চান ধনাঢ্যরা কিভাবে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে; আর অন্যদের যে অধিকার তার ওপর আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা কতোটুকু সে আদায় করে।

## সূরা নাহলের ৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ○

'আর আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদেরকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের জন্য সন্তানসন্ততি সৃষ্টি করেছেন আর তিনি তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি তারা মিথ্যাকে বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?'

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ নিজ বান্দাদের ওপর আরো একটি নেয়ামতের কথা আলোচনা করেছেন, আমি তোমাদেরই প্রজাতির মধ্য থেকে, তোমাদেরই সম আকৃতি ও একই অবয়ব বিশিষ্ট নারীদেরকে তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছি। যদি ভিন্ন প্রজাতির হতো তাহলে পরস্পরে আন্তরিক প্রেম-অনুরাগ ও হৃদ্যিক বন্ধন সৃষ্টি হতো না। কিন্তু তা না করে, আল্লাহ নিজ দয়ায় নারী-পুরুষকে একই প্রজাতির সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তাদের মিলনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করিয়েছেন; সন্তানের ধারাবাহিকতা বিস্তৃত করেছেন। যার ফলে ছেলে হয়েছে। ছেলের ঘরে আবার ছেলে হয়েছে। حفدة এর এক অর্থ, পৌত্র। দ্বিতীয় অর্থ, সেবক, সহায়তাকারী। সুতরাং ছেলে ও নাতি-পুতিও একধরনের সেবক হয়ে থাকে। আরবদেশের প্রথাও এমনই ছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তান পরবর্তী স্বামীর ঔরসজাত হয় না। حفدة বলা হয় ওই ব্যক্তিকে যে কারো সামনে তার জন্যে কাজ করে। কারো কারো মতে শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য, বৈবাহিক আত্মিয়তা। অর্থের ব্যাপকতার অধীনে এসব অন্ত র্ভুক্ত। এ কারণেই দোয়ায়ে কুনূতে এসেছে, وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ —'আমাদের চেষ্টা, সাধনা ও সেবা তোমার জন্যেই নিবেদিত।'

## সূরা নাহলের ৭৮-৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে। এমতবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে

দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর; যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো। তারা কি আকাশে উড়ন্ত পাখিগুলোর দিকে তাকায় না? আল্লাহ্ ছাড়া কেউ সেগুলোকে স্থির রাখে না। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সর্বব্যাপক জ্ঞান ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কথা আলোচনা করে বলেন, তিনিই আসমান-জমিনের অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। অন্য কেউ নেই যে, গায়েব জানে। আল্লাহ্ তাআলা যার সম্পর্কে ইচ্ছা, যে জিনিস সম্বন্ধে চান সংবাদ জানানোর ক্ষমতা রাখেন। প্রতিটি জিনিস তাঁর কুদরতের অধীনস্থ। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা কারও নেই। তাঁকে প্রতিহত করার ক্ষমতাও কেউ রাখে না। তিনি যে কোনো সময় যে কোনো কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা ও শক্তি রাখেন। চোখ বন্ধ করার পর খুলতে তো যৎসামান্য পরিমাণ হলেও তোমাদের দেরি হয়; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার কোনো নির্দেশ সম্পন্ন করতে ওই পরিমাণ দেরিও হয় না। কিয়ামত সংঘটিত করাও তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ। সেটা নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সংঘটিত হয়ে যাবে।

আল্লাহর পক্ষে সবাইকে সৃষ্টি করা ততোটাই সহজ; একজনকে সৃষ্টি করা যতোটা সহজ। আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও করুণার অন্যতম প্রকাশ হলো, তিনি মায়ের পেট থেকে বনি আদম সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির শুরুতে যে ছিলো অত্যন্ত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র। আল্লাহ্ তাকে কান দিয়েছেন, যা দিয়ে সে শোনে। চোখ দিয়েছেন, যা দিয়ে সে দেখে। অন্তর দিয়েছেন, যা দিয়ে সে ভাবে। বুদ্ধি দিয়েছেন। বিবেক দিয়েছেন। অন্তর দিয়েছেন। বুদ্ধির মাধ্যমেই ব্যক্তি তার লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করে। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী ইন্দ্রীয়। আর এই ইন্দ্রীয়-জ্ঞান মানুষ ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে প্রাপ্ত হয়। বয়সের সঙ্গে সেটিও সমৃদ্ধ হতে থাকে। এক পর্যায়ে ওই বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। আল্লাহ্ মানুষকে এ সকল শক্তি ও অনুভূতি এজন্যে দিয়েছেন; যেন তারা আল্লাহর মা'রিফাত ও ইবাদতে মগ্ন হয়।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওলিদের বিরুদ্ধাচরণ করে সে প্রকৃতপক্ষে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর আমার ফরয বিধান পালনের মাধ্যমে বান্দা আমার যে পরিমাণ নৈকট্য লাভ করবে অন্য কোনো আমলের মাধ্যমে তা পারবে না। আর নফল নামায অধিক পরিমাণে আদায় করার মাধ্যমে বান্দা আমার প্রিয় হয়ে যায়। যখন আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই; যা দিয়ে সে শোনে। তার চোখ হয়ে যাই– যা দিয়ে সে দেখে। তার হাত হয়ে যাই– যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই যার সাহায্যে সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি অবশ্যই তাকে দেই। যদি দোয়া করে আমি

তা কবুল করি। যদি সে আশ্রয় চায় আমি আশ্রয় দিই। আর আমি কোনো কাজ করার সময় এতটা দ্বিধা বোধ করি না, যতোটা অনুভব করি মুমিনের রূহ কবয করার সময়। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে। আমি তাকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না। আর মৃত্যু এমন জিনিস নয় যে, এর থেকে কোনো প্রাণী পরিত্রাণ পেতে পারে।' এ হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, যখন ঈমানদার ব্যক্তি ইখলাস ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করে তখন তার প্রতিটি কর্ম একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যে হয়ে যায়। সে তখন আল্লাহর জন্যে শোনে; আল্লাহর জন্যে দেখে। অর্থাৎ শরীয়তের কথা শোনে। শরীয়ত তাকে যেসকল জিনিস দেখার অনুমতি দিয়েছে শুধু সেগুলোই দেখে। তার হস্ত সম্প্রসারণ, তার পদবিক্ষেপও শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পেই হয়ে থাকে। তার পূর্ণ ভরসা থাকে আল্লাহর ওপর। সে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে। তার সকল কর্ম একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ই নিবেদিত হয়ে থাকে। এ কারণে কিছু কিছু হাদীসে এ কথাও এসেছে যে, সে তখন শুধু আমার জন্যেই শোনে; আমার জন্যেই দেখে; আমার জন্যেই ধরে; আমার জন্যেই চলাফেরা করে।

এক আয়াতে এসেছে, বনি আদম যখন মায়ের পেট থেকে বেরোয় তখন আল্লাহ তাকে কান, চোখ, অন্তর ও মস্তিষ্ক দান করেন; যেন সে আল্লাহর শোকর আদায় করে। অন্য আয়াতে এসেছে, قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ الخ—'বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত হতে হবে।'[৬২]

অতঃপর আল্লাহ বান্দাদের সম্বোধন করে বলেন, ওই পাখিগুলোকে দেখো যা আকাশ ও জমিনের মাঝখানে শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে তাঁর অসীম কুদরতের মাধ্যমে সেখানে স্থির রেখেছেন; সেগুলোকে উড্ডয়ন ক্ষমতা দিয়েছেন; বাতাসকে তাদের অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। সূরা মুলকেও একই ভাষ্য এসেছে, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ الخ—'তারা কি তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পাখিগুলো দেখতে পায় না? ঐারা তাদের পাখাগুলোকে বিস্তার করে আছে ও সংকুচিতও করে আছে। তাদেরকে রহমান ও রাহিম আল্লাহ্ ছাড়া কে স্থির রাখেন? তিনি সমস্ত মাখলুককে খুব ভালোভাবেই দেখছেন।'[৬৩] আলোচিত আয়াতের শেষাংশেও আল্লাহ বলেন, এর মাঝে ঈমানদারদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

---

৬২. সূরা মুলক : ২৩-২৪।

৬৩. সূরা মুলক : ১৯।

## সূরা নাহলের ৮০-৮১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَ مِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○

আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য আবাস করেছেন এবং তোমাদের পশুর চামড়া দিয়ে তাবুর ব্যবস্থা করেছেন, যা খুব সহজেই তোমরা বহন করতে পার ভ্রমণকালে ও অবস্থানকালে। আর তাদের পশম, লোম ও চুল দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহসামগ্রী ও ভোগ-উপকরণ তৈরি করেছেন। আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড়ে তোমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, আর ব্যবস্থা করেছেন পোশাকের, যা তোমাদেরকে গরম থেকে রক্ষা করে এবং বর্মেরও ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদেরকে রক্ষা করে যুদ্ধে। এভাবেই তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতকে পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা অনুগত হও।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা তাঁর অগণিত দয়া, বদান্যতা ও অনাদিকাল হতে চলে আসা বিশাল বিশাল নেয়ামতের কথা এখানে প্রকাশ করছেন, তিনি আদমসন্তানদেরকে বসবাস, শান্তি ও বিশ্রাম গ্রহণ নিশ্চিত করতে বাড়ি-ঘরের সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। কাঁচা-পাকা বাড়িঘর ছাড়াও তিনি চতুষ্পদ জন্তুর পশম দিয়ে তৈরি তাবু, কুঁড়ে ঘর ও ছাউনি দিয়েছেন। যা বিশেষত সফরের সময় ব্যবহৃত হয়। এই তাবুগুলোর বহুবিধ উপকারীতা রয়েছে। সহজে বহন করা যায়। অনায়াসে স্থাপন করা যায়। এবং অবস্থানশেষে বিনাকষ্টে উঠিয়ে নেওয়া যায়। এছাড়া বকরির লোম, উটের কেশগুচ্ছ, মেষ-দুম্বার পশমকে আল্লাহই তোমাদের জন্যে ব্যবসায়িক পণ্য বানিয়েছেন। এগুলো যেমন ঘরের তৈজসপত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়; তদ্রূপ এগুলো দিয়ে পোশাক তৈরি করা যায়, কার্পেট বানানো যায়; এর বাইরে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রয়োজন্যে এগুলোর কেনাবেচা হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ে মুনাফাও অর্জন করা যায়।

গাছের ছায়াকে তোমাদের উপকারার্থে প্রশান্তিদায়ক বানিয়েছেন। এ ছাড়া

তিনি পাহাড়ের চূড়ায় তোমাদের জন্যে গুহা, কেল্লা ইত্যাদি দিয়ে রেখেছেন, যেন সেখানে তোমরা আশ্রয় নিতে পারো; আত্মগোপন করতে ও সেখানে থাকার জন্য জায়গা বানাতে পারো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সূতি ও পশমি কাপড় দান করেছেন। যেন তা পরিধান করে শীত ও গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি নিজ লজ্জাস্থান আবৃত রাখতে পারো। দেহের শোভা বর্ধন করতে পারো। আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন লৌহবর্ম– যা যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে ব্যবহার হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের নানা প্রয়োজন পুরোপুরি পূরণ করতে নানাবিধ নেয়ামত দান করেছেন। যাতে তোমরা আরাম, বিশ্রাম ও প্রশান্তির সঙ্গে তোমাদের প্রকৃত দাতা আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হতে পারো।

নিঃসন্দেহে জঙ্গল ও মরুপ্রান্তরও আল্লাহর অন্যতম বড় নেয়ামত। এ কারণে পূর্বের রহমত ও নেয়ামতের কথা আলোচনা করার পরপরই আল্লাহ বলেন, এখনও যদি তারা আমার ইবাদত, তাওহীদ ও অসংখ্য নেয়ামতের কথা স্বীকার না করে তাহলে তাদের প্রতি আপনার ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। আপনি তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন। আপনার নিজ কাজে নিমগ্ন হোন। আপনার একক কাজ তো শুধু তাবলীগ করা। তা করতে থাকুন। তারা নিজেরাও ভালোভাবে জানে, আল্লাহই একক নেয়ামতদাতা। আশপাশে তাঁর অসংখ্য নেয়ামত ছড়িয়ে রয়েছে। এটা জানা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর তাওহীদকে অস্বীকার করছে এবং তাঁর সঙ্গে অন্য উপাস্যদের শরিক করছে। এমনকি তারা সেই নেয়ামতদানের ক্ষমতাকে গায়রুল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করছে। তারা মনে করছে, অমুক স্রষ্টা সাহায্য করেন; অমুক স্রষ্টা রিযিক দেন। অকৃতজ্ঞ কাফেরদের এটাই আসল চিত্র।

ইবনে আবী হাতেমে এসেছে, এক আরব বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এলো। রাসূল সা. তাঁর সামনে এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا—'আর আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য আবাস করেছেন।' লোকটি সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ। এটা সত্য। নবীজী পরবর্তী অংশ তেলাওয়াত করলেন, তোমাদের পশুর চামড়া দিয়ে তাবুর ব্যবস্থা করেছেন। সে বললো, হ্যাঁ, এটাও সত্য। এভাবে নবীজী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতে থাকেন আর সে প্রতিটি নেয়ামত স্বীকার করতে থাকে। সবশেষে যখন নবীজী এ অংশ তেলাওয়াত করেন–لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ—'এ জন্য যে, তোমরা মুসলমানও অনুগত হয়ে যাও, তখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে গেলো। ওই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ অবতীর্ণ করেন, 'তারা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত; তারপরও তারা অস্বীকার করে কাফের হয়ে যায়।'

## সূরা আম্বিয়ার ৩০-৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○ وَ جَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَ جَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○ وَ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۖ وَّ هُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ○ وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না, আসমানসমূহ ও জমিন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? আর আমি জমিনে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যেন তা পর্বতসমূহ নিয়ে একদিকে হেলে না পড়ে, আর আমি তাতে তৈরি করেছি প্রশস্ত রাস্তা, যেন তারা গন্ত ব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। আমি আসমানকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা তাঁর নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তিনিই রাত ও দিন এবং চাঁদ ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন; সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা এ কথা বলছেন, তাঁর কুদরত অপরিসীম। তাঁর রাজত্ব পরাক্রান্ত। আল্লাহ বলেন, যেসকল কাফের গায়রুল্লাহর উপাসনা করে তারা কি জানে না, আল্লাহই এককভাবে সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবার তত্ত্বাবধায়ক। তারপরও তারা কেনো তাঁর সঙ্গে অন্যদের শরিক করছে? আসমান ও জমিন প্রথমে পরস্পরে ভাজে ভাজে যুক্ত ছিলো। আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে পৃথক করেছেন। জমিন নিচে ও আকাশ ওপরে স্থাপন করেছেন। এতদুভয়ের মাঝখানে প্রচুর দূরত্ব রেখেছেন। এ সকল কাজ তিনি চরম নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। সাত জমিন সৃষ্টি করেছেন। সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। আসমান ও জমিনের মাঝখানে পরিমিত দূরত্ব রেখে সেখানে মহাশূন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে জমিনে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন করেন। তিনি পানির মাধ্যমে প্রতিটি জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি করেন। এ সকল জিনিস– যা এক আল্লাহর নিরঙ্কুশ কুদরত ও একত্ববাদের প্রমাণ বহন করে– সেগুলোকে তোমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান পাও না? তাহলে কী ভাবে একদিকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছো আর অন্যদিকে তাঁর সঙ্গে শিরক করা ত্যাগ করছো না? কবির ভাষায়,

فَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

'প্রতিটি বস্তু আল্লাহর রবুবিয়তের প্রমাণ বহন করে। বোঝায়, তিনিই একক স্রষ্টা ও উপাস্য।'

একবার এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করে যে, প্রথমে দিন ছিলো, না রাত ছিলো? উত্তরে তিনি বলেন, জমিন ও আসমান প্রথমে পরস্পরে যুক্ত ছিলো। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ অবস্থায় অন্ধকারই হবে। এই অন্ধকারেরই অপর নাম রাত। সুতরাং প্রমাণিত হলো, প্রথমে রাত ছিলো।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে যখন এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন, তোমরা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করো। তিনি উত্তরে যা বলবেন তা আমাকে জানাবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, প্রথমে জমিন ও আসমান একসঙ্গে ছিলো। না ওই সময় বৃষ্টি হতো, না উদ্ভিদ জন্মাতো। আল্লাহ তাআলা যখন প্রাণীজগত সৃষ্টি করেন তখন তিনি আকাশ বিদীর্ণ করে সেখান থেকে পানি বর্ষণ করলেন। এরপর জমিনকে চিরে সেখান থেকে ফসল উৎপন্ন করলেন। প্রশ্নকারী কথাগুলো যখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে জানান তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হন। বলেন, আজ আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হলো যে, কুরআন সংক্রান্ত বিদ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জ্ঞান অনেক বেশি। আমার মনে এ ধারণা উঁকি দিতো, এমন তো না যে, ইবনে আব্বাস দুঃসাহস দেখাচ্ছে? কিন্তু আজ সেই ধারণা অন্তর থেকে চলে গেছে।'

আল্লাহ আসমান বিদীর্ণ করে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। জমিনের সামষ্টিকতা ভেঙ্গে সেটিকে সাত জমিনে পরিণত করেছেন। মুজাহিদ রহ.-এর তাফসীরে এ কথাও এসেছে যে, এগুলো প্রথমে পরস্পরে মিলিত ছিলো। অর্থাৎ প্রথমে সাত আসমান একসঙ্গে ছিলো। অনুরূপ সাত জমিনও একসঙ্গে ছিলো। পরবর্তীতে সেগুলোকে পৃথক করা হয়েছে। হযরত সাঈদ রহ.-এর তাফসীরে এ কথা এসেছে যে, জমিন ও আসমান প্রথমে একটাই ছিলো। পরবর্তীকালে এদু'টিকে পৃথক করা হয়েছে। এতোদুভয়ের মাঝখানে মহাশূন্য রাখা হয়েছে এবং পানিকে সমস্ত প্রাণীর মূল উপাদান বানানো হয়েছে।

সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রা রা. একবার নবী কারীম সা.-কে বললেন, হুযুর! আপনাকে দেখলে আমার বুকের ভেতর সীমাহীন খুশি অনুভূত হয়। আমার দু'চোখ শীতল হয়। আপনি আমাদেরকে সকল জিনিসের মূল সম্পর্কে অবহিত করুন। উত্তরে রাসূল সা. বলেন, 'হে আবু হুরায়রা! সকল জিনিস সৃষ্টি হয় পানি দ্বারা।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি

আমাকে এমন আমলের কথা জানিয়ে দিন যা আদায় করলে আমি বেহেশতে যেতে পারবো, রাসূল সা. বললেন, লোকদেরকে সালাম দেবে ও আপ্যায়ন করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। আর শেষ রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন তুমি উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করবে। তাহলে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে নিরাপদে জান্নাতে যেতে পারবে।'

আল্লাহ তাআলা জমিনকে পাহাড়ের পেরেকের মাধ্যমে দৃঢ়তা দান করেছেন। যেন জমিন দুলে উঠে মানুষকে পেরেশান করতে না পারে। ভুকম্পনের মাধ্যমে জনজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি না করে। জমিনের তিন চতুর্থাংশ পানির জন্যে বরাদ্দ। শুধু এক চতুর্থাংশ সূর্য ও বাতাসের জন্যে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। যেন মানুষ স্বচক্ষে আকাশ ও সেখানকার বিস্ময়কর জিনিসগুলো দেখতে পায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিজের পূর্ণ রহমত দ্বারা অসংখ্য পথ বানিয়ে দিয়েছেন। যেন মানুষ সহজে সফর সম্পন্ন করতে পারে। দূর-দূরান্তে আসা-যাওয়া করতে পারে। আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ দেখুন! ভূখণ্ডের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের আড়াল হয়ে আছে সারি সারি আকাশচুম্বী পাহাড়। তখন রাহ্যক এক পাশ থেকে অন্য পাশে যাওয়া অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ নিজ কুদরতের প্রকাশ ঘটিয়ে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে একেবেকে পথ বানিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে সহজেই এক ভূখণ্ডের লোক অন্য ভূখণ্ডে যেতে পারছে। এভাবে তারা নিজেদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে পারছে। আল্লাহ আসমানকে জমিনের ওপর গম্বুজসদৃশ্য ছাদ বানিয়েছেন। যেমনটি তিনি এক আয়াতে এভাবে বলেছেন, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ—'আমি আসমানকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছি। অবশ্যই আমি প্রশস্ততা ও বিস্তৃতির অধিকারী।'[৬৪] অন্য আয়াতে বলেন, وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا—'শপথ আকাশের এবং যিনি তা সৃষ্টি করেছেন।'[৬৫] অন্য আয়াতে বলেন, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ—'তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং করেছি সুশোভিত? তাতে কোন ছিদ্রও নেই।'[৬৬]

بنا বলা হয় গম্বুজ ও তাবু দাঁড় করা। যেমন রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'ইসলামের 'বিনা' বা মূল ভিত্তি হলো পাঁচটি।' যেভাবে পাঁচ স্তম্ভের ওপর কোনো ছাদ বা তাবু দাঁড়িয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিস্ময়কর বিষয় হলো, ছাদের মতো যেই আকাশ আমাদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটি এতোটাই সুরক্ষিত ও প্রহরীর প্রহরাধীন যে, কারো পক্ষে সেখানে ন্যূনতম ক্ষতি করা সম্ভব

---

৬৪. সূরা যারিয়াত : ৪৭।

৬৫. সূরা শামস : ৫।

৬৬. সূরা কাফ : ৬।

নয়। আকাশ অনেক উঁচুতে অবস্থিত ও তা শতভাগ নির্মল।

এক হাদীসে এসেছে, এক লোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল সা.! এই আকাশ কী? উত্তরে নবীজী সা. বলেন, এটি হলো বাতাসের তরঙ্গ– কিন্তু মানুষ আল্লাহর এই বিশাল নিদর্শন থেকেও নির্ভিক।

যেমন বলা হয়েছে, আসমান ও জমিনের অনেক নিদর্শন রয়েছে, যা মানুষের দৃষ্টি সীমার বাইরে। কিন্তু তারপরও তারা ওই সমস্ত জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। কেউ চিন্তা-ভাবনাও করে না যে, কত বিস্তৃত ও কত উঁচু এই আকাশ। যা আমাদের মাথার ওপরে বিনা স্তম্ভে আল্লাহ তাআলা দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এরপর সেখানে সৌন্দর্যের মেলা বসিয়েছেন জ্বলজ্বলে তারকারাজির মাধ্যমে! কিছু তারকা এদিক-সেদিক ছুটে বেড়ায়। কিছু তারকা স্থির থাকে। অন্যদিকে সূর্য তার নিজ কক্ষপথে আবর্তনশীল। সূর্যের উপস্থিতিতে দিন হয়, আর তা দেখা না গেলে রাত হয়। একদিন-একরাতের সফরের মাধ্যমে তার গোটা আকাশ প্রদক্ষিণ সম্পন্ন হয়। সূর্যের এই চলমানতা ও তার গতি সম্পর্কে শুধু আল্লাহ তাআলাই ওয়াকিফহাল। তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কেউ এমনি ধারণা বা অনুমান করা— সেটা ভিন্ন কথা।

বনী ইসরাঈলের এক বুযুর্গের ঘটনা। এই বুযুর্গ অনবরত ত্রিশটি বছর আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার মেয়াদ পূর্ণ করতে পেরেছিলো। ওই যুগে প্রচলন ছিলো, কেউ ত্রিশ বছর ইবাদত করলে তার মাথার ওপর মেঘের ছায়া চলে আসতো। ঘটনাচক্রে ওই বুযুর্গের ওপর মেঘের ছায়া আসছিলো না। বুযুর্গ লোকটি তখন তার মায়ের কাছে ঘটনা খুলে বললেন। মা বললেন, বেটা! তুমি এই মেয়াদের ভেতর কোনো গুনাহ করেছো কি? তিনি বললেন, আম্মা! আমি একটি গুনাহও করিনি। মা বললেন, তুমি হয়তো কোনো গুনাহের ইচ্ছা করেছিলে! তিনি বললেন, এমনটিও কখনও হয়নি। মা বলেন, হতে পারে– তুমি কোনোদিন আসমানের দিকে তাকিয়েছিলে; কিন্তু কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছো! বুযুর্গ বললেন, এমনটি তো নিয়মিতই হয়েছে। মা বললেন, তাহলে এটাই সেই কারণ। যার কারণে তুমি বঞ্চিত হয়েছো।

এরপর আল্লাহ তাঁর নিসীম কুদরতের কিছু নিদর্শন তুলে ধরে বলেন, তোমরা রাত ও তার অন্ধকারের দিকে লক্ষ্য করো। দিন এবং তার আলোকোজ্জ্বলতার প্রতি লক্ষ্য করো। এরপর এ দু'টির ধারাবাহিক আসা-যাওয়ার প্রতি লক্ষ্য করো। একটির হ্রাস ও অন্যটির বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করো। সূর্য ও চাঁদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবে, সূর্যের আলোর নিজস্ব ধরন রয়েছে। আকাশে তার আগমন, নড়াচড়া ও গতিবেগ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তদ্রূপ চাঁদের আলোও ভিন্ন। তার কক্ষপথ ও গতিধারাও ভিন্ন। তার ধরনও ভিন্ন। প্রতিটি নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে। তারা আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালনে নিমগ্ন।

তাইতো আল্লাহ বলেন, فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا الخ —'তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ।'[৬৭]

## সূরা মু'মিনূনের ১২-১৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا * ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ○ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ○

আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রকে আমি 'আলাক'-এ পরিণত করি। তারপর আলাককে গোশ্তপিণ্ডে পরিণত করি। তারপর গোশ্তপিণ্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশ্ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়! এরপর অবশ্যই তোমরা মারা যাবে। তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানবসৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে, তিনি আদম আ.-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। যা কাদা ও বেজে ওঠে– এমন মাটির আকৃতিতে ছিলো। অতঃপর আদম আ.-এর শুক্র থেকে তাঁর সন্তানদের সৃষ্টি করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করে অতঃপর মানুষরূপে জমিনে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

মুসনাদে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। যা তিনি সমগ্র জমিন থেকে নিয়েছিলেন। এ কারণেই বনি আদমদের রূপ-রং ভিন্ন। কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো এবং কেউ অন্য রংয়ের অধিকারী। কেউ নেককার, কেউ বদকার। অন্য আয়াতে এসেছে, أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ . فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ —'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (বীর্য) হতে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর তা স্থাপন করি একটি নিরাপদ আধারে।' মানবভ্রূণ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তার মায়ের গর্ভে লালিত হয়। সেখানে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় এক আকৃতি থেকে

---

৬৭. সূরা আন'আম : ৯৬।

অন্য আকৃতিতে পরিবর্তন হতে থাকে। অতঃপর শুক্র– যা তীব্রবেগে ছটফট করা পানি; যা পুরুষের পিঠ ও মায়ের বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়– তা রূপ পরিবর্তন করে লাল রংয়ের পিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর সেটি মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে। এ সময় তাতে কোনো আকৃতি বা রেখা থাকে না। অতঃপর আল্লাহ সেখানে অস্থি-মজ্জা তৈরি করেন। মাথা, হাত, পা, হাড়, শিরা ও নিতম্ব ইত্যাদি তৈরি করেন। বিশেষত মেরুদণ্ড তৈরি করেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'মানুষের সারা দেহ গলে পঁচে যায়; শুধু মেরূদণ্ড অবশিষ্ট থাকে। এথেকেই তাকে পুনসৃষ্টি করা হবে। তার দেহের পুনর্গঠন হবে।' আল্লাহ বলেন, অতঃপর আমি সেই অস্থি-মজ্জাকে গোশত দিয়ে ঢেকে দিই। যেন তা গুপ্ত ও শক্তিশালী থাকে। এরপর আল্লাহ তাতে রূহ ফুঁকে দেন। ফলে সেটি নড়াচড়া ও চলাফেরার যোগ্য হয়ে ওঠে। এভাবে সে একজন জীবন্ত মানুষের রূপ ধারণ করে। তার মাঝে আল্লাহ দেখা, শোনা, বোঝা, নড়া ও স্থির হওয়ার শক্তি দান করেন। আল্লাহ কতোই না বরকতময় সত্তা! তিনি সবচে নিপুণ সৃষ্টির স্রষ্টা।

সাইয়্যেদুনা হযরত আলী রা. বলেন, শুক্র যখন মাতৃগর্ভে চার মাস অতিবাহিত করে তখন আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন। ওই ফেরেশতা তিন ধরনের অন্ধকারের মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'অবশেষে আমি তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে'-এর এটাই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ এখানে দ্বিতীয় প্রকারের সৃষ্টির কথা বলে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথা বোঝানো হয়েছে।

একটি ভ্রূণ মায়ের পেটে এক অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা থেকে তৃতীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পর স্তরগুলো অতিক্রম করার পর জন্ম নেয় একান্তই অবুঝ ও জ্ঞানশূন্য শিশুরূপে। এরপর সে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। এক পর্যায়ে যৌবনে পদার্পণ করে। এরপর সে পৌঢ় হয়। সবশেষে পৌঁছে যায় বার্ধক্যে। তখন সে পুরোপুরি বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। মোটকথা, মানবজীবনের সূচনায় রূহ ফুঁকে দেয়ার পর থেকে একের পর এক অবস্থায় রূপান্তরপ্রক্রিয়া ঘটতে থাকে।

সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি চল্লিশ দিন পর্যন্ত মায়ের গর্ভে জমা হতে থাকে। পরবর্তী চল্লিশ দিন পর্যন্ত তা রক্তপিণ্ডের আকারে থাকে। এরপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংসপিণ্ডের আকারে থাকে। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। যিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে চারটি বিষয় লিখে নেন। তা হলো, তার রিযিক, আয়ুষ্কাল, আমল ও সে হতভাগ্য হবে, না সৌভাগ্যবান হবে। শপথ একক উপাস্য আল্লাহর! একব্যক্তি জীবনভর জান্নাতবাসীর আমল করতে থাকবে। এমনকি সে জান্নাত থেকে মাত্র এক হাত দূরে থাকবে। এমতবস্থায়

তাকদিরের লিপি তার ওপর জয় লাভ করবে। সে জীবনসায়াহ্নে এসে জাহান্নামীদের ন্যায় কাজ করতে থাকবে আর ওই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হবে। ফলে সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। তদ্রূপ আরেক ব্যক্তি জীবনভর জাহান্নামীদের ন্যায় কাজ করতে থাকবে। এমনকি সে জাহান্নাম থেকে বড়জোর এক হাত দূরে থাকবে। এমতবস্থায় তার দিকে তাকদিরের লিখন এগিয়ে আসবে। ফলে সে শেষ জীবনে জান্নাতীদের ন্যায় আমল শুরু করবে এবং এ আমলের ওপর তার মৃত্যু হবে। ফলে সে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, বীর্য যখন গর্ভাশয়ে পতিত হয় তখন সেটা প্রতিটি চুল ও নখের স্থানে পৌঁছে যায়। অতঃপর চল্লিশ দিন পরে ওটা জমাট রক্তের আকার ধারণ করে।

মুসনাদে আহমদে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ইত্যবসরে একজন ইহুদি উপস্থিত হলো। কুরাইশী কাফেররা তখন তাকে বললো, এ লোকটি নবুওয়াত দাবী করছে। সে বললো, আচ্ছা! আমি তাঁকে একটি প্রশ্ন করবো। এ প্রশ্নের উত্তর নবীরা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। সে তখন নবীজীর দরবারে এসে বসলো এবং নবীজী সা.-কে জিজ্ঞেস করলো, বলুন, মানুষের সৃষ্টি কী ভাবে হয়ে থাকে? নবীজী বললেন, পুরুষ ও নারীর বীর্য থেকে। পুরুষের বীর্য গাঢ় ও ভারী হয়ে থাকে। যা দিয়ে সন্তানের অস্থি-মজ্জা সৃষ্টি হয়। আর মহিলার বীর্য পাতলা ও তরল হয়ে থাকে। যা দিয়ে গোশত ও রক্ত তৈরি হয়। ইহুদি বললো, আপনি সত্য বলেছেন। পূর্ববর্তী নবীগণও এ কথাই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, শুক্র গর্ভাশয়ে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করার পর তার কাছে একজন ফেরেশতা উপস্থিত হয়। সে তখন আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ! এই ভ্রূণটি নেককার হবে, না বদকার? ছেলে হবে, না মেয়ে? আল্লাহ তখন উত্তরে যা বলেন, তা সে লিখে নিয়ে যায়। এ সময় সে তার আমল, বয়স ও ভালো-মন্দ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করে। অতঃপর সে খাতা গুছিয়ে ফেলে। পরবর্তীকালে তার মাঝে কমবেশি করার কোনো সুযোগ থাকে না।

বায্যারে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আল্লাহ তাআলা গর্ভাশয়ে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। যিনি নিবেদন করেন, হে আমার প্রতিপালক! এখন শুক্র। হে আমার প্রতিপালক! এখন রক্তপিণ্ড। হে আমার প্রতিপালক! এখন মাংসপিণ্ড। আল্লাহ যখন সেটিকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন, হে আমার প্রতিপালক! নর হবে, না নারী হবে? হতভাগা হবে, না ভাগ্যবান? এর রিযিক কী হবে? আয়ুষ্কাল কতো হবে? আল্লাহ উত্তর জানিয়ে দিলে তিনি সব তথ্য লিপিবদ্ধ করে নিয়ে যান।

অতঃপর আল্লাহ এ জাতীয় আরো কিছু বিষয়– যেখানে আল্লাহর পূর্ণ ও

ব্যাপক কুদরতের প্রকাশ ঘটেছে– তা বর্ণনা করে বলেন, 'অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতোইনা বরকতময়!

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খত্তাব রা. বলেন, আমি আমার রবের চারটি কথায় সামঞ্জস্য পেয়েছি। আল্লাহ যখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তখন অকৃত্রিমভাবেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ। আল্লাহ তখন এটিই অবতীর্ণ করেন।

যায়েদ ইবনে সাবেত আনসারী রা.-কে যখন রাসূলুল্লাহ সা. এ আয়াতগুলো লেখাচ্ছিলেন وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ .... خَلْقًا آخَرَ এবং এ পর্যন্ত লিখিয়েছেন। তখন হযরত মু'আয রা. স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ। তাঁর মুখে এ বাক্য শুনে রাসূলুল্লাহ সা. হেসে ওঠেন। মু'আয রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেনো হাসছেন? উত্তরে নবীজী বললেন, এ আয়াতের শেষেও এমনটা রয়েছে।'

আল্লাহ বলেন, এই প্রথম সৃষ্টির পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। এরপর কিয়ামত দিবসে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। তোমাদের হিসাবকিতাব হবে। সেদিন তোমরা প্রতিটি ভালো-মন্দ কাজের প্রতিফল পাবে।

## সূরা মু'মিনূনের ১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ○

আর অবশ্যই আমি তোমাদের ওপর সাতটি স্তর সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই।

**ব্যাখ্যা :** পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে তিনি আসমান সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করছেন। মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়া থেকে আসমান সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনেক বড়, অনেক কঠিন এবং সেখানে অনেক শিল্পকারিগরির প্রকাশ ঘটেছে। সূরা আলিফ লাম সেজদার মাঝে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. শুক্রবারের ফজর নামাযের প্রথম রাকাতে এ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন। সেখানে প্রথমে আসমান ও জমিনের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মানবসৃষ্টির বর্ণনা এসেছে। এরপর কিয়ামত ও পুরস্কার-তিরস্কার সহ প্রভৃতির আলোচনা এসেছে। সাত আসমান তৈরির কথা আলোচিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ করেছেন, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ —'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যাকিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও গুণকীর্তণ বর্ণনা করে।[৬৮]

---

৬৮. সূরা ইসরা : ৪৪।

অন্য আয়াতে বলেন, 'তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। অপর আয়াতে ইরশাদ করেন, 'তিনিই আল্লাহ্, যিনি সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর বেলায়ও অনুরূপ আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে, যাতে তোমরা জানতে পার, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুকে তিনি ঘিরে রেখেছেন। আল্লাহ তাঁর মাখলুকাত সম্পর্কে অসচেতন নন। জমিনে কী বপন করলো এবং তা থেকে কী উত্থিত হলো, সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আসমান থেকে যা কিছু অবতরণ করে, আর যা কিছু আসমানের দিকে উত্থিত হয়, সে সম্পর্কে তিনি জানেন। যেখানেই তুমি থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের প্রতিটি আমল দেখতে পাচ্ছেন। ঊর্ধ্বাকাশের বস্তুরাশি, জমিনের অভ্যন্তরে সুপ্ত জিনিসপত্র, পাহাড়ের শীর্ষদেশ আর সমুদ্রের গভীর গহ্বর– সবই আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত রয়েছে। পাহাড়শৃঙ্গে কী হচ্ছে, সমুদ্রের অতলান্তে কী ঘটছে, জঙ্গলের গাছ-গাছালির কী অবস্থা তা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। গাছের কোনো একটি পাতাও তাঁর অজ্ঞাতে ঝরে না। কোনো বীজ জমিনের অভ্যন্তরে এমনভাবে যায় না যে, তা তিনি জানেন না। কাজেই জলভাগ ও স্থলভাগের কোনো জিনিস এমন নেই, যা তাঁর কাছে অস্পষ্ট।

## সূরা মু'মিনূনের ১৮-২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَ اِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ
لَقٰدِرُوْنَ ○ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ ۖ لَكُمْ فِيْهَا
فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ
بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ○ وَ اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا
فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ○ وَ عَلَيْهَا وَعَلَى
الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ○

আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করি। অতঃপর আমি তা জমিনে সংরক্ষণ করি। অবশ্যই আমি সেটাকে অপসারণ করতেও সক্ষম। তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানসমূহ সৃষ্টি করি। তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল থাকে এবং তা থেকেই তোমরা খাও। আর সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা সিনাই পাহাড়ে জন্মায়, যা আহারকারীদের জন্য তেল ও তরকারী উৎপন্ন হয়। আর নিশ্চয় গবাদিপশুর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। তাদের পেটে যা আছে তা থেকে আমি তোমাদেরকে পান করাই এবং এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর

উপকারিতা; তা থেকে তোমরা খাও। আর এসব পশু ও নৌকায় তোমাদেরকে আরোহণ করানো হয়।

**ব্যাখ্যা :** এই বিশ্বচরাচরে মহান আল্লাহর অসংখ্য অগণিত নেয়ামত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেখান থেকে সুচয়িত কিছু বড় নেয়ামতের কথা আল্লাহ উপরিউক্ত আয়াতে তুলে ধরেছেন যে, তিনি আসমান থেকে পরিমিত আকারে, প্রয়োজন অনুপাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আল্লাহ এতো বৃষ্টি বর্ষণ করেন না যে, জমিনগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এবং উৎপাদিত ফসলাদি নষ্ট হয়ে যাবে। আবার এতো কম বৃষ্টিও দেন না যে, ফসলাদি ইত্যাদি জন্মাবেই না। এ কারণেই আল্লাহ পরিমিত বৃষ্টি বর্ষণ করেন; যেন শস্যক্ষেত সবুজ-শ্যামল থাকে; বাগানগুলো ফুল-ফলে সুশোভিত থাকে; পুকুর-খাল-বিল, নদী-নালা ও জলাধারগুলোতে ভারসাম্যপূর্ণ পানি থাকে। এমন না যে, ভেসে চলে যায়, আবার না সংকট হয় আর না অতিরঞ্জিত। যেসব অঞ্চলের অধিক পানি প্রয়োজন সেখানে বৃষ্টিপাত বেশি হয়। আর যেসব অঞ্চলে পানির প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কম সেখানে কম বৃষ্টিপাত হয়। যেসব অঞ্চল বৃষ্টি ধারণের ক্ষমতা রাখে না, সেখানে বৃষ্টি হয় না; তারপরও আল্লাহ নদী-নালার মাধ্যমে সেখানে কুদরতি ব্যবস্থাপনায় সেখানকার শস্যক্ষেতগুলোতে পানি পৌঁছিয়ে দেন। উদাহরণ স্বরূপ মিসরের এলাকাগুলো সবসময় নীলনদের প্রবহমান জলধারার মাধ্যমে সিক্ত হয়ে সবুজ-শ্যামল থাকে। নীলনদের পানির সঙ্গে লাল মাটির মিশ্রণ থাকে। যা মূলত হাবশা বা আবিসিনিয়ার মাটি। সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে যখন পানির স্রোত বইতে শুরু করে তখন তার সঙ্গে লাল পলিমাটিও প্রবাহিত হয়। এই মাটি যখন মিসরের মাটির সঙ্গে মেশে তখন মিসরের মাটির উর্বর ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং ওই জমিন চাষাবাদের উপযুক্ত হয়ে যায়। নয়তো সেখানকার লবণাক্ত জমিন তো চাষাবাদের উপযুক্ত না। সুবহানাল্লাহ। ওই সূক্ষ্মদর্শী, দক্ষ, ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহর অপরিসীম যোগ্যতা ও হেকমতের অধিকারী যে, জমিনে আল্লাহ পানিকে ধরে রেখেছেন। জমিন ওই পানিকে শোষণ করে নেয়ার যোগ্যতা আল্লাহই সৃষ্টি করেদেন, যেন দানা এবং বীজের ভেতরে পানি পৌঁছে যায়।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমি ওই বৃষ্টির পানি অপসারণ করা বা নিয়ে নেওয়ার অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ না করার ক্ষমতাও রাখি। ইচ্ছা করলে ওই পানিকে আমি কংকরময় ভূমি, পাহাড়, জঙ্গল ও নিষ্ফলা তেপান্তরে বর্ষণ করতে পারি। ইচ্ছা করলে আমি সেই পানিকে তেতো ও লবণাক্ত করতে পারি। তখন ওই পানি না নিজেরা ব্যবহার ও পান করতে পারবে; না কাউকে পান করাতে পারবে। না শস্য ও ফল-ফলাদি অর্থাৎ কোনো কাজেই আসবে না। আমি যদি চাই মাটির শোষণক্ষমতা কেড়ে নিতে পারি। যার ফলে ওই পানি মাটির ওপরই

ভেসে বেড়াতে থাকবে। এটাও আমার ইচ্ছাধীন যে, আমি ওই পানিকে তোমাদের থেকে অনেক দূরের কোনো বিলে পৌঁছে দিতে পারি। যেন তোমাদের জন্য সেই পানি অনর্থক হয়ে যায়, আর তোমরা সেই পানি দ্বারা উপকৃত হতে না পারো। কাজেই এটা আল্লাহর বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ যে, তিনি মেঘ থেকে সুমিষ্ট, উত্তম, হালকা ও সুস্বাদু পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর সেই পানি জমিনে পৌঁছে দেয়। যার ফলে চারদিকে শস্য-শ্যামল সবুজে ভরে ওঠে। পানি পেয়ে বাগানের গাছ-পালাগুলো সতেজ হয়ে ওঠে। এর বাইরে ওই পানি তোমরা নিজেরাও পান করো; তোমাদের গবাদি পশুগুলোকেও পান করাও। ওই পানিতে গোসল করার মাধ্যমে নিজেদেরকে পবিত্র করো। সকল প্রশংসা এককভাবে আল্লাহর।

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের জীবিকা ও আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। বাতাসের হিল্লোলে সবুজ শস্যের শীষগুলো দুলে ওঠে। ক্ষেতভরা সবুজের সমারোহ দেখে আমাদের চোখ শুধু শীতল হয় না; পাশাপাশি তা আমাদের জীবনধারণের জন্যে অপরিহার্য খাবারেরও যোগান দেয়। আরববাসীদের প্রিয় ফল হলো, খেজুর ও আঙ্গুর। তদ্রূপ প্রতিটি দেশের মানুষদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ফল আল্লাহ উৎপন্ন করে দিয়েছেন। যার কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করতে পারবে না। আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু ফলও দান করেছেন; যা একদিকে দৃষ্টিনন্দন, অপরদিকে অত্যন্ত সুস্বাদু। অতঃপর আল্লাহ যায়তুন গাছের কথা উল্লেখ করেছেন। তূরে সীনা হলো সেই পাহাড়– যার ওপর আল্লাহ তাআলা সাইয়্যেদুনা হযরত মূসা আ.-এর সঙ্গে কথা বলেছেন। সেই পাহাড়টির আশপাশে অনেকগুলো পাহাড় রয়েছে। তূর বলা হয় এমন পাহাড়কে– যা সবুজ এবং গাছ-গাছালিতে ভরপুর। না হয় জাবাল বলা হতো, তূর বলা হতো না। অতএব, তূরে সিনায় যে যায়তুন গাছ জন্মায়, তা থেকে তেল বের করা হয়, যা তরকারীর কাজে আসে।

হাদীসে এসেছে, 'তোমরা যায়তুনের তেল খাও ও শরীরে তেল হিসেবে ব্যবহার করো। কেননা তা বরকতময় বৃক্ষ থেকে নির্গত'। (আহমদ) সাইয়্যেদুনা উমরে ফারূক রা.-এর কাছে এক ব্যক্তি আশূরা রাতে মেহমান হলো। তিনি তাকে উটের মাথার গোশত ও যায়তুন দিয়ে আতিথেয়তা করেন এবং বলেন, এটি হলো বরকতময় গাছের তেল। যার কথা আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়নবী সা.-এর সাথে আলোচনা করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা চতুষ্পদ জন্তুর কথা উল্লেখ করেন। মানুষ এই চতুষ্পদ জন্তুগুলো থেকে যে উপকারগুলো গ্রহণ করছে সেটিকে আল্লাহ তাঁর নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তোমরা সেগুলোর দুধ পান করো; গোশত খাও; সেগুলোর শরীরের পশম দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরি করো;

সেগুলোর ওপর নিজেরা আরোহণ করো; নিজেদের ভারী বোঝা বহন করো এবং তা নিয়ে দূর-দূরান্তে যাত্রা করো। যদি এই জন্তুগুলো না হতো তাহলে সেখানে পৌঁছতে তোমাদের গলদঘর্ম হতে হতো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ নিজ বান্দাদের ওপর অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়ী। যেমন, অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا الخ—'তারা কি দেখে না, তাদের জন্যে আমি আমার নিজ হাতের তৈরি বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। আরো বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। এখনো কি আমার ওপর তাদের কৃতজ্ঞতা ওয়াজিব হয় নি?[৬৯]

এগুলো হলো স্থলভাগের বাহন। এর বাইরে আল্লাহ তোমাদেরকে জলভাগ অতিক্রম করার জন্যে দিয়েছেন নৌযান ইত্যাদি।

## সূরা মু'মিনূনের ৭৮-৮৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ هُوَ الَّذِیْ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○ وَ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ○ وَ هُوَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ وَ لَهُ اخْتِلَافُ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ○ قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًاءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ○ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ○

তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্র করা হবে। আর তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু দেন এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন তাঁরই অধিকারে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? তবুও তারা তাই বলে যেমনটি পূর্ববর্তীরা বলত। তারা বলে, যখন আমরা মরে যাব এবং আমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? অবশ্যই আমাদেরকে ও ইতঃপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। এসব কেবল পুরানকালের উপাখ্যান ছাড়া আর কিছুই নয়।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে তাদের অনিষ্ট কর্মকাণ্ডের কারণে বিপদে ফেলেছি; কিন্তু এরপরও তারা না তাদের কুফুরী ত্যাগ করেছে; না আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে; পূর্ববৎ কুফুরী ও গুমরাহির ওপর আঁকড়ে

---

৬৯. সূরা ইয়াসীন : ৭১-৭৪।

থেকেছে। আর না তাদের অন্তর নরম হয়েছে। না তারা সাচ্চা মনে আমার দিকে অধোমুখী হয়েছে। না দোয়ার হাত তুলেছে। যেমনটি অন্য আয়াতে বলেন, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا الخ —'অতঃপর আমার আযাবসমূহকে দেখে তারা আমার দিকে অনুনয়-বিনয়ে কেনো ধাবিত হলো না? বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গিয়েছে।'[৭০]

সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর অবাধ্যতার দরুন কুরাইশদের জনজীবনে যেই দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিলো, এ আয়াতে তার কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। ওই সময় আবু সুফিয়ান নিজেদের দুর্বিসহ জীবনযাত্রার কষ্টের নালিশ জানাতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তখন আল্লাহর শপথ করে, আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা তো এখন বাধ্য হয়ে মল ও রক্ত পান করার উপক্রম হয়ে পড়েছি।'[৭১] বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, কুরাইশদের অনিষ্টতার কারণে মনোক্ষুন্ন হয়ে রাসূলুল্লাহ সা. তাদের ওপর বদদোয়া করে বলেছিলেন যে, সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আ.-এর যুগে যেভাবে সাত বছরের দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিলো; আল্লাহ যেন অমন দুর্ভিক্ষ এদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমার সহায়তা করেন।

ইবনে আবী হাতেমে এসেছে, হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ.-কে কারাবন্দী করে দেয়া হয়েছিলো। সেখানে এক যুবক বললো, আমি কি আপনাকে মনোমুগ্ধ করার জন্য কিছু কবিতা শোনাতে পারি? উত্তরে তিনি বলেন, 'এখন আমরা আল্লাহর আযাবে পড়ে আছি। আর কুরআন ওই সকল লোকের নিন্দা করেছে, যারা এ সময়ও আল্লাহমুখী হয়নি।' এরপর তিনি একাধারে তিনদিন রোযা রাখেন (মাঝে ইফতার না করে)। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, মাঝখানে ইফতার না করে এটা কেমন রোযা? উত্তরে তিনি বলেন, 'একটি নতুন বিষয় ওদিক থেকে হয়েছে। অর্থাৎ কারাবন্দিত্বে তো একটি নতুন বিষয় আমি করলাম অর্থাৎ অতিরিক্ত ইবাদত।'

এমনকি আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে, হঠাৎ সে সময় চলে এসেছে। যে শাস্তির কথা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি সেই শাস্তি যখন চলে এসেছে, তখন তারা সমস্ত মঙ্গলের আশা ছেড়ে দিয়ে নিরাশ হয়ে যায় এবং ভীত হয়ে পড়ে।

আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে দেখো। তিনি কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, অন্তর দিয়েছেন, বিবেক-বদ্ধ দান করেছেন যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারো, আল্লাহর একত্ববাদ ও ক্ষমতাকে অনুধাবন করতে পারো। কিন্তু যতোই

---

৭০. সূরা আন'আম : ৮৩।

৭১. নাসায়ী শরীফ।

তাদের ওপর নেয়ামত বেড়েছে ততোই তাদের শোকরের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আপনি যদিও তীব্রভাবে কামনা করেন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।'

এরপর আল্লাহ তাঁর সুবিশাল রাজত্ব ও অন্তহীন কুদরতের কথা আলোচনা করে বলেন, আল্লাহই মাখলুক সৃষ্টি করে বিস্তৃত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর কিয়ামতের দিন সেই বিক্ষিপ্তদেরকে তিনি গুটিয়ে এনে নিজের কাছে একত্র করবেন। প্রথমেও তিনি সৃষ্টি করেছেন। ধ্বংসের পর তিনিই পুনরুজ্জীবিত করবেন। আদি যুগ থেকে শুরু করে শেষ যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক ছোট-বড় প্রাণীর ওপর আল্লাহর এই পদক্ষেপ কার্যকর হবে। পঁচে-গলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অস্থিগুলোকে আল্লাহই নতুন জীবন দান করবেন। যেভাবে ইতঃপূর্বে তিনি সেগুলোকে মৃত্যু দিয়েছিলেন। আল্লাহর নির্দেশেই দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটছে। তিনি একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীনে এতোদুভয়ের পালাবদল করাচ্ছেন। সূর্য যেমন চাঁদকে অতিক্রম করতে পারে না; তদ্রূপ রাতও পারে না দিবসকে অতিক্রম করতে। তোমাদের কি বিবেক-বুদ্ধি নেই? কেনো তোমরা এতো নিদর্শন পাওয়ার পরও আল্লাহকে চিনতে পারছো না? কেনো তাঁর রাজত্ব ও জ্ঞানগভীরতার স্বীকৃতি দিচ্ছো না?

তিক্ত বাস্তবতা হলো, পূর্বের যুগের কাফেরদের যেমন মন-মানসিকতা ছিলো, বর্তমান যুগের কাফেরদের মন-মানসিকতাও হুবহু তেমনই। তাদের ও এদের উক্তি একই, ওই পূর্বসূরিদের যে প্রলপ ছিলো এদের অনুরূপ। তারা বলে, 'এভাবে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর শুধু পঁচা-গলা অস্থিতে অবশিষ্ট রয়ে যাবার পরও নতুন করে সৃষ্টি কী ভাবে সম্ভব? এটা বুঝে আসছে না। আমাদেরকে এমনই বলা হয়েছিলো, আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও একথা বলে ধমকানো হয়েছিলো। কিন্তু আমরা তো মৃত্যুর পর কাউকে জীবিত হতে দেখিনি, আমরা তো জানি এটা মিথ্যা প্রলাপমাত্র।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলে, যখন আমরা পঁচা-গলা হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও আবার জীবিত করা হবে? জনাবে বারী তাআলা বলেন, তোমরা যে কথাকে আচমকা মনে করছো, সেটা তো আমি এক বিকট আওয়াজের মাধ্যমে করে দেখাবো এবং সমস্ত পৃথিবীর মানুষ নিজ নিজ কবর থেকে বের হয়ে এক ময়দানে আমার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। সূরা ইয়াসীনের মাঝেও একই অভিযোগ ও তার উত্তর রয়েছে। মানুষ কি দেখে না, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে অতঃপর সে একগুঁয়েমি ও বাক-বিতণ্ডাকারী বনে গেলো এবং নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে সে ভুলে গেলো। আমার ওপর অভিযোগ করার পর উদাহরণ দিতে শুরু করলো যে, এই পঁচা-গলা হাড্ডিকে কে জীবিত করবে? হে নবী! আপনি তাদের উত্তর দিন যে, তাদেরকে নতুনভাবে ওই

আল্লাহ সৃষ্টি করবেন যে আল্লাহ তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

## সূরা মু'মিনূনের ৮৪-৮৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۭ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۭ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○ قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ يُجِيْرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۭ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ○

বলুন, তোমরা যদি জানো তবে বলো, এ জমিন ও এতে যারা আছে তারা কার?' অচিরেই তারা বলবে, 'আল্লাহর'। বলুন, 'তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? বলুন, কে সাত আসমান ও মহা আরশের প্রতিপালক? তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলুন, তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না? বলুন, তিনি কে যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর ওপর কোনো আশ্রয়দাতা নেই? যদি তোমরা জানো। তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলুন, তবুও কী ভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ?

ব্যাখ্যা : আলোচিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা তাঁর তাওহীদ, স্রষ্টা হওয়া, নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা, রাজত্বের ওপর প্রামাণিক আলোচনা করেছেন। যেন সবাই জানতে পারে, সত্য রব শুধু তিনিই। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তিনি একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। সেমতে আল্লাহ সম্মানিত রাসূল সা.-কে নির্দেশ করছেন, আপনি মুশরিকদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, তারা পরিষ্কার শব্দে আল্লাহর স্রষ্টা হওয়ার কথা স্বীকার করবে। তাঁর কোনো শরীক না হওয়ার কথাও বলবে। আপনি তাদেরকে তাদের সেই উত্তরকে যুক্তি সম্মত সাব্যস্ত করে এ কথার স্বীকারোক্তি নিয়ে নিন যে, যখন আল্লাহই একক স্রষ্টা ও মালিক; তাঁর সঙ্গে অন্য কারো অংশিদারিত্ব নেই তাহলে তিনিই কেনো এককভাবে আল্লাহ বা উপাস্য হবেন না? কেনো তাঁর সঙ্গে অন্যদের ইবাদত করা হয়? আসল ঘটনা হলো, তারা জানে, তাদের এ সকল উপাস্যও আল্লাহরই সৃষ্টি। ওরাও আল্লাহর দাস। কিন্তু ওদেরকে তারা আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা মনে করে এ নিয়তে তাদের ইবাদত করে যে, ওরা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য এনে দেবে। সেমতে আল্লাহ ইরশাদ করছেন, জমিন ও তন্মধ্যকার প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা কে? এ কথা মুশরিকদের জিজ্ঞেস করুন। তারা এ উত্তরই দেবে যে, এককভাবে আল্লাহই স্রষ্টা। তাঁর সঙ্গে অন্য

কারো অংশিদারিত্ব নেই। এখন তাদের বলুন, এ কথা স্বীকার করার পরও তোমরা কেনো মানছো না যে, তিনিই এককভাবে ইবাদতের উপযুক্ত। কেননা তিনিই আমাদের স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। আবার জিজ্ঞেস করুন, এই সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী ও তন্মধ্যকার সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা কে? যিনি আরশের মতো শক্তিশালী বস্তুর রব? যা মাখলুকের ছাদস্বরূপ। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর কুদরত অসীম ও ব্যাপক। তাঁর আরশ আসমানের ওপর এভাবে আছে।' এ কথা বলে নবীজী হাতের সাহায্যে গম্বুজের আকৃতি বানিয়ে প্রদর্শন করেন।' (আবু দাউদ)

অন্য হাদীসে এসেছে, সাত আসমান, সাত জমিন ও তন্মধ্যে অবিস্থত সমস্ত মাখলুক কুরসির বিশালত্বের তুলনায় এমন, যেন বিশাল ধু ধু মরুভূমিতে কোনো ক্ষুদ্র বস্তু পড়ে আছে। আর কুরসি তার নিজের সবকিছু নিয়ে আরশের তুলনায়ও তেমনই। কিছু বুযুর্গানে দীন থেকে বর্ণিত আছে, আরশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের। সপ্তম জমিন থেকে তার উচ্চতার দূরত্বও পঞ্চাশ হাজার বছরের। আরশের নাম 'আরশ' তার দূরত্বের কারণেই।

কা'ব আহবার রহ. বলেন, আরশ আসমানের তুলনায় এমন, যেমন কোনো মোমবাতি আসমান ও জমিনের মধ্যখানে রয়েছে। মুজাহিদ রহ.-এর মন্তব্য হলো, আল্লাহর আরশের তুলনায় আসমান ও জমিনের পরিমাপ হলো, যেমন কোনো বিশাল মরুপ্রান্তরে কোনো কাপড়ের টুকরা পড়ে আছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আরশের সঠিক পরিমাণ ও বিশালতা আল্লাহ তাআলা ব্যতিরেকে অন্য করো পক্ষে নিরুপণ করা সম্ভব নয়। কোনো মনীষা হতে বর্ণিত আছে, আরশ লাল রংয়ের ইয়াকুত পাথরের তৈরি।

সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তোমাদের রবের কাছে রাত-দিন বলতে কোনো কিছু নেই। তাঁর চেহারার জ্যোতিতেই আরশ জ্যোতির্ময় হয়েছে। মোটকথা, এই প্রশ্নের উত্তরে তারা এটাই বলবে যে, আসমান ও আরশের মালিক আল্লাহই। তখন আপনি বলুন, তাহলে তোমরা তাঁর আযাব ও শাস্তিকে কেনো ভয় করো না? কেনো তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করছো?

কিতাবুত তাফাক্কুর ওয়াল ই'তিবার গ্রন্থে ইমাম আবু বকর ইবনে আবিদ দুনয়া রহ. একটি হাদীস নকল করেছেন। হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সা. প্রায়সময় বলতেন যে, জাহেলি যুগে এক মহিলা পাহাড়ের চূড়ায় ছাগল চরাতো। তার সঙ্গে তার এক ছেলেও ছিলো। একদিন ওই পুত্র তার মাকে জিজ্ঞেস করলো, আম্মাজান! আপনাকে কে সৃষ্টি করেছেন? বললো, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ছেলেটি প্রশ্ন করলো, আমার আব্বুকে কে সৃষ্টি করেছেন? বললো, আল্লাহ। ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করলো, আমাকে কে সৃষ্টি করেছেন? বললো, আল্লাহ। আবার প্রশ্ন করলো, এ আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন? বললো, আল্লাহ। আবার প্রশ্ন

করলো, এই জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? মা বললো, আল্লাহ। আবার প্রশ্ন করলো, এই পাহাড়গুলো কে সৃষ্টি করেছেন? বললো, এর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই। ছেলেটি আবার প্রশ্ন করলো, আমাদের এই ছাগলগুলোর সৃষ্টিকর্তা কে? মা বললেন, আল্লাহই। ছেলেটি বললো, 'সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর এতো শ্রেষ্ঠত্ব! তখন ওই রবের ও বড়ত্ব এমনভাবে তার অন্তরে বসে গেলো যে, সে থর থর করে কাঁপতে লাগলো এবং পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে জান আল্লাহর কাছে সঁপে দিলো।'

এরপর আল্লাহ বলেন, জিজ্ঞেস করুন– সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? কে একক নিয়ন্ত্রক? রাসূলুল্লাহ সা.-এর কসম সাধারণত এই বাক্য দ্বারা হতো যে, 'ওই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আর তিনি যখন কোনো অতি গুরুত্বপূর্ণ কসম করতেন তখন বলতেন, 'ওই সত্তার কসম! যিনি অন্তররাজ্যের অধিপতি। যাঁর হাতে অন্তরের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা। অতঃপর একথা জিজ্ঞেস করো যে, কে তিনি– যিনি সবাইকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন। যাঁর আশ্রয়কে কেউ অবজ্ঞা করতে পারে না। তাঁর বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ আশ্রয় দিতেও পারে না। তিনি কারো আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য নন। অর্থাৎ তিনি এতো বড় সরদার ও অধিপতি যে, সমস্ত সৃষ্টিজীব, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব এককভাবে তাঁর হাতে। বলো, কে তিনি? আরবে এ প্রথা ছিলো যে, গোত্রপতি যদি কাউকে আশ্রয় দান করেন তাহলে গোত্রের সকল সদস্য তা মানতে বাধ্য। কিন্তু গোত্রের কেউ যদি কাউকে আশ্রয় দেয় সেটা গোত্রের সরদার মানতে বাধ্য না। এখানেও আল্লাহর বড়ত্ব ও ব্যাপক ক্ষমতার কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, তিনি ব্যাপক ক্ষমতাবান ও নিরঙ্কুশ শাসক। কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে না। তাঁর কোনো নির্দেশ স্থগিত হতে পারে না। তাঁর কাছ থেকে কেউ জবাবদিহিতা গ্রহণ করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছার বাইরে গাছের একটি পাতাও নড়াচড়া করতে পারে না। এর বিপরীতে তিনি সবার কাছ থেকে জবাবদিহীতা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু কারো সাধ্য নেই; তাঁর সামনে টু শব্দ করার। তাঁর ক্ষমতা, বিশালতা, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, কুদরত, সম্মান, প্রজ্ঞা, ন্যায়নিষ্ঠতা নিরুপম ও সীমাহীন। সকল মাখলুক তাঁর সামনে অক্ষম ও অপারগ। আল্লাহ সকল মাখলুককে জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা রাখেন। আপনি যদি তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখনও তারা এই উত্তর ছাড়া অন্য কোনো উত্তর দিতে পারবে না যে, আল্লাহ-ই সে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, সার্বভৌম শক্তিবান রাজাধিরাজ। আপনি বলুন, তাহলে তোমাদের কী এমন ঠেকা? তোমাদের ওপর এমন কি যাদু করা হয়েছো যে, এতো কিছু স্বীকার করার পরও তোমরা অন্যদের উপাসনা করো? আমরা তোমাদের সম্মুখে সত্য প্রকাশ করেছি। রব একজন হওয়ার ওপর যেমন দলীল পেশ করেছি; তদ্রূপ উপাস্য এক হওয়ার ওপরও

প্রমাণ পেশ করেছি। স্বচ্ছ যুক্তির মাধ্যমে পরিষ্কার কথা পৌঁছে দিয়েছি। তোমাদের ভুলগুলো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি। তোমরা শরীক করতে যে মিথ্যার আশ্রয় নাও, তা তোমাদের মুখ দিয়েই স্বীকার করিয়েছি। একথাগুলোই সূরার শেষাংশে উঠে এসেছে, لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ 'গায়রুল্লাহর ইবাদত করার ওপর তাদের কাছে কোনো দলীলই নেই।' তারা শুধু বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে এ জাতীয় দাবী করে বেড়াচ্ছে। তারা শুধু এ অজুহাতই পেশ করে যে, আমরা আমাদের বড়দেরকে এমনই পেয়েছি। আমরা তাদের অনুকরণ ছাড়বো না।

## সূরা মু'মিনূনের ১১৫-১১৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ○ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○

তোমরা কি মনে করেছিলে, আমি তোমাদেরকে কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না'? সুতরাং সত্যিকারের মালিক আল্লাহ মহিমান্বিত, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব'।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, জান্নাতী ও জাহান্নামীরা যখন নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাবে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা মুমিনদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা দুনিয়াতে কতো দিন ছিলে? তারা বলবে, এই তো এক-আধ দিন ছিলাম। আল্লাহ তখন বলবেন, তবে তো তোমরা বেশ ভাগ্যবান যে, এই অল্প দিনের নেক কাজের বিনিময়ে এতো বেশি প্রতিদান পেয়েছো যে, তোমরা আমার রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জন করে ফেলেছো, যা চিরস্থায়ী। এরপর আল্লাহ জাহান্নামীদেরকে এ প্রশ্নই করবেন। তারাও তদ্রূপ বলবে, একদিন বা একদিনের কিছু অংশ। আল্লাহ তখন বলবেন, তোমরা ব্যবসায় চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছো। এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা আমার অসন্তুষ্টি, ক্রোধ ও সেই জাহান্নাম কিনে নিয়েছো, যেখানে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে।' তোমরা কি এমনটাই মনে করেছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেছি? তোমাদের সৃষ্টির মাঝে আমার কোনো কর্মকৌশল নেই? শুধু খেল-তামাশার জন্যেই কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি? তোমরা জন্তু-জানোয়ারে মতো লাফিয়ে দৌড়ে বেড়াবে? তোমরা কি তিরস্কারের পাত্র হবে না? এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তোমাদেরকে ইবাদতের জন্যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা কি এই মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছো যে, তোমাদেরকে আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে না? এটাও তোমাদের ভুল ধারণা। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে, أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى الخ—'মানুষ

কি এটা মনে করে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?'[৭২] আল্লাহর সত্তা অবশ্যই এথেকে উর্ধ্বে যে, তিনি অর্থহীন কোনো কাজ করবেন, কোনো কিছু নিরর্থক সৃষ্টি করবেন, অকারণে ভেঙ্গে ফেলবেন! তিনি সেই সত্য রাজাধিরাজ– যিনি এগুলো থেকে পবিত্র। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি সেই সুবিশাল আরশের অধিপতি– যা গোটা সৃষ্টিজীবকে গম্বুজ বা ছাদের মতো ছেয়ে আছে। তিনি খুবই ভালো, উৎকৃষ্ট, সুন্দর আকৃতির এবং নেক মুখায়বের। যেমন তিনি বলেন, জমিনে আমি প্রত্যেককে উত্তম জোড়া করে সৃষ্টি করেছি।

খলীফাতুল মুসলিমীন আমিরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. তাঁর সর্বশেষ খুতবায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বলেন, হে লোকসকল! তোমাদেরকে নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি এবং তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হয় নাই। মনে রেখো! সেই অঙ্গীকারকৃত দিন অবশ্যই আসবে যেদিন আল্লাহ নিজেই বিচার করতে ও নির্দেশ দিতে অবতরণ করবেন। সে বড়ই দুর্ভাগা, ক্ষতিগ্রস্থ, বঞ্চিত, ভাগ্যহত ও নিঃস্ব হবে– যে আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে থাকবে এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হবে। যেই জান্নাতের দৈর্ঘ সমস্ত জমিন ও আসমানের সমান। তোমরা কি জানো না যে, কাল কিয়ামতের দিন শুধু ওই ব্যক্তিই আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে যার অন্তরে আজও সেদিনের ভয় রয়েছে এবং যে ব্যক্তি চিরন্তন আখেরাতের জন্যে নশ্বর পৃথিবীকে উৎসর্গ করেছে। এই অল্পকে ওই ভবিষ্যতের প্রাচুর্য অর্জন করার জন্য অক্লান্তভাবে ব্যয় করছে। আর নিজের এই ভয়কে শান্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য উপাদান প্রস্তুত করছে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না, তোমাদের সেই পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে; যাদের তোমরা স্থলাভিষিক্ত হয়েছো। এভাবে একদিন তোমরাও হারিয়ে যাবে এবং আগামী প্রজন্ম তোমাদের স্থানে এসে বসবে। এভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর হয়ে এমন এক দিন আসবে যেদিন সারা দুনিয়াকে ভাঁজ করে শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী মহান আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে। হে জনগণ! মনে রেখো, দিন-রাত তোমরা মৃত্যুর নিকটবর্তী হচ্ছো এবং নিজ পায়ে কবরের দিকে হাঁটছো। তোমাদের ফল পরিপক্ক হচ্ছে। তোমাদের আশাগুলো নিঃশেষ হচ্ছে। তোমাদের জীবনকাল সমাপ্ত হচ্ছে। মৃত্যু একটু একটু করে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। শীঘ্রই তোমাদেরকে মাটির গহ্বরে দাফন করা হবে। যেখানে তোমাদের জন্যে কোনো শয্যা, কোনো বালিশ থাকবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে। হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যাবে। তোমাদের আমলগুলোই তোমাদের সামনে আসবে। অন্য যা কিছু পেছনে রেখে এসেছো তা অন্যদের হয়ে যাবে। আর যা মৃত্যুর আগে প্রেরণ করেছো সেটাই এখন তোমার কাজে

---

৭২. সূরা কিয়ামাহ : ৩৬।

আসবে। তখন তোমরা শুধু সাওয়াবের কাঙাল হয়ে থাকবে। ইতঃপূর্বে যেসকল অন্যায় কাজ করেছো তার শাস্তি ভোগ করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় করো। মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্বেই সে প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করো, যার জবাবদিহিতা তোমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে।' উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. এতোটুকু কথা বলতেই গোটা সভাস্থল জুড়ে চিৎকার করে এমন কান্নাররোল পড়ে গেলো যে, তাঁর কণ্ঠস্বর সেই কান্নার নিচে চাপা পড়ে গেলো। মুখের ওপর চাদরের আঁচল এনে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিতগণও আহাজারি করতে শুরু করলো।

ইবনে আবী হাতেমে আছে, এক অসুস্থ ব্যক্তি; যাকে দুষ্ট জ্বিন খুব কষ্ট দিচ্ছিলো। লোকটি সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.-এর কাছে হাজির হলো। তিনি তখন اَفَحَسِبْتُمْ থেকে সূরা শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো লোকটির কানে তেলাওয়াত করলেন। ফলে লোকটি সুস্থ হয়ে গেলো। যখন নবী কারীম সা.-এর কাছে ঘটনাটি বলা হলো, তখন তিনি বললেন— হে আবদুল্লাহ! তুমি তার কানে কী পড়েছিলে? উত্তরে তিনি আয়াতগুলোর কথা বললেন। তখন নবীজী সা. বললেন, তুমি এই আয়াতগুলো তার কানে পড়ার মাধ্যমে দুষ্ট জ্বিনকে পুড়িয়ে দিয়েছো। আল্লাহর কসম! যদি কেউ পূর্ণ ঈমান সহকারে এ আয়াতগুলো কোনো পাহাড়ের ওপর পড়ে তাহলে পাহাড়ও নিজ স্থান থেকে সরে যেতে বাধ্য হবে।

আবু নাঈম রহ. এ বর্ণনা নকল করেছেন যে, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সা. একটি সেনাদলে প্রেরণ করার সময় বললেন, আমরা যেন সকাল-সন্ধ্যা اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ তেলাওয়াত করি। আমরা নিয়মিত এ আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা নিরাপদে, গনীমত সহকারে ফিরে আসতে পেরেছি।

নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন, আমার উম্মত ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নৌকায় আরোহণের প্রাক্কালে এই দোয়া পাঠ করে নেবে।

بِسْمِ اللهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ، وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

## সূরা মু'মিনূনের ১১৭-১১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ
اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ
○

যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহকে ডাকে, যে বিষয়ে তার কাছে প্রমাণ নেই; তার হিসাব কেবল তার রবের কাছে। নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না। আর বলুন, হে আমাদের রব, আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

**ব্যাখ্যা :** আলোচিত আয়াতদু'টিতে মহান আল্লাহ মুশরিকদের ভয় দেখিয়ে বলছেন, তাদের কাছে তাদের শিরিকের পক্ষে কোনো দলীল নেই। তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই শেষ পরিণতিতে কাফেররা কখনই সফল হবে না। তারা রেহাই পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

রাসূলুল্লাহ সা. একদিন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার কার পূজা করো? সে বললো, আল্লাহ ও অমুক অমুককে। নবীজী সা. জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তোমার বিপদের সময় তোমাকে সাহায্য করবে? সে বললো, শুধু আল্লাহ। নবীজী সা. তখন বললেন, যখন তুমি জানো, সাহায্যকারী শুধু আল্লাহই; তাহলে আবার তাঁর সঙ্গে অন্যদের উপাসনা করার কী প্রয়োজন? তুমি কি মনে করো, তিনি একা তোমার জন্য যথেষ্ট না? সে বললো, এটা তো বলতে পারবো না। তবে আমার ইচ্ছা হলো, অন্যদের ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহর শোকর শতভাগ আদায় করতে পারবো। নবী সা. বললেন, সুবাহানাল্লাহ! জ্ঞানের সাথে এই অজ্ঞতা। জানা থাকা সত্বেও না জানার ভান করছো? লোকটির কাছে নবীজীর এ ভর্ৎসনার কোনো উত্তর ছিলো না। সুতরাং মুসলমান হয়ে যাবার পর প্রায়ই বলতো, আমাকে নবী সা.-এর তাওহীদের প্রবক্তা বানিয়েছেন।

অতঃপর একটি দোয়া শিক্ষা দিলেন, 'গাফুর' সাধারণত গুনাহকে মিটিয়ে দেওয়া এবং গুনাহকে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলার জন্যে আসে। আর 'রহমত'-এর অর্থ সঠিক পথে অবিচল রাখা এবং ভালো কথা ও কাজের তৌফিক দেয়ার জন্য আসে।

## সূরা নূরের ৪১-৪২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

আপনি কি দেখেননি, আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা এবং সারিবদ্ধ হয়ে উড়ন্ত পাখিরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে? প্রত্যেকেই জানে তাঁর নামায ও তাসবীহ এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। আর আসমান ও জমিনের মালিকানা আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন।

ব্যাখ্যা : সকল মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা, প্রাণীকূল এমনকি জড়পদার্থও আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠে লিপ্ত রয়েছে। সাত আসমান, সাত জমিন ও এতোদুভয়ের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে, প্রত্যেকেই মহান আল্লাহ পবিত্রতা বর্ণনায় লিপ্ত। ডানার সাহায্যে উড়ে এমন পাখিরাও আল্লাহর ইবাদত ও পবিত্রতা বর্ণনায় লিপ্ত। এসকল প্রাণীর জন্য যেসব তাসবীহ উপযুক্ত ছিলো– আল্লাহ ওদেরকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন। তাদের সবাইকে ইবাদতের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কাজ গোপন নয়; তিনি সর্বজ্ঞানী। তিনি সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের অধিকারী শাসক। তিনি রাজাধিরাজ। সর্বসেরা। তিনিই প্রকৃত উপাস্য। আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি শুধু তিনিই। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর নির্দেশসমূহকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। কিয়ামতের দিন সবাইকেই তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে। তিনি স্বীয় মাখলুকদের ওপর ইচ্ছানুযায়ী আদেশ জারী করবেন। মন্দ লোকেরা নিকৃষ্ট বিনিময় পাবে। আর নেক লোকেরা ভালো বিনিময় পাবে। তিনিই স্রষ্টা; তিনিই অধিপতি। দুনিয়া ও আখেরাতের তিনিই একচ্ছত্র শাসক। তাঁর সত্তাই প্রশংসা ও গুণগানের যোগ্য।

## সূরা নূরের ৪৩-৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۭ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ○ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ○

আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ মেঘমালা পরিচালিত করেন, তারপর তিনি সেগুলোকে একত্র করেন এবং পরে সেগুলো স্তূপীকৃত করেন, তারপর আপনি দেখতে পান যে, তার মধ্য থেকে বৃষ্টির ফোঁটা বের হয়। আর তিনি আকাশে স্থিত শিলাস্তূপ হতে বর্ষণ করেন শিলা। তারপর তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন, আর যাকে ইচ্ছা তার ওপর হতে তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুত ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।' 'আল্লাহ দিন ও রাতের আবর্তন ঘটান, নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে'।

ব্যাখ্যা : আকাশে বিচরণশীল মেঘমালা প্রথম প্রথম তো আল্লাহর কুদরতে সেগুলো হালকা ধোঁয়ার মতো হয়ে আকাশে ওঠে। এরপর পরস্পরে একীভূত হয়ে বেশ বড় আকার ধারণ করে এবং একটি ওপরটির ওপর জমে যায়। অতঃপর সেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। বাতাস বয়ে যায়। জমিগুলো উর্বর হয়ে ওঠে। জলীয় বাস্প জমা হওয়া থেকে বৃষ্টি বর্ষণ পর্যন্ত পুরো ব্যবস্থাপনা আল্লাহই পরিচালনা করে থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ শিলা বর্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটির ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে যে, আকাশে শিলার পাহাড় আছে। আয়াতের পরবর্তী অংশের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ জমিনের যে অংশটিতে ইচ্ছা করেন সেখানে তাঁর রহমতে মেঘ ও শিলা বর্ষণ করেন! আর যেখানে চান না সেখানে বর্ষণ করেন না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটির ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ এই শিলাবৃষ্টির মাধ্যমে কারও ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা নষ্ট করে দেন। আর যার ওপর দয়া হয় তাকে বাঁচিয়ে দেন।

অতঃপর বিজলির উজ্জ্বলতার শক্তির কথা আলোচনা হচ্ছে। বলেন, বিজলির শক্তি এমন যে, মনে হয়– এই বুঝি দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে। দিন-রাতের নিয়ন্ত্রণও আল্লাহর হাতে। যখন ইচ্ছা তিনি দিনকে ছোট করে রাত বড় করে দেন। আবার যখন ইচ্ছা রাতকে ছোট করে দিন বড় করে দেন। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন– যেখানে আল্লাহর কুদরতের সক্ষমতা প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহর বড়ত্ব ফুটে উঠেছে। পরিশেষে আল্লাহ বলেন, আসমান-জমিনের সৃষ্টি, রাত-দিনের বৈপরীত্বের মাঝে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক নিদর্শনই রয়েছে।

## সূরা নূরের ৪৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। অতঃপর তাদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও বিশাল রাজত্বের ওপর আলোকপাত করে বলেন, তিনি একই পানি থেকে বিভিন্ন ধরনের মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। সাপ ইত্যাদিকে দেখো, সেগুলো পেটের ওপর ভর করে ছুটে বেড়ায়। মানুষ ও পাখিদের দেখো, যাদের দু'পা হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে তারা চলে। প্রাণীগুলো এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে দেখো, তারা চার পায়ের ওপর চলে। আল্লাহ নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই হয়ে যায়। যা চান না তা কখনও হতে পারে না। তিনি সর্বশক্তিমান।

## সূরা নূরের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

অবশ্যই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ দেখান।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলাই কুরআন কারীমে বিভিন্ন প্রজ্ঞাদীপ্ত বিধান ও এই সুস্পষ্ট উদাহরণসমূহ আলোচনা করেছেন। বুদ্ধিমানদেরকে সেগুলো বোঝার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

## সূরা ফুরকানের ১-২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ○ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ○

তিনি বরকতময়– যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করেছেন যেন তা জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হয়। যার অধিকারে রয়েছে আসমান ও জমিনের মালিকানা; আর তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নিপুণভাবে নিরুপণ করেছেন।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রহমতের আলোচনা করেছেন। যেন মানুষের মাঝে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর ওপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন। সূরা কাহাফের শুরুতেও আল্লাহ নিজ প্রশংসা করেছেন এই تبارك বিশেষণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এখানে স্বীয় সত্তা বরকতময় হওয়ার এবং এই বিশেষণই উল্লেখ করেছেন। এরপর এখানে نَزَّلَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার দ্বারা অধিক পরিমাণে বারবার অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণ হয়। যেমন বলেছেন, وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ সুতরাং অতীতের কিতাবসমূহের ক্ষেত্রে أَنْزَلَ এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন কারীমের ক্ষেত্রে نَزَّلَ শব্দ এসেছে। কারণ, আগের কিতাবগুলো একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর কুরআন কারীম প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। কখনও কিছু আয়াত, কখনও কিছু সূরা, কখনও কিছু বিধি-বিধান। এভাবে নাযিল করার এক অন্যতম বড় হিকমত এটাও ছিলো, যেন তার ওপর আমল করা মানুষের পক্ষে কঠিন না হয়; খুব ভালোভাবে মুখস্থ হয়ে যায় এবং মেনে নেয়ার জন্য অন্তর প্রস্তুত থাকে। যেমন– এ সূরায় বলেছেন, কাফেরদের একটি অভিযোগ এটাও ছিলো যে, কুরআনে কারীম নবী সা.-এর ওপর একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েনি কেনো? উত্তর দেয়া হয়েছিলো যে, এভাবে এজন্যে অবতীর্ণ হয়েছে যেন তোমাদের অন্তরে বসে যায়। আমি অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি; আর এরা যে কথা বলবে আমি তার সঠিক ও সমুচিত জবাব দেবো। যা হবে বিশদ বিবরণ সম্বলিত। এ কারণেই এখানে এ আয়াতে কুরআনের নাম রাখা হয়েছে 'ফুরকান'। কারণ, এই কুরআন সত্য-মিথ্যার মাঝে, হিদায়াত ও গুমরাহির মাঝে পার্থক্যকারী। এথেকে ভালো-মন্দের মাঝে, হালাল-হারামের মাঝে ব্যবধান গড়ে তোলে।

কুরআন কারীমের এই পবিত্র বৈশিষ্ট আলোচনা করার পর যার ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁর একটি পবিত্র বৈশিষ্ট আলোচনা করা হয়েছে যে— নবী কারীম সা. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তিনি আল্লাহর মুখলিস বান্দা। এটিই তাঁর অনেক উঁচু বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই বড় বড় নেয়ামতসমূহের আলোচনার প্রাক্কালে নবী সা.-এর এই গুণটিই আলোচিত হয়েছে। যেমন, মি'রাজের ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেন, سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ—'পূতঃ পবিত্র সেই সত্তা– যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন।'... নবীজীর এই বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই আয়াতে যেখানে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া ও নবীজী সা.-এর কাছে সম্মানিত ফেরেশতাদের আগমনকে কেন্দ্র করে প্রতি সম্মানের আলোচনার প্রাক্কালে বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়, এই পবিত্র কিতাব নবী সা.-এর ওপর এজন্য অবতীর্ণ

হয়েছে, যেন গোটা বিশ্বজাহানের জন্যে সতর্ককারী বনে যায়। এমনকি কিতাবটির আদ্যোপান্ত প্রজ্ঞা, হিদায়াতে ভরপুর; বিশদ বিবরণ সম্বলিত ও দ্ব্যর্থবোধক। কোনো বাতিলের সাধ্য নেই, এ কিতাবের ধারে-কাছে ঘেঁষবে। অবতীর্ণ হয়েছে প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে। নবী সা. এর প্রচার দুনিয়াজুড়ে করেছেন। কাছের ও দূরের, সাদা ও লাল বর্ণের সবাইকে আল্লাহ তাআলা আযাবের ভয় দেখিয়েছেন। যারাই আসমানের নিচ ও জমিনের ওপর আছে তাদের কাছে নবী সা.-এর রেসালাতের বার্তা রয়েছে। যেমন– খোদ নবী সা.-এর বাণী, 'আমি সকল সাদা-কালো মানুষের উদ্দেশে প্রেরীত হয়েছি।' আরো বলেছেন, 'আমাকে এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে যা আমারপূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি।... তন্মধ্যে একটি হলো, প্রত্যেক নবীকে নিজ নিজ জাতির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু আমি গোটা বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরীত হয়েছি। খোদ কুরআন কারীমে এসেছে, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا —'হে রাসূল! আপনি বলুন– হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল হয়ে প্রেরীত হয়েছি।'

তারপর বলেন, আমাকে রাসূল বানিয়ে প্রেরণকারী; আমার ওপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণকারী; তিনিই আল্লাহ– যিনি আসমান ও জমিনের একক অধিপতি। যিনি কোনো কাজ করতে চাইলে শুধু এতোটুকুন বলেন যে, 'হয়ে যাও' সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। তিনিই মৃত্যু দেন এবং পুনরুজ্জীবিত করবেন। তাঁর কোনো সন্তান নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। প্রতিটি জিনিস তাঁর মাখলুক। প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত। তিনিই সবার স্রষ্টা, মালিক, রিযিকদাতা ও উপাস্য। প্রতিটি জিনিসের পরিমাণ নির্দিষ্টকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী তিনিই।

## সূরা ফুরকানের ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا وَّ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا ○

আর তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট; তারা নিজেদের কোনো কল্যাণ ও অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানেরও কোনো ক্ষমতা রাখে না।

**ব্যাখ্যা :** মুশরিকদের অজ্ঞতার কথা আলোচনা হচ্ছে, তারা সর্বস্রষ্টা, রাজাধিরাজ, মহাসম্রাট, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছু নিষ্প্রাণের উপাসনা করে– যারা মাছির একটি ডানা তৈরি করতেও অক্ষম। বরং সেগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি। সেগুলো নিজেদেরই কোনো লাভ-ক্ষতি

করার ক্ষমতা রাখে না; তাহলে কী ভাবে অন্যদের লাভ-ক্ষতি বা অন্য কিছু করবে? সেগুলো নিজের জীবন-মৃত্যু বা পুনরুত্থানের ক্ষমতা রাখে না। তাহলে কী করে তারা নিজ ইবাদতকারী ওই সমস্ত জিনিসের 'মালিক' হয়? আসল কথা হলো, উপরিউক্ত সবগুলো বিষয়ের পূর্ণ ক্ষমতা এককভাবে আল্লাহর হাতে। তিনিই মারেন, তিনিই জীবিত করেন; তিনিই সকল মাখলুককে কিয়ামতের দিন নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। এটি তাঁর জন্যে কোনো কঠিন কাজ নয়। একজনকে মারা আর সবাইকে মারা; একজনকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা আর সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করা তাঁর কাছে সমান। চোখের এক পলকেই তাঁর সমস্ত নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়ে যায়। শুধু একটি আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মৃত মাখলুক জীবিত হয়ে তাঁর সামনে এক বিশাল ময়দানে দাঁড়িয়ে যাবে। অন্য আয়াতে এসেছে, 'শুধু একবার একটি আওয়াজ ওঠবে; তাতেই সকল মাখলুক আমার সামনে হাজির হবে। তিনিই মা'বুদে হক। তিনি ছাড়া না কোনো রব আছে না কেউ ইবাদতের উপযুক্ত। তাঁর প্রতিটি ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয়। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু হয় না। তিনি মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, সমকক্ষ-সক্ষমতাবান, উযির-সহকর্মী, অংশীদার-যৌথ দাবীদার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি একক, অদ্বিতীয়। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।

## সূরা ফুরকানের ৪৫-৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۝ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۝ وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ۝

আপনি কি আপনার রবকে দেখেননি, কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? আর তিনি যদি চাইতেন, তাহলে তা অবশ্যই স্থির রাখতে পারতেন। অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি তার নির্দেশক। তারপর আমি ধীরে ধীরে এটাকে আমার দিকে গুটিয়ে আনি। আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা এবং দিনকে করেছেন জাগ্রত থাকার সময়।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তাঁর কুদরতের ওপর দলীলসমূহ পেশ করে বলা হয়েছে যে, তিনি বৈচিত্র্যময় ও বৈপরীত্বপূর্ণ বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছায়া দীর্ঘ করেন। আল্লাহ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছায়ার দৈর্ঘ কমান ও বাড়ান। তিনি যদি চাইতেন তাহলে একই অবস্থায় রেখে দিতে পারতেন। যেমন বলেন, যদি তিনি রাতকে রাতই রেখে দেন, তখন কেউ দিন করতে পারবে না এবং যদি দিনকে দিনই রেখে দেন তাহলে কেউ রাত করতে পারবে না।

যদি সূর্যোদয় না হতো তাহলে ছায়া কি জিনিস সেটা বোঝাই যেত না। প্রতিটি জিনিস তার বিপরীত জিনিসের মাধ্যমে চেনা যায়। ছায়ার পেছনে আলো, আলোর পেছনে ছায়া– এটিও কুদরতের অনিন্দ্য ব্যবস্থাপনা। অতঃপর ধীরে ধীরে আমি তাকে অর্থাৎ ছায়াকে অথবা সূর্যকে নিজের দিকে সংকুচিত করে নিয়ে আসি। তখন একটি ছোট হতে থাকে, অপরটি বড় হতে থাকে। আর এই পরিবর্তন বেশ দ্রুততার সঙ্গে হয়ে যায়। কোনো জায়গায় তখন ছায়া অবশিষ্ট থাকে না। শুধু ঘরের ঝুপড়িতে ও গাছের নিচে ছায়া অবশিষ্ট থাকে। সেগুলোর ওপরও তখন রোদের প্রখরতা থাকে। ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে আমি তা নিজের দিকে সংকুচিত করে নিয়ে আসি। আল্লাহই তোমাদের জন্যে রাতকে পোশাক বানিয়েছেন। অর্থাৎ তোমাদের অস্তিত্বের ওপর রাত ছেয়ে যায় এবং তোমাদেরকে আবৃত করে ফেলে। যেমন, ইরশাদ করেছেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى—'শপথ রাত্রির, যখন সে আবৃত করে।'[৭৩]

তিনিই নিদ্রাকে শান্তি ও আরামের মাধ্যম বানিয়েছেন। তখন কাজকর্ম থেমে যায় এবং সারা দিনের কাজকর্ম থেকে যে ক্লান্তি এসে গিয়েছিল তা বিশ্রামের কারণে দূর হয়ে যায়। ফলে শান্তি অনুভব করে। যার ফলে দিনের বেলা তুমি নতুন শরীর ও মন নিয়ে উঠে দাঁড়াও এবং জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো। যেমন, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো এবং স্বীয় জীবিকাও অর্জন করতে পারো।

## সূরা ফুরকানের ৪৮-৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَهُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ○ لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّ نُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّ اَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ○ وَ لَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ○

তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে সুসংবাদস্বরূপ বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি— যাতে তা দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমি যে সকল জীবজন্তু ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্য থেকে অনেককে তা পান করাই। আর আমি এই পানি তাদের মধ্যে বণ্টন করি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা আরো একটি কুদরত বর্ণনা করছেন, তিনি বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টির সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। এই বাতাসের মাঝে আল্লাহ

---

৭৩. সূরা লাইল : ১।

তাআলা অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। কিছু বাতাস মেঘমালাকে সমৃদ্ধ করে। কিছু বাতাস সেগুলোকে উঠিয়ে তোলে। কিছু বাতাস ওই মেঘকে নিয়ে চলে। কিছু হিমশীতল এবং ভেজা বাতাস গিয়ে মানুষকে রহমতের বৃষ্টির দিকে নিবিষ্ট করে। কিছু বাতাস বৃষ্টির পূর্বে জমিনকে প্রস্তুত করে দেয়। কিছু বাতাস মেঘমালাকে পানিতে ভরপুর করে দেয় এবং মেঘকে ভারী করে দেয়। আল্লাহ বলেন, আকাশ থেকে আমি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি বর্ষণ করি– যা পবিত্রতার অন্যতম উপকরণ।

হযরত সাবেত বুনানী রহ. বলেন, আমি বৃষ্টির সময় আবুল আলিয়া রহ.-এর সঙ্গে বের হলাম। ওই সময় বসরার পথ-ঘাট নোংরা হয়ে গিয়েছিলো। তিনি এমন এক রাস্তার ওপর নামায আদায় করলেন। আমি বিষয়টির দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ আসমানের পবিত্র পানি দ্বারা তা পাক করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. বলেন, আল্লাহ পবিত্র পানি বর্ষণ করেছেন; কাজেই কোনো জিনিস সেটিকে নাপাক করে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা কি 'বুদা'আহ' কুয়োর পানি দিয়ে অযু করে নেবো? এটি একটি কূয়ো– যেখানে আবর্জনা ও কুকুরের গোশত নিক্ষেপ করা হয়। নবীজী সা. বললেন, পানি পাক। সেটিকে কোনো জিনিস নাপাক করতে পারে না।

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের দরবারে একবার পানি নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। তখন খালেদ ইবনে ইয়াযীদ রহ. বলেন, কিছু পানি আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। কিছু পানি তৈরি হয় সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্প হয়ে উত্থিত হয়। বিদ্যু, বজ্র ও বিজলি সেই পানিকে সুমিষ্ট বানিয়ে দেয়। কিন্তু এ ধরনের পানি দ্বারা জমিনে ফসল হয় না। তবে আসমানি পানির দ্বারা জমিনে ফসল উৎপন্ন হয়। ইকরামা রহ. বলেন, আসমানি পানির প্রতিটি ফোঁটার মাধ্যমে জমিনে চারা–ঘাস ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এর মাধ্যমে সমুদ্রে মণি-মুক্তাও সৃষ্টি হয়। কাজেই এই বৃষ্টির মাধ্যমে স্থলভাগে খাদ্য হয়; জলভাগে মুক্তা হয়। في البر بر وفي البحر در।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, 'তা দ্বারা অনুর্বর ও শুষ্ক জমিনকে জীবিত করে দিই।' মাটির ওপর সবুজ ফসলের শীষগুলো দুলতে থাকে। বৃষ্টির বদৌলতে তা তরতাজা হয়ে ওঠে। যেমন ইরশাদ করেন, فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ—'অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।'[৭৪]

এই পানির মাধ্যমে শুধু মৃত জমিন জীবিত হয়ে ওঠে না; বিভিন্ন জন্তু ও

---

৭৪. সূরা হজ : ৫

মানুষ পানি পান করে। এখান থেকে তারা নিজেদের বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-খামারে পানি সিঞ্চন করে। যেমন আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তিনিই– যিনি মানুষদের পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। অন্য আয়াতে বলেন, আল্লাহ্ তাআলার রহমতের প্রতিক্রিয়া দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত জমিনকে জীবিত করে দেন।

এরপর আল্লাহ বলেন, আমার কুদরতের অন্যতম দৃশ্য এটাও যে, কীভাবে জলীয় বাষ্পগুলো আকাশে উঠিয়ে জমিনে বর্ষণ করি। কিন্তু আমি যেখানে চাই, সেখানেই বর্ষণ হয়। এর মাঝেও হিকমত তথা কর্মকৌশল ও প্রমাণ রয়েছে। সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, প্রতিবছর সমান পরিমাণে বৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যেখানে ইচ্ছা বৃষ্টি দেন; যেখানে ইচ্ছা বৃষ্টি দেন না। কাজেই আমাদের উচিত ছিলো, ওই নিদর্শনগুলো দেখে আল্লাহ তাআলার কুদরতসমূহকে সামনে রেখে ওই বিষয়কেও স্বীকার করে নেয়া যে, নিঃসন্দেহে আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। আর এটাও জানা উচিত, এই বৃষ্টি আমাদের গুনাহের কারণে তুলে নিতে পারেন। তাই আমারা গুনাহ পরিত্যাগ করবো। কিন্তু আমরা তা করি না; বরং আমার নেয়ামসমূহের ওপর আরো বেশী না-শোকর করছি।

ইবনে আবী হাতেমে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. জিবরাঈল আ.-কে বলেন, 'আমি বৃষ্টির ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি।' জিবরাঈল আ. বললেন, মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বে এই ফেরেশতা নির্ধারিত রয়েছেন। আপনি তাকেই যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করুন। ওই ফেরেশতা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে তো নির্দেশ আসে, অমুক অমুক শহরে এতো পরিমাণ বৃষ্টির ফোঁটা বর্ষণ করো। আমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করি।'

বৃষ্টির মতো এমন নেয়ামতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের কুফুরির এক পদ্ধতি এটাও যে, তারা বলে– অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। সুতরাং একটি বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, একবার বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, হে লোকসকল! তোমরা কি জানো– তোমাদের রব কী বলেছেন? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। নবীজী সা. বললেন, শোনো, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্য হতে অনেকেই আমার ওপর ঈমান এনেছে। অনেকেই কুফরী করেছে। যারা এ কথা বলেছে, শুধু আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কারণে আমাদের ওপর এই বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে তারা তো আমার ওপর ঈমান রাখে এবং নক্ষত্রের সাথে কুফরীকারী হয়েছে। এর বিপরীতে যারা বলে, আমাদের ওপর অমুক অমুক তারকার প্রভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, তারা আমার সঙ্গে কুফরী করেছে এবং তারকার ওপর ঈমান এনেছে।

## সূরা ফুরকানের ৫১-৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ○ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ○ وَ هُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○ وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ صِهْرًا ؕ وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ○

আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম। সুতরাং আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করুন। আর তিনিই দু'টো সাগরকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন। একটি সুপেয় সুস্বাদু, অপরটি লবণাক্ত খরাবিশিষ্ট এবং তিনি উভয়ের মাঝখানে রেখে দিয়েছেন একটি অন্তরায় ও একটি অনতিক্রম্য ব্যবধান। আর তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর আপনার রব হলো প্রভূত ক্ষমতাবান।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ ইচ্ছা করলে প্রতিটি বস্তিবাসীর কাছে একজন করে নবী প্রেরণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে শুধু একজনকেই নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। অতঃপর তাকে নির্দেশ করেছেন, আপনি সবাইকে এই কুরআনের ওয়ায শুনিয়ে দিন। যেমন, বলেন, আমি এ কুরআনের মাধ্যমে আপনাকে এবং অন্য যাদেরকে ইচ্ছা সচেতন করি।' ওই সকল দলের মধ্য হতে যারাই একে অস্বীকার করবে তার জন্যে জাহান্নামই অঙ্গীকারস্থল। অন্যত্র বলেন, 'আপনি মক্কাবাসীদেরকে ও চতুর্দিকে লোকদের সতর্ক করুন।' অন্য আয়াতে বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন– হে লোকসকল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রাসূল হয়ে এসেছি।'

হাদীসের বিশুদ্ধতম দু'টি কিতাব বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ বর্ণনাটি এসেছে যে, 'আমি লাল ও কালো– সবার প্রতি প্রেরীত হয়েছি।' অন্য হাদীসে এসেছে, 'প্রত্যেক নবীকে প্রেরণ করা হয়েছে নিজ নিজ জাতির প্রতি। কিন্তু আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে গোটা বিশ্ববাসীর প্রতি।' আল্লাহ বলেন, 'আপনি কাফেরদের কথা মানবেন না। এই কুরআন দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে বৃহৎ জিহাদের অবতীর্ণ হোন।' যেমনটি অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ—'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।'

আল্লাহই পানিকে দু'ধরণের করেছেন। একটি মিষ্ট ও অন্যটি লবণাক্ত।

নদী, ঝরনা ও কুয়োর পানি সাধারণত মিষ্ট, পরিষ্কার ও সুস্বাদু হয়। এর বিপরীতে সমুদ্রের পানি লবণাক্ত ও বিস্বাদ হয়। আল্লাহ্ তাআলার এই নেয়ামতের ওপরও আমাদের শোকর আদায় করা দরকার যে, তিনি আমাদের চতুর্পাশে মিষ্টি পানির সমারোহ তৈরি করে দিয়েছেন। যার ফলে আমরা সেই পানি গোসল, ধোওয়া-মোছা ও ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা সিঞ্চনের কাজে অতি সহজে ব্যবহার করতে পারছি। আল্লাহ্ প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি বইয়ে দিয়েছেন। যা সেখানে সুস্থির আছে। এদিক-ওদিক প্রবাহিত হয় না। যদিও সেখানে প্রতিমুহূর্তে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ হচ্ছে। ঝঞ্ঝা দেখা দিচ্ছে। কোথাও কোথাও জোয়ার-ভাটা হচ্ছে। প্রতি মাসের প্রথম তারিখগুলোতে সেই পানি ফুলে-ফেঁপে ওঠে। চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত রীতিমতো চাঁদের সাথে সাথে বাড়তে থাকে। কিন্তু চাঁদের অবয়ব হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সেই স্ফীতিও কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। আবার যখন চাঁদ বড় হতে থাকে পানির স্ফীতিও বাড়তে থাকে। এই সমুদ্রগুলোকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বব্যাপক ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টা। লবণাক্ত ও তেতো পানি যদিও পান করা যায় না; কিন্তু বাতাসকে স্বচ্ছ রাখার ক্ষেত্রে সেগুলোর ব্যাপক অবদান রয়েছে। যার কারণে মানবজীবন ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। সমুদ্রে যে জীবজন্তু মারা যায়, এগুলোর দুর্গন্ধ পৃথিবীবাসীদের কষ্ট দেয় না। লবণাক্ত পানির কারণে বাতাস সুস্বাস্থ্যকর থাকছে এবং পানি পবিত্র ও এর স্বাদ ভালো থাকে। নবী কারীম সা.-কে যখন সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমরা কি তা দিয়ে অযু করতে পারবো? উত্তরে তিনি বলেন, এর পানি পবিত্র। এর মৃত জন্তু হালাল।

আল্লাহর কুদরত দেখুন। তিনি কী ভাবে নিজ শক্তি ও নির্দেশে সমান্তরালে প্রবাহিত দু'টি পানিকে পরস্পরে মিলিত হতে দিচ্ছেন না! লবণাক্ত পানি মিষ্টি পানির সঙ্গে মেশে না। মিষ্টি পানি লবণাক্ত পানির সঙ্গে মেশে না। ইরশাদ করেন, 'তিনি পাশাপাশি দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। অতএব, তোমরা পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?'

অন্য আয়াতে এসেছে, 'বলুন, কে সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন; তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন; তার ওপর পাহাড় স্থাপন করে দিয়েছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে আড়াল করেছেন। অতএব, আল্লাহ্ তাআলার সাথে অন্য কোনো উপাস্যও আছে কি? বরং কথা হলো, এই মুশরিকদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ।

আল্লাহ মানুষকে দুর্বল বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাকে যথাযথ অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর

তাকে নর বা নারী বানিয়েছেন। তাকে বংশীয় আত্মীয়-স্বজন দিয়েছেন। অতঃপর কিছুদিন পর শ্বশুরালয়ের সঙ্গে তার আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন। এতো শক্তিশালী আল্লাহর কুদরতসমূহ তোমাদের সামনে রয়েছে।

## সূরা ফুরকানের ৫৫-৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَ لَا يَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ○ وَ مَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ○ قُلْ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○ وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ○ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۛ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ○

তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যা তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। আর কাফির তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী। আমি তো আপনাকে শুধুমাত্র সুংসবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি। বলুন— 'আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না, তবে যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক। আর আপনি ভরসা করুন এমন চিরঞ্জীব সত্তার ওপর যিনি মরবেন না। তাঁর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করুন। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। যিনি আসমান, জমিন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই পরম করুণাময়। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে যিনি সম্যক অবহিত, আপনি তাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের অজ্ঞতার বিবরণ তুলে ধরে বলছেন, তারা যে মূর্তির পূজা করছে, এর ওপর তাদের কাছে কোনো দলীল নেই। মূর্তিগুলো তাদের কোনো ধরনের লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। তারা শুধু পিতৃপুরুষদের দেখাদেখি, প্রবৃত্তির পূজারী হয়ে নিজেদের মনে মূর্তি-দেবীর শ্রদ্ধা লালন করছে। এ কারণে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করছে। তারা শয়তানের সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আল্লাহর বাহিনীর বিপক্ষে নেমেছে। তবে স্মর্তব্য যে, বিজয় সবসময় আল্লাহওয়ালাদেরই হবে। তারা এই আশায় আছে যে, এই মিথ্যা উপাস্যগুলো তাদের সহায়তা করবে; অথচ এটি তাদের শুধুই ভুল ধারণা। ওরা খামোখা মূর্তিদের পক্ষে বিবাদ করছে। চূড়ান্ত

পরিণতিতে বিজয় মুমিনদের হাতেই থাকবে। কারণ, দুনিয়া ও আখেরাতের পরওয়ারদেগার তাঁদের সহায়তা করবেন। এই কাফেরদেরকে তো শয়তানই শুধু আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে। তাদের অন্তরে আল্লাহর বৈরীতার বীজ বপন করছে। শিরকের প্রতি ভালোবাসা তাদের অন্তরে বসিয়ে দিচ্ছে। যার কারণে তারা আল্লাহর বিধানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন, আমি আপনাকে মুমিনদের জন্যে সুসংবাদবাহী ও কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনের জন্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি। আপনি অনুগতদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিন আর অবাধ্যদেরকে জাহান্নামের বিভৎস শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করুন। মানুষের মাঝে ঘোষণা দিন– আমি এই দীনপ্রচারের পরিবর্তে তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না। আমার এই দীন প্রচারের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ। তা ছাড়া অন্য আর কোনো চাওয়া নেই। আমার শুধু এটাই ইচ্ছা, তোমাদের মধ্য হতে যারা সঠিক পথে আসতে চায়, তাদের সম্মুখে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবো। হে রাসূল! আপনি সকল কাজে ওই আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। যিনি মৃত্যু ও বিনাশ হওয়া থেকে পবিত্র। যিনি আদি ও অন্ত; প্রকাশ্য ও গোপন; প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে সম্যক অবগত; যিনি চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী-শাশ্বত-চিরন্তন-মৃত্যুহীন-চিরপ্রতিষ্ঠিত। যিনি প্রতিটি বস্তুর মালিক। তাঁকেই আপনি প্রকৃত আশ্রয়স্থল সাব্যস্ত করুন। একমাত্র তাঁর সত্তাই এমন, যাঁর ওপর ভরসা ও আস্থা রাখা যায়। প্রতিটি বিপদে ও সংকটে আপনি তাঁরই দ্বারস্থ হোন। তিনিই যথেষ্ট। তিনিই সহায়তাকারী, সমর্থনকারী ও ভাগ্যদাতা। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 'হে রাসূল! যা কিছু আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন।' আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি সত্য পয়গাম কিছুই আদায় করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের মন্দ উদ্দেশ্য থেকে রক্ষা করবেন।'

এক হাদীসে এসেছে, একবার মদীনা তাইয়্যেবার কোনো গলিতে সাইয়্যেদুনা সালমান ফারসী রা. রাসূলুল্লাহ সা.-কে সেজদা করতে লাগলেন। তখন নবীজী বললেন, হে সালমান! আমাকে সেজদা করো না। সেজদার উপযুক্ত তো তিনিই– যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। যাঁর কখনই মৃত্যু হবে না। তাঁরই তাসবীহ ও প্রশংসা আদায় করো।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ সা. তা পালনার্থে বলতেন– سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ। অর্থাৎ ইবাদত শুধু আল্লাহরই করো। তাওয়াক্কুলও শুধু তাঁর সত্তার ওপরই করো। যেমন ইরশাদ হয়েছে, 'পূর্ব ও পশ্চিমের রব তিনিই। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।'

অন্য আয়াতে এসেছে— আমরা ওই রহমানেরই বান্দা এবং তাঁরই ওপর

আমাদের পূর্ণ আস্থা। তাঁর কাছে বান্দাদের সব কর্মকাণ্ড স্পষ্ট। সামান্যতমও তাঁর কাছে গোপন নয়। কোনো রহস্যের কথাও তাঁর কাছে লুকায়িত নয়। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। প্রতিটি প্রাণীকে তিনিই রিযিক পৌঁছে দেন। তিনি নিজ ব্যাপক ক্ষমতা ও কুদরতের মাধ্যমে আসমান-জমিনের মতো সুবিশাল এই সৃষ্টিকে মাত্র ছয় দিনে অস্তিত্ব দান করেন। এরপর আরশের ওপর সমাসীন হন। প্রকৃতির প্রতিটি কাজ সুচারু ব্যবস্থাপনা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। তিনিই আদেশদাতা ও নিয়ন্ত্রণকারী। তাঁর সিদ্ধান্ত সত্য ও কল্যাণময়। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অবগত আছে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ও জ্ঞাত নবী সা.-ই ছিলেন যিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সকল বনী আদমের সর্দার। যিনি নিজের পক্ষ থেকে একটি কথাও বলতেন না; বরং যা বলতেন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবহিত হয়েই বলতেন। নবী কারীম সা. আল্লাহর যতোগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তার প্রতিটিই সত্য। তিনি যতোগুলো সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোও সব সত্য। সত্য ইমাম ও নবী ছিলেন। সকল ঝগড়ার মীমাংসা নবী সা.-এর নির্দেশেই করা হতো। যে নবী সা.-এর কথা প্রচার করবে সে সত্য এবং যে নবী সা.-এর বিরুদ্ধাচরণ করবে সে নাস্তিক, বিধর্মী; চাই সে যেই হোক। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ বিশ্বাস যোগ্য, যা স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়া করো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর শরণাপন্ন হও। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো, তার ফয়সালা আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করো। আরো বলেছেন, তোমার প্রতিপালকের কথা, যা ইনসাফপূর্ণ ও সত্য, পূর্ণতা লাভ করেছে। এটাও বর্ণিত রয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন।

মুশরিকরা গায়রুল্লাহকে সেজদা করতো। তাদেরকে যখন বলা হতো, তোমরা রহমানের সেজদা করো তখন তারা বলতো, আমরা রহমানকে চিনি না। আল্লাহর অপর নাম রহমান; তারা এটা অস্বীকার করতো। যেমন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ সা. যখন সন্ধি লেখককে বললেন, লেখো– بسم الله الرحمن الرحيم তখন মুশরিকরা বলে উঠেছিলো, আমরা না রহমানকে চিনি; না রহীমকে চিনি। আমাদের প্রথা অনুসারে লেখো– باسمك اللّٰهُمَّ। যার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ الخ —বলুন, আল্লাহ্ বলে আহবান করো কিংবা রহমানকে যে নামেই আহবান করো না কেনো, তাঁর অনেকগুলো সুন্দর নাম রয়েছে।'[৭৫] তিনিই আল্লাহ, তিনিই রহমান। তখন মুশরিকরা বলে উঠেছিলো– 'শুধু কি

---

৭৫. সূরা ইসরা : ১১০।

তোমার কথায়ই আমরা এমন করে নেব?' মোটকথা, এভাবে ওদের বৈরীতার পরিমাণ আরও বেড়ে গিয়েছিলো। ঈমানদাররা এর বিপরীত। তাঁরা আল্লাহর ইবাদত করে, যিনি রহমান ও রহীম, তাঁকেই ইবাদতের উপযুক্ত মনে করে এবং তাঁর জন্যই সেজদা করে।

## সূরা ফুরকানের ৬১-৬২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ○ وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ○

বরকতময় সে সত্তা যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন বিশাল গ্রহসমূহ। আর তাতে প্রদীপ ও আলো বিকিরণকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিবা-রাত্রিকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন তার জন্য—যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, সুউচ্চ কুদরতের পরিচয় পেতে দেখুন, তিনি কী ভাবে আসমানে এই بُرُوْجُ তৈরি করেছেন। এ শব্দ দ্বারা হয়তো বড় বড় তারকা উদ্দেশ্য। অথবা প্রহরীদের নিক্ষিপ্ত বজ্র উদ্দেশ্য। প্রথম অভিমতটিই অধিক স্পষ্ট। হতে পারে, বড় বড় তারকাগুলোই নক্ষত্রের কক্ষপথ। আয়াতে এসেছে, দুনিয়ার আসমানকে আমি তারকা দ্বারা সুশোভিত করেছি। যেমন, ইরশাদ করেছেন, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا —'এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ অর্থাৎ সূর্য বানিয়েছি।'[৭৬] আর বানিয়েছি চাঁদ যা আলোকিত ও উজ্জ্বল। নূর— যার আলো সূর্যের আলো থেকে ভিন্ন। যেমন ইরশাদ করেছেন, 'তিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে বানিয়েছেন নূর।' হযরত নূহ আ. স্বজাতিকে বলেছিলেন, 'তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না, আল্লাহ সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে চাঁদকে নূর বানিয়েছেন এবং সূর্যকে বানিয়েছেন প্রদীপ স্বরূপ। দিন-রাত একটি অপরটির পেছনে আসা-যাওয়া করে। আল্লাহর কুদরতের ব্যবস্থাপনাই হলো একটি যায় তো অন্যটি আসে। যেমন বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের জন্য চন্দ্র সূর্যকে ধারাবাহিকভাবে আবর্তনকারী বানিয়েছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, রাত দিনকে আবৃত করে ফেলে এবং খুব তাড়াতাড়ি তাকে ডেকে চলে আসে। না সূর্য চন্দ্র থেকে আগে যেতে পারে আর না রাত দিনকে অতিক্রম করে।

এই চন্দ্র-সূর্যের আবর্তনের কল্যাণেই মানুষ নিজ ইবাদতের সময় জানতে পারে। রাতের ছুটে যাওয়া আমল দিনে সম্পন্ন করে নেয়। দিনের রয়ে যাওয়া

---

৭৬. সূরা নাবা : ১৩।

আমল রাতে পূর্ণ করে নেয়। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্ তাআলা রাতের বেলা নিজ হাত প্রসারিত করে দেন; যেন দিনের গুনাহগার তাওবা করে নেয়। তদ্রূপ তিনি দিনে নিজ হাত প্রসারিত করে দেন; যেন রাতের গুনাহগার তাওবা করে নেয়।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদিন সাইয়্যেদুনা উমরে ফারুক রা. দোহার নামায আদায় করতে খুব বেশী সময় নিলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমার রাতের ওযিফা রয়ে গিয়েছিলো। এজন্যে আমি চেয়েছি সেটি পুরা করে নেবো। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

## সূরা নামলের ৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

বরং তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তারা যা কিছু শরীক করে আল্লাহ তা থেকে ঊর্ধ্বে।

**ব্যাখ্যা :** মহান আল্লাহ আসমান ও জমিনের মাঝে এমন অসংখ্য সনাক্তকরণ চিহ্ন রেখে দিয়েছেন যে, যদি কেউ জলভাগে বা স্থলভাগে সফর করার সময় পথ হারিয়ে ফেলে তাহলে ওইসব চিহ্ন দেখে তারা সঠিক পথ পেয়ে যায়। যেমন, ইরশাদ করেছেন, তারকা দ্বারাও মানুষ রাস্তা পেয়ে যায়। স্থল ও জলভাগে এগুলো দেখে স্বীয় পথ ঠিক করে নেয়।

মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে, এর পূর্বে ঠাণ্ডা মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত করে। যা থেকে মানুষ অনুভব করে যে, এখনই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। এ সকল কাজ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ করেনা আর করার ক্ষমতাও রাখে না। নিশ্চয়ই তিনি সকল অংশীদার থেকে পৃথক ও পবিত্র এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

## সূরা কাসাসের ৬৮-৭০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○ وَ هُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

তোমার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোনো এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে তিনি তা থেকে ঊর্ধ্বে। আর তোমার রব জানেন, তাদের অন্তর যা গোপন করে আর তারা যা প্রকাশ করে। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; বিধান তাঁরই। আর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহই সকল মাখলুকের স্রষ্টা। সকল অধিকার ও ক্ষমতা তাঁর হাতেই। তাঁর সঙ্গে বিবাদ, কলহ ও মতদ্বৈধতা করার ক্ষমতা কারও নেই। তাঁর কোনো অংশীদার ও সমকক্ষ নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন। যা ইচ্ছা তাই করেন। যা চান না, তা হতেই পারে না। সকল বিষয়ে যাবতীয় কল্যাণ ও অনিষ্টতা তাঁর হাতে। তাঁর কাছেই সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে। কারো কোনো স্বাধীনতা নেই। অর্থাৎ আল্লাহ সেটাই পছন্দ করেন, যার মধ্যে বান্দার কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সহ অন্যান্য সাহাবী হতে বর্ণিত যে, এ আয়াতের বিষয়বস্তু হলো– মাখলুকের সৃষ্টির প্রাক্কালে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের একক অধিকার আল্লাহর হাতেই। তিনি অন্য কোনো দৃষ্টান্ত থেকে পবিত্র। এ কারণেই এ আয়াতের শেষাংশে বলেছেন, 'তারা যেসকল মূর্তি ইত্যাদিকে আল্লাহর অংশীদার অভিহিত করে রেখেছে সেগুলো না কোনো জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে; না কোনো ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তাআলা অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র। অতঃপর বলেন, আল্লাহ অন্তরের লুকায়িত কথাও জানেন। আর ওই সমস্ত লুকায়িত কথা তাঁর কাছে প্রকাশ্য কথার মতোই স্পষ্ট। তোমরা গোপনে বলো আর ঘোষণা দিয়ে বলো, তিনি সমুদয় কথাই জানেন। দিন-রাতে কী হচ্ছে, তার কোনোটাই আল্লাহর অবিদিত নয়। তাঁর সকাশেই সকল মাখলুকাত নিজ প্রয়োজন নিবেদন করে; তিনি ছাড়া কেউ নেই যে, মানুষ তার কাছে গিয়ে নিজের সমস্যার কথা বলবে। তিনিই সকল মাখলুকের আশ্রয় দাতা। তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। তিনিই স্রষ্টা, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, অধিপতি ও রব। তিনি যা কিছু করেছেন সবই প্রশংসার যোগ্য। তিনি ইনসাফ ও প্রজ্ঞার সঙ্গেই প্রতিটি কাজ নিষ্পন্ন করেন। তাঁর নির্দেশসমূহ কেউই অগ্রাহ্য করতে পারে না। কেউ তাঁর ইচ্ছা প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না। প্রভাব, প্রজ্ঞা ও রহমত তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে মিশে আছে। তোমরা সবাই কিয়ামত দিবসে তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে। সেদিন তিনি প্রত্যেককে নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন। তোমাদের কোনো কথা বা কাজ তাঁর কাছে গোপন নয়। তিনি সেদিন ভালো

কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের ওপর শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে মাখলুকের মাঝে মিমাংসা করে দেবেন।

## সূরা কসাসের ৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি দিনকে তোমাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের রাত এনে দেবে যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ দেখো, তোমাদের কোনো চেষ্টা তদবির ছাড়াই দিন-রাত নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটার পর অন্যটা চলে আসছে। যদি রাতই দীর্ঘায়িত হতো তাহলে তোমরা অক্ষম হয়ে যেতে। তোমাদের কাজ-কর্ম স্থবির হয়ে তোমাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতো। তোমরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বিরক্ত হয়ে পড়তে। কাউকে পেতে না যে, তোমাদের জন্যে দিন নিয়ে আসবে। আর তোমরা ওই আলোর দ্বারা চলাফেরা ও দেখাশোনা করে নিজের কাজ-কর্ম করে নিতে পারবে। আফসোস! তোমরা শুনেও না শোনার ভান করে আছো।

তদ্রূপ যদি তিনি তোমাদের জন্য দিনকে দীর্ঘায়িত করতেন, রাত আসতোই না। তখনও তোমাদের জীবন তিক্ত হয়ে যেতো। শারীরিক শৃঙ্খলা উলোটপালট হয়ে যেতো। ক্লান্ত ও বিস্বাদ হয়ে যেতো জীবন। এমন কেউ নেই, যার ক্ষমতা আছে রাত এনে দেবে। আর তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে বিশ্রাম করতে পারবে? অথচ তোমরা চোখ থাকতেও আল্লাহর এই নিদর্শন এবং অনুগ্রহসমূহ দেখতেই পাচ্ছো না।

## সূরা কসাসের ৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

তিনিই তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যেন তোমরা শোকর আদায় করতে পারো।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর অন্যতম দয়া যে, তিনি রাত-দিন দু'টোই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা রাতে বিশ্রাম নিতে পারো এবং দিনে কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-ক্ষামার ও সফর করতে পারো। তোমাদের উচিত হলো,

তোমরা ওই প্রকৃত মালিক সর্বশক্তির অধিকারী আল্লাহর শোকর আদায় করো; দিন-রাত তাঁর ইবাদত করো। রাতের ভুল-ভ্রান্তিগুলো দিনে এবং দিনের ভুল-ভ্রান্তিগুলো রাতে সংশোধন করো। বিচিত্র এই জিনিসগুলো আল্লাহ তাআলার কুদরতের যৎসামান্য নমুনা। এগুলো এ জন্য, যেন তোমরা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো এবং রবের শোকর আদায় করো।

## সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ○

তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা। আর যখন তিনি কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : এ আয়াত সহ সংশ্লিষ্ট আরও কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে খ্রিস্টান ও তাদের সমমানসিকতার অধিকারী ইয়াহুদ-মুশরিকদের অপনোদনে। যারা মানে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, জমিন ও আসমানের সকল বস্তুর মালিক আল্লাহ। তিনিই সেগুলো সৃষ্টি করেছেন; তিনিই রিযিক দিচ্ছেন; তিনিই সেগুলোকে পরিমিত রূপ দিয়েছেন। আল্লাহর একক নিয়ন্ত্রণেই মহাবিশ্ব। সেখানকার যাবতীয় রদবদল তিনিই নিষ্পন্ন করেন। তাহলে ওই মাখলুকদের মধ্য থেকে কেউ কী করে আল্লাহর সন্তান হতে পারে? না উযায়ের আ., না ঈসা আ.– কেউই আল্লাহর সন্তান হতে পারে না। যেমনটি ইয়াহুদী-নাসারাদের বিশ্বাস ছিলো। না ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা হতে পারে। তদ্রূপ আরবের মুশরিকরাও মনে করতো। কারণ, সন্তান হয় একই প্রজাতির পরস্পর যৌনমিলনের মাধ্যমে। অথচ আল্লাহর না কোনো সমকক্ষ আছে; না তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে কোনো অংশিদারিত্ব আছে; আর না তাঁর সমগোত্রীয় কেউ আছে। তিনি তো আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। কাজেই কীকরে তাঁর সন্তান হয়? তাঁর তো কোনো স্ত্রীও নেই। তিনিই প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সম্যক অবগত।

তারা বলে, রহমানের সন্তান রয়েছে। কত বড় অবান্তর ও নিরর্থক কথা তোমরা বলো। তোমাদের মুখ থেকে নোংরা কথা বের হয় যে, তার দ্বারা আকাশ ভেঙ্গে চুরমার হওয়া এবং জমিন কেটে যাওয়া ও পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়াও সম্ভব। তাদের দাবী, আল্লাহ তাআলার সন্তান রয়েছে। অথচ আল্লাহর সন্তানই তো হতে পারে না। কারণ, তিনি ছাড়া যা কিছুই আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। জমিন ও আসমানের সকল জিনিস তাঁর গোলামিতে দণ্ডায়মান। যাদের সবাইকে তিনি বেষ্টণ করে আছেন এবং গণনা করে রেখেছেন। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে

একাকী উপস্থিত হতে হবে। কাজেই গোলাম কখনই সন্তান হতে পারে না। মালিকানা আর পিতৃ পরিচয় দু'টি ভিন্ন ও বিপরিত অস্তিত্ব। দু'টির অবস্থান পুরোপুরি ভিন্ন। আল্লাহ অন্য সূরায় সন্তানের সম্ভাবনা নাকচ করে বলেন, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ○ اللَّهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ○ আল্লাহ্ এক ও অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। তাঁর কোনো মা-বাবা নেই এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।' এমন আরো অনেক আয়াতেই আল্লাহ নিজের গুণগাণ ও পূতঃপবিত্রতার কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রমাণ করেছেন যে, তিনি দৃষ্টান্তহীন, অদ্বিতীয়, নিরুপম ও অংশীদারহীন। তিনি মুশরিকদের নোংরা বিশ্বাস অগ্রাহ্য ও নাকচ করেছেন। বলেছেন, তিনি এককভাবে তাদের সকলের স্রষ্টা ও রব। তাহলে তাঁর সন্তান কোত্থেকে হবে?

সূরা বাকারার এ আয়াতের তাফসীরে বুখারী শরীফে একটি হাদীসে কুদসী রয়েছে। যেখানে আল্লাহ বলেন, আমাকে আদমসন্তান মিথ্যা সাব্যস্ত করে; অথচ তারা উপযুক্ত ছিলো না। তারা আমাকে গাল-মন্দ করে; তাদের এটা করা উচিত ছিলো না। তাদের মিথ্যা তো এটা ছিলো যে, তারা ভেবে বসে আছে– আমি তাদেরকে মৃত্যু দেয়ার পর পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম না। আর আমাকে গালি দেয় এভাবে যে, তারা বলে– আমার সন্তান রয়েছে। অথচ আমি স্ত্রী ও সন্তান থেকে পূতঃপবিত্র। শব্দের সামান্য তারতম্যের সঙ্গে এ হাদীসটি ভিন্ন সনদে অন্য কিতাবগুলোতেও বর্ণিত রয়েছে।

হাদীসের দু'টি বিশুদ্ধতম কিতাব বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, মন্দ কথা শুনে ধৈর্যধারণ করার ক্ষেত্রে কেউ আল্লাহর চেয়ে এগিয়ে নেই। কিছু লোক বলে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে এবং তিনি তাদের রিযিক ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকে।' অতঃপর বলেন, প্রতিটি জিনিস তাঁরই অনুসরণ করে। তাঁর গোলামিকে সমর্থন করে। তাঁর একনিষ্ঠ উপাসনা করে। তাঁর আদালতে কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই তাঁর সামনে করজোড়ে দাঁড়াতে হবে এবং দুনিয়াতে যারা ইবাদতকারী তারাও। যাকে বলবেন, এমন হও, এইভাবে হও! সে ওই রূপ হয়ে যাবে। তদ্রূপ প্রত্যেকে তাঁর সম্মুখে একান্ত বাধ্য হবে। কাফেররাও যদিও চাইবে না তবুও তাঁর সকাশেই মাথা নত করে থাকবে। কুরআনের অপর আয়াতে এসেছে, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ —'আসমান ও জমিনের প্রতিটি জিনিস স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহ তাআলাকেই সেজদা করে। সকাল-সন্ধ্যা তাঁর সামনেই মাথা নত করে। অতঃপর বলেন, আল্লাহই আসমান ও জমিনকে কোনো ধরনের নমুনা ব্যতিরেকে প্রথমবারেই সৃষ্টি করেছেন। অভিধানে بديع শব্দের অর্থ, সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব বস্তু সৃষ্টিকারী।

ইবনে জরীর রহ. বলেন, এখন তাহলে এই দাঁড়ালো যে, আল্লাহ তাআলা

পিতৃত্ব থেকে পবিত্র। তিনি আসমান ও জমিনের সকল জিনিসের মালিক। প্রতিটি জিনিস আল্লাহর একত্ববাদের দলীল বহন করে; তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতি দেয়। তিনি সবার সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবাইকে বানিয়েছেন ও অস্তিত্বদান করেছেন। আল্লাহই সেই সত্তা; যিনি কোনো ধরনের ভিত্তি ও উপমা ব্যতিরেকে উদ্ভাবন করেন। তিনিই রাব্বুল আলামীন। দু'জাহানের প্রতিপালক। প্রতিটি বস্তু আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষী দেয়। খোদ ঈসা মসীহ আ.ও আল্লাহর সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং বর্ণনাকারী। যে আল্লাহ ওই সমস্ত জিনিস কোনো নমুনা, উৎস ও ভিত্তি ছাড়া সৃষ্টি করেছেন, তিনিই হযরত ঈসা আ.-কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। অতএব, অহেতুক তোমরা তাঁকে 'আল্লাহর সন্তান' বলে দাবী করবে? অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজত্ব এমন, তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু এতোটুকুনই বলেন যে, 'হয়ে যাও' সঙ্গে সঙ্গে সেটি হয়ে যায়। কবির ভাষায়–

إِذَا مَا أَرَادَ اللهُ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ قَوْلَةً فَيَكُوْنُ

'আল্লাহ যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু একটি বার বলেন 'হও' সঙ্গে সঙ্গে সেটি হয়ে যায়।'

আলোচিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা খ্রিস্টানদের অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, হযরত ঈসা আ. আল্লাহর সেই كُنْ শব্দ বলার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছেন। অর্থাৎ ঈসা আ.-এর উদাহরণ আল্লাহর কাছে আদম আ.-এর মতো; যাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করার সময় শুধু এতোটুকু বলেছেন 'হও' সঙ্গে সঙ্গে তিনি অস্তিত্ব লাভ করেছেন।

## সূরা বাকারার ১৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহর রাজত্বে তিনি একাই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁর মতো কেউ নেই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নন। তিনি রহমান ও রহীম। সূরা ফাতেহার প্রারম্ভে এ নিয়ে বিশদ তাফসীর বর্ণিত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, এই দু' আয়াতের মাঝেই إِسم أَعظم (ইসমে আ'যম) রয়েছে। একটি হলো এ আয়াত। অপরটি হলো, الٓمٓ ○ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ তারপর আল্লাহর তাওহীদের ওপর দলীল পেশ করা হয়েছে। মনোযোগের সঙ্গে শুনুন।

## সূরা বাকারার ১৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ○

নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে, সে নৌকায়– যা সমুদ্রে মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তু নিয়ে চলে এবং আসমান থেকে আল্লাহ যে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন অতঃপর তা দ্বারা মৃত জমিনকে জীবিত করেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার বিচরণশীল প্রাণী ও বাতাসের পরিবর্তনে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে নিয়োজিত মেঘমালায় রয়েছে নিদর্শনসমূহ এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা বিবেকবান।

**ব্যাখ্যা :** উদ্দেশ্য হলো এই, ওই আল্লাহর খোদায়ীত্ব ও তাঁর তাওহীদের ওপর দলীল একেতো এই আসমান– যার সুউচ্চ ও সুবিস্তৃত পরিসর, যার বুকে চলন্ত ও স্থির উজ্জ্বল তারকারাজি তোমরা দেখতে পাচ্ছো; দ্বিতীয়ত এই জমিনের সৃষ্টি– যার বুকে ঘনপুরো ঘাসের সমারোহ তোমাদের পায়ের নিচে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, প্রতিনিয়তঃ যার ওপর তোমরা হাঁটছো; যার বুকে অসংখ্য আকাশচুম্বী পাহাড় শোভা পাচ্ছে; যার মাঝে বিক্ষুব্ধ ঢেউ আঁছড়ে পড়া সীমাহীন সমুদ্র রয়েছে। যার ওপর বৈচিত্র্যময় ফুল রয়েছে; যেখানে বিভিন্ন ধরনের ফসলের বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-খামার ও উদ্ভিদ জন্মায়। যেখানে তোমরা বসবাস করো এবং নিজের মর্জিমতো আরামদায়ক ভবন নির্মাণ করে জীবন যাপন করছো; যেখান থেকে তোমরা হাজার রকমের উপকার গ্রহণ করছো। অতঃপর রাত-দিনের এই পালাবদল; রাত গেলো তো দিন এলো, দিন গেলো তো রাত এলো– না একে অন্যকে অতিক্রম করে। প্রতিটি যথাসময়ে যথানিয়মে আসছে-যাচ্ছে; কখনও দিন বড় হচ্ছে তো কখনও রাত বড় হচ্ছে; কখনও দিনের কিয়দাংশ রাতের মধ্যে চলে যাচ্ছে, কখনও রাতের কিয়দাংশ দিনের মধ্যে চলে যাচ্ছে। অতঃপর নৌযানগুলো দেখো। যা তোমাদেরকে, তোমাদের মাল-পত্র ও ব্যবসায়িক জিনিসপত্র নিয়ে একদিক থেকে অন্যদিক আসা-যাওয়া করছে। একদেশের মানুষ অন্য দেশে যাচ্ছে; এ দেশের মানুষ ওই দেশের মানুষের সাথে সম্পর্ক ও লেনদেন করতে পারছে। এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় পৌঁছতে পারছে। অতঃপর মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করছেন। এর মাধ্যমে মৃত জমিনে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করছেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের সবজি ও ফল-মূল উৎপন্ন হচ্ছে। চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ সৃষ্টি হচ্ছে। এর

বাইরে আল্লাহ তোমাদের জন্যে জমিনে বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তাদের নিরাপত্তা দেওয়া, খাবারের ব্যবস্থা করা, সেগুলোর শোয়া, বসা ও বিচরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা; বাতাসকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, কখনও পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত করেন; কখনও ঠাণ্ডা, কখনও উষ্ণ, মেঘকে জমিন ও আসমানের মধ্যখানে অনুগত করা, মেঘকে এক দিক থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া, যে জায়গায় প্রয়োজন সেখানে বর্ষণ করা ইত্যাদি। এগুলো মহান আল্লাহর কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন। যা দেখে বুদ্ধিমানরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর তাওহীদের প্রমাণ পেয়ে যায়। একথাই অন্য আয়াতে এভাবে ইরশাদ হয়েছে, 'আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। যাঁরা উঠতে, বসতে, শুইতে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বলে, হে আমার রব! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।'

সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কুরাইশের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে হাজির হয়ে বললো, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন– তিনি যেন সাফা পাহাড়টিকে সোনা বানিয়ে দেন। ফলে তা দিয়ে আমরা ঘোড়া, যুদ্ধাস্ত্রসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবো এবং আপনার সঙ্গ দেবো ও ঈমান আনবো। নবীজী বলেন, তোমরা পাক্কা অঙ্গীকার করছো তো? তারা বললো, হ্যাঁ, পাক্কা অঙ্গীকার করছি। নবীজী সা. তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। জিবরাঈল আ. এলেন এবং বললেন, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে। কিন্তু তারপরও যদি এরা ঈমান না আনে তাহলে তাদের ওপর আল্লাহর এমন আযাব আসবে যা ইতঃপূর্বে কারও ওপর আসেনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. কেঁপে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, না আল্লাহ না। আপনি তাদেরকে এভাবেই থাকতে দিন। আমি তাদেরকে আপনার দিকে ডাকতে থাকবো। আজ নয়তো কাল, কাল নয়তো পরশু তাদের কারও না কারও মন আপনার দিকে ঝুকবে। সেই প্রেক্ষিতে আলোচিত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় যে, তারা যদি আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনগুলো দেখতে চায় তাহলে কি এই নিশানাগুলো নিদর্শন হিসেবে কোনো অংশে কম?

আয়াতগুলোর আরেকটি শানে নুযূল রয়েছে। যখন وَإِلٰهُكُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, এক খোদা কী ভাবে গোটা পৃথিবীকে পরিচালনা করবেন? যার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। কিছু বর্ণনায় এসেছে, তারা আল্লাহ এক শুনে এর প্রমাণ পেশ করতে বলে। যার প্রেক্ষিতে আলোচিত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। যেখানে তাঁর কুদরতের অনেকগুলো নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে।

## সূরা আলে ইমরানের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○

তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে তিনি চান। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আসমান ও জমিনের অদৃশ্যগুলো তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন। তাঁর কাছে কোনো জিনিস গোপন নয়। তিনি তোমাদেরকে মায়ের পেটে অবয়ব দান করেছেন। যাকে যেভাবে চেয়েছেন– সুন্দর-অসুন্দর, ভালো-মন্দ বানিয়েছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তিনি প্রাধান্য বিস্তারকারী প্রজ্ঞাবান। যখন শুধু তিনি একাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তখন অন্যের উপাসনা কেনো করো? তিনি অনন্ত সম্মানের অধিকারী। অবিনশ্বর রাজত্বের অধিরাজ তিনি। তাঁর প্রতিটি বিধান অনড় অবিচল। এ আয়াতে শুধু ইশারা নয়; সুস্পষ্টভাবে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ঈসা আ.ও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। আর আল্লাহর সম্মুখেই অবনত মস্তক ছিলেন যেভাবে সমস্ত মানুষ অবনত হয়। ওই সমস্ত মানুষের মতো তিনিও একজন। তাঁকেও মায়ের পেটে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমি সৃষ্টি করেছি বলে সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে তিনি খোদা কী ভাবে হয়ে গেলেন? যেভাবে ওই অভিশপ্ত দল ইহুদি, খ্রিস্টানরা মনে করছে। অথচ তিনিও তো অন্য সকল মানবভ্রূণের মতো মায়ের পেটে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এসেছেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে।[৭৭]

## সূরা আলে ইমরানের ২৬-২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۡ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۡ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۡ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

---

৭৭. সূরা যুমার : ৬।

বলুন, হে আল্লাহ! হে রাজত্বের মালিক! আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন। আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন, আর যাকে চান অপমানিত করেন। আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।' 'আপনি রাত্রিকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে রাত্রিতে পরিণত করেন। আর মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর যাকে চান অপরিমিত রিযিক দান করেন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুহাম্মদ সা.! আপনি যদি আপনার রবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে চান; তাঁর শোকর আদায় করতে চান; তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করতে চান; সকল কর্মকাণ্ডে তাঁর ওপর আস্থা রাখতে চান তাহলে এই আয়াতে তাঁর বড়ত্বের কথাগুলো পাঠ করুন। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনিই রাজাধিরাজ। গোটা পৃথিবী আপনার রাজত্বাধীন। আপনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। যার থেকে ইচ্ছা কেড়ে নেন। আপনি দান করেন; আবার নিয়েও নিতে পারেন। আপনি যা চান তা হয়ে যায়; আর যা চান না তা কখনো হতে পারে না।

আয়াতটিতে সতর্কতাবশত ওই নেয়ামতের শোকরও আদায় করতে বলা হয়েছে যা আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সা. ও তাঁর উম্মতকে দান করেছেন। তা হলো নবুওয়াতের নেয়ামত। যা ইতঃপূর্বে বনী ইসরাঈলে ছিলো। সেখান থেকে তা উঠিয়ে মক্কার উম্মী কুরাইশী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.-কে দেয়া হয়েছে। তাঁকে জাতীয় নবী হিসেবে সকল নবীর শেষ নবীর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাঁকে সকল জ্বিন ও মানবজাতির নবীর দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী নবীদের মাঝে যতো বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি ছিলো; তা আমাদের প্রিয়নবীকে দান করা হয়েছে। এর বাইরে তাঁকে এমন কিছু ফযীলত দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণ এথেকে বঞ্চিত ছিলেন। চাই সেটা আল্লাহর ইলম সম্বন্ধেই হোক বা আল্লাহর শরীয়ত সম্বন্ধে হোক; আর হোক সেটা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংবাদ সম্বন্ধে। আল্লাহ তাঁর কাছে আখেরাতের সকল তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁর উম্মতকে পৃথিবীর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধর্ম ও শরীয়তকে অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদের ওপর বিজয় দান করেছেন। তাঁর ওপর আল্লাহর দরূদ অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত দিবস-রজনীর পালাবদল যতোক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে আল্লাহ তাআলা নবী সা.-এর ওপর স্বীয় রহমতসমূহ ততোক্ষণ বর্ষণ করতে থাকবেন। আমীন।

অতঃপর আল্লাহ ইরশাদ করেন, আপনি বলুন– হে আল্লাহ! আপনিই

আপনার সৃষ্টিজীবের মাঝে রদবদল করতে থাকেন। যা চান করে ফেলেন। যারা বলতো, কেনো ওই দু' জনপদের মধ্য থেকে কোনো বড় ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় কালাম অবতীর্ণ করলেন না? তাদের প্রশ্ন নাকচ করে দিয়ে আল্লাহ বলেন, أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ؟—'আপনার রবের রহমত বণ্টনের অধিকার কি তাদের? অথচ আমিই তাদের রুটি-রুযির মালিক। যাকে ইচ্ছা কম দিই। যাকে ইচ্ছা বেশি দিই। তাহলে আমার ওপর খবরদারি করার এরা কে যে, তারা বলছে– কেনো অমুক অমুককে নবী বানানো হয়নি! নবুওয়াতও আমার মালিকানাধীন জিনিস। আমিই জানি, কে সেই নবুওয়াত পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। যেমন, অন্য আয়াতে এসেছে, اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ —আল্লাহ্ এ বিষয়ে ভালো জানেন, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে।[৭৮]

অন্য আয়াতে বলেন,

انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপর দলের ওপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম।[৭৯]

এরপর বলেন, আপনিই রাতের অতিরিক্তটুকু দিয়ে দিনের ঘাটতিকে পূর্ণ করে দিন-রাত সমান করে দেন। অতঃপর এদিকের অংশ ওদিক করে ওদিকের অংশ এদিক করে ছোট বড় করে দেন। আবার সমানও করেন। আসমান ও জমিনের ওপর, চাঁদ ও সূর্যের ওপর আপনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সবকিছু আপনিই পরিচালনা করেন। গ্রীষ্মকে শীতে ও শীতকে গ্রীষ্মে; এই পরিবর্তনও আপনারই ক্ষমতার মধ্যে বিদ্যমান। বসন্ত, হেমন্ত সহ সকল ঋতুর ওপর আপনারই নিয়ন্ত্রণ। আপনিই জীবিত থেকে মৃত ও মৃত থেকে জীবতকে বের করেন। ক্ষেত থেকে দানা ও দানা থেকে ক্ষেত, খেজুরগাছ বিচি থেকে এবং বিচি খেজুর থেকে আপনিই সৃষ্টি করেন। মুমিনের ঘরে কাফের ও কাফেরের ঘরে মুমিন আপনিই জন্ম দেন। মুরগি থেকে ডিম ও ডিম থেকে মুরগি আপনিই সৃষ্টি করেন। এভাবে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর ওপর আপনার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। আপনি যাকে ইচ্ছা এতো সম্পদ দান করেন যে, সে গুণেও শেষ করতে পারে না। আবার যাকে ইচ্ছা ক্ষুধা পরিমাণ রুটিও দেন না। আমরা বিশ্বাস করি, আপনার এই কাজগুলো আদ্যোপ্রান্ত জ্ঞানগর্ভে ভরপুর। আপনার প্রতিটি ইচ্ছা আপনার চাহিদা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তাবরানী শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে, اللّٰهُمَّ قُلِ আয়াতটিই আল্লাহর ইসমে আ'যম। কেউ যদি এ নাম নিয়ে দোয়া করে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে নেন।

---

৭৮. সূরা আন'আম : ১২৪।

৭৯. সূরা ইসরা : ২১।

॥ নবম খণ্ড সমাপ্ত ॥

# মুক্তার চেয়ে দামী

(দশম খণ্ড)

অনুবাদ

**মাওলান আদনান মাসউদ**

শিক্ষাসচিব,

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল ইনআম

কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

সম্পাদনা

**ফারুক ফেরদৌস**

# মুখবন্ধ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم — أما بعد

আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য শুকরিয়া, তাঁর অপার রহমত ও দয়ায় بکھرے موتی (মুক্তার চেয়ে দামী)-এর দশম খণ্ড আপনাদের হাতে। এই খণ্ডটির কাজ শেষ করে আমি হারামাইন শরীফাইন এসেছি। খণ্ডটি হাতে নিয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছি। আর দোয়া করেছি- আল্লাহ্ তাআলা যেন অধমের সকল সংকলন নিজ করুণায় কবুল করে নেন।

আমি বর্তমানে হারাম শরীফেই আছি। ২২ রজব ১৪৩৩ হিজরী মুতাবিক ১১ জুন ২০১২ ঈসায়ী এশার নামাযের সময় এই সংকলন সম্পন্ন হয়। পাঠককূলের কাছে আরজি- আমার জন্য; বিশেষত আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী রহ. ও মমতাময়ী মাতা এবং আমার অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য দোয়া করবেন। উপরন্তু, অত্র কিতাবের সংকলন ও প্রকাশনায় যাদের শ্রম রয়েছে- তাদের সকলের জন্য বিশেষভাবে রাব্বে কারীমের নিকট দোয়া করবেন।

এই মুখবন্ধ লিখেছি- ২২ রজব ১৪৩৩ হিজরী মুতাবিক ১১ জুন ২০১২ ঈসায়ী এশার আযান ও নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে মক্কার হারাম শরীফে বসে। আল্লাহ্ তাআলার ওপরই ভরসা করে بکھرے موتی (মুক্তার চেয়ে দামী)-এর একাদশতম খণ্ডের কাজও আজই হারাম শরীফে বসে শুরু করেছি। আল্লাহ্ তাআলা সংকলনটির সকল কাজ সহজ করে দেন এবং তা সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য বানিয়ে দেন। আমীন।

আল্লাহ্ তাআলার রেযার ভিখারী
মুহাম্মদ ইউনুস পালনপুরী
১১ জুন, ২০১২ ঈসায়ী

## নবীজী সা.-এর স্তুতিগান

যাঁকে পেয়ে সৌন্দর্য গর্বিত তিনি রাসূলে কারীম সা.
এই ছায়াপথজুড়ে শুধু তাঁরই পদধুলি

ভালোবাসার নাবিকগণ! হেথায় শক্তিকে করো উৎসর্গ
মদীনা তাইয়্যিবার পথের কাঁটাও যে পুষ্পস্তবক

এখানে পদে পদে সূক্ষ্মদর্শিতা খুঁজে ফেরো
ভালোবাসা বাকহীন-নিরব, এ তো নবীপ্রেম

হে সন্ন্যাসী! দৃষ্টি রেখো, মুস্তফার বাধ্যতায় সজাগ থেকো
এর পরেই পূর্ণতা অর্জনের পথ তোমার পানে চেয়ে আছে

মিম্বর কি ঘর, নিঃশেষ হবে না স্মৃতিচারণ তাঁর
হৃদয় হে! এঁ প্রেমময় সত্তা, পূর্ণতার প্রাপ্তি

মিথ্যার সামনে কভু নত করো না মস্তকখানি
আমার দৃষ্টিতে আদর্শ সেই কুমারিত্বের ঔরস

মুস্তফা সা.-এর নীতি ছাড়া বিপদমালার সমাধান
সে তো বুদ্ধির ভ্রম, দৃষ্টির ত্রুটি বৈ নয় অন্য কিছু

তাঁর ওপর করুণাধারার সিক্ততা অবারিত করো হে রব!
স্তম্ভের জীর্ণতায়, বন্ধুর বিচ্ছেদে হৃদয় যে বড় ব্যথাতুর



## বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর উপদেশ

- আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করো। যেন তিনিও তোমার জন্য সন্তুষ্টির নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত করে দেন।
- ইলমে শরীয়ত বাস্তবিকই ইলমে নূর।
- দরদী লোকদের কথা শোনো, যেন তোমার হৃদয়ে দরদ তৈরি হয়।
- মুসলমান তো সেই, যে অপর ভাইয়ের কল্যাণে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়।
- তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো- তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?
- সর্বদাই স্বল্পভাষী থাকবে। কারণ এতে অনেক উপকার রয়েছে।
- সর্বদা অন্যের উপকার করো। আল্লাহ তাআলাও তোমার উপকার করবেন।
- সর্বদা আল্লাহর কাজ করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার কাজে আসবেন।
- আল্লাহর সহনশীলতা দেখে বেপরোওয়া হয়ো না। তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

## হযরত উসমান গনী রা.-এর উপদেশ

- নিচু স্বরে কথা বলা, দৃষ্টি অবনত রাখা ও জীবনযাপনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ঈমানের নিদর্শন।
- পার্থিব বিষয়ে প্রার্থনাকারীকে আল্লাহ তাআলা ঠিক ততোটুকুই দেন, যতোটুকু তার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।
- ভুল খাতে সম্পদ ব্যয় করা মানে প্রাপ্ত নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা।
- অভাবে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তাআলা অভাব দূর করে দেন।
- সম্পদশালীর লাখ টাকা দানের চেয়ে অভাবী ব্যক্তির এক টাকা দান উত্তম।
- সুস্থতা ও পর্যাপ্ত নেয়ামত থাকা সত্ত্বেও আরো কামনা করাও আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ

## হযরত খাজা নিযামুদ্দীন রহ.-এর উপদেশ

- দোয়ার সময় কোনো গুনাহ বা অনুগত্যের কথা চিন্তা না করে আল্লাহর রহমতের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।
- মানবজীবনের সবচেয়ে উত্তম কর্ম হলো, আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকা।
- আল্লাহ তাআলার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা উচিত। তিনি ছাড়া কারো কাছে আশা না রাখা উচিত।

## হযরত ইমাম গাযালী রহ.-এর উপদেশ

- রাতে ঘুমানোর সময় পুরো দিনের হিসাব নিকাশ করে নিও।
- নম্রভাবে কথা বলো। কারণ, শব্দের চেয়ে ভঙ্গির প্রভাব বেশী।
- অধিক লৌকিকতা ভালোবাসা কমিয়ে দেয়।
- নারীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণকারী হযরত আইয়ূব আ.-এর ধৈর্যধারণের মতো প্রতিদান লাভ করবে।
- উদাসীনতা এমন অভিশাপ, যা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
- চাওয়া ছাড়া ঋণ পরিশোধ করা ঋণদাতার প্রতি ঋণগ্রহিতার অনুগ্রহ।
- সুন্নত পরিপন্থী কোনো কাজ ইবাদতসদৃশ হলেও পাপ।
- যে পরহেযগারী কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেয়, তা ছেড়ে দাও।
- সবচেয়ে বড় নেয়ামত 'যিকিরকারী যবান', 'কৃতজ্ঞ হৃদয়' ও 'অনুগত স্ত্রী'।
- উত্তম স্ত্রী পরকাল লাভের উপায়।
- স্ত্রীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণ করা, তার প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা এবং তাকে শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে রাখার চেষ্টা করা সর্বোত্তম ইবাদত।

## হযরত ওয়াইস ক্বারনী রহ.-এর উপদেশ

- যে ব্যক্তি উত্তম খাবার, উত্তম পোশাক ও সম্পদশালীর সহচর্য প্রত্যাশা করে সে জাহান্নামের খুব কাছে।
- সত্য বলবে, নিয়ত ও কাজ অভিন্ন রাখার চেষ্টা করবে, তবেই তুমি সুপুরুষ।
- পরের সম্পদে লোভ করার চেয়ে নিজের অল্প সম্পদে সন্তুষ্ট থাকো।
- সফলতার জন্য তোমার প্রচেষ্টা যদি শুধু আল্লাহর জন্যই হয়, তখন মানুষের মুখাপেক্ষী থাকবে না। এটাই সত্যিকারের প্রাচুর্য।
- নেতৃত্ব সততায়, দারিদ্র অহংকারে, বুযুর্গী অল্পেতুষ্টিতে, মর্যাদা বিনয়ে এবং গ্রহণযোগ্যতা পরহেজগারীতে। প্রয়োজন কমিয়ে ফেলো, শান্তি পাবে।

## হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর উপদেশ

- যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, তখন অন্য মতামত ভুলে যাও।
- অন্তর যবানের শস্যক্ষেত্র, সেখানে ভালো জিনিস বপন করলে সবক'টি না

হলেও কিছু বীজ তো ফসল দেবে।

- অনেক ভুল ভ্রান্তি দেখেও না দেখার ভাণ করে, এমন বন্ধু আমার প্রিয়।
- আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ বিপদে থাকে।
- নির্জনে কাউকে উপদেশ দেওয়া ভদ্রতা এবং সংশোধনের কারণ হয়। আর সবার সামনে উপদেশ দেওয়া অপমানের নামান্তর।
- যে ইলমের সাথে ভালোবাসা রাখে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।
- জেনে-শুনে যে গুনাহ্ করে, সে সর্বাধিক অজ্ঞ।

## হযরত শামসুদ্দীন রহ.-এর উপদেশ

- তুমি নিজেকেই কেনো ভুলে গেলে? নিজেকে ভুলে গিয়েই তো সবচেয়ে বড় ভুল করলে।
- তুমি নিজকে ইলমের সাজে সাজাও। কারণ, ইলমই সত্যিকার পুরুষের অলংকার ও সৌন্দর্য।
- খারাপ কাজ থেকে তাওবা করো, মন্দ বিষয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো এবং সৎকাজ গোপন রাখো।
- যদি আল্লাহওয়ালা হতে চাও, পার্থিব আরাম আয়েশ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখো।
- আল্লাহওয়ালা কখনো নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে চান না। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভই তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে যায়।
- যে বান্দা আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে, আল্লাহও তাকে সন্তুষ্ট করেন।
- বুযুর্গানে দীনের জীবনকে অনুসরণ করেই উত্তম জীবন যাপন করা যেতে পারে।

## হযরত শেখ সা'দী সিরাজী রহ.-এর উপদেশ

- সংকটে মন খারাপ করে বসে থেকো না। কারণ, ধৈর্যের স্বাদ তিক্ত হলেও তার ফল মিষ্টি।
- বিপদ-আপদ ধৈর্য ও ঈমানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই আসে। হতাশা দূর্বল ঈমানের পরিচয় বহন করে।
- যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখে দুঃখী হয় না, সে মানুষ হিসেবে গণ্য হতে পারে না।
- শত্রু থেকে সব সময় বেঁচে থাকবে। আর বন্ধু থেকে শুধু তখনই বেঁচে থাকবে, যখন সে তোমার প্রশংসা করে।
- যদি চড়ুই পাখির মাঝে ঐক্য থাকে, তবে তারা বাঘের চামড়া তুলে নিতেও সক্ষম।
- মিষ্টি কথা ও নম্র ভাষা মানুষের রাগের আগুনে পানির মত প্রভাব ফেলে।

## হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর উপদেশ

- সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে জীবনকে নেয়ামত মনে করে আর তা আল্লাহর স্মরণেই ব্যয় করে।
- আখেরাতের কাজ আজ করো। দুনিয়ার কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দাও।
- কাউকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসলে তার সব কিছুই ভালো লাগে।
- শরীয়তের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) ইলম (২) আমল (৩) ইখলাস। এই তিনটি বিষয় অর্জন করতে পারলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।
- নফসের উপর নিয়মিত নেককাজ করার চেয়ে কঠিন আর কিছু নেই।
- সবচেয়ে বড় নেককাজ হলো দীন প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ তাআলার নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা।
- ইখলাসের মাধ্যমেই নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে- হাজারে একজনই এই সৌভাগ্য লাভ করতে পারে।

## হযরত আবু বকর সয়দলানী রহ.-এর উপদেশ

- সত্য প্রকাশে সংকোচ বোধ করে চুপ থাকে, সে বোবা শয়তান।
- আলেম ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ নিষেধের প্রতি যত্নবান থাকে।
- ঐ ব্যক্তি সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হয় না, যে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা বজায়।
- সবচেয়ে ভালো মানুষ সে, যে অন্যের ভালো দেখে এবং নিজের গুণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।
- মানুষের আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শে থাকা উচিত। কারণ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার এটাই শুধু পথ।
- যে আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজের নফসের চাহিদার উপর প্রাধান্য দেয়, সেই উদার।
- যে আল্লাহর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, সেই নিঃস্বার্থ।

## হযরত খাজা মুহাম্মদ আসাদ হাশেমী রহ.-এর উপদেশ

- যে ব্যক্তি নিজের মালিকের শুকরিয়া আদায় করে না, সে অন্যের প্রতি কী কৃতজ্ঞতা দেখাবে?
- যে সৃষ্টির শুকরিয়া আদায় করলো, সে আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করলো।
- ধৈর্যধারণ করো, পরিশ্রম করো। সুদিন ফিরে আসবেই।
- অন্যের সেবায়ই সম্মান। দরিদ্রের লালনই সর্বোত্তম ইবাদত।
- স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে বিতাড়িত।
- নিজের মধ্যে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করো। কারণ, মনুষ্যত্বই মানুষের জন্য 'মি'রাজ'।

- নিজেকে দেশ ও জাতির জন্য উৎসর্গপ্রাণ করবে।
- অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষা করা, দরিদ্র ব্যক্তিকে সান্তনা দেয়া এবং জালিমের মুকাবিলা করা সর্বোত্তম জিহাদ।

## দার্শনিক প্লেটো-এর উপদেশ

- নির্বোধ ব্যক্তিই পার্থিব স্বাদে আনন্দিত হয় এবং বিপদে উদ্বিগ্ন হয়।
- বন্ধুর সাথে এমন আচরণ করবে, যেন বিচার-সালিশ পর্যন্ত না গড়ায় । আর শত্রুর প্রতি এমন আচরণ করবে, যেন বিচার সালিশ পর্যন্ত গড়ালেও জয় তোমারই হয়।
- মানুষের অহংকার এটাই যে, সে অহংকার করবে না। আর বড় হওয়া সত্বেও নিজেকে নগণ্য মনে করবে।
- যে ব্যক্তি নিজেকে আড়ালে রাখে, তুমি তার সঙ্গ অবলম্বন করো। আর যে ব্যক্তি জনপ্রিয়তা চায়, তুমি তার সঙ্গ পরিহার করো।
- মহানুভব রবের যাবতীয় দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে প্রজ্ঞা। আর জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি যার কথা ও কাজ দুটোই ঠিক থাকে।

## আল্লামা ড. ইকবাল রহ.-এর উপদেশ

- মুসলমানের একমাত্র আশ্রয়ের জায়গা কুরআনে হাকীম।
- কুরআন শুধু পাঠ করো না, তা বুঝার চেষ্টাও করো।
- রাসূলুল্লাহ-র ভালোবাসা যেমন দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনি দুনিয়া লাভের অন্যতম মাধ্যমও বটে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর ভালোবাসা ছাড়া মানুষ দীনও পায় না দুনিয়াও পায় না।
- ইলম যেভাবেই অর্জন করো না কেন, তা ইবাদতই হবে।
- ইসলামই আমাদের জন্মভূমি এবং আমাদের বংশপরিচয়, যেমন হযরত সালমান ফারসী রা. নিজের পরিচয় দিতেন 'সালমান ইবনে ইসলাম ইবনে ইসলাম' বলে।
- পৃথিবী একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, এখান থেকে সঠিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য আমাদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

## হযরত শায়েখ রহ.-এর উপদেশ

- মিথ্যা মনুষ্যত্বকে দূর্বল করে দেয়।
- পরনিন্দা সামাজিক ব্যধি ছড়িয়ে দেয় এবং পরিবেশ দূষিত করে।
- কারো মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। মানুষকে খুশি করা ইবাদত।
- মুসলমানের মর্যাদা এতোই উচু যে, আকাশের নক্ষত্রও ঈর্ষা করে।
- মুমিন ও আল্লাহ তাআলার মাঝে কোনো অন্তরায় থাকে না।
- আল্লাহর বান্দা কখনো নিজের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয় না।

- নিজের জীবন নিয়ে একটু ভাবো, ভুলগুলো সংশোধন করো। যেন সঠিক গন্তব্যে পৌঁছা সহজ হয়।
- নিজের জন্য যা তোমার পছন্দ, অন্যের জন্য ঠিক তাই পছন্দ করো।

## খাজা গোলাম মুহাম্মদ রহ.-এর উপদেশ

- কারো মনে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা উচিত।
- মানবসেবা অন্যান্য নফল ইবাদত থেকে শ্রেষ্ঠ।
- তাসবীহ্-তাহ্লীল থেকে মানবসেবাই উত্তম।
- ইস্তিগফার শুধু পাঠ করার জন্য নয়, বরং কাজে পরিণত করতে হয়। অর্থাৎ গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং এর পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা।
- আল্লাহর বান্দা আল্লাহর পথে লাঞ্ছনা বা তিরস্কারকে ভয় করেন না।
- বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে আন্তরের পবিত্রতা বৃদ্ধি করাকেই সব সময় প্রাধান্য দেওয়া উচিত।
- নামায ও সিয়াম আদায়ে মনোযোগী হতে হবে।

## মা

- মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত। (কানজুল উম্মাল)
- যদি আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি প্রত্যাশা করি, তবে অবশ্যই আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মা তৈরি করতে হবে। [স্যার সৈয়দ আহমাদ খান]
- কঠিন থেকে কঠিনতর হৃদয়কে মায়ের চোখের অশ্রু মোমে পরিণত করতে সক্ষম। [আল্লামা ইকবাল রহ.]
- আমাদের মা আমাদেরকে বেঁচে থাকা ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন শিক্ষা দিয়েছেন। [মাওলানা শওকত আলী]
- মায়ের ভালোবাসাই খাঁটি ভালোবাসা। [মাওলানা আলতাফ হুসাইন]
- যেই ঘরে শিক্ষিত ভালো মা রয়েছেন, সেই ঘর সভ্যতা ও মানবতার শিক্ষাকেন্দ্র। [ফ্রেডারিক]

## অন্যান্য

- মানুষের প্রকৃত মর্যাদা যাচাই করা যায় তার আমল দ্বারা।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু মানুষের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করাই নয়; বরং শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের মেধাকে সুসংগঠিত করা।
- সম্পদশালীরা ভাবে, 'দরিদ্রদের কোনো দুঃশ্চিন্তা থাকে না' এবং দরিদ্ররা ভাবে, 'ধনী লোকমাত্রই সুখী'। মূলত উভয়ই সমান বোকা।
- শিক্ষার শুরু তো মায়ের কোল থেকেই। ওই সময় মায়ের প্রতিটি শব্দই তার চরিত্র গঠনে প্রভাব ফেলে।

- ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার মানুষের সবচেয়ে বড় পুঁজি। আর মস্তিস্কে ধারণকৃত গ্রন্থাগার সবচেয়ে বড় নেয়ামত।
- সুখই সুস্থ্যতা। আর দুঃশ্চিন্তাই সকল রোগের আধার।
- আত্মবিশ্বাসই জীবনের অন্যতম চালিকাশক্তি।
- সব কাজে স্বনির্ভরতা অনেক বড় জিনিস। তাকে হাত ছাড়া করো না।
- যে কোনো কাজ করার পূর্বে চিন্তা করে নাও যে, তার পরিণতি কী হবে? এবং কাজটি কী ভাবে করা উচিত। তাহলে তার ফল ভালো হবে।
- কোনো কাজকেই সহজ ভাববে না। আবার এত কঠিনও মনে করবে না যে, সাহসের স্বল্পতায় পিছপা হতে হয়।
- যে বিষয়ে তোমার নিজেরই সন্দেহ, তার দাবী কখনো করবে না।
- বাহ্যিক সৌন্দর্য চর্চার পরিবর্তে জ্ঞান ও চরিত্রের মাধ্যমে অন্তরকে সুসজ্জিত করতে চেষ্টা করো।
- পানাহারে সব সময় ওই পন্থা অবলম্বন করো, যাতে জীবন চলে যায়।
- সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখবে। নয়তো দুশ্চিন্তা ও নিরাশা তোমাকে শেষ করে দেবে।
- তুমি যেখানেই থাকো না কেনো, মৃত্যু তোমার নিকট উপস্থিত হবেই। চাই তুমি মজবুত পাথরের বিল্ডিংয়েই অবস্থান করো না কেনো!
- নিজের ঘরের কথা বাইরে বলে বেড়িয়ো না। কারণ এতে লোকেরা তোমার অনুপস্থিতিতে তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে।
- পরিক্ষিত ব্যক্তিকে বারবার পরীক্ষা করো না।
- যদি নিজের ব্যক্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাও, তবে মানুষের দোষ ত্রুটি এড়িয়ে যাও।
- উপদেশ হলো সততা। আর তোষামদি নিকৃষ্ট ধোঁকা।
- মাঝে মাঝে কাঁদবে। কারণ এতে মনের ভার সামান্য হলেও হালকা হয়।
- পরাজয় বিজয়েরই অলংকার। জিততে হলে হেরে যাও।
- তিন আইনের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল থাকবে। এক. আল্লাহর আইন দুই. শরিয়তের আইন এবং তিন. রাষ্ট্রীয় আইন।
- যদি বাস্তবেই তোমার কোনো গুণ থাকে তবে বড়ত্ব প্রদর্শন করো না।
- তুমি তো আপন ভাইয়ের চোখে থাকা বালুকণা ঠিকই দেখতে পাও। কিন্তু তোমার নিজের চোখের বর্শা তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।
- কৃপন ব্যক্তি সেই ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো, যা শিকার দেখেও তা নিজে না খেয়ে অন্যের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করে।
- আনন্দ-বিষাদ উভয় অবস্থায়ই ধৈর্যধারণ করো। কারণ সব কিছুরই একটি সমাপ্তি আছে।

- পৃথিবী শয়তানের দোকান। তা থেকে কোনো কিছু নিও না। কারণ যদি তুমি শয়তানের দোকান থেকে কিছু নাও, তবে সে সেই জিনিসের পিছু পিছু তোমার নাগাল পেয়ে যাবে।
- পার্থিব বাসনা সে ব্যক্তিই বিসর্জন দিতে পারে, যার অন্তরে পরকালের চিন্তা রয়েছে।
- বারবার পরীক্ষার পরেই কাউকে মানুষ মনে করা হয়।
- জীবন মৃত্যু অপেক্ষা কঠিন। কারণ জীবনে মানুষকে অনেক দুর্দশা সহ্য করতে হয়।
- নিরাশা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং আল্লাহর আযাব।
- যে রোগের কারণ জানা আছে, তার চিকিৎসাও আছে।
- বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজকে অন্যের নিন্দা থেকে বাঁচিয়ে রাখে।
- মানুষের বুদ্ধিমত্তা বোঝা যায় তার কথা থেকে। আর প্রমাণিত হয় তার কাজ থেকে।
- প্রশংসার যোগ্য সেই ব্যক্তি, যে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নিজের ক্রোধকে সংবরণ করতে সক্ষম।
- অতি নীরবতা কিংবা অতি কথন কোনোটিই ভালো নয়।
- নিকৃষ্ট সেই, যার লজ্জা কম।
- সামান্য পানির ফোঁটা নিজের নিয়মতান্ত্রিকতা দ্বারা পাথরের গায়েও ছিদ্র তৈরি করতে পারে।
- অন্যের দোষ তালাশ করতে করতে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়ে যেয়ো না।
- সর্বোত্তম সেই ঘর, যে ঘরে এতিমকে সম্মান করা হয়।
- যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, সে ধ্বংস হয়।
- আত্মনির্ভরতা সফলতার সব চেয়ে বড় ভিত।
- এমন ইঙ্গিত করাও হারাম, যা কারো মনে কষ্ট দেয়।
- যে কাজ করলে লজ্জিত হতে হয়, তা পরিহার করো।
- বুদ্ধিমান সেই, যে জীবনকে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে।
- সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে নিজের জন্য নিজেই সুযোগ তৈরি করো।
- কুধারণা এমন বিষ, যা তরতাজা বৃক্ষকে ভস্ম করে দেয়।
- আত্মপরিচয় প্রকাশে মানুষের কথার চেয়ে স্বচ্ছ কোনো আয়না পৃথিবীতে নেই।
- পার্থিব জীবনের তুলনায় কবরের জীবন অনেক দীর্ঘ।
- নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকার নামই প্রকৃত পুরুষত্ব।
- সুঁই যেভাবে নিরাবরণ থেকে মানুষকে আবৃত করতে সাহায্য করে, তুমিও সেভাবে অন্যের কাজে আসো।
- নিম্ন শ্রেণির প্রতি সদয় হও এবং উচ্চ পদস্থদের প্রতি আদব বজায় রাখো।

- মিতব্যয়ী হওয়া জাতীয় দায়িত্ব।
- মুখ ফসকে যাওয়া পা ফসকে যাওয়ার চেয়ে বেশি বিপদজনক।
- জীবন শুধু সুখের নামই নয়, অধিক দুঃখ এবং অল্প সুখের নামই জীবন।
- কোনো মানুষের অশ্রু মুছে দেওয়া হাজারো মানুষের রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে উত্তম।
- নিয়মিত পরিশ্রম করা এবং ব্যর্থতায় অবিচল থাকাই সফলতার প্রমাণ।
- প্রতিটি কাজেরই নিজস্ব শিক্ষা রয়েছে।
- পরিশ্রমে শারিরীক সুস্থ্যতা, মানসিক স্বচ্ছতা, অন্তরের উদারতা এবং স্বচ্ছলতা লাভ হয়।
- চরিত্র মানুষের শারিরীক সৌন্দর্যের অভাবকে পূর্ণ করে দেয়।
- যখন তুমি হাসবে, তখন সমগ্র পৃথিবীই তোমার সাথে থাকবে। কিন্তু যখন তুমি কাঁদবে, তখন তোমাকে একাই কাঁদতে হবে।
- বড় হতে চাইলে প্রথমে ছোটো হও। কারণ ছোটো ছোটো ইট দ্বারাই বিশাল অট্টালিকা তৈরি হয়।
- অন্যের ওপর ভরসাকারীরা খুব কমই সফল হয়।
- কাউকে রাগের মাথায় বলা কথা ভুলে যেয়ো না।
- প্রকৃত অর্থে বিত্তশালী সেই, যে ঋণগ্রহণ করে না এবং কাউকে তোষামোদ করে না।
- দরিদ্রদের পরিকল্পনা খুব নীচ হয়।
- পরামর্শ নেওয়া ভালো। তবে চিন্তা ভাবনা ছাড়া সেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা খারাপ।
- জীবনে দু'টি বিষয় সর্বদা মনে রাখবে। রাগের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না এবং আনন্দিত অবস্থায় কোনো প্রতিশ্রুতি দেবে না।
- উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু সমস্যার সমাধান করা কঠিন।
- অতি দারিদ্র মানুষকে কুফরের নিকটবর্তী করে।
- ঘুমন্ত অবস্থায়ও মানুষ প্রতি মিনিটে ১৪ বার শ্বাস গ্রহণ করে।
- সূর্য চাঁদের তুলনায় ৪০০ গুণ বড়।
- ফলের মধ্যে সবচেয়ে কম ক্যালোরি খিরা বা শশায় থাকে।
- পুরো পৃথিবীতে সর্বমোট ৬ হাজারের অধিক ভাষা ব্যবহৃত হয়।
- মহিলার রক্তে পুরুষের তুলনায় রক্তকণিকা ২০ ভাগ কম হয়।
- পেঁচা নিজের মাথা আপন শরীরের সব স্থানে পৌঁছাতে পারে।
- পৃথিবীর সম্মান সম্পদে আর পরকালের সম্মান আমলে।
- মৃত্যুর স্মরণ অন্তরের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা।
- সচ্চরিত্র এমন গুণ, যার বিনাশ নেই।
- একটি মিথ্যা থেকে বহু মিথ্যার জন্ম হয়।
- যে ব্যক্তি বিপদকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে, সেই ভালো কাজ করতে পারে।

- যুদ্ধ করে বিজয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো নিরাপদ জয়।
- পূর্বের অভিজ্ঞতাই নতুন নির্মাণের ভিত হয়ে থাকে।
- ভরসার মধ্যেই খুশীর ঝিলিক বাসা বাঁধে।
- মৃত্যু তো সেই সোনার চাবি, যা চিরস্থায়ী মহলের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।
- দীনদার স্ত্রী সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ আসমানী উপহার।
- পার্থিব জীবনে ভালো স্ত্রী পুরুষের জন্য সর্ববৃহৎ নেয়ামত।
- বুদ্ধির সীমা থাকে, কিন্তু নির্বুদ্ধিতার সীমা নেই।
- সৎ ব্যক্তি নিজের অবস্থান নিজেই তৈরি করে নেয়।
- আস্তে কথা বলা, দৃষ্টি অবনত রাখা, মধ্য পন্থা অবলম্বন করা ঈমানের নিদর্শন
- নিজের বোঝা অন্যের কাঁধে তুলে দিয়ো না। চাই সেটা ছোট হোক বা বড়।
- পাপ সর্বাবস্থায় মানুষের মনকে অস্থিরতায় পূর্ণ করে রাখে।
- ভুল জায়গায় নিজের অর্থ বিত্ত ব্যায় করা অকৃতজ্ঞতা।
- আল্লাহর নির্দেশমতে নিজেকে পরিচালিত করার নামই বন্দেগী।
- জীবনের একটি লক্ষ্য ঠিক করে নাও। অতঃপর নিজের সর্বশক্তি তাতে নিয়োগ করো। অবশ্যই তুমি সফল হবে।
- যেখানে স্ত্রীলোক থাকে না, সেখানে রহমতের ফেরেশ্‌তা আসে না। (হযরত মূসা আ.)।
- নারী ও ভালোবাসা পরস্পর সম্পৃক্ত বিষয়।
- যদি নারীর মন চিরে দেখা হয় সেখানে ধৈর্য, সহনশীলতা ও কুরবানী ব্যতীত অন্য কিছুই পাবে না। (সংগৃহীত)
- পুরুষের জন্য নারী এমনই আবশ্যকীয় জিনিস, যেমন বেঁচে থাকার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস। (কনফিউশেস)
- নারী এমন বৃক্ষকাণ্ড, যা বাতাসে নত হয়। কিন্তু তীব্র ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে না। (এডওয়ার্ড মুর)
- পৃথিবীতে সর্বাধিক শক্তিশালী জিনিস হচ্ছে নারীর অশ্রু। (টম্‌স মুর)
- পুরুষ যদি চোখ হয়, তবে নারী তার দৃষ্টিশক্তি। পুরুষ যদি ফুল হয়, তবে নারী তার ঘ্রাণ। (সক্রেটিস)
- পরিশ্রমহীন জীবন বিপদ। আর বুদ্ধিহীন জীবন পশুত্ব।
- কতোই না সুন্দর সেই জীবন, যা বিদ্রোহ ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত।
- আত্মবিশ্বাস, স্বনির্ভরতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণই জীবনকে পরিপূর্ণ করে দেয়।
- মানুষকে সাহায্য করার নামই জীবন।
- আল্লাহ তাআলার সামনে অসহায়ত্ব প্রকাশের নামই জীবন।
- জীবনের যে জিনিসের একক মালিকানার দাবী আমি করতে পারি, সেটা

হলো আমল।

- জীবনের প্রতিটি সময়ে লক্ষ্য করলে এমন অসংখ্য ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে, যা খুবই শ্বাসরুদ্ধকর।
- জীবন একটি সুন্দর স্বপ্নের নাম, যার সমাপ্তি ঘটলে লজ্জা-অনুতাপ বৈ কিছুই জোটে না।
- যে তোমার সাথে অসদাচরণ করে, তুমি তার প্রতি সদাচার করো। আর যে তোমাকে কষ্ট দেয়, তাকে তুমি ক্ষমা করো। (হযরত আলী রা.)
- কোনো বিষয়ের তীব্র বাসনা শুধু ক্ষতিকরই নয়, বরং তা ধ্বংসের কারণও বটে। (হযরত হুসাইন রা.)
- দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি যেমন 'যাহেদ'। ঠিক তদ্রূপ তকদিরের উপর সন্তুষ্ট ব্যক্তিও 'যাহেদ'। (আবু আলী ইবনে সীনা রহ.)

## পানি দ্বারা চিকিৎসা

পানি যে আল্লাহ তাআলার বড় নেয়ামত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বেঁচে থাকার জন্য বাতাসের পর পানির প্রয়োজন সর্বাধিক। আল্লাহ তাআলা পানির মধ্যে জীবনীশক্তি রেখেছেন তা সবার জানা আছে। কিন্তু তার মধ্যে যে সুস্থতার গুণও রয়েছে, এ সম্পর্কে এক জাপানি ডাক্তারকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন। ওই ডাক্তার এই বিষয়ে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটি চায়না ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এবং এক ভদ্রলোক জনকল্যাণে তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। যে প্রবন্ধটি এখন উর্দুতে অনুবাদ করে জনসাধারণের উপকারার্থে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আমি নিজেই এই চিকিৎসার অনেক রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করেছি এবং পরিচিতজনদের মধ্যে অনেককে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীনভাবে সুস্থতা লাভ করেছেন বলে বলতে শুনেছি। এছাড়া সমাজে নিম্নবিত্ত মানুষের সংখ্যাই বেশী, যারা বিভিন্ন রোগের ব্যায়বহুল চিকিৎসা গ্রহণে অক্ষম এবং যারা অজ্ঞতার কারণে পানির নানান ব্যবহারে অক্ষম। আমি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি- তিনি যেন সকলকে তাঁর দেয়া মহান নেয়ামত পানির সঠিক ব্যবহার শেখান এবং তার দ্বারা সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

পানির মাধ্যমে চিকিৎসা সম্পর্কে জাপানী চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ভাষ্য ও লেখা নিম্নরূপ :

ক) অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা: ১) মাথা ব্যথা ২) উচ্চ রক্তচাপ ৩) রক্তশূন্যতা ৪) শরীর ফুলে যাওয়া ৫) ঝলসে যাওয়া ৬) পক্ষাঘাত ৭) রক্তবমি ৮) লিভারের টিবি ৯) মোটা হয়ে যাওয়া ১০) খর্বাকৃতি প্রভৃতি রোগে কাজ করে।

খ) মস্তিষ্কের সমস্যাজনিত মাথা ফোলা, মনোরোগে আক্রান্ত হওয়া, পাকস্থলীর অসুস্থতা, আমাশয়, কাঁচ বের হওয়া, অর্শরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

গ) চক্ষুরোগ: দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, চোখে রক্ত জমাট বাঁধা, স্পষ্ট না দেখা।

ঘ) মেয়েদের রোগ: ঋতুস্রাবে অনিয়ম হওয়া, মাসিক ছাড়া অন্য সময়েও রক্ত আসতে থাকা, জরায়ু ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার।

ঙ) গলায় কোনো সমস্যা হওয়া। যথা, গলা ফুলে যাওয়া, কফ জমা, হাঁচি আসতে থাকা।

পানির মতো সাধারণ জিনিস দ্বারা এতসব জটিল রোগের চিকিৎসা বাহ্যদৃষ্টিতে অবোধগম্য মনে হতে পারে। কিন্তু গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এটাই প্রতীয়মান, চিকিৎসার এ পদ্ধতি যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। এ পদ্ধতিতে চিকিৎসায় ফলও বেশ ভালো। বেশি বেশি পানি পানের মাধ্যমে মল-মূত্রের নালীতে শক্তির সঞ্চার হয়। যার ফলে রক্ত সঞ্চালন ও রক্ত উৎপাদনের

পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এটাকে হিমোগ্লোবিন বলা হয়। (হিমোগ্লোবিন মল-মূত্রের নালীর মাধ্যমে দেহের মূল খোরাকের জোগান দিয়ে থাকে)।

নতুন এই গবেষণাটি গত সাত বছর পূর্বে সেই জাপানী চিকিৎসকের গবেষণার রেজাল্ট হয়ে বেরিয়ে আসে মেডিকেল বোর্ডসভায়। এই নালীতে দুর্বলতা তৈরি হলে পরবর্তীতে পুরো দেহে দুর্বলতা ও অবসাদ ছড়িয়ে পড়ে। সৃষ্ট হতে থাকে নানাবিধ রোগ, এক পর্যায়ে এ রোগের চিকিৎসাই দুরূহ হয়ে ওঠে। মানুষের এই বৃহৎ শিরাটি সাধারণত তিন গজ দীর্ঘ হয়ে থাকে। এই শিরাটিই রক্তের খাবার সরবরাহ করে থাকে। যদি এই শিরাটি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে তবে সেটি খাদ্যকণিকায় সুস্থ রক্ত সঞ্চারিত করে এবং এই ভালো রক্তের সুবাদে সমস্ত রোগ দূর হয়ে যায়। (যদি রক্তের মধ্যেই সমস্যা থাকে সেখানে চিকিৎসা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে)। ভিন্ন শব্দে বললে, 'ওয়াটার থেরাপি' (জল-চিকিৎসা) এর সাহায্য নিয়ে আমরা সুস্থতার সাথে দীর্ঘ জীবন কাটাতে পারবো।

দীর্ঘকালীন অসুস্থতায় ভোগা এক ব্যক্তির আরোগ্যলাভের গল্প আপনাদের শোনাচ্ছি। বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে। তাঁকে দেখে বয়সের তুলনায় যথেষ্ট শক্ত-সামর্থ ও সুস্থ মনে হলো। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, আপনার কি কখনো কোনো রোগ হয়েছিলো? তিনি বললেন, দীর্ঘ সময় আমার কোনো রোগ হয়নি। হ্যাঁ, যখন আমি দু' বছরের শিশু ছিলাম তখন গ্যাস্ট্রাইটিস (পেটের রোগ) এর সমস্যা হয়েছিলো। টানা দশ বছর আমি শয্যাশায়ী ছিলাম। পাঁচ-পাঁচজন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চিকিৎসা চলে আমার অগণিত ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। কিন্তু ফলাফল শূন্য। সে সময় আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা হয়। সে আমাকে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলে। 'প্রতিদিন ভোরে উঠেই সাথে সাথে (মুখ না ধুয়ে) খালি পেটে সোয়া কেজি পানি পান করার কথা বলে।

তার কথা অনুযায়ী আমি চিকিৎসাটি গ্রহণ করতে শুরু করি। প্রথম দিন এক ঘণ্টায় আমার তিন বার প্রস্রাব হয়। নাশতা করতে গিয়ে আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, দীর্ঘ দশ বছর পর আমি খাবারের স্বাদ পাচ্ছি। তিন মাসে আমার ওজন দশ কিলো বৃদ্ধি পায়। আমি চিন্তা করে দেখলাম, পানিতে জীবাণু থাকতে পারে। তাই রাতেই পানি গরম করে ফুটিয়ে রেখে দিতাম আর ভোরে পান করতাম। এভাবে আমার স্বাস্থ্য অনেক সুস্থ হয়ে উঠলো।

আমার ছেলেদের Menengites-এর সমস্যা ছিলো। সেটাও এ চিকিৎসাতেই ভালো হয়ে গেলো। আমার স্ত্রীর হার্টের দুর্বলতা ছিলো, স্বাস্থ্যহীনতার সমস্যা ছিলো। দশ দিনের মধ্যেই সে রোগ সেরে গেলো, তিন মাসের মধ্যে দশ কিলো ওজন বৃদ্ধি পেলো।

এই চিকিৎসাটির ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় জানা প্রয়োজন।

অনেক সময় এতো পানি একসাথে পান করা কষ্টকর মনে হতে পারে। তখন ধৈর্য ধরে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে হাঁটবে, দৌড়াবে কিংবা সাইকেল চালাবে। পানি পানের পর বিশ মিনিট শারীরিক ব্যায়াম করা খুব ভালো। যদি বিছানা থেকে ওঠা কষ্টকর মনে হয় তাহলে বিছানাতেই পানি পান করে জোরে জোরে শ্বাস নেবে অথবা হাত দিয়ে পেটে চাপ দেবে। যাতে পানি অন্ত্রনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিন চার দিনেই অভ্যাস হয়ে যাবে এবং একবারই পেশাব হবে।

গ্যাস্ট্রিক (পেটের সমস্যা) এর জন্য এক সপ্তাহ, হাই ব্লাড প্রেসারের জন্য এক মাস, পাকস্থলীর সমস্যা থাকলে তিন দিন, হজমের সমস্যা হলে এক দিন, ডায়াবেটিসের জন্য এক সপ্তাহ, ফুসফুসে টিবি হলে এক সপ্তাহ। প্রতিদিন তিনবার এই চিকিৎসা গ্রহণ করলে ইনশাআল্লাহ পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভ হবে। খাবার সময় অভ্যাস অনুযায়ী পানি পান করবে। খাওয়ার দু' ঘণ্টা পর অতিরিক্ত পানি পান করবে না এবং শোয়ার আগে কোনো কিছু খাওয়া উচিত নয়। বিশেষত ফলমূল তো অবশ্যই পরিহার করা অত্যাবশ্যকীয়। (ফিলিপাইন ইউনিভার্সিটি: মসিলা)- পানির চিকিৎসা।

## নবীজী সা.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হুযুর সা.-এর জীবন-চরিত লেখার ব্যাপারে আমাকে মাওলানা যুবায়রুল হাসান কান্দলভী সাহেব বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশনাতেই আমার নিম্নোক্ত লেখায় হাত দেওয়া। আল্লাহ কবুল করুন

## মহৎপ্রাণ এক সত্তার মহত্ত্বের রহস্য

মহান পথপ্রদর্শক নবী কারীম সা.-এর ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্যের অন্যতম রহস্য হলো, তাঁর কথা ও কাজের মাঝে কখনো কোনো পার্থক্য ছিলো না। নবীজী নিজে তার শিক্ষার সর্বোত্তম উপমা ছিলেন। যা অন্যদের বলতেন, তা আগে নিজে করে দেখাতেন। বরং সেই আমলের সর্বোত্তম উপমা উপস্থাপন করতেন।

নবীজীর অন্তঃপ্রাণ সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সা.-এর আমলের অনুকরণ করা সত্বেও আনুগত্যের হক আদায় করতে পারতেন না। কথা ও কাজের এমন অতুলনীয় মিল ছিলো যে, নবী সা.-এর সান্নিধ্য যে যত বেশি লাভ করতো, সে ততটাই মুগ্ধ হয়ে যেতো।

নবীজী মানুষের মাঝেই জন্ম নিয়েছিলেন, মানুষের মতই জন্ম নিয়েছিলেন। মানব সম্প্রদায়ের মাঝেই তিনি তার সমস্ত জীবনের দিন রাত অতিবাহিত করেছেন। তিনি পিতাও ছিলেন, সন্তানও ছিলেন, ভাইও ছিলেন, স্বামীও ছিলেন, বন্ধুও ছিলেন, শশুরও ছিলেন, জামাতাও ছিলেন এবং বয়সে ছোটও ছিলেন আবার বড়ও ছিলেন। ভ্রমণসঙ্গীও ছিলেন আবার ব্যবসার অংশীদারও ছিলেন। মনিব ছিলেন আবার খুব পরিশ্রমীও ছিলেন। কিন্তু নবী

সা. এর ব্যক্তিত্ব এত পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিলো যে, কোনো চক্ষু কখনো তার কোনো কাজের দুর্বল দিক খুঁজে পায় নি। পারস্পরিক বন্ধন, লেনদেন থেকে শুরু করে বংশীয়-সামাজিক প্রতিটি অঙ্গনে নানাভাবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী আমাদের সামনে এসেছে। যখনই যেদিকেই দৃষ্টি পড়েছে হৃদয় তখনই এ পঙতি আবৃত্তি করেছে- তোমার কীর্তি হৃদয়ের আঁচল টানতে থাকে, আমাদের প্রাণ যে সেখানেই নিবেদিত।

## ব্যক্তিত্বের প্রভাব

আরাশ গোত্রের এক ব্যক্তি মক্কায় উট বিক্রি করতে এলো। আবু জেহেল তার সবগুলো উট ক্রয় করে নিলো। কিন্তু উট-গ্রহণের পর দাম পরিশোধ করতে টাল বাহানা শুরু করলো। আরাশ গোত্রের সেই উট বিক্রেতা মক্কায় বেশ কয়েকদিন অবস্থান করলো। কিন্তু আবু জেহেল প্রতিনিয়ত নানা কৌশল অবলম্বন করতে লাগলো। যখন আরাশী লোকটি ক্লান্ত হয়ে পড়লো, তখন একদিন সে হারাম শরীফে গিয়ে কোরাইশ সর্দারদের কাছে নিজের বিপদের কথা শুনিয়ে বললো, তোমরা আমার পাওনা আবু জেহেলের কাছ থেকে আদায় করে দাও। আমি ভিনদেশী এক দরিদ্র মুসাফির। আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাহায্য করো।

ঘটনা চক্রে যে সময় ওই ব্যাক্তি কোরাইশ সর্দারদের কাছে নালিশ করছিলো, আল্লাহর রাসুল সা. মসজিদে হারামের এক কোণে বসা ছিলেন। কোরাইশ সর্দাররা কৌতুক করে লোকটিকে বললো, দেখো ভাই, এই বিষয়ে আমরা কিছুই করতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, হারামে কাবার ওই কোণে যে ব্যাক্তিটি বসে আছেন, তিনি অনেক প্রভাবশালী। তার কাছে যাও এবং তোমার অভিযোগ পেশ করো। তিনি অবশ্যই তোমার টাকা আদায় করে দেবেন।

কুরাইশ সর্দাররা একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসছিলো আর বলছিলো, এবার মজা হবে। তারা আবু জেহেলের সাথে নবীজীকে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে মজা নিতে চাচ্ছিলো।

নিপীড়িত আরাশি নবীজী সা.-এর কাছে নিজের অভিযোগ নিয়ে গেলো। তাকে সমস্ত ঘটনা শোনালো এবং অনুরোধ করলো, যেন আবু জেহেল থেকে তার উট বিক্রির পুরো মূল্য আদায় করে দেন। এই জালিম বেশ ক'দিন যাবৎ টাল বাহানা করছে। আমি এখানে বড় অসহায়, বন্ধুহীন। এখানে কেউ নেই যে, আমাকে সহায়তা করবে।

আল্লাহর রাসুল সা. তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আরাশী লোকটিকে সাথে নিয়ে সরাসরি আবু জেহেলের বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে আবু জেহেল জিজ্ঞাসা করলো, কে?

নবীজী সা. উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ

আবু জেহেল অস্থির হয়ে বের হয়ে এলো। নবীজীকে দেখে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। নবীজী সা. গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এই আরাশী ব্যক্তির উট কি তুমি ক্রয় করেছ? এই মুহূর্তে এই ব্যক্তিকে তার মূল্য পরিশোধ করে দাও।

আবু জেহেল নিঃশব্দে সোজা ঘর থেকে মূল্য নিয়ে এসে বিনা বাক্যব্যায়ে আরাশীকে দিয়ে দিলো।

কোরাইশ সর্দাররা আরাশীকে নবীজীর কাছে পাঠিয়ে এক লোককে তার পেছনে পাঠিয়েছিলো। যেন পুরো ঘটনা তাদের কাছে এসে বলতে পারে। ঐ লোকটি পুরো ঘটনা কোরাইশ সর্দারদের এসে শোনালো।

সে বললো, আমি আজ বিস্ময়কর ঘটনা দেখলাম, যা এর আগে কখনো দেখি নি। আবু জেহেল ঘর থেকে বের হলো। মুহাম্মদকে দেখে তার চেহারার রং পাল্টে গেল। যখন মুহাম্মদ তাকে বললেন, আরাশীর মূল্য পরিশোধ করতে, তখন মনে হচ্ছিলো, যেন আবু জেহেলের দেহে প্রাণই নেই। সে চুপচাপ ঘর থেকে উটের মূল নিয়ে এসে লোকটিকে দিয়ে দিলো।

ঘটনার বিবরণ শুনে কোরাইশ সর্দাররা অবাকও হলো, রাগান্বিতও হলো। তারা আবু জেহেলকে তিরস্কার করে বললো, তুমি তো কাপুরুষ দেখছি।

আবু জেহেল বললো, দুর্ভাগার দল, আমার সাথে কী ঘটেছে, তা তোমাদের আর কী বলবো। যখন মুহাম্মদ দরজায় কড়া নাড়লেন আর আমি তার কণ্ঠ শুনলাম, তখন তার ভয়ে ও প্রভাবে আমার অবস্থা নিস্প্রাণ মূর্তির মত হয়ে গেল। অনিচ্ছাকৃতভাবে আমি কাঁপতে শুরু করলাম। আর সেইসব কাজ করলাম, যার বর্ণনা ওই ব্যক্তি তোমাদের শুনিয়েছে।

## দয়ালু মনিব

আট বছরের এক নিস্পাপ শিশুকে তার মা সু'দা নিজের সাথে তার বাবার বাড়ি নিয়ে গেলেন। সু'দা ত্বাই গোত্রের একটি শাখা বনী মা'আন গোত্রের ছেলে ছা'লাবার মেয়ে ছিলেন। যার বিয়ে কালব গোত্রের এক ব্যক্তি হারেছা ইবনে শুরাহবীলের সঙ্গে হয়েছিলো। সু'দা যখন নিজের প্রিয় সন্তানকে বাবার বাড়ি নিয়ে যায়, তখন সেখানে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো।

কায়েন ইবনে যুবায়ের গোত্রের লোকেরা সেই বসতিতে আক্রমণ করে বসলো এবং সব লুটপাট করে নিয়ে গেল। ওই জালেমরা যাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে সু'দার প্রিয় সন্তান যায়েদও ছিল।

সে সময় ত্বায়েফের নিকটবর্তী উকাযে মেলা চলছিলো। উকাযে অনেক বড় মেলা হতো, যেখানে সব ধরণের জিনিস বিক্রি হতো। নিষ্ঠুর লোকগুলো যায়েদকে বিক্রি করার জন্য সেই মেলায় নিয়ে গেল এবং তাদের কাছ থেকে হাকিম ইবনে হিযাম শিশুটিকে ক্রয় করে নিলেন।

হাকিম ইবনে হিযাম হযরত খাদিজা রা.-এর ভাতিজা ছিলেন। শিশুটিকে হাকিম ইবনে হিযামের খুব পছন্দ হলো। তিনি বাচ্চাটিকে নিয়ে গিয়ে ফুফুর হাতে তুলে দিলেন।

কিছু কাল পর খাদিজা রা.-এর বিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর সাথে হয়ে গেলো। হযরত খাদিরা রা.-এর ঘরে অবস্থানের সময় এই আদুরে শিশুটির আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন নবীজীর খুব পছন্দ হলো। তখন রাসূল সা. হযরত খাদিজা রা.-এর কাছ থেকে বাচ্চাটিকে চেয়ে নিলেন।

হযরত যায়েদ রা.-এর ভাগ্য খুলে গেলো। তিনি নবীজীর খেদমতে চলে এলেন। সে সময় যায়েদের বয়স ছিলো মাত্র পনেরো। তার কয়েক বছর পরই নবী সা. নবুওয়ত লাভ করলেন। হযরত যায়েদ নবীজীর কাছে রইলেন। আর রাসুল সা.-এর খেদমত ও দাসত্ব তার জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এলো। ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে তাকে 'মাহবুবে রাসুল সা.' নামে স্মরণ করা হয়। নবীজীর সহচর্যে এবং তার অধীনে থেকে সবচেয়ে বড় যে সৌভাগ্য যায়েদের লাভ হয়েছিলো তা হলো, আল্লাহ তাআলা কুরআনে তার আলোচনা করেছেন। সহস্র বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ তার নাম তিলাওয়াত করে আসছে। আর যত দিন পর্যন্ত পৃথিবী থাকবে, এভাবে না জানি কত মানুষ তিলাওয়াত করতে থাকবে। সুরা আহযাবে যায়েদের বিবরণ এভাবে এসেছে,

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها

যায়েদ যখন তাঁর থেকে নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করলেন তখন আমি তার (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক) এর সঙ্গে আপনার বিয়ে সম্পাদন করে দিলাম।

এভাবে দিন অতিবাহিত হতে লাগলো এবং যায়েদ রা. রাসূল সা.-এর খেদমতের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। ওদিকে তাঁর পিতামাতা জানতে পারলেন, তাদের কলিজার টুকরা মক্কায় আছে। যায়দের পিতা হারেছা এবং চাচা কা'ব তার সন্ধানে মক্কায় এলেন। খুঁজতে খুঁজতে তারা নবীজীর দরবারে এসে উপস্থিত হলেন।

**হারেছা :** আপনি বড়ই সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত মানুষ। আমাদের সন্তানকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। সন্তান বিচ্ছেদের কষ্টে তার মায়ের বড়ই করুণ দশা। আর আমাদের মনেও শান্তি নেই। অনুগ্রহ করে তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন, তার বিনিময় হিসাবে আপনি যা চাইবেন তাই দিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

**কা'ব :** আপনার মহৎ চরিত্রের কাছে আমাদের পূর্ণ প্রত্যাশা রয়েছে, আপনি অবশ্যই আমাদের সন্তানকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন। তার বিনিময় হিসেবে আপনি যা চাইবেন, নির্দ্বিধায় আমরা আপনার খেদমতে তা পেশ করবো।

**হযরত মুহাম্মাদ সা. :** নিঃসন্দেহে কলিজার টুকরোর বিচ্ছেদ তোমাদের জন্য বড়ই পীড়াদায়ক হয়েছে। আর তার মাও নিশ্চই তার চিন্তায় অস্থির হয়ে

আছেন। আমি যায়েদকে ডেকে নিয়ে আসছি। আমার পক্ষ থেকে অবশ্যই অনুমতি আছে। যদি সে তোমাদের সাথে যেতে পছন্দ করে তাহলে আমি তাঁর বিনিময়ে কোনো প্রকার মুক্তিপণ নেবো না। তোমাদের সন্তান, তোমরা তাঁকে অবশ্যই নিয়ে যেতে পারো। তবে হ্যাঁ, যদি সে আমার কাছে থাকতে পছন্দ করে, তাহলে আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কেউ আমার কাছে থাকতে চাইবে, আর আমি শুধু শুধু তাকে তাড়িয়ে দেব।

রাসূল সা.-এর এ কথা শুনে কা'ব ও হারেছা বেশ খুশি হলো। তারা বলতে লাগলো, আপনি তো ইনসাফের চেয়েও অধিক মহৎ কথা বলেছেন। অবশ্যই! আপনি যায়েদকে ডাকুন। তার কাছ থেকেই তার অভিপ্রায় জানা যাক।

যায়েদের পিতা ও চাচা ভাবছিলেন, এতদিন পরে দেখা হচ্ছে, তাদের দেখা মাত্রই যায়েদ তাদের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাপ-চাচাকে জড়িয়ে অঝোর ধারায় কাঁদবে। এতদিন পর দাসত্বের শিকলমুক্ত হয়ে নিজের পিতা-মাতা, গোত্রের লোকজনের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়বে।

যায়েদকে ডাকা হলো। নবীজী যায়েদকে জিজ্ঞাসা করলেন, এঁদের দু'জনকে তুমি চিনতে পারছো? যায়েদ উত্তর দিলেন, জ্বি হ্যাঁ। ইনি আমার পিতা, ইনি আমার চাচা।

নবীজী ঃ 'আচ্ছা, তুমি তাহলে এঁদেরকেও চেনো, আর আমার বিষয়েও জানো। আমার পক্ষ থেকে তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তুমি চাইলে এঁদের সাথে যেতে পারো আর চাইলে আমার সঙ্গে থাকতেও পারো।'

কিন্তু এটা কোনো সাধারণ মানুষের কথা ছিলো না। আল্লাহর রাসুল সা. এর কথা ছিলো। যায়েদ এমন মহান ব্যক্তির খেদমতে ছিলেন, যার দাসত্বের বিপরীতে সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহীও তুচ্ছ। যায়েদ এক পলক পিতা ও চাচার দিকে তাকালেন। আবার নবীজীর দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্তসুলভ ভঙ্গিতে বললেন,

'আমি তো আপনাকে ছেড়ে এখন কোথাও যেতে পারি না।'

হারিছা ও কা'বের জন্য এ কথা ছিলো প্রত্যাশার বাইরে। ছেলের কথা শুনে তারা বললেন, যায়েদ! আমরা কি তোমার বাপ-চাচা নই? তুমি কি স্বাধীনতার বিপরীতে দাসত্বের জীবনকে পছন্দ করো? নিজের ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে অন্যের কাছে থাকতে চাও?

যায়দের অন্তর কাঁপছিলো। তার চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বইতে শুরু করল। তিনি বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন,

আব্বাজান! অবশ্যই আপনি আমার পিতা, নিঃসন্দেহে তিনি আমার চাচা। সন্দেহ নেই, আমার মাও যে আমাকে স্মরণ করছেন। কিন্তু আপনাদের বোঝাতে পারবো না, আমি এখানে কী দেখেছি। আমার মনিবের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট আমি দেখেছি, এখন আমি যত দিন বেঁচে থাকবো, তার গোলামীই

আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। এখন আমি পৃথিবীর কাউকেই আমার দয়ালু মনিব নবী সা. এর উপর প্রাধান্য দিতে পারবো না।

যায়েদের এই উত্তর শুনে পিতা হারেছা এবং চাচা কা'ব বললেন, যায়েদ! বাস্তবতা যদি এমনই হয় তাহলে আমরা সানন্দে তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি এখানেই থাকো। তোমার খুশিই আমাদের সব কিছু।

নবী কারীম সা. যায়েদকে তৎক্ষণাৎ আযাদ করে দিলেন। তাকে নিয়ে কাবার পাশে গিয়ে কোরাইশদের জনসমাগমের সামনে ঘোষণা করলেন, আপনারা সাক্ষী থাকুন! আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে। আমি তাকে আমার পালক ছেলে হিসেবে ঘোষণা করছি।

হারেছা ও কা'ব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছিলেন, তারা এ কি দেখছেন! এ কোনো স্বপ্ন নয় তো? নাকি সত্যি সত্যি পৃথিবীর বুকে আসমান থেকে কোনো মহৎপ্রাণ ফেরেশতা নেমে এসেছেন!

সেদিনের পর থেকে কুরাইশের লোকেরা যায়েদকে 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ' বলে ডাকতো। ইনি তো সেই যায়েদ, নবীজীর নবুওয়তের পর সর্বপ্রথম যিনি ঈমান এনেছিলেন।

তাঁর সাথে নবীজীর বন্ধন কতো গভীর ছিলো একটি ঘটনা থেকে তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তখন হযরত উমর রা.-এর খেলাফতকাল চলছে। তিনি হযরত উসামা (যায়েদ রা.-এর পুত্র) এর ভাতা নির্ধারণ করলেন তিন হাজার। যেখানে তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এর ভাতা আড়াই হাজার। যখন আব্দুল্লাহ অভিযোগ করলেন, তখন উমর রা. বললেন, আব্দুল্লাহ! উসামার পিতা তোমার পিতার তুলনায় নবীজীর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। আর উসামা নিজেও তোমার থেকে নবীজীর কাছে অধিক প্রিয় ছিলো।

## এতিমের সহায়

মদীনার অলি গলিতে আনন্দের ঢল নেমেছে। শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ সব বয়সী মানুষ পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে সুগন্ধি লাগিয়ে ঈদগাহের দিকে যাচ্ছে। মদীনার পথ-ঘাট তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। মদিনার একটি রাস্তা দিয়ে নবী কারীম সা.ও ঈদের নামায পড়ার জন্য ঈদগাহের দিকে একটু দ্রুত চলছিলেন। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে নবী সা. দাঁড়িয়ে গেলেন। মদিনার কিছু বাচ্চা খুব নিশ্চিন্তে সুন্দর পোশাক পরে আনন্দ চিত্তে খেলা করছে। তাদের থেকে কিছু দূরে একটি শিশু অত্যন্ত মলিন চেহারা নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে আছে। তার গায়ে জীর্ণ-শীর্ণ পুরনো পোশাক। খেলতে থাকা ছেলেগুলোর দিকে সে অত্যন্ত আক্ষেপ নিয়ে তাকিয়ে ছিলো।

আল্লাহর রাসুল সা. ওই বিপদগ্রস্থ ছেলেটির কাছে গেলেন। তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ছেলে! তুমি খেলছো না যে? তুমি

দেখছি কাপড়ও পাল্টাও নি? তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

ছেলেটি এক পলক তাকিয়ে মাথা নিচু করে ফেললো। সহানুভূতি ও ভালোবাসার পরশ পেয়ে সে চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলো না। অশ্রু ঝরতে লাগলো। কিন্তু সে কান্না সংবরণের চেষ্টা করে উত্তর দিলো, কোনো সমস্যা নেই। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আনন্দ আর খেলা কি আমার ভাগ্যে আছে? আমাকে তো কষ্ট পাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথা বলে ছেলেটি অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো।

ছেলেটিকে কাঁদতে দেখে করুণার আধার হযরত মুহাম্মদ সা.-এর অন্তর বিগলিত হলো। চোখ থেকেও অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং বললেন, বাবা! তোমার কিসের এত দুঃখ? তোমার উপর কী এমন বিপদ এসে পড়লো? তুমি এত বিষণ্ন কেন?

ছেলেটি বললো, আপনি আমার বিপদের কথা শুনে কী করবেন? আমি একটি এতিম ছেলে। আর আমার মা...

কান্নার দমকে ছেলেটির কথা জড়িয়ে গেলো। সে তার কথা শেষ করতে পারলো না।

আল্লাহর রাসুল সা. বালকটিকে নিজের আরও কাছে টেনে নিলেন এবং আদর করে বললেন, বাবা! তোমার বাবা মা কবে ইন্তেকাল করেছেন? আর তুমি কোথায় থাকো?

ছেলেটি বললো, আমার বাবা এক যুদ্ধে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছেন। আর আমার মা আল্লাহর রহমতে জীবিত আছেন। কিন্তু তিনি আবার বিবাহ করেছেন। এবং আমার বাবার রেখে যাওয়া আসবাবপত্র নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছেন। প্রথমে আমিও আনন্দচিত্তে মায়ের সাথে নতুন সংসারে গিয়েছিলাম। কিছুদিন সেখানে ছিলামও কিন্তু আমার সৎ বাবা আমার উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তিনি আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। এখন আমার কোনো ঘর নেই। আমাকে আশ্রয় দেওয়ার কেউ নেই। আমাকে নিয়ে ভাববার কেউ নেই। আমার এখন আর কেউ নেই।

ছেলেটির বাক রুদ্ধ হয়ে এলো। আমার মাও কিছু করতে পারে না। আমার প্রতি তার অনেক ভালোবাসা ছিলো কিন্তু তিনিও এখন অপারগ। এখন তিনি অন্যের অধিনে। কিছুই করার সাধ্য তার নেই। তিনি এখন আর কিছুই করতে পারবেন না।

ছেলেটির কথা শুনে এবং তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে দয়ার সাগর নবী সা.-এর চোখেও পানি চলে এলো। নবী সা. কিছু সময় দাঁড়িয়ে কাঁদলেন। আর ছেলেটির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর অত্যন্ত আদরমাখা কণ্ঠে ছেলেটিকে বললেন, বাবা! তুমি কি

এটা পছন্দ করবে যে, মুহাম্মদ সা. তোমার পিতা, আয়েশা তোমার মা, ফাতেমা তোমার বোন এবং হাসান হোসাইন তোমার ভাই হোক। নবীজী এবং ফাতেমার নাম শুনে ছেলেটি চমকে উঠলো। অপলক নয়নে শ্রদ্ধার সাথে রাসুল সা.-এর নুরানী চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার অত্যন্ত আদবের সাথে দৃষ্টি নামিয়ে নিলো এবং কিছুক্ষণ নীরব থেকে অত্যন্ত নম্র ও আদবের সাথে বললো, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। প্রথমে আমি খুবই উদাসীনতার সাথে আপনার কথার উত্তর দিয়েছি।

'ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে' নবীজী সা. তাকে সান্তনা দিলেন। হে আল্লাহর রাসুল! আপনার উপর আমার পিতা সহস্রবার উৎসর্গ হোন। হযরত আয়েশা রা.-এর মত উত্তম মা, হযরত ফাতেমা রা.-এর মত ভালো বোন, হাসান হোসাইনের মত উত্তম ভাই পাওয়া আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমি নবী সা.-এর পরিবারকে নিজের পরিবার হিসেবে পাচ্ছি। আমার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে আছে? হে আল্লাহর রাসুল আমি মন প্রাণ দিয়ে আপনার খেদমত করবো। কখনো আপনাকে একটু কষ্টও দেবো না। এগুলো বলতে বলতে ছেলেটির চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বইতে লাগলো।

এতিমদের অভিভাবক নবী সা. বালকদের হাত ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং হযরত আয়েশা রা.-কে বললেন, আল্লাহ ঈদের এই খুশির দিনে তোমাকে একটি সন্তান দান করেছেন। এই নাও, তাকে ভালো করে গোসল করে কাপড় পরিয়ে দাও। হযরত আয়েশা রা. এর চেহারা আনন্দে ভরে উঠলো।

এই ছেলেটি শেষ দিন পর্যন্ত নবীজীর খেদমতে ছিলো। অবশেষে নবী সা.-এর ইন্তেকালের সময় চলে এলো এবং তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। রাসুলের ইন্তেকালের পর কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটির বাকরুদ্ধ হয়ে এলো। সে বলতে লাগলো, আজ আমি সত্যি সত্যিই এতিম হয়ে গেলাম।

ছেলেটির অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর রা.-এর মন বিগলিত হলো। তিনি ছেলেটির মাথায় স্নেহের হাত রেখে বললেন, তুমি আজকে থেকে আমাদের সাথে থাকবে। তারপর থেকে বালকটি হযরত আবু বকর রা.-এর তত্ত্বাধানেই ছিলো।

(নাওয়াদিরাত: শিহাবুদ্দীন কাইলুভী)

## এতিমের সমব্যথী

চিন্তায় অস্থির হয়ে একটি ছেলে নবীজী সা.-এর দরবারে ফরিয়াদ নিয়ে উপস্থিত হলো। বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি জোর করে আমার খেজুরের বাগান দখল করে নিয়েছে। আমাকে কিছুই দিচ্ছে না।'

ছেলেটির অভিযোগ শুনে নবীজী সা. তৎক্ষণাৎ ওই ব্যাক্তিকে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি উপস্থিত হলো। এবং দু'জনেই নবী সা.-এর দরবারে নিজেদের অভিযোগ পেশ করলো। আল্লাহর রাসুল দু'জনের কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং পুরো বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তিনি নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন।

নবীজীর সিদ্ধান্ত এতিমের বিপক্ষে ছিলো। সিদ্ধান্ত নিজের বিপক্ষে দেখে এতিম ছেলেটি কাঁদতে লাগলো। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারলো না। এতিম ছেলেটিকে কাঁদতে দেখে নবী সা.-এর অন্তর কেঁদে উঠলো। নবীজীও কাঁদতে লাগলেন। তখন নবী সা. ওই লোকটিকে বললেন, ভাই, বাস্তবে বাগানটির ব্যাপারে রায় তো তোমার পক্ষেই হয়েছে এবং বাগানটি তোমারই। কিন্তু কতই না ভালো হতো যদি তুমি নিজের বাগানটি এতিম ছেলেটিকে দিয়ে দিতে। আল্লাহ তোমাকে এর পরিবর্তে জান্নাতে চিরস্থায়ী বাগান দান করবেন।

সে সময় নবী কারীম সা.-এর দরবারে আবুদ্দাহদাহ রা. উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকটিকে চুপচাপ এক দিকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমি যদি তোমাকে এই বাগানের পরিবর্তে আমার অমুক বাগানটি তোমাকে দিয়ে দেই, তাহলে কি তুমি ওই বাগানটি আমাকে দিয়ে দেবে?

লোকটি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলো। কারণ আবুদ্দাহদাহ রা.-এর বাগানটি তার বাগানের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান ছিলো। তখন আবুদ্দাহদাহ রা. নবীজীর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল আমি আপনার কাছে একটি কথা জানতে চাই।

নবীজী হাসতে লাগলেন এবং বললেন, আবুদ্দাহদাহ! জিজ্ঞেস করো কী জানতে চাও।

আবুদ্দাহদাহ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি যে বাগানটি ওই এতিম বালকটিকে দিতে চাচ্ছেন, যদি ওই বাগানটি আমি তাকে দিয়ে দিই তবে কি আমিও এর বিনিময়ে জান্নাতে বাগান পাবো?'

আবুদ্দাহদাহ রা.-এর কথা শুনে নবীজীর চেহারা আনন্দে ঝলমল করে উঠলো। মুচকি হেসে রাসূল সা. বিশ্বাসের সাথে জোরালো গলায় বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই পাবে।

আবুদ্দাহদাহ রা.-এর আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার এক বাগানের বিনিময়ে সেই বাগানটি ওই লোকের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি বাগানটি এতিম ছেলেটিকে দিয়ে দিচ্ছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন! আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এই কাজ করেছি।

আবুদ্দাহদাহ রা.-এর কথা শুনে এতিম ছেলেটির বিষণ্ন মুখ খুশীতে ভরে উঠলো এবং এতিমে সমব্যথী নবী কারীম সা.-এর চেহারাও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আবুদ্দাহদাহ রা. জান্নাতের বাগান ক্রয় করে খুশিতে আত্মহারা হয়ে নবী সা.-এর দরবার থেকে বাড়ি ফিরে গেলেন।

## অনন্য ব্যক্তিত্ব

হযরত হাসান রা. একদিন পিতা হযরত আলী রা.-এর কাছে জানতে চাইলেন- আব্বাজান! সাথি সঙ্গীদের সাথে রাসূল সা.-এর আচরণ কেমন ছিলো?

হযরত আলী রা. আবেগময় কণ্ঠে এভাবে বর্ণনা দিতে শুরু করলেন, 'নবীজী সবার সাথে হাসি মুখে মিলিত হতেন। তিনি না কঠোর স্বভাবের ছিলেন, না রাগী ছিলেন, না কখনো অনর্থক কথা তার মুখ থেকে বের হতো। না কখনো কারো দোষ খুঁজতেন, আর না কারো প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করতেন।

তিনটি বিষয় থেকে নবীজী সব সময় নিজেকে বাঁচিয়ে চলতেন,

১. গর্ব ও অহংকার।

২. সম্পদ সঞ্চয় করা।

৩. অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা।

এমনিভাবে তিনটি বিষয় থেকে নবী সা. অন্যদেরকে বাঁচিয়ে রাখতেন,

১. কখনো কারো নিন্দা করা বা কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা।

২. কাউকে দোষারোপ করা বা লজ্জা দেওয়া।

৩. কারো গোপন দোষ অনুসন্ধান করা।

তিনি শুধু ওই কাজই করতেন, যা দ্বারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সওয়াব ও প্রতিদানের আশা করা যায়।

কোনো মজলিসে নবীজী সা. যখন কথা বলতেন, তখন মানুষ এমনভাবে তন্ময় হয়ে তার কথা শুনতো, যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। নবীজী যতক্ষণ কথা বলতেন, সবাই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতো। নবীজীর কথার মাঝে কেউ কথা বলতো না। যখন তিনি কথা শেষ করতেন, মানুষ তখন নিজের কথা বলতো। যদি কখনো কোনো অপরিচিত মুর্খ ব্যক্তি নবীজী সা.-কে কোনো প্রশ্ন করে অথবা কোনো কথা বলতে গিয়ে বেয়াদবী করতো, তখন নবী সা. ধৈর্য ধারণ করতেন। কখনো রাগান্বিত হতেন না। যদি কেউ লোকটির উপর রেগে যেতো এবং তাকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করতো, তাহলে নবী সা. তা পছন্দ করতেন না এবং বলতেন, যখন কোনো বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি তোমার সামনে নিজের বিপদের কথা বলবে, তখন তাকে হতাশ করো না। যতটুকু সম্ভব তার প্রয়োজন পূরণ করবে আর না হয় নম্রভাবে ধৈর্য ও শোকর করতে বলবে।

তিনি কারো প্রশংসায় খুশি হতেন না। হ্যাঁ, যদি কারো কথার উত্তরে নবী সা. এর পক্ষ থেকে কোনো কথা বলা হতো অথবা কোনো ভুল বা অতিরঞ্জিত কথার সংশোধনের জন্য নবী সা.-এর সম্পর্কে কোনো ভালো কথা বলে দেওয়া হতো, তখন তিনি তা পছন্দ করতেন।

কারো কথা থামিয়ে দিয়ে তিনি কখনো নিজের কথা বলতেন না। তিনি ব্যক্তিত্ব, ইলম ও ধৈর্যের পাহাড় ছিলেন।

নিজের জন্য নবীজী সা. না কখনো রাগান্বিত হতেন, আর না কখনো ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ দীনের ব্যাপারে কোনো প্রকার ঔদ্ধত্য দেখাতো কিংবা কারো কোনো অধিকার হরণ করতো, তাহলে নবীজীর রাগ ততক্ষণ পর্যন্ত শান্ত হতো না যতক্ষণ সেটির ক্ষতিপূরণ না করা হতো।

চারটি বিষয়ে নবীজী অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাতে কোনো ছাড় দিতেন না।

১. ভালো কাজের ক্ষেত্রে।

২. মন্দ কাজ ত্যাগ করার ক্ষেত্রে।

৩. উম্মতের সফলতা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার ক্ষেত্রে।

৪. এবং সেই সব কাজ করার ক্ষেত্রে যা করলে উম্মতের ইহকাল ও পরকাল সুন্দর হয়।

## অনন্য গুরুজন

হযরত আনাস রা.-এর বয়স তখন মাত্র দশ বছর। তিনি তখন একটি অবুঝ বালক। তাঁর মা হযরত উম্মে সুলাইম রা. তাঁকে নবীজী সা.-এর খেদমতে রেখে এলেন। এই অবুঝ বয়স থেকেই হযরত আনাস রা. নবীজীর সেবায় ছিলেন। তিনি সর্বাবস্থায় নবীজীর খেদমত আঞ্জাম দিতেন।

মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাজে তার ভুলভ্রান্তিও হয়ে যেতো। মাঝে-মধ্যে উল্টোটাও করে ফেলতেন। সেই ছোট্ট বয়সে অবুঝের মতো অনেক কিছুই তাঁর দ্বারা হয়ে যেতো। কিন্তু বিস্ময়কর কথা হলো, দশ বছরের সেই দীর্ঘ সময়ে নবীজীর কাছ থেকে কখনো কোনো কঠোর কথা শোনা তো দূরের কথা, সামান্যতম 'উফ' শব্দটিও তিনি শোনেন নি।

হযরত আনাস রা. বলেন, 'আমি ধারাবাহিকভাবে দশ বছর নবীজীর সেবায় কাটিয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ে কখনো এমনটি দেখিনি যে, নবী কারীম সা. মজলিসের লোকজনের দিকে পা ছড়িয়ে বসেছেন। এও দেখিনি, কেউ নবীজীর সঙ্গে মুসাফাহা করেছেন আর তিনি আগে হাত সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি হাত মিলিয়ে রাখতেন, যতক্ষণ না অপর মুসাফাহাকারী নিজে থেকে হাত না সরাতো।

আমি এও দেখিনি, কোনো ব্যক্তি নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য সাথে

এসে দাঁড়িয়েছে আর নবীজী আগে সরে গেছেন। তিনি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না সে ব্যক্তি নিজেই সরে যেতো।

আমি যখনই যে কাজ করেছি, সঠিক-ভুল যাই হোক না কেনো- নবীজী সা. কখনো এভাবে বলেন নি যে, 'তুমি এমনটি কেনো করেছ বা এমনটি কেনো করো নি'?

আমি বরাবরই সুগন্ধিপ্রিয়। আমি রিতিমত সুগন্ধি ব্যবহার করি এবং আজ পর্যন্ত অনেক ভালো ভালো সুগন্ধি ব্যবহার করেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি নবীজী সা.-এর শরীরের সুঘ্রাণ থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো সুঘ্রাণ পাইনি।

আর আজ পর্যন্ত কখনো এটাও দেখি নি যে, কোনো ব্যক্তি একান্তে কথা বলার জন্য রাসূল কারীম সা.-এর কানের কাছে এসেছে- আর তার মাথা সরিয়ে নেওয়ার আগে আল্লাহর রাসুল সা. কখনো নিজের মাথা সরিয়ে নিয়েছেন।

## আদর্শ স্বামী

**এক.** একদিন হযরত আয়েশা রা. রেগে গেলেন। রাগের কারণ ঘরের কোনো বিষয় নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মনমালিন্য। তাঁর রাগ খানিক বেড়ে গেয়েছিলো।

রাসূলে আকরাম সা. ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কথা বলছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রা.-এর কণ্ঠ কিছুটা উঁচু হয়ে গেলো। নবীজী সা. হেসে হেসে বোঝাচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে তখন হযরত আয়েশা রা.-এর পিতা হযরত আবু বকর রা. চলে এলেন।

স্বামী-স্ত্রীর মনমালিন্য দেখে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একদিকে আল্লাহর রাসূল সা., যাঁর সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। অপর দিকে কলিজার টুকরো আয়েশা।

পিতার সামনেও হযরত আয়েশার কণ্ঠ পূর্বের মতোই উঁচু ছিলো। হযরত আবু বকর রা. আর সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, তুমি নবীজীর সামনে এভাবে উচ্চকণ্ঠে কথা বলছো! তোমার সাহস এত বেড়ে গেছে!!'

তিনি খুব রেগে গেলেন। মেয়েকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু মাঝখানে জগতকুলের সর্দার মুহাম্মাদ সা. দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত আয়েশা রা. রণেভঙ্গ দিয়ে বসে পড়লেন। রাগ করে হযরত আবু বকর রা. থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রিয়তমা আয়েশা রা.-এর কোমল হৃদয়ে আঘাত লেগেছে, আল্লাহর রাসূল সা. আর কতক্ষণ সহ্য করে থাকতে পারেন। কিছুক্ষণ তিনি উদাস হয়ে রইলেন। তারপর নবীজী আয়েশা রা.-এর কাছে গিয়ে মায়াভরা কণ্ঠে বললেন, আয়েশা! দেখলে কী ভাবে বাঁচিয়ে দিলাম!

আয়েশা রা. হেসে নবীজীকে জড়িয়ে ধরলেন। 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কী যেন হয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।' নবীজীর চেহারাও আনন্দে ভরে উঠলো।

কিছুদিন পর আবু বকর রা. মেয়েকে দেখতে আবার এলেন। সেদিন দেখলেন, আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর ঘরটি আনন্দে মেতে আছে। কেনোই বা হবে না? তারাই তো উম্মতের আদর্শ। হযরত আবু বকর রা. ভালোবাসাপূর্ণ এই অনন্য পরিবেশ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। নবীজীকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেদিন আপনাদের মনোমালিন্যে শরীক ছিলাম, আজ আমাকে ভালোবাসায় শরীক করে নিন। নবী কারীম সা. বললেন, অবশ্যই।

**দুই.** আয়েশা রা. তখন নয় বছরের। তিনি বান্ধবীদের সাথে দোলনায় দোল খাচ্ছিলেন। মা উম্মে রুমান রা. তাকে ডেকে পাঠালেন। দিনটি ছিল হযরত আয়েশা রা.-এর স্বামীর ঘরে যাওয়ার জন্য বিদায় নেওয়ার দিন। বেলা পড়ার সাথে সাথে নবীজীও চলে এলেন। নয় বছরের বালিকা আয়েশা রা. মা-বাবার ঘর থেকে বিদায় নিয়ে নববী গৃহে বধূ হয়ে এলেন। তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্না এক মেয়ের নয় বছরের কিশোরী বয়স, তিনি এমন একজনের জীবনসঙ্গিনী হলেন, যার কাঁধে সমগ্র জগতের নেতৃত্বের দায়িত্ব, যিনি অত্যন্ত সহনশীল ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব, বয়সও পড়ে গিয়েছিলো, কত পার্থক্য ছিলো উভয়ের স্বভাব, চিন্তার পরিধি এবং আকাঙ্খার ক্ষেত্রে। কিন্তু আদর্শ স্বামী যেভাবে নয় বছরের বালিকার কোমল আবেগ ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, যেভাবে তার ছেলেমানুষির সাথে মানিয়ে নিয়েছেন এবং নিজের আদর্শ জীবনের অন্যান্য অংশের সাথে বৈবাহিক জীবনকেও দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন, তা শুধু নবীজীর পক্ষেই সম্ভব ছিলো।

এক ঈদের দিনে মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু হাবশী অস্ত্রচালনার খেলা দেখাচ্ছিলো। আয়েশা রা. বিষয়টি জানতে পারলেন। স্বভাবতই কিশোরী মন কৌতূহলী হয়ে উঠলো। নবী কারীম সা. নিজের পেছনে আয়েশা রা.-কে নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন। উম্মুল মু'মিনীন নবীজীর কাঁধে থুতনী রেখে হাবশীদের খেলা দেখতে থাকলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খেলা চলছিলো। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন- 'আয়েশা! মন ভরেনি এখনো?' আয়েশা অকপটে বলে দিলেন, জ্বি না!। আল্লাহর রাসূল সা. অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকা সত্ত্বেও প্রিয়তমাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে হযরত আয়েশা রা.-ই ক্লান্ত হয়ে চলে গেলেন।

কখনো নববধূর কাছে অল্প বয়সী বাচ্চারা পুতুল খেলতে আসতো। একদিন এমন মুহূর্তে নবীজী উপস্থিত হলেন। বাচ্চারা ঘোড়ার পুতুল বানিয়ে খেলছিলো। পুতুলগুলোর মধ্যে এমন একটি ঘোড়া ছিলো, সেটির ডান ও বা

দিকে দু'টি ডানা লাগানো ছিলো।

নবীজী সা. জিজ্ঞাসা করলেন, আয়েশা! এটি কী?

আয়েশা রা. উত্তর দিলেন, এটা ঘোড়া।

নবীজী সা. জিজ্ঞেস করলেন, ঘোড়ার আবার ডানা হয় নাকি!

আয়েশা রা. তাৎক্ষণিক উত্তর দিলেন, হযরত সুলাইমান আ.-এর ঘোড়ায় তো ডানা ছিলো!

রাসূল সা. উত্তর শুনে হেসে ফেললেন।

তিন. বিয়ের কয়েক দিন পর কোনো এক সফরে নবী সা. আয়েশার সাথে মদীনা নগরীর বাইরে ছিলেন। নবীজী সা. আয়েশা রা.-কে বললেন, আয়েশা! এসো, দৌড় প্রতিযোগিতা করবে?

'জ্বী, কেনো নয়?' সাথে সাথে বললেন আয়েশা রা.। দৌড় প্রতিযোগিতা হলো। আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর তখন অল্প বয়স। হালকা শরীর। দৌড়ে তিনিই এগিয়ে গেলেন। নবীজী পেছনে পড়ে গেলেন। সেদিন আয়েশা রা.-এর আনন্দ দেখার মতো ছিলো।

অনেক দিন পর আবার এমন সুযোগ এলো। নবীজী আবার আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলেন। বয়সের সাথে সাথে সেই সময় আয়েশা রা.-এর শরীর আগের চেয়ে ভারী হয়ে গিয়েছিল। দৌড়ে এবার নবীজীর জয় হলো। তিনি আয়েশাকে বললেন, 'প্রথম দৌড়ের কথা মনে আছে? এটা তার বদলা!'

চার. নবীজী সফরে আছেন। সঙ্গে উম্মাহাতুল মু'মিনীনও রয়েছেন। পথে কোনো কারণে হযরত সাফিইয়া রা.-এর উট অসুস্থ হয়ে পড়লো। তিনি পেছনে পড়ে গেলেন। নবীজী তাঁর কাছে গেলেন। কাছে এসে দেখলেন, সাফিয়্যা অঝোর ধারায় কাঁদছেন। নবীজী কারণ জেনে সান্তনা দিলেন। কিন্তু নবীজী যতই সান্তনা দিচ্ছিলেন, উম্মুল মু'মিনীনের কান্না ততই বেড়ে চলছিলো। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি কাঁদছিলেন আর নবীজী নিজের চাদর দিয়ে তাঁর চোখ মুছে দিচ্ছিলেন।

পাঁচ. হযরত সাফিয়্যা রা.-কে নবীজী অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর কোমল হৃদয়ে যেন কোনো আঘাত না লাগে সে বিষয়ে সব সময় খুব সতর্ক থাকতেন। একবার নবীজী তাঁর কামরায় গিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। নবীজীকে দেখে তাঁর কান্না বেড়ে গেলো।

নবীজী বড় মায়াময় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, সাফিয়্যা! কী হয়েছে তোমার?

উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে সাফিয়্যার কান্না বেড়েই চললো।

নবীজী আবার জিজ্ঞেস করলেন, বলো কী হয়েছে!

সাফিয়্যা বললেন, আয়েশা আর যয়নব বলে, আমরা দু'জন নবীর সকল স্ত্রী থেকে শ্রেষ্ঠ। আমরা সম্পর্কে নবীজীর বোনও হই'। এতটুকু বলে হযরত

সাফিইয়া আবার কাঁদতে লাগলেন।

রাসুল সা. বললেন, আরে! এটা কী এমন কথা! তুমি বলে দিতে পারলে না, হযরত হারুন আমার বাবা, মূসা আ. আমার চাচা আর মুহাম্মাদ সা. আমার স্বামী। তোমরা আমার চেয়ে সেরা কিভাবে হও?

নবীজীর এ কথা শুনে হযরত সাফিয়্যা রা.-এর মন প্রফুল্ল হয়ে উঠলো আর নবীজীর হৃদয় তা দেখে ভরে গেলো।

**ছয়.** একবার নবীজী কোথাও সফর করছিলেন। সঙ্গে উম্মাহাতুল মু'মিনীনও ছিলেন। উটে আরোহণ করে কাফেলা এগিয়ে চলছিলো। উট চালকরা খুব দ্রুত চালাচ্ছিলো। হঠাৎ নবীজী সেদিকে খেয়াল করে চালকদের উদ্দেশে বললেন, একটু খেয়াল করো! সাথে কোমলপ্রাণ নারীরা আছে।

নারীদের প্রতি নবীজী কত লক্ষ্য রাখতেন! তাদের প্রতি নবীজীর মনে কত বেশি ভালোবাসা ছিলো! সেই অনুভূতিকে কত মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় তিনি প্রকাশ করলেন। আল্লাহর কসম! এর চেয়ে সুন্দরভাবে নারীদের কোমলতা বোঝানো সম্ভব নয়।

**সাত.** উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা রা. পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার বহু দিন পর একবার তাঁর বোন হালা নবীজীর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। সালাম দিয়ে ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন তিনি। হালা রা.-এর কণ্ঠস্বরের সাথে খাদিজা রা.-এর কণ্ঠস্বরের খুব মিল ছিলো। নবী সা.-এর কানে এই পরিচিত কণ্ঠ পৌঁছার সাথে সাথে খাদিজা রা.-এর স্মৃতি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। নবীজী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ, হালা! বলো।

আয়েশা রা. নবীজীর এই অবস্থা লক্ষ্য করলেন। তাঁর খুবই ঈর্ষা হলো। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন এক বৃদ্ধার কথা স্মরণ করছেন যে মৃত্যু বরণ করেছে। আল্লাহ আপনাকে তাঁর তুলনায় বহুগুণ ভালো ও যুবতী স্ত্রী দান করেছেন।

নবীজী আয়েশা রা.-এর কথার কোনো উত্তর দিলেন না। হযরত খাদিজা রা.-এর স্মৃতির কথা চিন্তা করে নবীজীর মনে তখন অন্য এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো।

## স্নেহশীল পিতা

**এক.** হযরত যয়নব রা. ছিলেন নবীজী সা.-এর বড় মেয়ে। অল্প বয়সেই আবুল আস ইবনে রাবীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। সম্পর্কে আবুল আস হযরত যয়নব রা.-এর খালাতো ভাই হতেন। হযরত খাদিজা রা.-এর বোন হযরত হালা রা.-এর সন্তান ছিলেন আবুল আস।

যয়নব রা. বাবা-মায়ের খুব আদরের সন্তান ছিলেন। বিয়ের সময় তাঁকে খাদিজা রা. অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিলেন।

সেগুলোর মধ্যে খাদিজা রা.-এর লাল পাথরের দামী ইয়েমেনী হারটিও ছিলো।

মক্কী জীবনে তের বছর দাওয়াতের কাজ করার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ এলো। নবীজী সা. হিজরত করলেন। যয়নব রা. তখনো মক্কায় শ্বশুর বাড়িতেই রয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে যখন বদরের যুদ্ধ হলো, সে যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে তার স্বামী আবুল আসও ছিলো। বদরের ময়দানে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. অনেক মুশরিককে বন্দী করেছিলেন।। তাদের মধ্যে নবীজীর জামাতা আবুল আসও ছিলো।

মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ার পর বন্দিদের আত্মীয় স্বজন তাদের জন্য মুক্তিপণ হিসেবে বিভিন্ন জিনিসপত্র পাঠালো। হযরত যয়নব রা. নিজের স্বামীর বন্দিত্বের খবর পেয়ে খুব অস্থির হয়ে গেলেন। তিনি মুক্তিপণ হিসেবে নিজের মায়ের দেওয়া সেই হারটি তার দেবর ওমর ইবনে রাবীর মাধ্যমে মদিনায় পাঠালেন। মুক্তিপণের জিনিসপত্র যখন নবীজীর সামনে পেশ করা হলো, সেগুলোর মধ্যে হযরত খাদিজা রা.-এর সেই হারের উপর দৃষ্টি পড়লে তার মন ভরাক্রান্ত হয়ে উঠলো। একদিকে কন্যার স্নেহে মন উতলা হলো আবার খাদিজার কথাও তার মনে পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ নবীজী সা. চুপ হয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এই হারটি মুহাম্মাদের কন্যা যয়নবের। তাঁর মা তাঁকে বিয়ের সময় উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিলেন। আমি কী ভাবে বলি, আবুল আসকে তোমরা মুক্তিপণ ছাড়া ছেড়ে দাও! কিন্তু আমার মানসিক অবস্থা তোমরা বুঝতে পারছো। এখন তোমরাই ভেবে চিন্তে বের করো, আবুল আস-এর মুক্তিপণ কী হতে পারে। সম্ভব হলে এই হার যয়নবকে ফিরিয়ে দাও, আবুল আসকেও মুক্তি দিয়ে দাও।'

সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শে বসলেন। কোনো ভাবেই এটা সমীচীন মনে হচ্ছিলো না যে আবুল আসকে ফিদিয়া ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হবে। একজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন আচরণ করা ইসলামী চিন্তাধারা অনুযায়ী খুব গুরুতর ছিলো। সবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, আবুল আসকে মুক্তিপণ ছাড়া মুক্তি দেওয়া যাবে না। অতএব তার মুক্তির শর্ত হলো, সে মক্কায় পৌঁছেই নবীজীর কন্যা যয়নব রা.-কে মদিনায় পাঠিয়ে দেবে। আবুল আস খুশি মনেই এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলো। নবীজীকে এই সিদ্ধান্ত জানানো হলে নবীজীর চেহারা মুবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নবীজী সা. বললেন, আবুল আসের সাথে যায়েদ ইবনে হারেছাকেও পাঠিয়ে দাও। মক্কার অদূরে ইয়াজুহ নামক প্রান্তরে যায়েদ অপেক্ষা করবে। সেখানে আবুল আস যয়নবকে পৌঁছে দেবে। যায়েদ ও আবুল আস উভয়েই রওনা হলেন। ইয়াজুহ প্রান্তরে যায়েদ অপেক্ষায় রইলেন। ওয়াদা অনুযায়ী মক্কায় পৌঁছে আবুল আস যয়নব রা.-কে পৌঁছিয়ে দিলেন।

স্ত্রীকে তো পাঠিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু স্ত্রী ছাড়া আবুল আসের দিনরাত অন্ধকার হয়ে উঠলো। মনোকষ্টে তিনি পেরেশান হয়ে উঠলেন। একবার শামের সফরে গিয়েছিলেন। স্ত্রীর স্মরণে অস্থির আবুল আস তখন এই কবিতা গুনগুন করে আবৃত্তি করছিলেন—

'আমি 'আরা' অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলাম, যয়নবের স্মৃতি আমাকে তাড়িত করলো। অমনিই মুখ দিয়ে এই প্রার্থনা বেরিয়ে এলো- হে আল্লাহ! সে লোককে ভালো ও খুশি রাখুন যে হারাম শরীফে অবস্থান গ্রহণ করেছে, আর আমীন (নবীজী সা.) এর কন্যাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। স্বামী সেই সব স্মৃতি স্মরণ করছে যা সে ভালো জানতো।'

আবুল আস যখন তার ব্যবসায়িক কাফেলার সাথে ফিরছিলেন, নবীজী সা. তাদের পেছনে একশত সত্তরজনের বাহিনী পাঠালেন। তারা আয়স নামক স্থানে ব্যবসায়িক কাফেলাকে পাকড়াও করলো। মুশরিকরা বন্দী হলো। তাদের সমস্ত জিনিসপত্র আটক করা হলো। তবে ইসলামী সৈনিকরা নবী সা.-এর জামাতা আবুল আসকে কিছু বললো না।

আবুল আস মক্কার পরিবর্তে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। মদীনায় পৌঁছে যয়নব রা.-এর ঘর খুঁজে বের করলেন। তাঁর কাছে নিজের নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। তখন মসজিদে নববীতে ফজরের জামাত চলছিলো। নামাযরত লোকজন নারীকণ্ঠে আওয়াজ শুনতে পেলো 'আমি আবুল আসকে নিরাপত্তা দিয়েছি।'

নামায শেষে নবীজী সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোনো আওয়াজ শুনেছো? কী আশ্চর্য! মুসলমানদের দুর্বলরা শত্রুদের নিরাপত্তা দান করছে।'

নবীজী সা. ঘরে পৌঁছলে প্রিয় সন্তান স্নেহশীল পিতার কাছে এসে বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবুল আসের কাফেলা থেকে যে সব জিনিসপত্র আটক করা হয়েছে, সেগুলো কি ফেরত দেওয়া সম্ভব?'। কন্যার আবেদন শুনে পিতার মন সিক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু তিনি চুপ রইলেন। কিছুক্ষণ পর সাহাবীদের কাছে এ বার্তা পাঠালেন যে, 'আবুল আস আমার আদরের কন্যার জামাতা। যয়নবের কামনা হলো, আবুল আসের পণ্যসামগ্রী ফেরত দেওয়া হোক। তোমাদের এটা করতেই হবে- এমনটি আমি বলছি না। কিন্তু তোমরা জানো যয়নবের খুশিই আমার খুশি। যদি তোমরা আবুল আসের প্রতি দয়া করো, তাহলে আমি খুশি হবো।'

রাসুল সা. এর এই কথা শুনে সবাই এক বাক্যে বললো, 'আপনার ওপর আমরা উৎসর্গিত ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবকিছু ফেরত পাঠাতে আমারা প্রস্তুত।'

নবী কারীম সা. কন্যার কাছে এসে বললেন, দেখো বেটি! আবুল আসের সব জিনিসপত্র ফেরত পাওয়া যাবে। তুমি আবুল আসের সমাদরে কোনো ত্রুটি করো না।' নবীজী পয়গম্বরের দৃষ্টি দিয়ে ততদূর দেখছিলেন যতদূর অন্যদের দৃষ্টি পৌঁছা সম্ভব ছিলো না।

আবুল আস সব মালপত্র নিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওনা করলেন। কিন্তু এইবার তিনি বারবার মুখ ফিরিয়ে মদীনার দিকে দেখছিলেন। তার পা ভারী হয়ে আসছিলো। তার হৃদয় অনেকটাই বদলে গিয়েছিলো। নবীজীর অসীম দয়া ও অনুগ্রহ তার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। আবুল আস মক্কায় পৌঁছলেন। যার যার জিনিস তাদের কাছে পৌঁছে দিলেন। অভিজ্ঞ ও আমানতদার ব্যবসায়ী হিসেবে মক্কায় আবুল আসের বিশেষ খ্যাতি ছিলো। সবার সমস্ত পাওনা মেটানোর পর তিনি ঘোষণা করলেন- 'আমার কাছে মক্কার কারো কিছু পাওনা থাকলে আদায় করে নাও' সবাই বললো, 'আপনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত মানুষ।'

এবার আবুল আসের হৃদয়ের কথা মুখে উঠে এলো। তিনি বললেন, 'এবার মদীনা থেকে ফিরতে মন চাচ্ছিলো না। কিন্তু এই চিন্তা করে ফিরেছি, যাতে তোমরা কেউ এমনটা মনে না করো যে, আমি তোমাদের জিনিসপত্র আত্মসাৎ করেছি। আমি যখন তোমাদের সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি, আল্লাহ এই বোঝা আমার কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি ঘোষণা করছি-

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ.

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল।'

সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে আবুল আস রা. ইসলামের সৌভাগ্যে ধন্য হয়ে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। নবীজী তাঁকে মুক্তি দেওয়ার সময় নববী দৃষ্টিতে যা দেখে নিয়েছিলেন, তা বাস্তবে রূপ নিলো। আবুল আসের ঈমান আনার সংবাদে পুরো মদীনা নগরীতে আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো।

**দুই.** মদীনায় হযরত ফাতিমা রা.-এর ঘর নবীজী সা.-এর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ছিলো। একদিন নবীজী সা. মেয়েকে দেখতে সেখানে গেলেন। বাপ-বেটির মধ্যে কথা হচ্ছিলো। স্নেহশীল পিতা কন্যাকে বললেন- 'কলিজার টুকরো মা! তুমি বড় দূরে থাকো। আমার খুব ইচ্ছা হয় তোমাকে নিজের কাছে নিয়ে যাই।'

স্নেহশীল বাবার কাছাকাছি থাকার কথা শুনে মেয়ের মন অস্থির হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'হারেছ ইবনে নোমানের বেশ ক'টি ঘর আছে। একটা তো আপনার অনেক কাছেই। আপনি যদি তাঁকে বলেন, সে কখনোই দিতে অস্বীকার করবে না।' নবীজী সা. বললেন, 'কিন্তু মা! এ কথা আমি তাকে কী ভাবে বলি? এ কথা বলতে তো আমার ভালো লাগবে না। যাক! আল্লাহই কোনো ব্যবস্থা করে দেবেন!।' নবী কারীম সা. মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে বিদায় নিলেন।

হারেছা রা. কিভাবে যেন জানলেন, নবীজী মেয়েকে কাছে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। তিনি নিজ থেকেই নববী দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন -'ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমি শুনেছি, আপনি ফাতিমাকে নিজের কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাচ্ছেন।' হারেছার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে রাসূল সা. চুপ রইলেন। হারেছা রা. বলে চললেন-'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জান মাল সব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর কোরবান হোক! আপনি জানেন, আপনার কাছাকাছি আমার বেশ ক'টি ঘর রয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী রইলেন, আমার যে জিনিসই আপনার পছন্দ হয় সেটি আমার পরিবর্তে আপনার কাছে থাকা আমার অনেক বেশী প্রিয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার যে ঘরই আপনার পছন্দ হয়, আমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। আমার খুব ভালো লাগবে যদি সেই ঘরে আপনি ফাতিমাকে এনে রাখেন।

রাসুল সা. হারেছাকে দোয়া দিয়ে বললেন, তুমি যা বলেছো সত্যিই বলেছো। তারপর স্নেহের কন্যা ফাতিমাকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন।

**তিন.** রহমাতুল্লিল আলামীন সা.-এর সবচে ছোট পুত্র মদীনার শহরতলীতে আবু ইউসুফ নামে এক লোহার ব্যবসায়ীর ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছিলো। নবীজী অধিকাংশ সময় পায়ে হেঁটেই সেখানে চলে যেতেন। আবু ইউসুফের লোহার কারবার। স্বভাবতই ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। নবীজী পরিচ্ছন্ন স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও পুত্রের টানে সেখানে গিয়ে বসে থাকতেন। ওই ধোঁয়ার মধ্যেই আদরের সন্তানকে কোলে নিয়ে আদর করতেন। সন্তানের গাল ও মুখে এমনভাবে নিজের নাক মোবারক মেশাতেন যেন ঘ্রাণ নিচ্ছেন। এভাবে আদর করে মদীনায় ফিরে যেতেন।

একবার নবী সা. আবু ইউসুফের ঘরে এসে দেখলেন, প্রিয় সন্তানের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। নবীজীর সাথে তখন আনাস ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফও ছিলেন। নবীজী কলিজার টুকরো সন্তানকে কোলে নিলেন। তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. এ দৃশ্য দেখে আল্লাহর রাসূল সা.-কে প্রশ্ন করলেন- 'আপনিও কাঁদছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ!' রাসুল সা. উত্তর দিলেন -'এ অশ্রুকণা রহমতের নিদর্শন।' বলছিলেন আর টপটপ করে তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিলো।

নবীজির চোখের দৃষ্টি পুত্র ইবরাহীম (নবীজীর পুত্র) এর দিকে ছিলো। স্নেহশীল পিতার মন অত্যন্ত ভরাক্রান্ত ছিলো। নবীজী বলছিলেন, 'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে, হৃদয় আহত হয়। কিন্তু মুখে আমরা সেই কথাই বলবো যা শুনতে আমাদের প্রতিপালক পছন্দ করেন। ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

**চার.** রাসুল সা.-এর অভ্যাস ছিলো, যখনই কোনো সফর থেকে ফিরতেন, মসজিদে গিয়ে দু' রাকআত নামাজ পড়ে ফাতিমার বাসায় যেতেন। আর কোথাও সফরে যাওয়ার সময়েও সবার শেষে ফাতিমা রা.-এর কাছ থেকে বিদায় নিতেন।

মেয়ের সাথে বাবার এমন গভীর ভালোবাসা ছিলো যে, নবীজীর কাফন-দাফনের পর সাহাবায়ে কেরাম যখন ফাতিমা রা.-কে সান্ত্বনা দিতে তাঁর কাছে এলেন তখন ফাতিমা রা. হযরত আনাস রা. কে বললেন, তুমিও কী ভাবে পারলে মাটির নিচে নবীজী সা.-কে রেখে আসতে! বলতে বলতে তিনি অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন। তারপর বরকতময় রওযায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তার চোখ দিয়ে লোনা অশ্রু ঝরছিলো। তিনি কবরের কিছু মাটি উঠিয়ে চোখে লাগালেন। তারপর এই কবিতা আবৃত্তি করলেন.

'যে ব্যক্তি হুযুর সা.-এর রওযার মাটির ঘ্রাণ শুঁকবে, তার উচিত জীবনভর আর কোনো সুঘ্রাণ না নেওয়া। আমার ওপর যে মসিবত এসছে, যদি এই মসিবত দিনের ওপর আসতো তো দিন রাত হয়ে যেতো।'

## কোমলহৃদয় নানা

**এক.** আল্লাহর রাসূল সা. মসজিদে খুতবা প্রদান করছিলেন। দেখলেন, হাসান-হুসাইন মসজিদের আঙ্গিনায় খুব দ্রুত পা ফেলে নানার দিকে ছুটে আসছে। হাসান-হুসাইনের পা এলোমেলো চলছে; প্রতিটি পদক্ষেপে আশংকা হচ্ছে হঠাৎ পড়ে যেতে পারে। ছোট শিশু দু'টিকে লাল পোশাকে খুব সুন্দর লাগছিলো। তাদের ছোট ছোট পা গুলো কাঁপছিলো আর তারা নানাজানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। আল্লাহর রাসূল সা. কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি মিম্বর থেকে নেমে নাতিদ্বয়কে কোলে তুলে নিলেন। তারপর মিম্বরে উঠে সামনে বসালেন। তারপর তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন, আল্লাহ কতই না সত্য কথা বলেছেন,إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ "সত্যই তোমাদের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।"

**দুই.** হযরত হাসান রা. কিংবা হযরত হুসাইন রা. স্নেহশীল নানার পায়ে পা রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবীজী সা. তার দুই হাত ধরে রেখে বলছিলেন, বেটা! আরও উপরে চলে আসো। উপরে উঠতে উঠতে তিনি বুকের উপর চলে এলেন; যে বুক পুরো মানবতার জন্য ব্যথা অনুভব করতো। তখন নানাজান প্রিয় নাতিকে চুমো দিচ্ছিলেন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ! আমি একে বড় ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসুন।'

**তিন.** কোনো সাহাবীর বাসায় নবীজী সা.-এর দাওয়াত ছিলো। তিনি দ্রুত যাচ্ছিলেন। চলতে চলতে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। আদরের নাতি হুসাইন রাস্তায় খেলা করছে। সামনে গিয়ে নবীজী হাত বাড়ালেন। নাতিকে বুকে আসার জন্য ডাকলেন। হুসাইন রা. হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু কাছে আসা মাত্রই আবার পেছনে সরে গেলেন। এভাবে নানার সাথে লুকোচুরি করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত নবীজীর হাতে আটকা পড়লেন। নানাজান এক হাত তাঁর

মাথায় আরেক হাত বুকে রাখলেন। তারপর সীনা মুবারকে জড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, হুসাইন আমার আর আমি হুসাইনের।

**চার.** নবীজী সা. এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার কাঁধে কোনো প্রিয় নাতি ছিলো; যে কাঁধে সমগ্র জগতের নেতৃত্বের ভার অর্পিত ছিলো। পথে কেউ বললো, কত চমৎকার বাহনই না পেয়েছো বেটা! তার কথা শুনে স্নেহশীল নানা উত্তর দিলেন, আরোহীও কতইনা উত্তম!

**পাঁচ.** আল্লাহর রাসূল সা. নামায আদায় করছিলেন। ওই নামায, যে নামাযের এখলাস ও একাগ্রতার যৎসামান্য ছিঁটেফোঁটাও যদি হয়, তাহলে সমস্ত উম্মতের নামায প্রকৃত নামায হয়ে যাবে। নামায পড়াকালীন সময় এক নিষ্পাপ শিশু এসে রাসূল সা.-এর কাঁধে চড়ে বসল। রাসূল সা. তখন রুকুতে যেতে চাচ্ছিলেন আর শিশুটি তার কাঁধে ছিলো। রাসূল সা. অত্যন্ত কোমলতা ও আদরের সঙ্গে শিশুটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল সা. রুকু ও সেজদা করে উঠে দাঁড়ালেন। তখন বাচ্চাটি আবার কাঁধে উঠলো। নামায শেষে তিনি প্রিয় নাতিকে ধমকালেন না, রাগও করলেন না বরং ভালোবাসায় বুকে টেনে নিলেন।

একবার নবীজীর কাছে কিছু হাদিয়া এলো। দামী উপঢৌকন। উপহার সামগ্রীতে একটি সুন্দর দামী হারও ছিলো। এই বাচ্চাটিই ঘরের এক কোণায় খেলা করছিলো। নবীজী বললেন, হারটি আমি আমার ঘরের সবচেয়ে মুহাব্বতের পাত্রকে দেবো। সবাই মনে করলো, নিশ্চয় এই হারটি হযরত আয়েশা রা.-এর গলায় পরিয়ে দেবেন।

কিন্তু নবীজী সা. খেলতে থাকা বাচ্চাটিকে কাছে ডাকলেন। আদর করলেন এবং মুবারক হাতে আদরের নাতি উমামার গলায় হারটি পরিয়ে দিলেন।

**ছয়.** মমতাময়ী নানাজান নাতি হুসাইনকে আদর করছিলেন। মক্কার ধনী সর্দার আকরা' ইবনে হাবেসও সেখানে ছিলো। এ দৃশ্য দেখে আকরা' অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। এতো অভিজাত মানুষ হয়েও বাচ্চাকে এভাবে আদর করছেন!

বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বলে উঠলেন, আমাকে আল্লাহ দশটি সন্তান দান করেছেন। আমি আজ পর্যন্ত একটি শিশুকেও আদর করিনি।

তখন দয়ার সাগর নবীজী সা. ইরশাদ করলেন, যে অন্যকে দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না।

অধিকাংশ সময় নবীজী সা. বলতেন, হাসান হোসাইন আমার ভালোবাসার ফুল। যখনই তিনি মেয়ে ফাতিমার ঘরে যেতেন, বলতেন, ফাতিমা! আমার বাচ্চারা কোথায়? তাদের নিয়ে এসো। তখন তিনি তাদের দু'জনকে নবীজীর সা.-এর কাছে নিয়ে আসতেন। রাসূল কারীম সা. বড় আদরের সঙ্গে তাদের বুকে টেনে নিতেন। উভয়ের গণ্ডদেশে নাকমুখ রেখে এভাবে আদর করতেন, যেন ঘ্রাণ নিচ্ছেন।

সাত. একদিন মেয়ে যয়নব প্রিয় বাবার কাছে সংবাদ পাঠালেন, আমার বাচ্চার খুব নাযুক অবস্থা, অল্প সময়ের জন্য আসুন। সংবাদ শুনে নবীজী সা. স্বভাবতই পেরেশান হলেন। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করে সংবাদদাতাকে বলে পাঠালেন, 'বেটি! তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! যা কিছু আল্লাহ নিয়ে নিয়েছেন তার মালিক আল্লাহই, আর যা কিছু দান করেছেন, তারও মালিক আল্লাহই। সবকিছুর জন্য সময় নির্দিষ্ট করা আছে। বেটি! ধৈর্যধারণ করো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন।'

হযরত যয়নব রা. কলিজার টুকরা সন্তানের অবস্থা দেখে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। সন্তান তখন জীবনের শেষ মুহূর্ত অতিক্রম করছে। পুনরায় সংবাদদাতাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, বাবা! অবশ্যই আসুন! বড় কঠিন সময় যাচ্ছে।

নবীজী সা. ততক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন, সঙ্গে সা'দ ইবনে উবাদাহ, মুআজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবিত এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন। আল্লাহর রাসূল সা. মেয়ের কাছে পৌঁছা মাত্র শিশুটিকে নবী সা.-এর কোলে দেয়া হলো। বাচ্চাটির তখন অন্তিম মুহূর্ত। নিষ্পাপ শিশুটি সর্বশেষ শ্বাস নিচ্ছে। নাতির এ অবস্থা দেখে নবীজীর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

সা'দ ইবনে উবাদাহ রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কি! আপনি কাঁদছেন? উত্তর দিলেন, এটি দয়া, যা আল্লাহ তাঁর স্বীয় বান্দাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ ওই বান্দাদের ওপর রহম করেন, যারা পরস্পরের উপর দয়া করে।

## বিনয়ী সন্তান

জিইর্‌রানাহ নামক স্থানে নবীজী সা. বসে গোশত বিতরণ করছিলেন। এক বৃদ্ধা মহিলা এলো। তিনি বনু সা'দ গোত্রের নারী ছিলেন। নবীজী বৃদ্ধাকে দেখা মাত্রই অভ্যর্থনা ও সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। চাদর বিছালেন। তারপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে বৃদ্ধাকে সেখানে বসালেন এবং অত্যন্ত আদবের সাথে বৃদ্ধার সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলেন ।

এক সাহাবী আবুত তুফাইল রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? নবীজী সা. তাকে এত সম্মান করছেন! লোকজন উত্তর দিলো, এই সম্মানিতা মহিলা 'হালিমা সা'দিয়া', যিনি নবীজীকে দুধ পান করিয়েছেন এবং লালন পালন করেছেন।

## দায়িত্বশীল ভাই

একবার মুজাহিদরা বনু হাওয়াযেন গোত্রের ওপর আক্রমণ করে প্রচুর সম্পদ এবং অনেক দাসদাসী অধিকার করলো। এদের মাঝে হারেছের মেয়ে শীমাও

ছিলো। এদেরকে নবীজী সা.-এর সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন শীমা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ নবীজীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, জানো আমি কে? আমি তোমার দুধবোন শীমা। দেখো আমার চিহ্ন, এর সম্পর্কে তুমি জানো। সেই চিহ্ন দেখে নবীজীর মনে কিছু স্মৃতি ভেসে উঠলো এবং চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। সেই দৃশ্য তার মনে পড়ে গেলো সেই দিনগুলোর কথা, যখন দুধ মা হালীমার ঘরে শীমা নবীজীকে নিয়ে খেলা করতেন।

শীমা বলতে লাগলেন, মুহাম্মাদ, তোমার কি মনে আছে? তোমাকে নিয়ে আমি খেলতাম আর এই কবিতা আবৃত্তি করতাম-

يَا رَبَّنَا اَبْقِ لَنَا مُحَمَّدًا * حَتّٰى اَرَاهُ يَافِعًا وَاَمْرَدًا
ثُمَّ اَرَاهُ سَيِّدًا مَسْعُوْدًا * وَا كَبَّتْ اَعَادِيْهِ الْحُسَّدَا

'হে প্রতিপালক! আপনি আমাদের জন্য মুহাম্মদকে বাঁচিয়ে রাখুন, নিজ চোখে যেন বালক থেকে তাঁকে এক সুদর্শন যুবক রূপে দেখতে পাই। তারপর তাকে যেন এক সম্মানিত নেতা হিসেবে দেখি এবং তাঁর বিদ্বেষী শত্রু যেন অপমানিত হয়'।

আল্লাহর শোকর! আজ এর সবকিছুই আমি নিজ চোখে দেখতে পচ্ছি, বলতে বলতে শীমার চোখ থেকে টপটপ করে আনন্দাশ্রু পড়তে লাগলো।

অন্য বর্ণনায় আছে, যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে নবীজী সা.-এর দুধবোন শীমাও ছিলেন। লোকজন যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করল, তখন তিনি বলছিলেন, আমি তোমাদের নবীর দুধবোন। সত্যায়নের জন্য সাহাবীরা তাকে নবীজী সা.-এর কাছে নিয়ে এলেন। শীমা বললেন, মুহাম্মাদ! আমি তোমার বোন। এরপর সেই চিহ্নও দেখালেন, যেখানে শৈশবে একবার নবীজী কামড় দিয়েছিলেন। নবীজী তাকে চিনতে পারলেন এবং স্বাগত জানালেন। শৈশবের দিনগুলোর কথা তখন নবীজীর মনে পড়ছিলো। তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি নিজ হাতে নিজের চাদর বিছালেন, বড় বোনকে সম্মানের সাথে সেখানে বসালেন এবং বললেন, যদি আমার কাছে থাকতে তোমার ভালো লাগে, তাহলে এখানে তোমার আরাম আয়েশে থাকার সব ব্যবস্থা আমি করবো। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তুমি এখানে থাকবে। আর যদি নিজ গোত্রে ফিরে যেতে চাও, তাহলে নিরাপদে সেখানে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো ।

শীমা বললেন, প্রিয় ভাই! সবকিছুর আগে আমাকে কালিমা পাঠ করিয়ে মুসলমান বানিয়ে নাও। কালিমা পড়ে তিনি ইসলাম গ্রহণের পরম সৌভাগ্যে ধন্য হলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোত্রেই আমাকে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

নবীজী শীমাকে তিনটি দাস, একটি দাসী, একটি বকরি ও নগদ বেশ কিছু টাকা দিয়ে সম্মানের সঙ্গে বিদায় দিলেন।

## দয়ালু শ্বশুর

একবার হযরত আলী রা. রাসূল কারীম সা.-এর কাছে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেয়ে আর জামাতার মধ্যে কাকে আপনি বেশি ভালোবাসেন? খুব অদ্ভুত প্রশ্ন ছিলো। নবীজী সা. আরো বিস্ময়কর উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, ফাতিমাকে আমি তোমার চেয়ে বেশি ভালোবাসি, আর ফাতিমার চেয়ে তুমি আমার কাছে বেশি প্রিয়।

হযরত আলী ও ফাতিমা রা.-এর মাঝে একবার কোনো বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হলো। হযরত আলী রা. কিছুটা কঠিন আচরণ করেছিলেন। ফাতিমা রা. রাগ করে নিজের মন হালকা করার জন্য স্নেহপরায়ণ বাবার কাছে চলে এলেন। পেছনে পেছনে জামাতাও এলেন এবং আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন। আল্লাহ না করুন, নবীজী অসন্তুষ্ট হলে তো দীন-দুনিয়া দু'টোই শেষ হয়ে যাবে। ফাতিমা রা. স্বামীর রূঢ় আচরণ এবং ক্রোধের কথা বলে নবীজীর কাছে অভিযোগ করলেন। তাঁর বাড়াবাড়ির বর্ণনা দিলেন এবং খুব কাঁদতে লাগলেন। কন্যাকে এভাবে কাঁদতে দেখে স্নেহশীল বাবার মন ভরাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু জামাতার ব্যাপারে কোনো কটুকথা বলার বদলে তিনি মেয়েকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, বেটি! আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছি, যে কুরাইশের সব যুবক এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

'বেটি! স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কখনো কখনো এমন কিছু কথা হয়েই থাকে। এমন কোনো স্বামী-স্ত্রী আছে যাদের মাঝে কখনো কোনো মনোমালিন্য হয়নি? আর তুমিই বলো বেটি! এও কি সম্ভব যে, সব সময় স্বামী স্ত্রীর কথামতই কাজ করবে, বিবিকে কিছুই বলবে না? যাও বেটি, নিজের ঘরে যাও। আল্লাহ তোমাদের সব সময় খুশী ও আনন্দে রাখুন। আমি তোমাদের দু'জনকে সুখী দেখে নিজের চক্ষু শীতল করি।'

পিতার কথা শুনে কন্যার অন্তর থেকে বিষন্নতা দূর হয়ে গেলো। এদিকে হযরত আলী রা.ও দয়াপরবশ শ্বশুরের স্নেহমাখা কথা শুনেছেন। তখন তাঁর মনও সিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি স্বজল চোখে সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'আল্লাহর শপথ! ভবিষ্যতে এমন কথা আর বলতে শুনবে না, যার দ্বারা তোমার কোমল হৃদয়ে কষ্ট হয়'। ফাতেমা রা.-এর মনও সিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'নাহ! ভুল তো আমারই ছিলো।' দু'জনই একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে সন্তুষ্টচিত্তে নিজ ঘরে ফিরে গেলেন। নবীজীর চোখে তখন আনন্দাশ্রু দেখা যাচ্ছিলো।

তারপর তাদের ভালোবাসা এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, হযরত ফাতিমা রা.-এর ইন্তেকালের পর প্রতিদিন আলী রা. অস্থির হয়ে তাঁর কবরে চলে যেতেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করতেন,

'হে আল্লাহ! আমার কী হয়ে গেলো, আমি প্রতিদিন কবরে সালাম পাঠ করতে আসি, কিন্তু আমার প্রিয়তমার কবর আমাকে কোনো উত্তর দেয় না।

হে কবর! তোমার কী হলো যে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিচ্ছনা? তুমি কি স্বজনদের ভালোবাসা থেকে নিরাসক্ত হয়ে গেছো?'

## দয়ালু ভাতিজা

**এক.** ওহুদ যুদ্ধে হযরত হামযা রা. তলোয়ার চালিয়ে বীরত্বের সাথে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর বীরত্ব দেখে কাফেরদের সারিতে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। ওাহশি নামে জুবায়ের ইবনে মুত্বইম এর এক হাবশী গোলাম ছিলো। জুবায়ের ওয়াহশীর সাথে ওয়াদা করেছিলো, সে যদি হামযাকে হত্যা করতে পারে, তাকে আযাদ করে দেয়া হবে।

তাই ওয়াহশি হামাযাকে হত্যা করার জন্য ওৎ পেতে ছিলো। যুদ্ধের এক পর্যায়ে হযরত হামযা রা. ওয়াহশীর কাছে আসতেই সে তার ছোট বল্লম হযরত হামযার দিকে ছুড়ে মারলো। বল্লম হামযার নাভিদেশে আঘাত করলো এবং আমূল বিদ্ধ হয়ে গেলো । হযরত হামযা রা. পাল্টা আক্রমণ করতে চাইলেন । কিন্তু জখমের তীব্রতায় দাঁড়িয়েই সাথে সাথে পড়ে গেলেন এবং শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।

এই যুদ্ধে যদিও নবীজীর সাহসিকতা, বীরত্ব ও তুলনাহীন দূরদৃষ্টির কারণে মুসলমানদের পরাজয় জয়ে পরিবর্তিত হয়েছিলো, কিন্তু মুসলমানদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতিও হয়ে গিয়েছিলো, অনেক মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

মুসলিম সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ শেষে যখন মদীনায় ফিরে এলেন তখন ঘরে ঘরে শোকাবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো। নারীরা নিজ নিজ পরিবারের শহীদদের স্মরণে বিলাপ করছিলেন। নবীজী যখন দেখলেন, নারীরা নিজেদের কলিজার টুকরা ও প্রিয়জনদের জন্য মাতম করছে, তখন নবীজীর অন্তর ভরাক্রান্ত হলো। তাঁর চোখের সামনে হযরত হামযা রা.-এর শাহাদাতবরণের দৃশ্য ভেসে উঠলো এবং কাতর কণ্ঠে বললেন, হামযার জন্য মাতমকারী কি কেউ নেই?

ওয়াহশী ত্বায়েফ যুদ্ধের পর ঈমান এনেছিলো। কিন্তু যখনই ওয়াহশীর উপর নবীজী সা.-এর দৃষ্টি পড়তো তখনই প্রিয় চাচার কথা তার মনে পড়ে যেতো। অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে সংবরণ করতেন। অবশেষে একদিন ওয়াহশীকে বলেই দিলেন, তুমি আমার সামনে এসো না।

**দুই.** বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে নবীজীর চাচা হযরত আব্বাস রা.ও ছিলেন। মুসলমানরা বন্দীদের হাত-পা বেঁধে রেখেছিলো। আব্বাসের হাত-পাও রশি এবং শিকলে বাঁধা ছিলো। আব্বাস রা. ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন। তাঁর কাতর কণ্ঠস্বর নবীজীর কানে পৌঁছছিলো। রাতে নবী সা. অস্থির হয়ে বারবার বিছানায়

এপাশ-ওপাশ করছিলেন। কোনোভাবেই তার ঘুম আসছিলো না। কিন্তু তিনি কী করে আব্বাসের বাঁধন ঢিলে করে দেওয়ার নির্দেশ দেন! নবীজীর অস্থিরতা দেখে সাহাবীরাও অস্থির হয়ে উঠলেন। বুঝতে পারলেন, আব্বাসের কাতরানোর শব্দই নবী সা.-কে অস্থির করে রেখেছে। সাহাবীরা আব্বাসের বাঁধন ঢিলে করে দিলেন। তাঁর ব্যথা কমে এলো। কাতরানোর শব্দও থেমে গেলো। তখন রহমতে আলম সা. স্বস্তি পেলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।

## অসহায়ের সহায়

**এক.** নবী সা. বাজারে যাচ্ছিলেন। পকেটে মাত্র আট দিরহাম ছিলো। পথে এক দুর্বল মহিলা বসে কাঁদছিলো। নবীজী সা. দাঁড়িয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন- মা! কী হয়েছে তোমার? কাঁদছো কেনো?

বৃদ্ধা বললো, 'গৃহকর্তী কেনাকাটার জন্য দুই দেরহাম দিয়ে পাঠিয়েছিলো। দেরহামগুলো রাস্তায় কোথায় যেন পড়ে গেছে। এখন তিনি কী ভাববেন!' বলে বৃদ্ধা আবার কাঁদতে লাগলেন। নবীজী সা. পকেট থেকে দুই দেরহাম বের করে বৃদ্ধার হাতে দিলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সামনে এগোলেন।

বাজারে পৌঁছে দুই দেরহাম দিয়ে একটি জামা কিনে পথ ধরলেন। ফেরার পথে দেখতে পেলেন, এক ভিক্ষুক বিবস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ছেঁড়া-ফাড়া পুরনো একগাদা কাপড় পায়ে বেঁধে রেখেছে। আর জোরে জোরে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে, যে আমাকে কাপড় পরিধান করাবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের বস্ত্র দান করবেন।

নবীজী সা. চলার গতি মন্থর করলেন। ভিক্ষুক আবার ঘোষাণা করলো, যে আমাকে কাপড় পরিধান করাবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে জোড়াবস্ত্র দান করবেন।' নবীজী সা. তখনই ওই জামাটি ভিক্ষুককে পরিয়ে দিলেন এবং আবার বাজারের দিকে চললেন। সেখানে গিয়ে নবী সা. দ্বিতীয় আরেকটি জামা দুই দেরহাম দিয়ে কিনে ফেরার জন্য চললেন। রাস্তায় আবার সেই বৃদ্ধার সাথে দেখা হলো। মহিলা দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

রাসুল সা. জানতে চাইলেন, মা! আবার কী হয়েছে?

বৃদ্ধা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবা-মা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি আর কতবার আপনাকে পেরেশান করবো! ঘর থেকে বের হতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিলো। ঘরের লোকজন আমার অপেক্ষায় রয়েছে। এখানে এতো দেরি হয়ে গেলো যে, ঘরে গেলে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে ভালো-মন্দ দু'চার কথা শোনাবে, শাস্তি দেবে।' এ বলে বৃদ্ধা জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো। বৃদ্ধার কথা শুনে নবীজীর দয়া হলো। বৃদ্ধাকে সাহস জুগিয়ে তিনি বললেন, চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। বৃদ্ধা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বাড়ির দিকে চললো ।

কিছু দূর যাওয়ার পর কিছু আনসারীর বাড়িঘরের সামনে এসে বৃদ্ধা বললো, আমি ওখানে কাজ করি। পুরুষরা বাইরে কাজে গেছে, ঘরে শুধু মহিলারাই রয়েছে।

নবীজী সা. ঘরের কাছে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, হে নারীরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

কণ্ঠস্বর পরিচিত ছিলো। সব নারীই আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছিলেন, কে তদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সবাই চুপ রইলেন। কোনো ঘর থেকে উত্তর আসছিলো না।

এবার নবীজী আরো উচ্চস্বরে বললেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু!

এবারো চুপ, কোনো উত্তর আসছিলো না।

গৃহকর্তীরা দরজার কাছে এসে অধীর হয়ে সেই প্রিয় কণ্ঠস্বরে পুনরায় সালাম শোনার জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। নবীজী সা. তৃতীয়বার আরো উঁচু কণ্ঠে বললেন, হে গৃহিণীরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

তৃতীয় সালামের পর ঘরের সমস্ত মহিলারা সম্মিলিত কণ্ঠে উত্তর দিলো- ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! আপনার ওপর আমাদের পিতা-মাতা কুরবান হোক।

নবীজী সা. জানতে চাইলেন, তোমরা কি আমার প্রথম সালামের আওয়াজ শোননি?

নারীরা উত্তর দিলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমারা আপনার প্রথম আওয়াজই শুনেছি এবং আপনার কণ্ঠও চিনতে পেরেছি। কিন্তু উত্তর দেইনি কারণ আমরা চাচ্ছিলাম, আপনার পবিত্র যবান মুবারকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা, রহমত ও বরকতের দোয়া আমরা ও আমাদের সন্তানেরা যেন বারবার শুনতে পাই।' নারীদের কথা শুনে নবীজী মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, তোমাদের বৃদ্ধা সেবিকা ভয় পাচ্ছে যে, তোমরা তাকে বকবে, শাস্তি দেবে। ঘটনাচক্রে আল্লাহর এই বান্দির ফিরতে দেরি হয়ে গেছে। আমি তার হয়ে সুপারিশ নিয়ে এসেছি।

নবীজীর সা.-এর কথা শুনে নারীদের চোখে পানি চলে এলো। সমস্বরে সবাই বললো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বৃদ্ধা সুপারিশ করার জন্য আপনাকে নিয়ে এসেছে! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা তাকে এই মুহূর্তেই আজাদ করে দিচ্ছি। তার ওপর আমাদের আর কোনো দাবি রইলো না।

বৃদ্ধা দাসীর আজাদ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা শুনে নবীজীর চেহারা মোবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই নেককার মহিলাদের জন্য দোয়া করতে করতে তিনি খুশি মনে ঘরে ফিরলেন।

**দুই.** মক্কা বিজয় হয়েছে। দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হচ্ছিল। নবীজীর রফিকে গার (গুহার সঙ্গী) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এক দুর্বল বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধের পা কেঁপে কেঁপে চলছিলো। চোখের দৃষ্টিশক্তি নিভু নিভু প্রায়। দুর্বলতার কারণে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো। তিনি ছিলেন আবু বকর রা.-এর সম্মানিত পিতা আবু কুহাফা উসমান। বৃদ্ধকে দেখে রহমতে আলম সা.-এর চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলো। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কালিমা পাঠ করিয়ে এঁকে মুসলমানদের কাতারে শামিল করে নিন।

নবীজী বললেন, আবু বকর! তুমি কেন শুধু শুধু এই শ্রদ্ধেয় মানুষটিকে এভাবে কষ্ট দিতে গেলে? আমি নিজেই তাঁর কাছে যেতে পারতাম। তারপর বৃদ্ধকে কালিমা পাঠ করিয়ে মুসলমান বানালেন।

## সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

নবীজী সা.-এর বিয়ের পরবর্তীকালের ঘটনা। সম্ভবত তিনি তখন ত্রিশ বছরের যুবক ছিলেন। সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন, অথবা আল্লাহর সৃষ্টির সেবায় কল্যাণচিন্তায় ডুবে থাকতেন। আরবের অবস্থা তখন খুব খারাপ ছিলো। কোথাও কোনো নিরাপত্তা ছিলো না। রাস্তাঘাটে সব সময় লুটপাটের আশংকা থাকতো। ডাকাতদের কবলে পড়ে বেশিরভাগ সময় মুসাফিরদেরকে শূন্য হাতে ঘরে ফিরতে হতো। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের ওপর সব দিক থেকে অন্যায় ও অত্যাচার ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো। রাসূল সা. সব সময় চিন্তা করতেন, এই অবস্থার পরিবর্তন কী করে করা যায়? গোত্রের সর্দারদের সাথে প্রায়ই সাক্ষাত করে তাদের এসব ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য উৎসাহ দিতেন। এসব প্রচেষ্টার ফলাফলস্বরূপ একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলো। এতে বনু হাশিম, বনু মুত্ত্বালিব, বনু আসাদ, বনু যুহরা এবং বনু তামীমের যুবকরা অংশ নেয়।

এই সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয়ে অঙ্গীকার নেওয়া হতো।

১. আমরা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করবো।

২. আমরা মুসাফির ও দুস্থদের রক্ষা করবো।

৩. আমরা গরিব ও অসহায়দের সাহায্য করবো।

৪. আমরা দুর্বলদের বিরুদ্ধে শক্তিশালীদের অন্যায় প্রতিরোধ করবো।

এই সংগঠনের প্রচেষ্টায় মক্কায় অনেক অনাচার বন্ধ হলো। লোকজনের জান-মাল কিছুটা নিরাপদ হলো এবং মক্কায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হলো। এর কিছু দিন পর আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সা.-কে নবুওয়ত দান করলেন। পুরো বিশ্বের সংশোধন ও নেতৃত্বের দায়িত্ব রাসূল সা.-এর ওপর অর্পণ

করলেন। নবুওয়ত প্রাপ্তির পর রাসূল সা. বলতেন, আজও কেউ যদি ওই সংগঠনের দোহাই দিয়ে আমার সাহায্য চাও, তাহলে আমি এখনও তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবো।

তার কাজের কারণে মক্কার মানুষ তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত- উপাধীতে স্মরণ করতো। তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীতে মক্কাবাসী বিমুগ্ধ ছিলো।

সে সময় মক্কায় মারাত্মক বন্যা হয়। বায়তুল্লাহর দেয়ালে বন্যার কারণে ফাটল ধরে। তাই বায়তুল্লাহ পুনরায় নির্মাণ করা হয়। সে কাজে কুরাইশের সকল মানুষ অংশগ্রহণ করে। কাজের শেষ পর্যায়ে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। সব গোত্রই চাচ্ছিলো যে, তারাই এই সৌভাগ্য অর্জন করবে। কথায় কথায় মতপার্থক্য বেড়েই চলছিলো। এভাবে চার দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার আশংকা দেখা দিচ্ছিলো। শেষে উমাইয়া ইবনে মুগীরা এক প্রস্তাব পেশ করলো, কাউকে মধ্যস্থতাকারী বানানো হোক। তার সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নেবে। বনু উমাইয়া গোত্রের লোকজন কুরাইশের নেতৃত্বস্থানীয় ছিলো, বুদ্ধিমানও ছিলো। প্রস্তাবও যুক্তিসঙ্গত ছিলো। সবাই মেনে নিলো। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো, আগামীকাল যে ব্যক্তি হারাম শরীফে প্রথম প্রবেশ করবে তাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মেনে নেওয়া হবে।

ঘটনাক্রমে পরের দিন সবার আগে নবী কারীম সা. হারাম শরীফে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলো- هَذَا الْأَمِيْنُ। هَذَا الصَّادِقُ رَضِيْنَاهُ ইনি বিশ্বস্ত, ইনি সত্যবাদী, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আমরা তাঁকে মেনে নিলাম।

আল্লাহর রাসূল সা. প্রখর দূরদৃষ্টি ও অসাধারণ চিন্তাশক্তি দ্বারা এমন সুন্দর সিদ্ধান্ত দিলেন যে, লোকজনের আনন্দের সীমা রইলো না। নবীজী সা. একটি বড় চাদর নিয়ে বিছালেন। পবিত্র হাতে হাজরে আসওয়াদকে উঠিয়ে এনে সেই চাদরের ওপর রাখলেন। তারপর সব গোত্রের সর্দারদের বললেন, চাদর ওঠাও। এভাবে সব গোত্রের সর্দাররাই পাথর ওঠানোর সৌভাগ্য লাভ করলেন। তারপর নবী কারীম সা. নিজের পবিত্র হাতে মাটি থেকে পাথর উঠিয়ে স্বস্থানে স্থাপন করলেন।

## অতুলনীয় বিজেতা

তখন হিজরতের অষ্টম বছর চলছে। মদীনায় নবীজী সা. ঘোষণা করলেন, ইসলামের অকুতভয় সেনানীরা! তৈরি হয়ে যাও, মদীনার চারদিকে মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ নিজ অস্ত্র প্রস্তুত করতে লাগলো। ঘরেও নবীজী সা. এ আদেশ পাঠালেন, আমার অস্ত্রও প্রস্তুত করে দাও। একটি বড় যুদ্ধ আসন্ন। কিন্তু তিনি এ রহস্য কারো কাছে প্রকাশ করছিলেন না যে, তিনি কোন দিকে

যুদ্ধযাত্রা করতে যাচ্ছেন। আয়েশা রা. নিজ হাতে নবী কারীম সা.-এর অস্ত্র প্রস্তুত করে দিলেন, কিন্তু তিনিও জানতেন না ইসলামী সৈন্যরা এবার কোন দিকে যাবে। তবে বৃহৎ সৈন্যদলের প্রস্তুতি দেখে সবার এ ধারণা হচ্ছিলো যে, সম্ভবত মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে।

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের দশ তারিখে আল্লাহর রাসূল সা. দশ হাজার যোদ্ধার বিশাল বাহিনী সাথে নিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মক্কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ইসলামী সৈন্যরা জিহাদী জযবায় উদ্বেলিত হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হচ্ছিলো। রাস্তায় অন্যান্য গোত্রের লোকেরা এসে সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছিলো। মাররুয্ যাহরান নামক স্থানে পৌঁছে নবীজী ক্যাম্প স্থাপন করলেন। সৈন্যবাহিনীর খোঁজখবর নিলেন। একজন নবীর দূরদৃষ্টি থেকে নবীজী সা. সৈন্যবাহিনীকে তিনি আদেশ করলেন, প্রত্যেক সৈন্য পৃথক পৃথক আগুন প্রজ্জ্বলিত করে চুলা তৈরি করো। দশ হাজার,সেনা পুরো ময়দানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দশ হাজার চুলা প্রজ্জ্বলিত করলে পুরো ময়দানটিকে আয়মান উপত্যকার মত দেখাচ্ছিলো।

কুরাইশের কাছে মুসলিম সেনাবাহিনীর আগমনবার্তা পৌঁছে গিয়েছিলো। তিন সর্দার আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকিম ইবনে হিযাম, বুদাইল ইবনে ওয়ারকা অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ময়দানের কাছাকাছি পৌঁছুলো। উঁচু টিলা থেকে তারা দেখতে পেলো, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত শুধু চুলা আর চুলাই দেখা যাচ্ছে। এত বিশাল সৈন্যদল দেখে তারা চিন্তার শক্তি হারিয়ে ফেললো।

পথে হযরত আব্বাস রা.-এর সাথে তাদের দেখা হয়ে গেলো। আবু সুফিয়ানকে তিনি বললেন, নবী কারীম সা. বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কায় এসেছেন। আবু সুফিয়ান বললো, এখন কুরাইশের কী হবে! আব্বাস রা. বললেন, খচ্চরের পিঠে বসে আমার সঙ্গে চলো। আল্লাহর রাসূল সা.-এর সাথে কথাবার্তা বলো।

আবু সুফিয়ান নবীজী সা.-এর সাথে আলোচনা করার জন্য নবীজীর তাবুর দিকে রওনা হলো। কাছাকাছি পৌঁছতেই হযরত ওমর রা. তাকে দেখতে পেলেন। আবু সুফিয়ানকে দেখে প্রতিশোধের স্পৃহায় ওমর প্রায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমন! আজ তোমাকে আমরা হাতে পেয়েছি। বলতে বলতে খুব দ্রুত তিনি নবীজীর কাছে পৌঁছলেন। নবীজীর কাছে তিনি আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। তখন আব্বাস রা. বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! একে আমি নিরাপত্তা দিয়ে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। নবীজীও কি চেয়েছিলেন আজ রক্ত প্রবাহিত হোক! তিনি বললেন, আবু সুফিয়ান! তোমার কি এখনো এই বিশ্বাস হয়নি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই?

আবু সুফিয়ান বললো, অন্য খোদা থাকলে তো আজ আমাদের সাহায্যে আসতো!

রাসুল বললেন, তোমার কি এখনো এ বিষয়ে সন্দেহ হয় যে, আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল?

আবু সুফিয়ানঃ হ্যাঁ, এ বিষয়ে তো কিছুটা সন্দেহ আছে।

রহমাতুল্লিল আলামীন সা. বললেন, আবু সুফিয়ান! এখন গোড়ামী ত্যাগ করে সম্মানের সাথে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় চলে এসো।

মক্কার অন্যতম শীর্ষ সর্দার ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। মুসলিম সৈন্যরা আবু সুফিয়ানকে ভোর পর্যন্ত নিজেদের নজরদারিতে রাখলেন। কিন্তু এমন বিচক্ষণতার সাথে নজরদারী করলেন যে, আবু সুফিয়ান বুঝতে পারলো না।

ভোর হলে মুসলিম বীর সেনানীরা কুদাইয়ের পথ ধরে মক্কার দিকে এগিয়ে চললো। হুযুর সা. হযরত আব্বাস রা.-কে ইশারায় বললেন, আবু সুফিয়ানকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও, যেন সে নিজ চোখে ইসলামী সৈন্য বাহিনীর শান শওকত দেখতে পায়।

প্রথমে গিফার গোত্রের সৈন্যরা পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে চললো, মুখে মুখে আল্লাহর যিকির। তারপর জুহাইনা ও সুলাইম গোত্র। জানবাজ সশস্ত্র সৈন্যরা আত্মোৎসর্গ করার শপথে বলিয়ান হয়ে উঁচু আওয়াজে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে চললো। সবশেষে আনসারীদের সৈন্যবহর এক শান শওকতের সাথে এগিয়ে চললো যে, আবু সুফিয়ান সম্মোহিত হয়ে পড়লো। আব্বাস রা.-কে প্রশ্ন করলো, এরা কারা? হযরত আব্বাস রা. নাম বললেন। ঠিক সে মুহূর্তে আনসার-দলপতি হযরত সা'দ ইবনে উবাদা সেই জায়গা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আবু সুফিয়ানের ওপর দৃষ্টি পড়তেই তিনি উঁচু আওয়াজে বললেন,

اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ اَلْيَوْمَ تَسْتَحِلُّ الْكَعْبَةَ-

'আজ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিন, আজ কা'বার চারপাশেও রক্তপাত হালাল করে দেওয়া হবে।'

এই কথা বলতে বলতে সা'দ ইবনে উবাদাহ বীরত্বের সঙ্গে অগ্রসর হলেন। তাঁর পেছনেই উভয় জাহানের সর্দার নবী কারীম সা.-এর বাহন ছিলো। সেই বাহন খুবই সাদা-মাটা ও দীনহীন ভঙ্গিতে অগ্রসর হচ্ছিলো। আবু সুফিয়ানের দৃষ্টি নবীজী সা.-এর নুরানী চেহারায় পড়ামাত্রাই সে বলে উঠলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সা'দ ইবনে উবাদাহর কথা শুনেছেন?

নবীজী সা. বললেন, সা'দ সঠিক কথা বলেনি। আজ কা'বার সম্মানের দিন। আজ দয়া ও ক্ষমার দিন।

اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ- আজ দয়া-করুণা ও ক্ষমার দিন।

তিনি আরো বললেন, সা'দ ইবনে উবাদাহর কাছ থেকে সৈন্যবাহিনীর পতাকা নিয়ে তাঁর ছেলের হাতে দেওয়া হোক। নবীজী সা. যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন নবীজীর অবস্থা ও আচরণ অন্যান্য বিজেতাদের মত ছিলো না। না তার কোনো দম্ভ ছিলো, না ছিলো কোনো গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অহংবোধ। তিনি বিজয়দম্ভে উল্লাসিত ছিলেন না, কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাও তার ছিলো না। তিনি বিজয়োল্লাসে নোংরা উত্তেজনায় মত্তও ছিলেন না। বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সা.-এর মাথা মোবারক বাহনের ওপর এমনভাবে ঝুঁকে ছিলো যে, কপাল মুবারক উটের কুঁজ স্পর্শ করছিলো। নবীজী সা. সূরা ফাতাহ তেলাওয়াতে মগ্ন ছিলেন।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

নিশ্চয় আমি আপনাকে স্পষ্ট এক বিজয় দান করেছি।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? পিতৃ পুরুষের ভিটায়? নম্র ও কোমল কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, ঘরে থাকার উপায় কি আকীল রেখেছে? আকীল নবীজীর ঘর আবু সুফিয়ানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলো। আমি খীফে অবস্থান করবো, যেখানে কুরাইশ আমাদের বিরুদ্ধে পরস্পরের চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিলো। খীফে অবতরণ করার পর নবীজী হারাম শরীফে প্রবেশ করলেন। যেখানে মুশরিকদের তিন শ' ষাটখানা মূর্তি স্থাপিত ছিলো। নবীজী সা. এক একটি মূর্তিকে ছড়ি দিয়ে আঘাত করছিলেন আর পাঠ করছিলেন-

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.

সত্য এসে গেছে, মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা দূরীভূত হওয়ারই ছিলো।

তারপর নবী কারীম সা. বায়তুল্লাহ শরিফে শুকরিয়ার নামায আদায় করে কিছুক্ষণ যিকির-আযকার করলেন। কা'বার বাইরে মক্কার জনসাধারণ সমবেত হয়েছিলো। সবাই নিজেদের ভাগ্য কী হবে, তা শোনার প্রতীক্ষায় অস্থির হয়ে ছিলো। সে মুহূর্তে নবীজী সা. এক ঈমানদীপ্ত খুতবা প্রদান করলেন, যা কেবল মক্কাবাসীর জন্যই ছিলো না, বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য ছিলো। নবীজী বললেন, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি নিজ ওয়াদা পূরণ করে দেখিয়েছেন। তিনি স্বীয় বান্দাদের সাহায্য করেছেন। সব বাহিনীকে আজ তিনি পরাজিত করেছেন।

আজ গর্ব ও অহংকারের সব কথা, রক্তের সব দাবি, সম্পদের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া আমার এই পদতলে দলিত করে দেয়া হয়েছে। তবে হ্যাঁ, বায়তুল্লাহর যিম্মাদারী ও হাজ্বীদের সেবার দায়িত্ব তা থেকে ভিন্ন।

হে কুরাইশবাসী! এখন থেকে জাহেলিয়াতের অহংকার, পরিবার ও বংশীয় গর্ব আল্লাহ তাআলা নিঃশেষ করে দিয়েছেন। আমরা সবাই আদম সন্তান, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।

তারপর তিনি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন।

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ○

হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদের গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করেছি পরিচয়ের সুবিধার্থে। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই সবচে' বেশি সম্মানী যে সবচে' বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সবিশেষ অবগত।[৮০]

ভাষণ শেষে তিনি উপস্থিত জনসমাগমের দিকে তাকালেন। চতুর্দিকে ভীতিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছিলো। এরা তো সেই সব মানুষ, যারা কয়েক বছর আগে নবীজীকে মক্কা নগরী থেকে বের করে দিয়েছিলো। এদের মধ্যে তারাও ছিলো যারা তাঁকে গালমন্দ করেছিলো। সেও ছিলো, যে তীর্যক কথা বলে নবীর মনে দুঃখ দিয়েছিলো। সেও ছিলো, যে রিসালাতের বিষয়ে জঘন্য কথা বলেছিলো। সেও ছিলো, যে নবীজীর পথে ময়লা ও কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। সেও ছিলো, যে পাথর নিক্ষেপ করে নবীজীকে আহত করেছিলো। সেও ছিলো, যে নবীজীর প্রিয়ভাজনদের কলিজা চিবিয়েছিলো। সেও ছিলো, যে নবীজীকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। সেও ছিলো, যে নবীজীকে শান্তিতে নিশ্বাসও ফেলতে দিতো না। সেও ছিলো, যে প্রখর রোদে মুসলমানদের চিৎ করিয়ে বুকের ওপর ভারী পাথর চেপে রাখতো। সেও ছিলো, যে মুসলমানদের শিকলে বেঁধে পাথুরে ভূমিতে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতো। সেও ছিলো, যে এই পরম সৌভাগ্যবান মানুষগুলোকে শিয়াবে আবী তালিবে বন্দি করে কাঁচা চামড়া ও গাছের পাতা খেতে বাধ্য করেছিলো।

রহমতে আলম সা. সবার দিকে একবার তাকালেন। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, জানো আজ আমি তোমাদের সাথে কী আচরণ করবো? অনুতাপ ও অসহায়ত্বেপূর্ণ পরিবেশে শুধু করুণা ভিক্ষার আওয়াজই গুঞ্জরিত হচ্ছিলো।

তারা বললো, اَخٌ كَرِيْمٌ وَابْنُ اَخٍ كَرِيْمٍ আপনি এক অভিজাত ভাই, একজন অভিজাত ভাইয়ের সন্তান।

---

৮০. সূরা হুজরাত : ১৪।

তাদের কথার উত্তরে রহমতে আলম সা. বললেন,

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

যাও, আজ তোমাদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত।

উদার বিজেতা রাসুল সা. তাদের দেহগুলোকে তো মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু তাদের হৃদয়গুলোকে আপন শৃঙ্খলে বেঁধে নিলেন। আর এটিই নবীজী সা.-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। নামাযের সময় হয়ে এলো। নবীজীর মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল রা. কা'বার ছাদে উঠে উচ্চ আওয়াজে আজান দিলেন। খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মদ সা. তাওহীদের প্রাণকেন্দ্রে তাওহীদের বিশ্বাসীদের নিয়ে নামায আদায় করলেন।

## এক বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী

এক ব্যক্তি নবী কারীম সা.-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। সাহাবায়ে কেরাম রা. তাদের ওই সঙ্গীর খুব প্রশংসা করলেন। নবীজী সা. বললেন, এই ব্যক্তিকে আমি তোমাদের থেকে ভালো জানি। তখন সেই ব্যক্তি বললো, আমি কিছুদিন নবী কারীম সা.-এর ব্যবসার অংশীদার ছিলাম। নবীজীর লেনদেন সব সময় পরিচ্ছন্ন ছিলো। আরেক সাহাবী কাইস মাখযুমীও কিছুকাল নবীজী সা.-এর ব্যবসার অংশীদার ছিলেন। তিনি বলেন, নবীজী সা. সব সময় আমার সাথে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ছিলেন। তাঁর লেনদেন সব সময় পরিচ্ছন্ন ছিলো।

মক্কায় সবচেয়ে বড় ব্যবসা ছিলো হযরত খাদিজা রা.-এর। যখনই মক্কা থেকে কোনো ব্যবসায়ী কাফেলা যেতো –সাহিবে ত্বকাত ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুযায়ী- অর্ধেক পণ্য থাকতো মক্কার সব ব্যাবসায়ীর আর অর্ধেক পণ্য থাকতো একা খাদিজা রা.-এর। খাদিজা রা. নবীজী সা.-এর বিশ্বস্ততা, সুন্দর লেনদেন, সততা ও আমানতদারিতার কথা শুনে তাঁর কাছে এ আবেদন করলেন যে, আপনি যদি শাম দেশে আমার পণ্য সামগ্রী নিয়ে যেতে আগ্রহী হন, তাহলে অন্যদেরকে আমি যে লভ্যাংশ দেই, তার দ্বিগুণ আপনাকে দেবো। খাদিজা রা.-এর এই প্রস্তাবে নবীজী সা. রাজি হলেন এবং ব্যবসায়িক পণ্যসামগ্রী নিয়ে শাম অভিমুখে যাত্রা করলেন।

আল্লাহর অশেষ দয়া ও মেহেরবানীতে এই সফরে যথেষ্ট লাভ হলো। সফর থেকে ফিরে নবীজী সা. সমস্ত হিসাব খাদিজা রা.-কে বুঝিয়ে দিলেন। খাদিজা রা. যখন দেখলেন, এবারের সফরে অনেক লাভ হয়েছে তখন তিনিও অভিভূত হলেন। এরপর যখন তাঁকে নবীজীর সফরসঙ্গী গোলাম নবীজীর পবিত্রতা, সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে অবহিত করলো, তখন খাদিজা রা.-এর হৃদয়ে নবীজীর প্রতি আরেকটু মুগ্ধতা তৈরি হলো। এই ব্যাবসায়িক সফরের তিন মাস পর হযরত খাদিজা রা. রাসূলে কারীম সা.-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। তখন খাদিজা রা.-এর বয়স চল্লিশ। আর নবীজীর বয়স মাত্র

পঁচিশ। নবীজী সা.ও সম্মতি প্রকাশ করলেন এবং খাদিজা রা.-এর সাথে রাসূল সা.-এর বিবাহ হয়ে গেলো।

## শত্রু হলো বন্ধু

**এক.** মক্কা বিজয়ের মাত্র একদিন পর নবী কারীম সা. খুব আবেগের সাথে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করছিলেন। ফুযালাহ ইবনে উমাইর দেখলো, নবী সা. গভীর মনোযোগের সাথে তওয়াফ করছেন। শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো। সে নবীজী সা.-কে হত্যা করার স্বংকল্প নিয়ে নবীজীর দিকে এগিয়ে গেলো। যখন নবীজীর কাছে পৌঁছলে, নবীজী সা. তার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, ফুযালাহ আসছে নাকি?

ফুজালাহ বললো, জ্বি, আমি ফুযালাহ।

রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসেছো?

ফুজালাহ বললো, বিশেষ কোনো কারণে আসিনি। এইতো এমনিতেই আল্লাহ আল্লাহ করছি।

নবীজী সা. ফুযালাহর এ উত্তর শুনে মৃদু হাসলেন আর বললেন, "ফুযালাহ! তুমি তো অন্য কারণে এসেছো।" নবীজীর কথা শুনে ফুযালাহ স্তব্ধ-বিস্মিত হয়ে গেলো। নবীজী সা. অত্যন্ত স্নেহের কণ্ঠে বললেন, 'তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে নিজের জন্য ক্ষমা চাও।' এ কথা বলে নবীজী তার বুকে ডান হাত মুবারক রাখলেন।

ফুযালাহ বলেন, বুকে নবীজী সা. হাত রাখার সাথে সাথেই আমার অন্তরে অদ্ভূত প্রশান্তি অনুভূত হলো। এই কিছুক্ষণ পূর্বে যে ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদগ্রীব ছিলাম এখন তাঁর ভালোবাসা হৃদয়ে স্থান করে নিলো। এখন আমার কাছে নবীজী সা.-এর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কেউ নেই। কিছুক্ষণ আমি এই মহান ব্যক্তিত্বের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। আমার হৃদয়ের আলো বেড়েই চলছিলো। আমার অন্তরে অব্যক্ত আনন্দ অনুভূত হচ্ছিলো। অন্তরের এই অভূতপূর্ব আলোড়ন নিয়ে আমি ঘরের পথ ধরলাম। নবী-প্রেমে হৃদয়ের সব বক্রতা দূর হয়ে যেতে থাকলো। পথে আমার সেই প্রেয়সীর সাথে দেখা হলো, যার সাথে আমি প্রহরের পর প্রহর বসে থাকতাম। আমার হৃদয় তার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিলো। ওই প্রেয়সী তার স্বভাবসূলভ ভঙ্গিমায় আমাকে স্বাগত জানিয়ে কাছে ডাকলো। আমি বললাম, এখন আমি তোমার কাছে আসতে পারবো না। আমি আমার হাত মুহাম্মাদ সা.-এর হাতে দিয়ে দিয়েছি। এখন তাঁর ভালোবাসার সাথে অন্য কারো ভালোবাসার স্থান হতে পারে না।

**দুই.** তখন নবুওয়তের তেরোতম বছর চলছে। সফরের সাতাইশতম রাত। এই রাতটি ইতিহাসের অন্ধকারতম ও ভয়াবহ একটি রাত। মক্কার কাফেররা নবীজী সা.-এর ঘর ঘেরাও করে রেখেছে। সিদ্ধান্ত ছিলো, যখনই নবী কারীম

সা. বাইরে আসবেন, সবাই একযোগে তরবারি নিয়ে আক্রমণ করবে এবং নিজেদের চক্রান্ত বাস্তবায়িত করবে। আল্লাহর রাসূল সা. রবের নির্দেশনায় আপন চাচাতো ভাই হযরত আলী রা.-কে নিজ বিছানায় শুইয়ে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করতে করতে কাফেরদের বেষ্টনী থেকে বের হয়ে গেলেন। আল্লাহ কাফেরদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন। তারা কিছুই টের পেলো না। সকালে যখন তারা জানতে পারলো যে, আল্লাহর রাসূল সা. আল্লাহর হিফাযতে চলে গেছেন, তখন কাফেররা দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলো। তারা হতভম্ব হয়ে ভাবছিলো, কী ভাবে কী হয়ে গেলো!

মক্কার কাফেররা নবীজীর রক্তের মূল্য নির্ধারণ করে ঘোষণা করলো, যে ব্যক্তি (নাউজুবিল্লাহ) নবীজীর গর্দান কেটে আনতে পারবে অথবা জীবিত তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে পারবে, তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। তারা একশত মোটা তাজা উটসহ অন্য অনেক পুরষ্কারের লোভ দেখালো। পুরষ্কারের লোভে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম রাসূল সা.-এর পিছু নিলো, সে ছিলো সুরাকাহ ইবনে জু'শুম।

নবীজী সা. ঘর থেকে বেরিয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। গুহাটি মক্কা থেকে কিছুটা দূরে ছিলো। এর নাম ছিলো গারে ছওর। নবীজী সা. এখানে তিন দিন অবস্থান করলেন। চতুর্থ দিন তিনি মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সেদিন ছিলো রবিউল আওয়ালের এক তারিখ। শনিবার। সঙ্গী ছিলেন আবু বকর আর আমের ইবনে ফেহেরা নামের এক দাস। পথপ্রদর্শনের জন্য ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আরিক্বিত। নবী সা. তাঁকে পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য অর্থের বিনিময়ে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

নবীজী সা. সমুদ্রের পাশ ঘেষে চলছিলেন। যখন তিনি রাবুগ এবং সাহেল সমুদ্রের মাঝামাঝি ময়দান অতিক্রম করছিলেন তখন তাঁর ওপর সুরাকাহ ইবনে জু'শুম-এর দৃষ্টি পড়লো। নবীজী সা.-কে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে উঠলো। ঘোড়াকে দ্রুত নবীজীর পেছনে ছোটালো। সুরাকাহর মাথায় শীরস্ত্রান ছিলো। বল্লমসহ অন্যান্য অস্ত্রের ঝলকে তার দেহ ঝলমল করছিলো। ঘোড়া দৌড়াচ্ছিলো আর মনে মনে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছিলো। কারণ সাফল্য এখন তার হাতের নাগালে। একশ' উটের লালসায় সে ঘোড়া আরো দ্রুত গতিতে চালালো। পরমুহূর্তেই তার দ্রুতগামী ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। সোরাকাও মুখ থুবড়ে নীচে পড়ে গেলো। কিন্তু দ্রুত সে আবার উঠে দাঁড়ালো। ঘোড়াকে উঠিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারী করালো এবং লাফিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করলো।

নবীজী সা. আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে নিশ্চিন্তে পথ অতিক্রম করছিলেন। শত্রু যখন একেবারেই কাছে চলে এসেছে, তখন রাসূল সা.-কে সতর্ক করা হলো। রাসূল সা. একবার সুরাকাহর দিকে তাকালেন এবং স্বীয়

পরওয়ারদিগারের কাছে ফরিয়াদ করলেন- পরওয়ারদিগার! তুমি তার থেকে আমাদের রক্ষা করো।

পবিত্র মুখ থেকে কথা শেষ হওয়া মাত্রই ঘোড়ার পা মাটিতে ডেবে গেলো। সুরাকাহ সশব্দে মাটিতে পড়ে গেলো। সে বুঝতে পারলো, আল্লাহ নিজেই এদেরকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সোরাকা অত্যন্ত অসহায়ত্বের সাথে নিজের জীবনের নিরাপত্তা চাইলো। নবীজী সা. তার জীবনের নিরাপত্তা দিলেন।

সুরাকাহ বললো, আমি আপনার কাছে ওয়াদা করছি, আপনার পেছনে যারা আসবে, তাদের সবাইকে আমি পথ থেকেই ফিরিয়ে দেবো। সোরাকাহ শপথ করে ফেরার সময় নবী কারীম সা. বললেন, সোরাকাহ! তখন তোমার শান শওকত কেমন হবে, যখন তোমার হাতে কিসরার বাজুবন্ধ পরিয়ে দেওয়া হবে?

কয়েক বছর পরই এই সোরাকাহ নবীজী সা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আপনার জন্য আত্মোৎসর্গকারীদের কাতারে শামিল করে নিন। নবী কারীম সা. তাকে কালিমা পাঠ করিয়ে নিলেন। হৃদয়বিদারক সেই অতীতের ব্যাপারে একটি শব্দও মুখে আনলেন না।

ফারুকে আযম রা.-এর শাসনামলে যখন মাদায়েন বিজিত হলো, কিসরার মুকুট, সোনাদানাসহ অনেক দামি গয়না হযরত উমর ফারুক রা.-এর সামনে উপস্থিত করা হলো তখন ফারুকে আযম রা. সোরাকাহকে কাছে ডাকলেন। তার হাতে কিসরার সেই বজুবন্ধ পরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আল্লাহু আকবার! সেই মহান সত্ত্বার কী কারিশমা! তিনি কিসরার বাজুবন্ধ আরবের মূর্খ সোরাকাহকে পরিধান করিয়েছেন।

তিন. হিজরতের তৃতীয় বছর চলছে। বদর প্রান্তরে নিহতদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কুরাইশরা অস্থির হয়ে আছে। উমাইর ইবনে ওয়াহাব নামে এক ব্যক্তি নবী কারীম সা.-এর প্রাণঘাতী শত্রু ছিলো। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া অনেক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে নবী কারীম সা.-কে হত্যা করার জন্য মদীনায় পাঠালো। উমাইর নিজের তলোয়ারে বিষ মিশিয়ে নিলো। নবীজী সা.-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রবেশ করলো।

সাহাবায়ে কেরাম ভাবভঙ্গি দেখে তার উদ্দেশ্য বুঝে তার সাথে কঠোর আচরণ করতে চাইলেন। কিন্তু রাসূল সা. এটা পছন্দ করলেন না। তিনি অত্যন্ত স্নেহ নিয়ে উমাইরকে কাছে ডেকে বসালেন। ভালোবাসাপূর্ণ কথাবার্তা বললেন। তারপর চুপিসারে তার সেই গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রহমতে আলম সা.-এর মুখে এ কথা শুনে সে অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। তার অন্তর কেঁপে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, আমার ভাগ্য আমাকে এখানে টেনে এনেছে। এখন এখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই। আল্লাহর রাসূল সা. তার মনের অবস্থা বুঝতে পারছিলেন। তিনি উমাইরকে

আশ্বস্ত করে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখানে থাকতেও পারো, চলে যেতেও পারো। কেউ তোমাকে কিছুই বলবে না। অতুলনীয় এই দয়া দেখে তার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। পূর্বের ঘৃণা ভালোবাসায় রূপ নিলো। অন্ধকার থেকে সে আলোর মুখ দেখলো। সে কপাল থেকে অনুতাপের ঘাম মুছে বললো, 'আমার বাবা-মা আপনার ওপর কোরবান হোক। আমাকে কালিমা পাঠ করিয়ে আপনার জন্য আত্মদানকারীদের কাতারে শামিল করে নিন।' উমাইর ইসলামের পরম সৌভাগ্যে ধন্য হয়ে মক্কায় পৌঁছুলেন। এবং সেখানে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজে নিয়োজিত হলেন। (দায়িয়ে আ'যম)

## বুজুর্গদের জ্ঞানগর্ভ বাণী

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.- যাঁর অস্থির হৃদয় চোখ উম্মতের সংশোধনের চিন্তায় মগ্ন থাকতো। যিনি দীনের দরদ, সুন্নতের অনুসরণ, ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টি এবং দীনের কাজের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন এই যুগে উম্মতের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি বলেন: সময় এক চলন্ত রেলগাড়ি। ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড রেলের বগির মত। আর আমাদের ব্যস্ততা সেই বগিগুলোতে বসে থাকা যাত্রীদের মতো। দুঃখজনক হলো, রেলগাড়ির বগিগুলোর ভেতরে জাগতিক ব্যস্ততা এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, আমরা গন্তব্যের কথা ভুলেই গেছি পরকালের চিন্তা করার সময়ই পাচ্ছি না। আমাদের উচিত দৃঢ় স্বংকল্প করে জাগতিক ব্যস্ততা বাদ দিয়ে আখেরাতের কাজ করা। যা আল্লাহকে খুশি করবে এবং আমাদের আখেরাত অর্জনের মাধ্যম হবে।[৮১]

## ক্লাস ও সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া

মুফতী মাহমুদুল হাসান গাঙ্গোহী রহ. এক মজলিসে বলেন, এমন লোক দেখলে আমার খুবই কষ্ট হয়, যে ছাত্রদের ক্ষতি করে। আমি দিনের পর দিন অসুস্থ থেকেও ছাত্রদের পড়াতাম। শুধু ছাত্রদের ক্ষতি হবে এই ভয়ে। আমার আব্বাজানেরও এই অভ্যাস ছিলো। তিনি বলতেন, শায়েখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. এর চাচা দাঈয়ে আ'যম হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ. হেজায থেকে সাহারানপুর ফিরছিলেন। রেলগাড়ি এমন সময় স্টেশনে পৌঁছার কথা ছিলো, যখন হযরতের ক্লাসের সময় ছিলো। তিনি চাচাকে আনতে স্টেশন গেলেন না এই চিন্তা করে যে, ছাত্রদের ক্ষতি হবে।[৮২]

যেভাবে ক্লাসে শিক্ষকের অনুপস্থিতির কারণে প্রিয় ছাত্রদের ক্ষতি হয় ঠিক তেমনি দেরি করে ক্লাসে উপস্থিত হলেও ছাত্রদের কষ্ট ও ক্ষতি হয়। অপেক্ষা

---

৮১. মালফুযাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস: ৩৮।

৮২. মালফুযাতে ফকীহুল উম্মত: ২/১৯৪,১৯৫।

করার সময় একাগ্রতা থাকে না। ফলে কোন কাজও হয় না, ছাত্ররা বসে বসে গল্প গুজব করে অথবা এদিক ওদিক চলে যায়। এভাবে সময় নষ্ট হয়ে যায়।

মাদরাসায়ে শাহীর সদরুল মুদাররিসীন ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল জাব্বার সাহেব আযমী রহ. নিজের অনেক ব্যস্ততা থাকার পরও ঘণ্টা শুরু হওয়ার পাঁচ-দশ মিনিট আগেই ক্লাসের সামনে এসে বসে থাকতেন। আর সময় শুরু হওয়া মাত্রই ক্লাসে প্রবেশ করতেন। অথচ এক যুগ তিনি কোনো বেতন নেন নি। বলতেন, বেতন না নেওয়ার মানে তো এই নয় যে, ছাত্রদের সময় নষ্ট করা যাবে!

## হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর উপদেশ

মুফতী তকী উসমানী দা.বা. লিখেছেন, মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. যেহেতু দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকতা ছাড়াও আধ্যাত্মিক জগতেরও শায়েখ ও রাহবার ছিলেন, হযরতের কাছে জনসাধারণের বেশ আসা-যাওয়া ছিলো। এ কারণে অনেক সময় দরসগাহে পৌঁছতে তার দেরি হয়ে যেতো। দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব দারুল উলূমের মুরুব্বী কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর কাছে সে বিষয়ে অভিযোগ পেশ করলেন। হযরত গাঙ্গুহী রহ. প্রথমে হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতভী রহ.-কে বোঝালেন। (কী বোঝালেন তা জানার আগে লক্ষ্য করুন! হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর দৃষ্টিতে হযরত মাওলনা ইয়াকুব নানুতবী রহ.-এর মর্যাদা কেমন ছিলো )। হযরত মুহতামিম সাহেবকে ডেকে তিনি বললেন, আমি তো মৌলভী মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেবকে সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব সম্পর্কে বলে দিয়েছি। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কখনো তাঁর সম্পর্কে এ ধরণের অভিযোগ আপনার কানে আসে, তাহলে আপনি এ বিষয়ে খুব বেশি ভাববেন না। আল্লাহর কসম! মৌলভী মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেবের মর্যাদা এমন যে, তিনি যদি একটি ক্লাসও না করান, মাদরাসায় শুধু দিনে একবার ঘুরে যান, এইটুকুই মাদরাসার জন্য যথেষ্ট এবং তাঁর বেতনের মূল্য উশুল হয়ে যাবে। এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হযরত গাঙ্গুহী রহ. মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী রহ.-কে যে উপদেশ দিয়েছিলেন. তা আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। তিনি বললেন, 'মাওলানা! এমনটা মনে করবেন না যে, জনসাধারণের সেবায় ব্যস্ত থাকার কারণে আপনার ওযর গ্রহণযোগ্য। যাদের সেবায় আপনি নিয়োজিত থাকেন তারা তো স্থানীয়। কিন্তু এই সকল ছাত্র যারা দূর-দূরান্ত থেকে ইলম অর্জনের জন্য এসেছে, যদি তাদের সময় নষ্ট হয় তাহলে পরকালে এদের হক নষ্ট করার জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।[৮৩]

বোঝা গেলো, 'ছাত্রের অধিকার' আর 'বৈতনিক অধিকার' দু'টি ভিন্ন ভিন্ন

---

৮৩. জাহাঁ দীদাহ: ৫১৬, ৫১৭।

অধিকার। আখেরাতে সব ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করা হবে। এ কারণেই হযরত গাঙ্গুহী রহ. একদিকে মুহতামিম সাহেবকে বলছেন, হযরত ইয়াকুব সাহেব রহ. মাদরাসায় একবার ঘুরে যাওয়াই মাদরসার জন্য যথেষ্ট। তাতে তাঁর বেতনের মূল্য উশুল হয়ে যাবে। অন্যদিকে ইয়াকুব নানুতুবী রহ.-কে বলছেন, যদি বিলম্বের কারণে আপনার অপেক্ষায় থেকে ছাত্রদের সময় নষ্ট হয় তাহলে পরকালে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ্ আমাকে ও অন্য সব আসাতেযায়ে কেরামকে আখেরাতের চিন্তা ও দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

## ইসলামী বিদ্যাপীঠসমূহের শিক্ষকবৃন্দ!

আল্লাহ্ তাআলা দয়া করে আপনাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের শিক্ষক বানিয়েছেন ও ধর্মীয় অভিভাবকত্বের মহান ও মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। আসহাবে সুফফা রা.-এর উপমা ও নবী কারীম সা.-এর মেহমানদের মুরুব্বী হিসেবে আপনাদের সম্মানিত করেছেন। আপনারা এদের অনুসরণীয় ও আদর্শ। ছাত্ররা আপনাদের অধীনস্থ ও অনুসারী। আপনাদের সামান্য অসাবধানতা তাদের বড় ধরনের পদস্খলনের কারণ হতে পারে। زَلَّةُ الْعَالِمِ زَلَّةُ الْعَالَمِ 'আলেমের পদস্খলন জগতের পদস্খলন'। এটা শুধু প্রবাদ নয়, বরং সত্য ও বাস্তবতা। এই কারণে দরসে সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে আপনার অলসতা ছাত্রদের চিন্তা ও মননে এবং মাদরাসার অন্য সকল কার্যক্রমের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। ছাত্রদের মধ্যেও এই অভ্যাস ঢুকে যেতে পারে। তারা যেখানেই যাবে এই ভুল অভ্যাসের প্রতিফলন ঘটাবে। যখন কোনো সহমর্মী ব্যক্তি তার ভুল ধরিয়ে বাধা দিতে যাবে, তখন নিজের উস্তাদদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে তাদের মুখ বন্ধ করার অনৈতিক সাহস দেখাবে। এভাবে আপনার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে একটি খারাপ কাজ চালু হয়ে যাবে এবং মত্যুর পরও যুগের পর যুগ ধরে আপনার আমলনামায় সেই পাপ লেখা হতে থাকবে। এটা স্পষ্ট যে, বিশৃঙ্খল পরিবেশে পড়াশোনাও হয় না, সংশোধনও হয় না। আপনার কারণে মুসলিম উম্মাহ যে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে, চিন্তাশীল ও বিবেচক উলামায়ে কেরামের কাছে এর ভয়াবহতা অস্পষ্ট নয়। মৃত্যুর পরেও এই বিপদ থেকে আপনি বা আমি মুক্ত নই। আল্লাহর নীতি হচ্ছে, প্রত্যেক অনুসরণীয় ব্যক্তিকে তার অনুসারীদের শাস্তির ভাগ নিতে হবে। হযরত জারীর রহ. বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ.

নবী কারীম সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম কাজ চালু করে, সেই কাজের সব আমলকারীর সওয়াব সে পেতে থাকবে। আমলকারীদের সওয়াবও একটুও কমবে না। আর যে ইসলামে কোনো মন্দ কাজ চালু করবে, তার নিজের পাপ এবং যারা ওই খারাপ কাজ করবে তাদের সবার পাপ তার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। আমলকারীদের পাপও একটুও কমবে না।[৮৪]

এখন আমরা যারা মাদরাসার বেতনভুক্ত, আইনত আমরা মাদরাসার কর্মচারী। তাই চাকুরীর ইসলামী সকল নিয়ম-কানুন আমাদের মানতে হবে। ক্লাসে নিয়মিত যথা সময়ে উপস্থিত হওয়া এবং আমাদের উপর অর্পিত সব দায়িত্ব পালন করা আমাদের কর্তব্য। এতে অবহেলা করা শুধু প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে উদাসীনতা নয়, বরং ইসলামী কানুনের পরিপন্থি ও গুনাহের কাজ। যথাসম্ভব এর থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। ত্রুটি হয়ে গেলে তওবাহ-ইস্তেগফার জরুরি। শুধু তওবা-ইস্তেগফারই যথেষ্ট নয়, প্রতিষ্ঠানের যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়াও জরুরি।

## বিলম্বের ক্ষতিপূরণ কী ভাবে

আমাদের পূর্বসূরীদের নিয়ম ছিলো, যে কয় মিনিট বা ঘণ্টা দেরি হয়ে যেতো, তা স্মরণ রেখে নোট করে রাখতেন। সেই সময়গুলোর বেতন নিজেদের জন্য বৈধ মনে করতেন না। পুরো মাসের বিলম্বের হিসাব করে সে অনুপাতে বেতন থেকে কেটে নিতেন।

হযরত মাওলানা আখতার শাহ খাঁ সুম্ভুলী রহ. -যার তাকওয়া, পবিত্রতা ও জ্ঞানসাধনার কোনো তুলনা ছিলো না। (মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তাঁর কবর উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তখন লোকজন দেখতে পায়, তাঁর কাফন ও শরীর সম্পূর্ণ রক্ষিত রয়েছে। মাদরাসায়ে শাহীতে হাদীসের ক্লাস নিতেন, ফতওয়াও লিখতেন)। তাঁরও এই অভ্যাস ছিলো। কখনো যদি কোনো কারণে দেরি হয়ে যেতো, হিসাব করে বেতন কেটে নিতেন। হযরত মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ.-এর মালফুযাতে আরেকজন বুযুর্গ ব্যক্তির এমন অভ্যাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। মালফুযাতে ফকীহুল উম্মতের বর্ণনা অনুযায়ী ওই মাওলানা সাহেবের শিক্ষকতাকালে তার অবস্থা এমন ছিলো যে, কোনো ব্যক্তি যদি মাদরাসার সময়ে মাসআলা জানতে আসতো তাহলে বলে দিতেন। আর যদি কেউ এমনিতেই কথা বলার জন্য আসতো তাহলে সাথে সাথে ঘড়ি দেখে নিতেন যে, এতো বেজে এতো মিনিটে এসেছে এবং এতো বেজে এতো মিনিটে ফিরে গেছে। এই পুরো সময় তিনি একটি কাগজে লিখে রাখতেন। কাগজটি হযরতের কিতাবের ভেতরে থাকতো। মাস শেষে সব হিসাব মিলিয়ে যত ঘণ্টা

---

৮৪ . মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা

অথবা যত দিন হতো, পূর্ণ হিসাব অফিসে পাঠিয়ে বলে দিতেন, এতো ঘণ্টা এতো দিনের বেতন কর্তন করে রাখা হোক।[৮৫]

## মাদরাসার সময় কোথায় ব্যয় হবে

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেব (প্রাক্তন শায়েখুল হাদীস, মাদরাসায়ে শাহী)-কে দেখতাম, মাদরাসার সময়ের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। একবার একটি ঘটনা ঘটে। হযরত তখন শিক্ষাসচিব ছিলেন। তিনি মাদরাসার প্রধান দফতরে বসেছিলেন। তার এক সাথী এসে জিজ্ঞাসা করলো, লালবাগে যাবেন? মাওলানা সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উঠতে উঠতে ঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর এই বলে বসে গেলেন, এখনো পাঁচ মিনিট বাকি আছে। সাথী বললো, এখন তো কোনো কাজ বাকি নেই! হযরত বললেন, মৌলভি সাহেব! মাদরাসার সময় মাদরাসায়ই ব্যয় করা উচিত।

দুঃখজনক হলো, পূর্বসূরীদের এই মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি এখন বিলুপ্তির পথে, উত্তরসূরীদের এ বিষয়ে কোনো অনুভূতিও নেই।

وائے ناکامی! کارواں جاتا رہا
اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا
হায়! কাফেলা চলে যাচ্ছে,
আর কাফেলার হৃদয় থেকে ক্ষতির অনুভূতি লোপ পাচ্ছে।[৮৬]

## অপেক্ষার যন্ত্রণা

বর্তমানে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করার মানুষের অভাব নেই। বর্তমানে চারদিকে এমন বুদ্ধিমানদের ছড়াছড়ি, যারা অন্যের সময় নষ্ট করাকেও বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। এইটুকুও ভাবে না, যেখানে অন্যের সময়ের অবমূল্যায়ন করে অন্যকে অপেক্ষার উনুনে দগ্ধ করলে, তার মধ্যে উদাসীনতা ও খারাপ ধারণা তৈরি হয়। সে দেরি করার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠীর কর্তব্য হচ্ছে, সময়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সমাজে সেটির প্রতিফলন ঘটানো এবং এই সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখা। আলহামদুলিল্লাহ, আজও উম্মতের মাঝে এমন সচেতন ও অনুভূতিশীল মানুষ আছেন, যারা তাদের এই সুন্দর ভূমিকার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

## ইলমের সম্মান ও মর্যাদায় যেন আঘাত না আসে

বাদশাহ হারুনুর রশীদের ইচ্ছা ছিলো, হযরত ইমাম মালেক রহ.-এর কাছ থেকে হাদীস শুনবেন। ইমাম সাহেব বললেন, اِنَّ الْعِلْمَ يُؤْتَى وَلَا يَأْتِى (অর্থাৎ, ইলমের শান হলো, ইলম নিজ থেকে কারো কাছে যায় না, ইলমওয়ালার কাছে

---

৮৫. মালফুযাতে ফকীহুল উম্মত: ২/২১৯।

৮৬. মালফুযাতে ফকীহুল উম্মত।

এসে ইলম অর্জন করতে হয়।) হারুনুর রশীদ তখনকার সম্রাট হওয়ার পরও ইমাম সাহেবের অনন্য সম্পদ ইলম ও মারেফাতের কাছে এলেন । বৈঠকে উপস্থিত হয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়লেন। ইমাম সাহেব উস্তাদের সম্মান ও আদব শেখানোর উদ্দেশ্যে নবী কারীম সা.-এর হাদীস শোনালেন,

اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللهِ اِكْرَامَ ذِىْ الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ.

'আল্লাহকে সম্মানদানের অন্যতম উপায় হলো, বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা।'[৮৭]

হারুনুর রশীদ ইমাম সাহেবের ইঙ্গিত বুঝে নিজের জায়গা থেকে উঠে ছাত্রদের কাতারে গিয়ে বসলেন। এভাবে হারুনুর রশীদ হযরত ইমাম মালিক রহ.-এর কাছ থেকে ইলম শিখেছেন। কিছুদিন পর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তার সেই কথাটি আলেম এবং সম্পদশালীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে আছে। হারুনুর রশীদ ইমাম মালেককে বলেন,

يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ! تَوَاضَعْنَا لِعِلْمِكَ فَانْتَفَعْنَا بِهٖ وَتَوَاضَعَ لَنَا عِلْمُ سُفْيَانَ بِنْ عُيَيْنَةَ فَلَمْ نَنْتَفِعْ.

'হে আবু আব্দুল্লাহ! আমরা আপনার ইলমের সামনে বিনয়ী হয়েছি, এই ইলমের দ্বারা আমরা উপকৃত হয়েছি (হৃদয় তাতে প্রভাবিত হয়েছে, আমলের সুযোগ হয়েছে)। বিপরীতে হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আমাদের কাছে ইলম পৌঁছানোর জন্য বিনয়ী হয়েছেন, (তিনি আমাদের কাছে ডেকে পাঠানোর পরিবর্তে নিজেই আসতেন।) ওই ইলম দ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারিনি।'

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলতেন, ইলমকে ওই সময় পর্যন্ত সম্মানিত থাকে, যতক্ষণ তাকে রাজা-বাদশাহ ও দুনিয়াদারদের সামনে উপস্থাপন করা না হয়। যখনই ইলমকে তাদের সামনে উপস্থাপন করে দুনিয়া অর্জন করার ধারাবাহিকতা শুরু করে দেয়া হয়, তখন আল্লাহ এইসব আলেমদের অন্তর থেকে দীন ও ঈমানের স্বাদ বের করে দেন এবং তার ওপর আমল করার তাওফিক থেকে বঞ্চিত করেন।[৮৮]

## আয়েশা রা.-কে নবী সা.-এর তিন উপদেশ

يَا عَائِشَةُ! اِنْ اَرَدْتِ اللُّحُوْقَ بِىْ فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ رَاكِبٍ، وَاِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْاَغْنِيَاءِ، وَلَا تَسْتَخْلِقِىْ ثَوْبًا حَتّٰى تُرَقِّعِيْهِ (ترمذى)

হে আয়েশা! মৃত্যুর পর যদি আমার সঙ্গে মিলিত হতে চাও, তাহলে (তিন উপদেশ অনুযায়ী চলো)। এক. মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ জাগতিক সম্পদ

---

৮৭. আবু দাউদ : ৬৬৫২।

৮৮. কিতাবুল আদাবিশ শারইয়্যাহ: ২/৫৫-৬৫।

যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়। **দুই.** ধনীদের সহচর্য থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। **তিন.** তালি লাগার আগে পরিধেয় বস্ত্র পুরনো বলে ফেলে দিয়ো না।

অর্থাৎ খাবার ও পোশাক উভয় ক্ষেত্রেই যেন সাদামাটাভাব বজায় থাকে। ধনী ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকতে হয় কারণ, তাদের ভালো অবস্থা, আরাম-আয়েশ তোমাকে প্রভাবিত করতে পারে।

## হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর নবীপ্রেম

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে ফিরে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গাঙ্গুহ গিয়েছিলেন। হযরত গাঙ্গুহী রহ. প্রশ্ন করলেন, রওযা পাকের মাটি কোথায়? হযরত মাদানী রওযার মাটি বের করে দিলেন। হযরত গাঙ্গুহী রহ. সেটিকে নিজের সুরমায় মিশিয়ে নিলেন। সেই পবিত্র স্থানের মাটিকে নিজ চোখে জায়গা দিলেন। এমনই ছিলো তার নবীপ্রেম। কোথায় সেই সব লোক যারা এই বুযুর্গ ও নবীপ্রেমিকদেরকে রাসূল সা.-এর সাথে বেয়াদবী করার অপবাদ দেয়! এসো এবং নিজেদের অবস্থার সাথে তুলনা করো![৮৯]

## বিয়েতে সাহাবায়ে কেরামের অনাড়ম্বরতা

এক ব্যক্তি মুফতী মাহমুদুল হাসান রহ.-এর কাছে গিয়ে নিজের সন্তানের বিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার আবেদন করলো। তিনি বললেন, বিয়ের ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে গুরুত্ব রয়েছে। যার সহজ উপায় হলো, আসরের পর লোকদের বসিয়ে বলা হবে, আমার ছেলে বা মেয়ের বিয়ে। লোকজন বসে পড়বে এবং বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হবে। এর বাইরে হিন্দুস্থানে যে সব রীতি বাধ্যতামূলক পালন করা হয় এ সবই বাড়াবাড়ি। (সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর যুগে এই সব অহেতুক আনুষ্ঠানিকতার কল্পনাও করা যেতো না।)

হুযুরে আকদাস সা. একদিন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর শরীরে হলুদ রং দেখতে পেলেন, এটি এক ধরনের সুগন্ধির রং ছিলো। তিনি প্রশ্ন করলেন, এটা কী? আব্দুর রহমান ইবনে আওফ উত্তরে বললেন, আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। তখন নবীজী সা. তাঁকে ওলিমা করতে উৎসাহ দিলেন।[৯০]

হযরত জাবের রা.-এর ঘটনাও এরকম। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সা.-এর সাথে কোনো এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি দ্রুত চলছিলাম। নবীজী সা. প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার জাবের? এতো তাড়া কেনো? উত্তরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সদ্য বিয়ে করেছি। নবীজী সা. প্রশ্ন করলেন,

---

৮৯. মালফুযাতে ফকীহুল উম্মত: ৩/২৯৫।

৯০. বুখারী: ২/৭৫৯।

পূর্ব বিবাহিতা না কুমারী মেয়ে? আমি বললাম, পূর্ব বিবাহিতা।...[৯১]

এই দুই ঘটনা থেকে তো এটাই বোঝা যায়, হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা. হুযুরে আকদাস সা.-এর মাধ্যমে বিয়ে পড়ানোকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না। এমনকি সে বিষয়ে নবীজী সা. কে জানানোও জরুরি মনে করতো না। নবীজী সা. পরে জানতেন।

ফাতহুল কাদীরের ভাষ্যমতে:

كَانُوْا يَتَزَوَّجُوْنَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهٖ وَحُضُوْرِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ.

সাহাবায়ে কেরামের মনে কি এই বাসনা কাজ করতো না যে, নবী সা. তাঁদের বিয়ে পড়াবেন? অবশ্যই করতো। কিন্তু যেহেতু শরীয়তে এই কাজের বিশেষ গুরুত্ব নেই, তাই তাঁরা এর প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন না।[৯২]

## বিয়েতে অংশগ্রহণের উদ্দেশে যাওয়া

হযরত মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. বলেন, মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা আবরারুল হক সাহেব রহ. হারদুঈ থেকে আমার কাছে চিঠি পাঠালেন, আমার ভাগ্নির বিয়ের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমি এতে কাউকে দাওয়াত করিনি। শুধু আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি এবং এসে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ করছি।

উত্তরে আমি লিখলাম, উপস্থিতি সম্ভব নয়, সে কারণে ওযর পেশ করছি। হ্যাঁ, যদি আপনার জানামতে ভাগ্নির বিয়েতে দূর থেকে কাউকে দাওয়াত করা বিষয়ে কোনো বর্ণনা থাকে, তাহলে তা আমাকে জানালে বড়ই অনুগ্রহ হবে।[৯৩]

## সন্তানদের শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচান

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. রাসূলে কারীম সা. থেকে বর্ণনা করেন,

لَوْ أَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ أَنْ يَّأْتِيَ اَهْلَهٗ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا فَاِنَّهٗ اِنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهٗ شَيْطَانٌ اَبَدًا.

কোনো ব্যক্তি যখন স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করতে চাইবে সে যদি তখন এই দোয়া পাঠ করে- بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا যদি এই মিলনে তাদের ভাগ্যে কোনো সন্তান লেখা থাকে, তাহলে সেই সন্তানকে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। –মুসলিম

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, যখন কোনো ব্যক্তি সহবাসের ইচ্ছা করবে, কাপড় উন্মোচিত করার পূর্বে এই দোয়া পাঠ করে নেবে। بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا। যে ব্যক্তি এই দোয়া গুরুত্বের সঙ্গে পাঠ

---

৯১. বুখারী: ২/৭৬০।

৯২. মালফুযাতে ফকীহুল উম্মাত: ১/৩৬২-৩৬৪।

৯৩. মালফুযাতে ফকীহুল উম্মত: ৩/৪২৮।

করবে তার সন্তানদের ঈমান নিরাপদ থাকবে। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের এক মুরসাল রেওয়াত মতে, সে সন্তান নেককার ও সৎ হবে।

## এই দোয়া কখন পড়তে হবে ?

হাদীসে স্পষ্টই এসেছে, যখন সহবাসের ইচ্ছা করবে তখন এই দোয়া পাঠ করবে। বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত। হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থে আছে,

ذِكْرُ اللهِ حَالَ اِنْكِشَافِ العَوْرَةِ وَفِيْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ غَيْرُ مُسْتَحِبٍّ تَعْظِيْمًا لِاِسْمِ اللهِ تَعَالَى. (عنايه، كفايه، فتح القدير ص٧)

'যখন লজ্জাস্থান নিরাবরণ থাকবে অথবা নাপাক স্থানে থাকবে তখন আল্লাহর নাম নেওয়া মাকরূহ ও অপছন্দনীয়।'

ইমাম নববী রহ. বলেন,

اعلم انه يكره الذكر فى حالة الجلوس على البول والغائط وفى حالة الجماع (حاشية مسلم ١٦٢\١)

'সহবাস শুরু করার মুহূর্তে কিংবা সহবাস চলাকালীন সময়ে আল্লাহর যিকির করা আল্লাহর নামের সাথে বেয়াদবি এবং মাকরূহ। হ্যাঁ, তবে মনে মনে দোয়া করা যাবে।,

এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, কাপড় খোলার পূর্বে এই দোয়া পড়তে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যখন বীর্যপাত হতে থাকবে, তখন এই দোয়া করবে, اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ نَصِيْبًا. । মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

لَعَلَّهُ يَقُوْلُهَا فِيْ قَلْبِه أَوْ عِنْدَ اِنْفِصَالِه لِكَرَاهَةِ ذِكْرِ اللهِ بِاللِّسَانِ فِيْ حَالِ الْجِمَاعِ بِالْاِجْمَاعِ. (فتح المهم شرح مسلم شريف ٥٠٧\٣)

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- মুখে মুখে না পড়ে মনে মনে এই দোয়া পড়বে। কারণ সহবাস অবস্থায় মুখে যিকির করা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ।

## ভুল বুঝাবুঝির অবসান

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, 'সঙ্গমের মুহূর্তে এই দোয়া পড়া উচিত। তবে মনে একথা রাখবে না যে, এখানে আল্লাহর নাম রয়েছে। সঙ্গমের সময়ে কী ভাবে এই দোয়া পড়া যায়? এমনটি মোটেও না, বরং সঙ্গমের শুরুতেই এই দোয়া পড়ে নেওয়া সুন্নাত।' কিন্তু উল্লেখিত দলিলসমূহের আলোকে এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো হাদীসবিশারদ কিংবা ফকীহ উপরোক্ত আমলটি সুন্নত হওয়ার প্রবক্তা নন। একটু ভাবুন, যে কাজটি সমস্ত ফকীহদের মতে মাকরূহ

সেটি সুন্নত হয় কী ভাবে? বাস্তবতা হলো, যখন কেউ কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় শুধু নিজের চিন্তা ও যুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, বড়দের বক্তব্য ও মতামত জানার চেষ্টা না করে, তখন এরকম ভ্রান্তির শিকার হয়।

## হযরত হাসান বসরী রহ.-এর সত্য উচ্চারণ

প্রথম সারির তাবেয়ীদের তালিকায় হযরত হাসান বসরী রহ.-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন অসাধারণ সব গুণের অধিকারী ভাগ্যবান একজন মানুষ। সৌভাগ্য যদি একটি গাছ হয়, তাহলে তার সব শাখা যেন তাঁকে ছায়াদানকারী ছিলো। অত্যন্ত নেক ও পবিত্র পরিবেশে তাঁর জন্ম। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রা.-এর কোলে বেড়ে ওঠেন তিনি। নবী কারীম সা.-এর মোবারক ঘরে তিনি শৈশবের দিনগুলো কাটিয়েছেন। তাঁর মা হীরা হযরত উম্মে সালমা রা.-এর আজাদকৃত বাঁদী ছিলেন। তিনি তাঁর সেবাতেই সময় কাটাতেন। অনেক সময় এমন হতো যে, হযরত হাসান বসরী রহ.-এর মা কোনো কাজে বাইরে গিয়েছেন, এদিকে শিশু হাসান বসরী রহ. ক্ষুধায় কান্না আরম্ভ করেছেন, তখন উম্মে সালমা রা. তাঁকে কোলে নিয়ে বুকের সাথে মিশিয়ে দুধ পান করাতেন। এই সৌভাগ্য হযরত হাসান বসরী রহ.-কে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছিলো। এমনিতে হযরত উম্মে সালমা রা. নবীজীর সা.-এর স্ত্রী হওয়ার সুবাদে সমস্ত মুসলিমের মা, সাথে সাথে হযরত হাসান বসরী রহ.-এর দুধমাতাও হয়ে গেলেন।

হযরত উম্মে সালমা রা. অনেক জ্ঞানী, বিদূষী ও চিন্তাশীল নারী ছিলেন। হযরত আয়েশা রা.-এর পর নবীজীর স্ত্রীদের মাঝে সর্বাধিক রেওয়াতকারী তিনিই। তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৩৭৮টি। তিনি সেই বিরল নারীদের অন্যতম, যারা জাহেলিয়্যাতের যুগ থেকেই লিখতে জানতেন।

হযরত হাসান বসরী রহ. দুধমাতার কাছে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। প্রতিদিন তার জীবনে নতুন নতুন অর্জনের উজ্জ্বল পেখম যুক্ত হচ্ছিলো। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর ঘর সবসময় কল্যাণ ও বরকতে ভরপুর থাকে। বরকতের এই ঝর্ণাধারা থেকে তিনি প্রাণভরে পান করছিলেন। বড় বড় সাহাবী- হযরত উসমান ইবনে আফফান রা., হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রা., হযরত আবু মূসা আশআরী রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখের শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিলো। তাকে 'সাইয়িদুত তাবেয়ীন' (তাবেয়ীদের সর্দার) বলা হয়।

হযরত আলী ইবনে আবি তালেবের কাছে তিনি খুব আদরের ছিলেন। হযরত আলীর দীনি দৃঢ়তা, ইবাদতে একাগ্রতা, দুনিয়াবিমুখ জীবনযাপন এবং পার্থিব চাকচিক্যের প্রতি অনিহা হাসান বসরী রহ.-কে অনেক প্রভাবিত করতো। এর সাথে সাথে তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানগর্ভ বাণী, অন্তরে আলোকদানকারী

ভাষণ এবং হৃদয় কাঁপানো উপদেশমালা হযরত হাসান বসরী রহ.-এর মনকে বিমোহিত করে রেখেছিলো। এ কারণে তিনি যেভাবে তাক্বওয়া, পরহেজগারী, ইবাদত, বীরত্ব ও দুনিয়াবিমুখতার মতো গুণে তিনি হযরত আলী রা.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সফলতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তদ্রূপ অলংকারশাস্ত্র ভাষা ও বক্তৃতায়ও অনেকাংশে তাঁর রঙে রঙিন হয়েছিলেন।

## হযরত হাসান বসরী রহ.-এর বসরা গমন

হযরত হাসান রহ.-এর বয়স তখন চৌদ্দ। সবেমাত্র তারুণ্যে পা রাখলেন। তখন তিনি আপন পিতামাতার সাথে মদীনা থেকে বসরার দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে নিজ গোত্রের সাথে থাকতে শুরু করলেন। এখান থেকেই তাঁর নামের সাথে 'বসরী' শব্দটি যুক্ত হয়। তিনি মানুষের কাছে 'হাসান বসরী' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

এটা ঐ সময়ের কথা যখন বসরা ইসলামী প্রজাতন্ত্রে ইলমের কা'বা, ওলামাদের কেন্দ্র এবং মুহাদ্দিসদের উর্বরভূমিতে পরিণত হয়েছিলো। সেখানকার বড় বড় মসজিদ জ্যেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম এবং প্রখ্যাত তাবেয়ীগণের পদভারে মুখরিত থাকতো। জায়গায় জায়গায় কুরআন-হাদীসের মজলিস হতো। ইলমে নববীর ছাত্ররা জ্ঞানসুধায় নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণ করতো। হযরত হাসান বসরী রহ.ও তাঁর অধিকাংশ সময় সেইসব মজলিসে অতিবাহিত করতেন। বিশেষত মুফাস্সিরীনদের সরদার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মজলিস তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। ইলমে তাফসীর, হাদীস এবং ক্বেরাআত বিষয়ে তিনি ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছ থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন। এভাবে তিনি ইবনে আব্বাস রা.-এর বিশেষ ছাত্রদের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হন। ইলমের এই সকল মজলিস থেকে প্রবহমান জ্ঞানসুধা থেকে তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করে নিয়েছিলেন। শরয়ী ইলমের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছিলে। কিছুকাল পর তিনি শরয়ী ইলমের শিক্ষকতার আসন অলংকৃত করলেন। অল্প কিছুদিনেই নববী ইলমের প্রেমিকরা তাঁকে ঘিরে নিলো। মানুষ তাঁর চারপাশে বসতো সেই উপদেশমালা শোনার জন্য, যা পাথুরে হৃদয়কে মোমের মত আর গুনাহগার চোখকে অশ্রুসিক্ত করে দিত। তার মজলিসে মানুষ এমন নীরব নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতো, যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। তাঁর বিবেক জাগানিয়া প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীতে নিজেদের সুসজ্জিত করতো। সেগুলোকে নিজ আত্মার রক্ষাকবচ হিসেবে সঞ্চয় করতো এবং তাঁর সুন্নতে নববীর শিক্ষাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে গর্ববোধ করতো। যা তাদের কাছে মেশকের সুগন্ধি থেকেও বেশি পবিত্র ও প্রিয় ছিলো।

এভাবে হযরত হাসান বসরী রহ. ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই সময়ের প্রভাবশালী রঈসরা এবং ধনী ব্যক্তিরাও তাঁর থেকে দীনের জ্ঞানগর্ভ

কথা শুনতে উৎসুক থাকতেন।

খালেদ ইবনে সফওয়ান বলেন, 'একবার হীরা নামক স্থানে আমার সাথে মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিকের সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে বললেন, খালেদ! আমাকে হাসান বসরী রহ. সম্পর্কে বলো তো! আমার ধারণা, তাঁর সম্পর্কে তুমি সবার চেয়ে বেশি জানো। আমি উত্তর দিলাম, আপনি সঠিকই বলেছেন। হাসান বসরীর বিষয়ে আমিই সবচেয়ে বেশি জানি। মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক বললেন, তাহলে তোমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো। আমি বললাম, হাসান বসরী রহ. এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর ভেতর তার বাইরের মতই স্পষ্ট। যখন কোনো অন্যায় কাজে বাধা দেন, সবার আগে তিনি নিজে সেই কাজ থেকে বিরত থাকেন। তিনি মানুষের পরোয়া করেন না। ধন সম্পদে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। আমি মানুষের মধ্যে তাঁর জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও তাঁর প্রতি প্রবল ভালোবাসা দেখেছি। এইটুকু শুনে মাসলামাহ ইবনে আব্দুল মালিক বলে উঠলেন, খালেদ ইবনে সফওয়ান! চুপ হয়ে যাও! সেই জাতি কী ভাবে পথভ্রষ্ট হতে পারে যাদের মধ্যে হাসান বসরী রহ.-এর মতো পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন!'

## হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনামল

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফী যখন ইরাকের গভর্নর হলেন, তিনি তার নিজের রাজত্বে সব ধরনের অন্যায়, অবিচার ও নিপীড়নের ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন। হাসান বসরী ছিলেন সেইসব অকুতোভয় মহাত্মাদের একজন, যারা হাজ্জাজের মতো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়েছিলেন। তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষজনকে প্রতিবাদী করে তুলেছিলেন এবং তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলতে একটুও দ্বিধা করেননি।

হাজ্জাজ ওয়াসেত নামক স্থানে এক বিলাসবহুল মহল নির্মাণ করেছিলেন। নির্মাণের কাজ শেষ হলে তিনি ঘোষণা করে দিলেন, সবাই যেন বিনোদনের জন্য ভবনটিকে দেখতে আসে এবং এর বরকতের জন্য দোয়া করে। হযরত হাসান বসরী রহ. এই মূল্যবান সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তিনিও লোকজনের সাথে ওয়াসেতে গেলেন তো ঠিকই, কিন্তু আলিশান মহল পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে নয়; বরং উপদেশ দিতে এবং মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে তুলতে। তিনি চাচ্ছিলেন, পার্থিব জগতের তুচ্ছ চাকচিক্য বিষয়ে মানুষের মনে অনিহা সৃষ্টি করতে এবং তাদেরকে পরকালীন স্থায়ী ও চিরন্তন নেয়ামতরাজির প্রতি আগ্রহী করে তুলতে। তিনি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখলেন, বড় একটি অট্টালিকার চারপাশে লোকজনের প্রচুর সমাগম ঘটেছে এবং বিভিন্ন স্থানে লোকজন নৃত্য করছে। অট্টালিকার সৌন্দর্যে, উচ্চতায়, কারুকার্যে সবাই বিমোহিত।

## হাসান বসরী রহ.-এর হৃদয়ছোঁয়া ভাষণ

তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। এমন অর্থপূর্ণ কিছু কথা বললেন, যা শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেল এবং তিনি সম্পূর্ণ পরিবেশটাকে ওলট-পালট করে দিলেন। তিনি বললেন,

لَقَدْ نَظَرْتَنَا فِيْمَا ابْتَنَى اَخْبَثُ الْاَخْبَثِيْنَ فَوَجَدْنَا أَنَّ فِرْعَوْنَ شَيَّدَ اَعْظَمَ مَاشَيَّدَ وَبَنَى اَعْلَى مِمَّا بَنَى ثُمَّ اَهْلَكَ اللهُ فِرْعَوْنَ وَاَتَى عَلَى مَا بَنَى وَشَيَّدَ. لَيْتَ الْحَجَّاجَ يَعْلَمُ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ قَدْ مَقَتُوْهُ وَاَنَّ اَهْلَ الْاَرْضِ قَدْ غَرُّوْهُ.

'অতি মন্দ এক লোকের তৈরিকৃত মহল আমরা দেখছি। আমরা জানি, ফেরাউন তার থেকেও মজবুত এবং তার থেকেও উঁচু অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলো। তারপর আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর তার নির্মিত আকাশসম অট্টালিকা চূরমার করে দিয়েছেন। আহ! হাজ্জাজ যদি জানতো, আসমানবাসী তার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে আছে এবং যমিনবাসী তাকে ধোঁকা দিয়েছে!'

হযরত হাসান বসরী রহ. আবেগ ও পূর্ণ উদ্যমের সাথে নিজ বক্তব্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সহানুভূতির সাথে বললো, হযরত! চুপ করুন! আবার না হাজ্জাজের প্রতিশোধ ও শাস্তির মুখে পড়েন! হযরত হাসান বসরী রহ. উত্তর দিলেন,

لَقَدْ اَخَذَ اللهُ الْمِيْثَاقَ عَلٰى اَهْلِ الْعِلْمِ لَيُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُوْنَهٗ

'আল্লাহ তাআলা জ্ঞানীদের থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিয়েছেন যে, তারা মানুষের কাছে জ্ঞানের কথা প্রকাশ করবে, গোপন করে রাখবে না।

## হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ রাগে অগ্নিশর্মা

হযরত হাসান বসরী রহ.-এর দুঃসাহসী এই সত্যভাষণের সংবাদ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছে পৌঁছে গেলো। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি সভাসদদের মধ্যে গজরাতে লালগেন। উপস্থিত কর্মচারীদের গালমন্দ করে বলতে লাগলেন, তোমাদের সবাইকে আমি শাস্তি দেব! বসরার এক দাস আমার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা বলে গেলো আর তোমাদের কারো উত্তর দিতে অথবা তাকে চুপ করাতে সাহস হলো না? وَاللهِ لَاُسْقِيَنَّكُمْ مِنْ دَمِهٖ يَا مَعْشَرَ الْجُبَنَاءِ. (আল্লাহর শপথ! তার রক্তে আমি তোমাদের পিপাসা নিবারণ করাবোই হে ভীতুর দল!) এই কথা বলে মুহূর্তের মধ্যে তিনি তলোয়ার এবং চামড়ার সেই বেদী নিয়ে আসার আদেশ করলেন যার ওপর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে বসিয়ে মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তিনি জল্লাদকে ডেকে পাঠালেন। জল্লাদ সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর তিনি পুলিশকে আদেশ করলেন, তারা যেন হাসান বসরীকে নিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পর সবাই হযরত হাসান বসরী রহ.-কে সেখানে নিয়ে আসা হলো। সবাই চোখ বড় বড় করে তাকে দেখছিল। তাঁদের হৃদয় কাঁপছিলো। চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিলো। সাথে সাথে সবাই তাঁর সৎ সাহসকে সাধুবাদও জানাচ্ছিলো। হযরত হাসান বসরী রহ. যখন জল্লাদ এবং তরবারীর মুখোমুখি হলেন, সবাই দেখতে পেলো তার ঠোঁট নড়ছে। তারপর তিনি হাজ্জাজের দিকে তাকালেন; তাঁর চেহারায় ঈমানের ঔজ্জ্বল্য, ইসলামের সৌন্দর্য, সত্যবাদিতার নুর এবং একজন দাঈর গাম্ভীর্য ও আল্লাহর ভালোবাসার চিহ্ন ফুটে উঠেছিলো।

## ভীত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ

রাগে অগ্নিশর্মা হাজ্জাজ যখন হযরত হাসান বসরী রহ.-এর মত ফেরেশতাতুল্য মানুষকে এই অবস্থায় দেখতে পেলেন, হঠাৎ তিনি খুব ভয় পেয়ে গেলেন। মুহূর্তেই তার রাগ পানি হয়ে গেলো। হাসান বসরী রহ. কে নাম নিয়ে সম্বোধন করার অথবা তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহসও তার হচ্ছিলো না। হাজ্জাজ এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে, বুঝে উঠতে পারছিলেন না, তিনি এখন কী করবেন! কাঁপা গলায় তিনি বললেন, আরে আবু সাঈদ! (হযরত হাসান বসরী রহ.-এর উপনাম)। এদিকে আসুন! বসুন! এরপর বিভিন্ন ভাবে তিনি তার খাতির তোয়াজ করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে হাজ্জাজ তাঁকে নিজের স্থানে বসালেন। সবাই হতভম্ব হয়ে গেলো। হাসান বসরীর কাছে এমন কি শক্তি আছে যে, তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মতো স্বৈরশাসক ও প্রতিশোধপ্রবণ ব্যক্তির দৃঢ় স্বংকল্পকে এভাবে বদলে দিলেন। যখন হাসান বসরী রহ. আসন গ্রহণ করলেন। আর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একজন বিনয়ী ছাত্রের মত তাঁর সামনে বসে বিভিন্ন দীনি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। হযরত হাসান বসরী রহ. অনন্য উপস্থাপনায় শান্তভাবে তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চললেন। তাঁর দৃঢ়তা, নির্ভীকতা দেখে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ প্রভাবিত হয়ে বললেন:.يَا اَبَا سَعِيْدٍ اَنْتَ سَيِّدُ الْعُلَمَاءِ (আপনি আলিমকুল শিরোমণি হে আবু সাঈদ!। অতঃপর সে মেশকে আম্বর দিয়ে তৈরি উন্নত একটি সুগন্ধি হযরত হাসান বসরী রহ.-এর খেদমতে পেশ করলেন। হাসান বসরী রহ. যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন হাজ্জাজের এক প্রহরী তাঁর পেছন পেছন এসে বললো, হযরত! হাজ্জাজ আপনার সাথে মহানুভবতা ও সম্মানসুলভ আচরণ করেছে, যা তার আগের ইচ্ছার বিপরীত ছিলো। আপনি যাওয়ার আগে সে আপনাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলো। আর সে একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার পর তো একচুল এদিক ওদিক করে না। আমি আপনার কাছে শুধু জানতে চাই, আপনি যখন হাজ্জাজের সভায় উপস্থিত হলেন এবং আপনার দৃষ্টি জল্লাদ ও তলোয়ারের ওপর পড়লো, তখন আপনি ঠোঁট নাড়িয়ে কী বলেছিলেন?

হযরত হাসান বসরী রহ. উত্তর দিলেন, আমি শুধু আমার আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে এ প্রার্থনা করেছিলাম-

يَا وَلِيَّ نِعْمَتِيْ وَمَلَاذِيْ عِنْدَ كُرْبَتِيْ اِجْعَلْ نِقْمَتَهُ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلَيَّ كَمَا جَعَلْتَ النَّارَ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ. (صور من حياة التابعين ٩٥-١٠٤، الحب الخالد ١٧٨، الطبقات الكبرى لابن سعد ١٥٦/٧)

'হে নেয়ামতদাতা! বিপদে রক্ষাকারী আল্লাহ! আমার বিরুদ্ধে হাজ্জাজের প্রতিশোধ-ইচ্ছা ও ক্রোধ আপনি শীতল করে দিন যেরূপ আগুনকে ইবরাহীমের ওপর শীতল করেছিলেন।'

অন্তর থেকে বেরিয়ে আসা এই বাক্যটিই তার ওপর এই প্রভাব বিস্তার করেছে। রবের দরবারে তার প্রেমিকের প্রার্থনা কবুল হয়েছে। আর এটাই তার রক্তপিয়াসী স্বংকল্পকে চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছতে বাধা দিয়েছে। যার সব প্রস্তুতি হাজ্জাজ নিয়ে ফেলেছিলো। নইলে কী ভাবে কল্পনা করা যায় যে, হাজ্জাজ মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্তের পর আবার তা প্রত্যাহার করে নেবে! আল্লাহ্‌র সাথে হযরত হাসান বসরী রহ.-এর সম্পর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলো। তাঁর ভালোবাসা ছিলো সততাপূর্ণ। যখন রবের সাথে কোনো অন্তরের ভালোবাসার সম্পর্ক হয়ে যায়, তখন কোনোকিছুই তার পথে বাঁধা হয় না। মানুষের অসন্তুষ্টি ও শত্রুতার পরোয়া করা ছাড়াই তারা সত্য ও মিথ্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সবার হৃদয়ে সেই ভালোবাসার আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে দেন। যাতে আমরা সেই চিরন্তন সৌভাগ্যের ধারায় নিজেদের সিক্ত করে নিতে পারি। আমাদের মুখে মুখে সব সময় এই প্রার্থনা থাকা উচিত,

اِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِيْ، وَفِيْ نَفْسِيْ لَكَ رَبِّ فَذَلِّلْنِيْ، وَفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنِيْ، وَمِنْ سَيِّئِ الْاَخْلَاقِ فَجَنِّبْنِيْ.

হে প্রভু! আমাকে আপনার প্রিয়ভাজন বানান। আমার হৃদয়কে আপনার অনুগত করুন। মানুষের চোখে আমাকে সম্মানিত করুন এবং অসৎ চরিত্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন।[৯৪] (আমিন)

## ইসলামের দৃষ্টিতে কুসংস্কার

ইসলামের প্রধান ভিত্তি আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহকে এক মানা। আল্লাহকে এক মানার অর্থ হচ্ছে, তিনি সত্তাগতভাবে একক, তাঁর কোনো বংশ বা পরিবার নেই। কোনো সন্তান বা আত্মীয়স্বজন নেই। আবার তিনি গুণগতভাবেও একক ও অনন্য। জীবন ও মৃত্যু তার হাতেই। তিনিই

৯৪. কানযুল উম্মাল: হাদীস নং ৫০৮৭।

রিযিকদাতা। তিনিই রিযিকে প্রাচুর্য ও অভাব দেন এবং কাউকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করেন। বিপদ থেকে রক্ষাকর্তা তিনি। সফলতা-ব্যর্থতা এবং জয়-পরাজয় তাঁরই নির্দেশে হয়ে থাকে। এই বিশ্বাস মানুষকে দ্বারে দ্বারে মস্তক অবনত করা থেকে রক্ষা করে। এই বিশ্বাস মানুষকে সব দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। মানুষ শুধু তারই দাস।

নফসের অনুসরণও এক ধরনের দাসত্ব। মানুষ চলার পথে কোনো কিছুতে হোঁচট খেলেও ভয় পেয়ে যায় এবং এ থেকে শুভ অশুভ বিচার করা শুরু করে। কারো সামনে দিয়ে কোনো জীবজন্তু অতিক্রম করলে মানুষ মনে করে এই যাত্রা বৃথা যাবে। আবার ঘরের ওপর কোনো পাখি এসে বসলেও এটাকে অশুভ মনে করে। বিশেষ পাথরের কোনো আংটিকে সাফল্য ও লাভের আশায় ধারণ করে। বিশেষ কোনো মাস, দিবস বা সময়কে অমঙ্গলজনক ও অশুভ মনে করতে শুরু করে। এই সব নফসের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। যে ব্যক্তি তাওহীদের বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত, আল্লাহর ওপর যার পূর্ণ বিশ্বাস নেই, তার জন্য এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। এ কারণেই উন্নত বিশ্বে- যেখানে শতভাগ মানুষ শিক্ষিত, সেখানেও দেখা যায়, তারা সুনির্দিষ্ট কিছু সংখ্যাকে অশুভ মনে করে।

আল্লাহর ওপর বিশ্বাস যার যত দৃঢ় হবে, মনের এই জাতীয় দাসত্ব এবং ভ্রান্ত ধারণার শৃঙ্খল থেকে সে ততো বেশি মুক্ত হয়ে যাবে। ইসলামপূর্বকালে আরবেও এরকম বিভিন্ন কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো। মানুষ সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পাখি উড়ে যেতে দেখলে পাখি যদি ডান দিকে যেতো তাহলে যাত্রা শুভ মনে করতো আর যদি বাম দিকে যেতো তাহলে যাত্রা অশুভ মনে করতো এবং সফর স্থগিত করতো। এরকম পেঁচাকে তারা অশুভ পাখি বলে মনে করতো। কারো ঘরে পেঁচা বসলে তারা মনে করতো, এই ঘর বিরাণ হয়ে যাবে। যে ভ্রমণে বের হবে সে সফলভাবে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। সফর মাসকে তারা অশুভ মনে করতো। ভাবতো এই মাসে যে বিয়ে হবে, তা মঙ্গলজনক হবে না। রাসূলে কারীম সা. এই সকল চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন: এগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই।[৯৫]

ছোঁয়াচে রোগের ধারণা, পাখি দেখে শুভ-অশুভ বিচার করা, পেঁচা এবং সফর মাসকে অশুভ মনে করার কোনো ভিত্তি নেই। আরবদের মাঝে এই ধারণাও ছিলো, মরুভূমিতে কিছু দুষ্ট আত্মা থাকে, যারা নিজেদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে এবং তারা মরুযাত্রীদের পথভ্রষ্ট করে। আরবরা এদেরকে 'গওল' বলতো। রাসূল কারীম সা. এ জাতীয় কাল্পনিক বিষয়ে বিশ্বাস করতেও নিষেধ করেছেন।[৯৬] আরববাসী শাওয়াল মাসকেও বিয়েশাদির জন্য

---

৯৫. বুখারী: অন্ধবিশ্বাস অধ্যায়।

৯৬. ফাতহুল বারী: ১/১৬৭।

অশুভ মনে করতো। রাসূল সা. হযরত আয়েশা রা.-কে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেছেন। উঠিয়েও নিয়েছেন শাওয়াল মাসেই। পরবর্তীতে আয়েশা রা. এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলতেন, আমার বিয়ের চেয়ে অধিক বরকতময় বিয়ে কার হতে পারে?

শিক্ষিত মানুষও অনেক সময় এ জাতীয় ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়।

উপমহাদেশে আমরা সামাজিক প্রথাসমূহের মধ্যে হিন্দুয়ানী প্রথার প্রভাব এমনভাবে মেনে নিয়েছি যে, আমরা তাদের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের বলয় থেকেও নিজেদের প্রভাবমুক্ত রাখতে পারছি না। তাদের মধ্যেও এইসব মনগড়া কুসংস্কার কাজ করে। আজকাল মুসলমানরাও মনে করে, পাকা সড়ক কাটা থাকলে সফর মুলতবি করে দেওয়া উচিত। পেঁচা বসা অপবিত্রতার লক্ষণ। যদি কোনো বধূর শশুর বাড়িতে আগমনের পর কারো মৃত্যু হয়, তাহলে তাকে কুলক্ষণা মনে করা হচ্ছে। ঘরের কাজ শুরু করার পর নারিকেল ভাঙা হচ্ছে। গাড়ি ক্রয় করা হচ্ছে তো কিছু লেবু ঝুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। আজকাল ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে 'দাস্ত' নামে এক নতুন প্রথার উদ্ভব হয়েছে। পণ্ডিত বলে দেয়, ঘর কোন ডিজাইনের হওয়া উচিত। মনে করা হয়, এর বিপরীত ডিজাইনে ঘর নির্মাণ করা হলে তা অকল্যাণ এবং ক্ষতির কারণ হবে। অথচ এটা ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করার কথা ছিলো, ঘর কোন ডিজাইনে হবে? কী ভাবে ঘর বানালে ঘরে আলো বেশি আসবে? কিন্তু এই পরামর্শও এখন পণ্ডিতের সাথে করা হচ্ছে। এরা কেবল পয়সার লোভে লোকজনকে মনগড়া কথা শুনিয়ে যাচ্ছে। এই সব কিছু আমাদের ঈমানের দুর্বলতা এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস দুর্বল হওয়ার ফলাফল। ভ্রান্তি এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, এখন কিছু মুসলমান বিবাহের বিষয়ে ওঝা-তান্ত্রিকদের সাথে পরামর্শ করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ইসলাম যে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুসলমানদের মুক্তি দিয়েছিলো, সেই শৃঙ্খলেই তারা আবার বন্দী হচ্ছে।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, নবী কারীম সা. স্পষ্টভাবে সফর মাস অশুভ হওয়ার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনায় নবীজীর হাদিস রয়েছে, তারপরও সফর মাসের ১৩ তারিখ এবং শেষ বুধবারকে অশুভ মনে করা হয়। কিছু মানুষ নিজেদের লাভ ও ব্যবসার জন্য মানুষের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে যে, এসব দিনে অনেক বিপদাপদ নেমে আসে এবং সে সব বিপদাপদ তারা দূর করতে পারে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো অশুভ মুহূর্ত নেই। নবী কারীম সা. কিছু মাস, কিছু রাত এবং কিছু মুহূর্তকে অবশ্যই বরকতময় বলেছেন। কিন্তু কোনো সময় বা মুহূর্তকে অকল্যাণময় বলেন নি। নবীজী সা. বলেছেন, যদি অশুভ কিছু থাকতো, তাহলে তিনটি জিনিসের মধ্যে থাকতো, নারী, ঘর ও বাহন। অর্থাৎ কোনো কিছুতেই অশুভ বলতে কিছু নেই। এই শিরকি ধারণার আড়ালে মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে লাভ-ক্ষতির সম্পর্ক এই

সব বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করছে। সঠিক জ্ঞানের সন্ধান পাওয়ার পরও মুসলমানরা মুর্খদের মত কাজকর্ম করছে, এরচে' বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে! আল্লাহ যাদেরকে লাঞ্ছনার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তারা এখন নিজেরাই সেই শৃঙ্খলে জড়িয়ে নিজেদেরকে কলুষিত করছে। আল্লাহই সহায়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এমন ঈমান দান করুন যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে। আমীন।

## যবান সংযত করা

এক ব্যক্তি কোনো বুযুর্গের কাছে জিজ্ঞাসা করলো, মানুষের মধ্যে কয়টি দোষ থাকে? বুযুর্গ বললেন, মানুষের তো এতো এতো দোষ থাকে যে, যদি তুমি গণনা করতে বসো গুনে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু তার একটি অনন্য গুণ আছে, যা তার সব অপরাধ ঢেকে দেয়। সেটি হচ্ছে যবানকে সংযত রাখা।

মিথ্যা, চোগলখুরি, খোশামোদ, দোষচর্চা, রুক্ষ কথা, অপবাদ দেওয়া, গালমন্দ করা, দোষ খুঁজে বেড়ানো, অভিশাপ দেওয়া, মিথ্যা কসম খাওয়া এবং অন্যের দোষ তালাশ করা— এগুলো সেই অন্যায় কাজের অন্তর্ভুক্ত যার সম্পর্ক মুখের সাথে। বর্তমান প্রেক্ষাপট ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, মানুষের পারস্পরিক কলহ, বিভিন্ন বংশীয় শত্রুতা এবং পারিবারিক দ্বন্দ্বের নেপথ্যে সবচে' বড় কারণ হলো যবানকে সংযত না রাখতে পারা।

প্রবাদে আছে, একবার জিহ্বা বত্রিশ দাঁতকে সম্বোধন করে বললো, তুমি আমার কত ভালো ভাই! আমার প্রতি কত যত্নশীল। বড়ই স্বাধীনভাবে তোমার অঙ্গিনায় নিরাপদ থাকি। বত্রিশ দাঁত উত্তর দিলো, বোন! কথা তো ঠিক। কিন্তু তুমিও আমার খেয়াল রেখো। আর মানুষের সাথে বিবাদে যেও না। নইলে যে কেউ তোমার বত্রিশ ভাইকে ঘর থেকে বের করে দেবে।

মুখের বাড়বাড়ি থেকে বাঁচার সবচে' সহজ উপায় হলো, মনে অন্যের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ না রাখা। যখন মনে হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে, তখন মুখেও গালমন্দ ও দোষচর্চা স্বভাবগত হয়ে যাবে। এই অনুচিত কাজগুলোই মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে।

পৃথিবীতে সবচে' সহজ কাজ অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো। অন্যের দোষ বর্ণনা করে অন্তরের আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে মানুষের মনে আঘাত দেওয়া, সাধারণ কথার বিপরীতে গালমন্দ করা এবং পদে পদে অপরের দোষ খোঁজা। এই মানসিকতা প্রমাণ করে, মানুষের অন্তরে অহংকার এবং আত্মগরিমার বীজ বপণ করা আছে, এই কারণেই সে যে কাউকে হীন ও তুচ্ছ মনে করে। এমন তিক্ত আচরণ ঘরে, অফিসে, বাসায়, প্রতিবেশীদের সাথে, পারিবারিক সম্পর্কে এবং বন্ধুমহলে বিরূপ প্রভাব ফেলে। একজন মুসলমানের পক্ষে মোটেও শোভা পায় না যে, নিজের রুক্ষ স্বভাব এবং বাড়াবাড়ির কারণে বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

মানুষের অভ্যাসই এমন যে, সে নিজের অপরাধ ও ভুলভ্রান্তির কারণে লজ্জিত না হয়ে অন্যের খুব সাধারণ কোনো কথার দোষ ধরে। অন্যের অপছন্দনীয় কথাবার্তার দোষ ধরাকে নিজের কর্তব্য মনে করে। মনে রাখা দরকার, অন্যের ওপর দোষ চাপানো ও সঙ্কীর্ণ মানসিকতা আগুনে তেলের কাজ করে। বিপরীতে কোমল কথা, ক্ষমা ও উদার মানসিকতা আগুন নিভিয়ে দেয়। আমরা নিজের অহংকার ও রুক্ষ আচরণের কারণে অন্যকে তুচ্ছ মনে করতে থাকি। পরিণতিতে মানুষ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এক কোণে একা পড়ে কাতরাচ্ছি। তারপরও আমাদের বুঝে আসছে না, কেনো এমন হচ্ছে? বাস্তবতা হলো, যখন কোনো মানুষের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে, তখন এই কাটা তার অন্তর থেকে কখনও বের হয় না।

ওই ব্যথার কোনো উপশম নেই, কথার তীরে হৃদয়ে যে জখম হয়েছে ।

শেখ সা'দী রহ.-এর একটি ঘটনা শোনা যাক:

এক মধুবিক্রেতা অত্যন্ত সদাচারী ও সুভাষী ছিলো। তার মিষ্টি কথার আকর্ষণে লোকজন তার চারপাশে জমায়েত হয়ে মৌমাছির মতো তাকে ঘিরে রাখতো। এভাবে তার সব মধু বিক্রি হয়ে যেতো। হিংসুকরা তাকে এতো কষ্ট ও যন্ত্রণা দিতে লাগলো যে, তার সদ্ব্যহার ধীরে ধীরে দূর্ব্যবহারে পরিণত হলো। এখন গ্রাহক তার সাথে কথা বলতে আসলে সে তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে এবং মন্দ কথা শুনিয়ে দেয়। এরকম চলতে চলতে তার কাছে ক্রেতা আসা বন্ধ হয়ে গেলো এবং তার অবস্থা খুব সংকটাপন্ন হয়ে দাঁড়ালো। একদিন সে স্ত্রীকে বললো, জানি না খোদা কী কারণে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। সারাদিন শুধু বসেই থাকি, কিন্তু মধু আর বিক্রি হয় না। স্ত্রী বললো, খোদা আগের মতোই দয়াবান আছেন। তবে তোমার ভাষা, চরিত্র ও চাল-চলনে পরিবর্তন এসেছে। আগে তুমি মিষ্টি কথা এবং সুন্দর আচরণ দ্বারা মানুষের মন কেড়ে নিতে। সবাই তোমার কথায় খুশি হয়ে অন্য মধুবিক্রেতাদের ছেড়ে তোমার কাছ থেকেই মধু কিনতো। এখন তোমার রুক্ষ কথার কারণে মানুষের মনে তোমার প্রতি অসন্তুষ্টি তৈরি হয়েছে। তারা তোমার তিক্ত কথা থেকে তারা দূরে থাকতে পছন্দ করে। তাদের কাছে এখন তোমার সুমিষ্ট মধু তিতা মনে হয়।

তিক্ত কথা বলা কিছু মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আর সে তখন কথায় কথায় কথাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করতে বাহানা খুঁজে নেয়। আজ যদি আমরা পারস্পরিক বিবাদ, ঘরে অশান্তি এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ খুঁজতে যাই, তাহলে এর নেপথ্যে কথায় বাড়বাড়ির প্রভাব স্পষ্টভাবে সামনে চলে আসবে। যদি আমরা আমাদের থানাগুলোতে, হাসপাতালসমূহে, আদালতে এবং কারাগারে পড়ে থাকা লোকগুলোর অবস্থা যাচাই করতে যাই, তাহলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবো যে, সেখানকার কত মানুষ নিজেদের অসহিষ্ণুতা,

রুক্ষ স্বভাব এবং মন্দ কথনের অভ্যাসের কারণেই এখানে পড়ে আছে। মোটকথা, শ্বাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর দ্বন্দ্ব, ননদ-ভাবীর মতপার্থক্য, ভাই-ভাইয়ের বিবাদ, স্বামী-স্ত্রীর বাদানুবাদ হোক, আর ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক তিক্ত কথাই হোক না কেনো, প্রতিটি ঝগড়ার পেছনে অন্ধ উন্মত্ততা এবং লাগামহীন কথাবার্তাই প্রধানত দায়ী।

গীবত লাগামহীন কথা বার্তার একটি উদাহরণ। এটা পারস্পরিক সম্পর্ককে কলুষিত করে এবং মানুষজনের মাঝে শীতল যুদ্ধের ভূমিকা হিসেবে কাজ করে। অন্যের দোষচর্চা থেকে আরো বড় অপরাধ হচ্ছে চোগলখুরি, এর নামে ওর কাছে- ওর নামে এর কাছে মিথ্যা কথা লাগানো। চোগলখুরি এমন নিকৃষ্ট কর্ম যে– পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেয় এই চোগলখুরি। সে জন্য নবী কারীম সা. বলেছেন, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

বলা হয়, এক চোগলখোর এক বুযুর্গের কাছে এসে বললো, অমুক ব্যক্তি আপনাকে গালি দিচ্ছিলো। বুযুর্গ তাকে বললেন, তুমিও তো বড় আজব কিসিমের বন্ধু! যে তীর সে আমাকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়েছে, তা আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি। এখন তুমি সেই তীর উঠিয়ে আমাকে বিদ্ধ করছো, যেন আমি তার বেদনা অনুভব করি।

আল্লাহ তাআলা মানুষের যবানে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা দু'টি মনের মিলন ও বিচ্ছেদে প্রবল প্রভাব রাখে। যবান থেকে নিসৃত একটি কষ্টদায়ক কথা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ তীরের মতো হৃদয়ে বিঁধতে পারে। এই আঘাতের উপশম খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এই জিহ্বাই তো আমাদের বন্ধনগুলোকে উন্নতির শিখর থেকে অবনতির গহ্বরে নামিয়ে দিতে পারে। আবার এই জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত কোনো উত্তম কথা কিংবা প্রশংসাবাক্য, সহমর্মিতায় ভরা কোনো উক্তি বা সান্ত্বনার বাণীই আমাদের বন্ধনকে দৃঢ় করতে পারে।

আমাদের সমাজে দোষচর্চা এতো বেড়ে গিয়েছে, এটা যে অন্যায়, এই অনুভূতিই এখন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রতিটি ঘরে, এলাকায়, পরিবারে বিশৃঙ্খলা ও বন্ধনহীনতা তৈরি হচ্ছে। নবী কারীম সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচে' দূর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যার যবানের কারণে তার থেকে লোকজন দূরে থাকে। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, গালমন্দকারী, অন্যের দোষচর্চাকারী, চোগলখোর, মিথ্যা ওয়াদাদাতা এবং কথায় কথায় ঝগড়াকারী সমাজে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকে। পার্থিব জগতের এই ক্ষতিগুলো ছাড়াও মনে রাখা দরকার, পরকালে আমাদের প্রতিটি কথার হিসাব দিতে হবে। তাই খুব সাবধানে কথা বলা উচিত। আমাদের সব কথা সংরক্ষিত করে রাখা হচ্ছে। আল্লাহ বলেন, মানুষ মুখে যা উচ্চারণ করে তার জন্য সদা সংরক্ষণকারী একজন প্রস্তুত থাকে।[৯৭]

---

৯৭. সূরা ক্বাফ: ১৮।

হিজরতের পথে সফররত অবস্থায় কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর নবী সা. তখন মক্কা থেকে বেশ দূরে মদীনার কাছাকাছি ছিলেন। কুরাইশরা নবীজী সা.-এর মাথার জন্য বড় বড় পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো। বারীদা তার গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলো। সে পুরষ্কারের লোভে নবীজী সা.-এর পেছনে লাগলো। নিজের কিছু লোকজন সাথে নিয়ে সে নবীজীর সন্ধানে বের হলো। পথে একদিন সে নবী কারীম সা.-কে পেয়ে গেলো। তার খুশির অন্ত রইলো না। কিন্তু যখন নবীজীর সাথে কথাবার্তা হলো, তখন তার হৃদয়জগত পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখনই সে তার সব সাথীসহ ঈমানের সৌভাগ্য লাভ করলো। নবী কারীম সা.-এর কিছু কথাই বারীদায়ে আসলামীর ভাগ্য বদলে দিলো। বারীদায়ে আসলামী রা. নিজের পাগড়ি খুলে বল্লমে বাঁধলেন, তারপর পাগড়ির কাপড় উড়িয়ে এ সুসংবাদ দিতে দিতে নবীজীর সাথে চললেন-

'শান্তির সম্রাট, সমঝোতার রক্ষক, মানুষকে ন্যায়, ইনসাফ এবং কল্যাণের পথপ্রদর্শনকারী তাশরীফ নিয়ে আসছেন'।

## বিশ্বস্ত ক্রেতা

ত্বারেক ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি মক্কার 'সাউকুল মাজায' নামক এক বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে এসে মানুষদের ডেকে ডেকে বলছিলো:

يَا اَيُّهَا النَّاسُ! قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تُفْلِحُوْا-

'হে লোকসকল! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলো, সফলকাম হয়ে যাবে।'

এই লোকের পেছনে পেছনে আরেক ব্যক্তি ছিলো, যে তাকে পাথর নিক্ষেপ করছিলো আর বলছিলো, লোকসকল! এই ব্যক্তিকে সত্যবাদী বলে মনে করো না, এ বড় মিথ্যাবাদী।

লোকজন বলছিলো, প্রথম লোকটি তো বনু হাশিমের, নিজেকে খোদার প্রেরিত দূত বলে থাকে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তার চাচা আব্দুল উজ্জা (আবু লাহাব)

এই ঘটনার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেলো। নবী কারীম সা. মদীনায় চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই অবস্থান করছিলেন। ততদিনে ঘটনা বেশ পুরনো হয়ে গেছে। আমরা কয়েকজন খেজুর কেনার জন্য মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে আমরা অবস্থান গ্রহণ করলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, হাত-মুখ ধুয়ে শহরে প্রবেশ করবো। এমন সময় এক লোককে আসতে দেখা গেলো। তিনি দুটি পুরাতন চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। আমাদের সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোত্থেকে এসেছো? কোথায় যাবে?

আমরা উত্তর দিলাম, আমরা রাবযা থেকে এসেছি, এখানেই এসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী উদ্দেশ্যে এসেছো?

আমরা উত্তর দিলাম, মদীনার মিষ্টি খেজুর ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এসেছি।

আমাদের সাথে একটি সুন্দর লাল উট ছিলো। উটটির নাকে দড়ি বাঁধা ছিলো। আগন্তুক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি বিক্রি করবে? আমরা বললাম, করবো। তবে খেজুরের বিনিময়ে এবং এই পরিমাণ খেজুর লাগবে। আমাদের উত্তর শুনে তিনি চুপ রইলেন। এটাও বললেন না, তোমরা বেশি খেজুর চাচ্ছো, কিছু কম দিবো। তার বদলে তিনি উটের দড়ি হাতে নিয়ে শহরের দিকে যাত্রা করলেন। আমরা হতভম্ব হয়ে তাঁকে দেখতে থাকলাম। যখন তিনি আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেলেন তখন আমাদের হুশ হলো। আরে! আমরা এ কী করলাম! অচেনা অপরিচিত এক মানুষের হাতে আমাদের উট তুলে দিলাম! না আমরা তাঁকে চিনি, না তাঁর ঠিকানা জানি। এখন কী হবে? হাওদার ভেতরে বসে আমাদের সর্দারের স্ত্রী আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, তোমরা বিন্দুমাত্র চিন্তা করো না। আমি ক্রেতার চেহারা দেখেছি। তার চেহারা চাঁদের চেয়েও বেশি আলোকিত ছিলো। এ ব্যক্তি ধোঁকা দিতে পারে না। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, এ লোক যদি দাম না দেয়, তবে আমি দিয়ে দেবো।

এই সব কথাবার্তা চলছিলো। এর মধ্যেই এক লোক শহরের দিক থেকে জোর কদমে এগিয়ে এলো এবং বললো, আমাকে রাসূল কারীম সা. পাঠিয়েছেন। উটের বিনিময়ের খেজুরও দিয়েছেন, সাথে সাথে তোমাদের আপ্যায়নের জন্যও ভিন্ন খেজুর পাঠিয়েছেন। এই নাও! বিনিময়ের খেজুর গ্রহণ করে দেখে নাও ঠিক আছে কিনা? আমরা খেজুর গ্রহণ করলাম এবং আনন্দচিত্তে খেলাম। তারপর মদীনা নগরীতে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, সেই ক্রেতা ব্যক্তি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন—

'হে লোকসকল! তোমরা দান-সদকা করো। দান-সদকা করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। উপরের হাত নিচের হাতের তুলনায় অনেক উত্তম। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন ও ক্রমানুসারে সমস্ত প্রিয়ভাজনের জন্য ব্যায় করো।'

## মোবাইলের ক্ষতি

গান শোনা তারই ভালো লাগে যার হৃদয়ে নোংরামি আছে। মোবাইলে গানের আওয়াজ বাজিয়ে সে শুধু নিজে গুনাহের ভাগিদার হচ্ছে তা নয়; বরং অন্যকেও সে গুনাহে শরীক করছে। কার্যত তাদের গুনাহের দায়ভারও নিজের কাঁধে টেনে নিচ্ছে। আফসোস সে উম্মতের জন্য, যাদের সর্দার ও শিরোমণি রাসূলে আকরাম সা. বলে গেছেন, আমাকে বাদ্যযন্ত্র (অর্থাৎ মিউজিকের সরঞ্জাম, গান-বাজনা ইত্যাদি) ধ্বংস করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। আজকাল সেই নবীর নাম জপকারীদের একটি বড় অংশ এই বিপদে আক্রান্ত। হযরত জাবের রা. বলেন, নবী কারীম সা. ইরশাদ করেছেন- غِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ অর্থাৎ গান-বাজনা সেভাবে নেফাক তৈরি করে যেভাবে পানি শস্য উৎপন্ন করে।

এ হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, যার কাছে গান ভালো লাগে তার মনে

নেফাক তৈরি হয়ে আছে। একজন সৎ ও নেফাকমুক্ত মুসলমান কখনোই গানের কাছেও যেতে পারে না। গান-বাজনা তো আজকাল এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, ছোট ছোট বাচ্চারাও হাঁটতে চলতে গুনগুন করে গান গাইতে থাকে। এগুলো টিভির কুপ্রভাব। টিভি আসলেই একটি রোগ। এটি পুরো পৃথিবীতে অশ্লীলতা ও নোংরামী ছড়িয়ে দিচ্ছে। অনেক ধর্মভীরু মানুষও আজকাল বিভিন্ন ছুঁতায় ঘরে টিভি রাখছেন। নিজেদের অভিশাপের ভাগিদার করে নিচ্ছেন। এটা স্পষ্ট যে, যে ঘরে টিভি রয়েছে সে ঘরে লজ্জা নামক অনুভূতির কবর রচিত হয়েছে। আজকাল টিভি চ্যানেলগুলো সংবাদ প্রচারের পাশাপাশি কিছুক্ষণ পর পর বিজ্ঞাপন দেখানোর নামে অশ্লীল দৃশ্য প্রচার করছে। যা দেখে ঘরের সমস্ত মানুষ, বাচ্চা থেকে বুড়ো, নামাযী কি হাজী, বাবা- মেয়ে সবাই লজ্জার মাথা খেয়ে ফেলছে। আর এখন স্মার্টফোন এসে ক্ষতের ওপর লবণ ছিটিয়ে দেওয়ার কাজ করছে।

## মোবাইলের মাধ্যমে বিরক্ত করা

মোবাইলের মাধ্যমে অকারণে অন্যকে ডিস্টার্ব করা এটা এখন সাধারণ প্রথার মতো হয়ে গেছে। বিনা কারণে মিসকল দিয়ে নিজের ফোন বন্ধ করে রাখার মত দুষ্কর্ম তো ব্যাক্তিগত পর্যায়ে ব্যাপকভাবে হচ্ছে। নোংরা স্বভাবের ছেলে-মেয়েরা বন্ধুত্ব করে বেড়াচ্ছে এবং তাতে অন্য সম্ভ্রান্ত মানুষ পেরেশান হচ্ছেন। আর মোবাইল কোম্পানীগুলো বিজ্ঞাপনের নামে মেসেজ পাঠাতেই থাকে, আর ফোনও করতে থাকে। এতে মোবাইল ব্যবহারকারী যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন। অভিজাত মানুষজন চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছেন, মোবাইলের এসব সমস্যার সমাধান কী? কীভাবে এই সব অর্থহীন মেসেজ এবং অনর্থক কল বন্ধ করা যায়? টাকা খরচের ভয়ে মিস্‌ড কল দেওয়া কিছু মানুষের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কাজ শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও গর্হিত ও অনুচিত। মুসলমান তো সে, যে অপরের জন্য তাই চায় যা নিজের জন্য চায়। হাদীসে এসেছে- اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ 'তুমি মানুষের জন্য তাই পছন্দ করো যা নিজের ক্ষেত্রে পছন্দ করো'। হ্যাঁ, কখনো কেউ নিতান্ত নিরুপায় হয়ে মিস্‌ড কল দিতে পারে। সেসব বিশেষ ক্ষেত্রে সমস্যা নেই। কখনো কখনো নিজের উর্ধ্বতন ব্যক্তি কিংবা অনুমতি প্রদানকারী ব্যক্তির সাথে এমন করতে পারে, সেক্ষেত্রে সমস্যা নেই।

## মোবাইল বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা

মোবাইল বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নির্দেশনা পেশ করা সঙ্গত মনে করছি। আশা করি পাঠক এতে উপকৃত হবেন এবং আল্লাহ যাকে তাওফিক দেবেন, সে আমল করবে। আর আমরা সাওয়াবের অংশীদার হবো।

১. সবার গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত, মোবাইল কি তার প্রয়োজন

নাকি তার শখ? প্রয়োজন হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেটা ব্যবহার করবে। প্রয়োজনের বাইরে অতিরিক্ত কথাবার্তা যেন না হয়- সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

২.যদি কেউ শখের বশে মোবাইল রেখে থাকে, তবে তার উচিত, এই শখ পরিহার করা। মোবাইলের এই শখ ধ্বংসাত্মক। মানুষের রক্ত-ঘামে উপার্জিত অর্থ খুব সহজেই নষ্ট করে মোবাইল। এমনকি মোবাইল প্রতিদিন অনেক মানুষের প্রাণও কেড়ে নিচ্ছে। হয়তো আমাদের কথার সাথে অনেকে একমত হবেন না। কিন্তু যদি কেউ কিছুদিন সংবাদপত্র পড়েন এবং সমাজকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আমার কথার সাথে একমত হবেন।

৩. একান্ত মোবাইল ব্যবহার করতে হলে শৃংখলা বজায় রেখে ব্যবহার করবে। সব সময় মোবাইল খুলেও রাখবেন না, সব সময় বন্ধও রাখবেন না। কিছু সময় আছে যখন মোবাইল বন্ধ রাখা অত্যন্ত জরুরী। নামাযের সময়, প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার মুহূর্তে, কিংবা ব্যক্তিগত বিভিন্ন কাজের সময় বা বিশ্রামের সময় মোবাইল বন্ধ রাখবেন। তাহলে আপনি মনযোগ সহকারে জীবনের ওই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করতে পারবেন।

৪.সাধারণ কল টোন ব্যবহার করুন। এতে বাজনা, গান ইত্যাদি না থাকা উচিত। তাহলে আপনি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন। ওয়েলকাম টোনও সাধারণ রাখবেন, এতে শ্রোতা হারাম মিউজিক শোনা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

৫.মোবাইল ব্যবাহারকারী সব সময় খেয়াল রাখবে, মোবাইলে যেন শুধু প্রয়োজনীয় কথাই বলা হয়। মোবাইল কোম্পানীর যে কোনো অফারই থাকুক না কেনো। টাকা খরচ না হলেও অতিরিক্ত কথার কারণে সময় তো নষ্ট হয়। আর সময়ের মূল্য কী অর্থের চেয়ে মূল্য কম? একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে, اَلْوَقْتُ اَثْمَنُ مِنَ الذَّهَبِ 'সময় স্বর্ণের চেয়েও দামি।' হাদীস শরীফেও অতিরিক্ত ব্যয় এবং অতিরিক্ত কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। বুখারী শরীফের বর্ণনায় হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. নবী কারীম সা. থেকে ইরশাদ করেছেন- اِنَّ اللهَ كَرِّهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، قِيْلَ وَقَالَ وَاِضَاعَةُ الْمَالِ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের তিন কাজ অপছন্দ করেন। অতিরিক্ত কথা বলা, সম্পদ নষ্ট করা এবং অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা। তাই যতটুকু কথা বললে প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় ততটুকুই বলুন এবং কথা শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কল কেটে দিন। এতে অহেতুক টাকা ও সময় নষ্ট হবে না। সময়ই আমাদের জীবন যা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হচ্ছে। মানুষ ভাবে, সময় চলে গেছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, অতিক্রান্ত মুহূর্তগুলো আমাদের জীবনের অংশ ছিলো। যা অতিবাহিত হওয়ার অর্থ হলো,

আমার জীবনের একটি অংশ কমে গেছে।

সকাল হয় সন্ধ্যা হয়; জীবন এভাবেই শেষ হয়ে যায়।

৬.ছোট বাচ্চাদেরকে মোবাইলের শখ তৈরি হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। ওদের বলুন, মোবাইল বড়দের প্রয়োজনীয় জিনিস। যখন তোমরা এর উপযুক্ত হবে তখন তোমাদের দেওয়া হবে।

৭. মেয়েদের হাতে খুব প্রয়োজন না হলে মোবাইল তুলে দেবেন না। আজকাল মেয়েদের কাছে মোবাইল থাকার কারণে এমন সব ঘটনার জন্ম হচ্ছে, যা শুনলে যে কেউ অবাক হতে বাধ্য। মোবাইলের কারণে আমরা সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, অশ্লীলতার প্রসার। মোবাইলের মাধ্যমে খুব সহজেই অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তার থেকে কত জঘন্য ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটছে, তা সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন। অতএব অভিভাবক ও পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে মেয়েদের মোবাইল ব্যবহার থেকে দূরে রাখা।

৮.ছেলেও যতো বড়ই হোক না কেনো, ছাত্র অবস্থায় তাকে মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত রাখা উচিত। ছাত্র অবস্থায় মোবাইল ব্যবহার কিছুতেই ভালো ফল বয়ে আনে না। তবে হ্যাঁ, যদি কারো পড়াশোনার বাইরে ভিন্ন কোনো দায়িত্ব কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য থাকে, তাহলে তার প্রয়োজনের দিকটা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে তাকে মোবাইল দেওয়া যেতে পারে। অন্যথায় কিছুতেই মোবাইল ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। বিশেষত বিয়ের পূর্বে অর্থাৎ ১২ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত সময়টুকু খুবই বিপদজনক। এই সময়ে পিতামাতা সন্তানের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখা উচিত। যথাসম্ভব বিয়ে করিয়ে দিতে দেরি না করা কর্তব্য। বিশ বছরের পর যত দ্রুত সম্ভব বিয়ের করিয়ে দেওয়ার চিন্তা করা দরকার। ফেতনার এই যুগে অভিভাকদের দায়িত্ব হলো, নিজের সন্তানের জীবন যেন পবিত্র থাকে, সে দিকে খেয়াল রাখা।

## পিতা-মাতার মর্যাদা

১. মা-বাবা মায়া-মমতা, স্নেহ-দয়া ও ভালোবাসার ফেরিওয়ালা।[৯৮]
২. মা-বাবা আল্লাহ তাআলার এমন এক নেয়ামত যার কোনো বিকল্প নেই।[৯৯]
৩. মা-বাবা সম্মানযোগ্য ও শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁদের ইজ্জত ও সম্মানপ্রদর্শন ওয়াজিব, তাঁরা কাফের হলেও তাঁদের সেবায় নিয়োজিত থাকা এবং তাঁদের প্রতি সদাচারী থাকা সন্তানের কর্তব্য।[১০০]

---

৯৮. সূরা ইউসুফ: ৮৪- বুখারী।
৯৯. বুখারী ও মুসলিম
১০০. বনী ইসরাঈল: ২৪, লোকমান, বুখারী।

৪. পিতামাতার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করার জন্য আল্লাহ্ সন্তানকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।[১০১]
৫. পিতামাতা সন্তানের বিষয়ে 'মুস্তাজাবুদ্ দাওয়াহ' (যারা দোয়া করলেই দোয়া কবুল হয়) হয়ে থাকেন, তাঁরা অমুসলিম হলেও (বুখারী)
৬. মা-বাবার দোয়ায় তাকদিরও পরিবর্তিত হয়ে যায়। (তিরমিযী)।
৭. বাবা মায়ের সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযী)।
৮. বাবা মায়ের সেবা এবং আনুগত্যে রিযিক ও বয়সে বরকত হয়। (মুসনাদে আহমাদ)
৯. মা-বাবার দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকালে মাকবুল হজ্বের সওয়াব পাওয়া যায়। (ঈমান অধ্যায়, বায়হাকী)
১০. মা-বাবার কৃতজ্ঞতা ততটাই জরুরি, যতটা জরুরি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা।[১০২]
১১. মা-বাবার কিছু অধিকার তাঁদের মৃত্যুর পরেও পালন করা আবশ্যক। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)
১২. মা বাবার অবাধ্য সন্তান মৃত্যুর আগেই শাস্তি পায়।[১০৩]
১৩. আল্লাহ্ মা-বাবার সামনে বিনয়ী থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।[১০৪]
১৪. মা বাবার অবাধ্য সন্তানের জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।[১০৫]
১৫. মা বাবার সেবা করার দায়িত্ব আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে প্রাণ উৎসর্গ করার মতো ফরযের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[১০৬]
১৬. মায়ের পায়ের কাছে আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠ নেয়ামতরাজির সমষ্টি 'জান্নাত' সংরক্ষিত। (নাসাঈ)
১৭. মায়ের সেবা করা রাসূল সা.-এর রওযা মুবারক যেয়ারত করার মতো মহৎ কর্ম থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।
১৮. মায়ের চোখকে শীতল করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা মূসা আ.-কে ফেরাউনের হামলা থেকে রক্ষা করেছেন।[১০৭]

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে মা-বাবার পরিপূর্ণ সেবা ও তাদের আনুগত্যের তাওফিক দান করুন। আমিন।

---

১০১. বনী ইসরাঈল: ২৪, আবু দাউদ।
১০২. সূরা লুকমান: ১৪।
১০৩. ঈমান অধ্যায়: বায়হাকী, মুস্তাদরাকে হাকেম।
১০৪. বনী ইসরাঈল: ২৪।
১০৫. দারেমী, মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ।
১০৬. বুখারী ও মুসলিম।
১০৭. সূরা ত্বহা: ৪০।

## আপন স্রষ্টাকে চেনো

১. হে মানুষ! নিজের জন্ম সম্পর্কে চিন্তা করো এবং আল্লাহকে চেনো।
২. নিজের অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করো এবং আল্লাহকে চেনো।
৩. নিজের মৃত্যু ও অসুস্থতার কথা ভাবো এবং আল্লাহকে চেনো।
৪. নিচের সন্তানদের আকৃতি, স্বর ও স্বভাবের ভিন্নতা দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
৫. সন্তানের বেড়ে উঠা, তার নড়াচড়া দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
৬. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
৭. শূন্যে পাখিদের ওড়ওড়ি দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
৮. সমুদ্রে জাহাজ চালাচল দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
৯. বৃষ্টি বর্ষণ এবং সমগ্র ভূমিকে সিঞ্চিত করার পদ্ধতি লক্ষ্য করো এবং আল্লাহকে চেনো।
১০. সব ধরনের ভূমিতে বৃষ্টির বর্ষণ দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
১১. পর্বতমালার উচ্চতা দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
১২. মুরগীর ডিমের ভেতরে বিভিন্ন রঙের জিনিস মিলে থেকেও পৃথক পৃথক- খোদার এই কারিশমা দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
১৩. একই পানির বহুমুখী ব্যবহার দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
১৪. একই মানুষ থেকে জন্ম নেওয়া নানা রঙের নানা বর্ণের নানা বংশের মানুষকে দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
১৫. মানুষের বলে যাওয়া কথার প্রতি লক্ষ্য করো এবং আল্লাহকে চেনো।
১৬. মানুষকে অসুস্থতা দেওয়ার মাধ্যমে হাজার মানুষের জীবীকার ব্যাবস্থা করার খোদায়ী নেযাম দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
১৭. এক পিতা মাতার মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানদের আকৃতিগত ভিন্নতা দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
১৮. বত্রিশ দাঁতের মাঝে নরম জিহ্বার নড়াচড়ার প্রতি লক্ষ্য করো এবং আল্লাহকে চেনো।
১৯. নিজ শরীরে রক্তের সঞ্চালনের পদ্ধতি দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
২০. নিজ শরীরে খাদ্য হজম এবং রগ-শিরাগত পদ্ধতির কথা ভাবো এবং আল্লাহকে চেনো।
২১. ছোট্ট এক মগজে জীবনভর অতিক্রান্ত সমস্ত স্মৃতির সংরক্ষিত হয়ে থাকার কথা ভাবো এবং আল্লাহকে চেনো।
২২. বয়সের সাথে মানুষের শরীরের পরিবর্তন দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।
২৩. একই শরীরে কিছু জায়গার চুল সর্বদা বাড়তেই থাকে আবার কিছু জায়গায় একটুও বাড়ে না- আল্লাহর এই কুদরত দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

২৪. পাথরের কাঠিন্য, রং এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

২৫. একই পানি দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের বেড়ে ওঠা দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

২৬. সমস্ত গাছের পাতাই সবুজ তবুও প্রতিটির রং ভিন্ন ভিন্ন— আল্লাহর এই কুদরত দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

২৭. আমের একটি বীজ থেকে কত বড় গাছ উঠছে, যার মাঝে হাজারো ফল ধরছে— আল্লাহর কুদরত দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

২৮. রাত নেমে আসতেই আল্লাহ সমস্ত মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেন, মানুষের অক্ষমতা দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

২৯. একই সূর্য পুরো জগতকে আলোকিত করছে, উষ্ণতা দান করছে— এই কুদরত দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

৩০. সূর্যের উদয়-অস্তের সুশৃঙ্খল পদ্ধতি দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

৩১. চাঁদের বড়-ছোট হওয়া দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

৩২. বাতাস প্রবাহিত হওয়া ও তার গতির ওঠা নামা দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

৩৩. ভূমি আল্লাহ পাকের সিন্দুক। প্রতিটি জিনিস সেখান থেকে বেরোচ্ছে। আল্লাহর এই কুদরত দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

৩৪. ভূমি আল্লাহ পাকের দস্তরখানও। সেখান থেকেই সমগ্র সৃষ্টিজীব রুজি অর্জন করে। আল্লাহর প্রতিপালন দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

৩৫. ভূমি আল্লাহর ময়লার গর্তও বটে। সমস্ত খারাপ জিনিস সেখানে পুঁতে রাখা হয়। মৃত মানুষরা সেখানে গিয়েই মাটিতে পরিণত হয়— আল্লাহর কুদরত দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

৩৬. নিজের শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্যের কথা ভাবো এবং আল্লাহকে চেনো।

৩৭. তোমার বাধ্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার প্রতি লক্ষ্য করো এবং আল্লাহকে চেনো।

৩৮. ঘুমিয়ে জেগে ওঠার পর নিজের সজীব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করো এবং আল্লাহকে চেনো।

৩৯. সূর্যের আলোয় তৈরি ছায়ার বড় ও ছোট হওয়াকে দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

৪০. আল্লাহ তাআলা এই মাটি থেকে সাতশত কোটি মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করছেন। আল্লাহর প্রতিপালন নিয়ে ভাবো এবং আল্লাহকে চেনো।

৪১. প্রাণীকূলের খাদ্যের ব্যাবস্থা নিয়ে ভাবো এবং আল্লাহকে চেনো।

৪২. মানুষের ভেতরের অবস্থা তার চেহারায় কীভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে- ভাবো এবং আল্লাহকে চেনো।

৪৩. সমস্ত মানুষের হাতের তালু এবং আঙ্গুলের রেখা কী করে ভিন্ন ভিন্ন—

দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

৪৪. মানুষের মাঝে বিদ্যমান গুণাবলী কিভাবে তার উত্তরসূরীদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে— দেখো এবং আল্লাহকে চেনো।

৪৫. মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিয়ে ভাবো এবং আল্লাহকে চেনো।

## আপনি কার ইবাদত করছেন; সৃষ্টির না সৃষ্টিকর্তার

আল্লাহ এমন এক মহিয়ান সত্তার নাম, যিনি নিজ সত্তা ও গুণে এক ও অনন্য, তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর কোনো উপমা নেই। যিনি সবসময় ছিলেন, সবসময় আছেন, সবসময় থাকবেন। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া আর সবকিছুই ধ্বংসশীল। মানুষের চিন্তাশক্তি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সত্তা এবং গুণ পুরোপুরি বুঝতে অক্ষম। আল্লাহর সত্তা ও গুণ অনুযায়ী তার প্রশংসা করতে মানুষ অক্ষম। আল্লাহর সৃষ্টি দেখে মানুষ তাঁর বড়ত্ব ও কুদরত সম্পর্কে ধারণা নিতে পারে। তিনি এমন এক সত্তা, যাকে মানব চোখে দেখা সম্ভব নয়। মানুষের তৈরি কোনো যন্ত্রের মাধ্যমেও তাকে দেখা সম্ভব নয়। নীচে তাঁর কয়েকটি সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এতে তাঁর মহিমার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে জানার এই পদ্ধতিও আল্লাহ তাআলাই বলে দিয়েছেন। আমাকে চেনো! আমি কত শক্তিমান, শক্তিশালী এবং শান শওকতের অধিকারী।

যেমন এক জায়গায় বলেছেন-

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ-

### উট

উট আল্লাহর সৃষ্টির এক বিস্ময়কর নমুনা। এর শরীর এত বড় যে, যে কোনো প্রাণী এর কাছে এলে নিজেকে ছোট মনে করতে বাধ্য। উটের পায়ের সাথে নিজের পায়ের তুলনা করলে নিজেকে অবশ্যই তুচ্ছ মনে হবে। কিন্তু এত অনুগত ও বাধ্য যে, একটি ছোট বাচ্চাও তার পিঠে আরোহন করে তাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারবে। উট না মরুর বুকে চলতে আপত্তি করে, না ঝড়-তুফানে ভীত হয়, না প্রখর রোদের কোনো প্রভাব তার উপর পড়ে আর না শীতে কাঁপুনি ওঠে। পনেরো দিন অবধি না খেয়ে সে অনায়াসে থাকতে পারে। না পাহাড়ের উচ্চতা তার গতিরোধ করতে পারে, না নিচু ও গভীর খাঁদ বা পিচ্ছিল ভূমিতে চলতে সে ভয় পায়। তার পা এমনভাবে বানানো হয়েছে যে, আরোহী এতে বসে কোনো ধরনের ঝাকুনি অনুভব করে না। অথচ উন্নত প্রযুক্তির দু' চার চাকা বিশিষ্ট যে কোনো গাড়িতে যাত্রার সময় আরোহী ঝাকুনি অনুভব করে। উটের কিছু প্রজাতি এমন আছে যে, এর ওপর পানি ভর্তি

পেয়ালা রেখে দিলে এক ফোঁটা পানিও ছিটকে পড়বে না। এ কারণেই আল্লাহ পাক বলেছেন, একে দেখে আমাকে চিনো। প্রয়োজন পড়লে এই বাহনই মানুষের খাদ্যে পরিণত হতে পারে। যদি পানি না পাওয়া যায় তাহলে এর শরীরের ভেতর থেকেই স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন পানি সংগ্রহ করতে পারে। এর চামড়াও মানুষের বেশ উপকারে আসে। এভাবে এর সাথে অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুগুলোরও তুলনা করুন। সব প্রাণীই আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। জন্তুর চামড়া, পশম, দাঁত, শিং সবকিছুতেই আল্লাহ তাঁর কুদরতে মানুষের জন্য উপকার রেখে দিয়েছেন।

## আকাশ

আকাশও আল্লাহর এক অপূর্ব ও বিস্ময়কর সৃষ্টি। এতো উঁচু যে, মানুষের সেখানে পৌঁছা তো দূরের কথা, সেখানে পৌঁছার কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন, দেখতে পাচ্ছ না! আকাশকে কীভাবে উঁচু করা হয়েছে। كَيْفَ رُفِعَتْ। এর দৈর্ঘ-প্রস্থ এত বড় যে, এর পরিমাপ করা যায় না। তার বিস্তৃতি অনুমান করার জন্য নবী কারীম সা. বলেছেন, আকাশের তুলনায় পৃথিবী যেন ধু-ধু মরু প্রান্তরের মাঝে পড়ে থাকা একটি আংটি। আকাশ এতো বড় কিন্তু তার কোনো খুঁটির দরকার হয় না। বলা হয়েছে, بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا অর্থাৎ- 'কোন ধরনের স্তম্ভহীন, তোমরা যেমনটি দেখতেই পাচ্ছো'। এমনভাবে তাকে বানানো হয়েছে যে, হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে; অথচ তার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন আসে নি। কখনো কোনো ধরনের সংস্কারেরও প্রয়োজন পড়ে নি। এই আকাশ স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছে। তার দাওয়াত হলো, দেখো এবং ভাবো। এ আকাশ আল্লাহর সৃষ্ট। وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ। সেখান থেকেই সমস্ত সৃষ্টির রিযিক অবতীর্ণ হয়। وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ। এটা একটা আকাশ যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এর ওপরে আরো ছয়টি আকাশ রয়েছে। প্রতিটি আকাশ তার নিচেরটির তুলনায় এত বড় যে, নিচেরটিকে ধু-ধু মরু প্রান্তরে পড়ে থাকা একটি আংটির মত মনে হয়। এই আকাশগুলো ফেরেশতাদের আবাসস্থল। সপ্তম আকাশে ফেরেশতাদের জন্য রয়েছে বায়তুল মামুর। ফেরেশতারা অবিরাম যার তাওয়াফ করছেন। মানুষ চাঁদে পৌঁছে আকাশকে ঠিক ততটুকুই দূরত্বে অনুধাবন করেছে, যেমনটি পৃথিবীর ভূমি থেকে অনুধাবন করে। মাটি থেকে দেখলে আকাশের রং নীল মনে হয়। চাঁদ থেকে আকাশকে কৃষ্ণবর্ণের দেখেছেন বিজ্ঞানীরা। চাঁদের উপরে অন্য কোনো গ্রহ-উপগ্রহ থেকে দেখলে আকাশের রং অন্য রকম মনে হলেও হতে পারে। রংও তো আল্লাহ পাকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এ রঙের খেলাও বড় বিস্ময়কর। দুই কিংবা ততাধিক রংকে মেলালে নতুন এক রং তৈরি হয়। যা তার মূল রং থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

## পাহাড়

পাহাড়ও আল্লাহর বড়ত্বের নিদর্শন। পাহাড়কে আল্লাহ পেরেক বলেছেন। বলেছেন- وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا অর্থাৎ 'পাহাড়কে কীলকস্বরূপ বানিয়েছেন।' এতো উঁচু যে, মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহার না করে সেখানে পৌঁছতে পারে না। এই পাহাড় নিজ আয়তনের বিচারে এতো বড় যে, জমিনের প্রতিটি সৃষ্টিজীব নিজেকে তার সামনে ছোট মনে করে। ওই পাহাড়ের পাশ দিয়ে কেউ চলতে থাকলে তার মনে আল্লাহর বড়ত্ব জাগ্রত হয়। অন্তর ভেতর থেকে চিৎকার করে বলে ওঠে— এর সৃষ্টিকর্তা কত শক্তিশালী! এর রংও কত বৈচিত্র্যময়। কিছু কালো, কিছু মেটে বর্ণের, আবার কিছু সুরমা রঙের। কিছু আছে তৃণলতা, সবুজ শস্য-শ্যামলে ভরা, আবার কিছু এমন, যেখানে গাছপালা জন্মায় না হয় না। সেখানে আল্লাহর গুপ্ত ভাণ্ডার রয়েছে। পাহাড়ে কত খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। কোথাও লোহা, কোথাও কয়লা, কোথাও স্বর্ণ, কোথাও রূপা। এই পর্বতমালা পৃথিবীর বুকে নদ-নদী প্রবাহিত হওয়ারও মাধ্যম। বৃষ্টি হলে পানি এই সব পাহাড় থেকেই প্রবাহিত হয়ে নদী নালায় গিয়ে মেশে। তারপর এই নদীই এগিয়ে গিয়ে খাল-বিল হয়ে যায়। আবার কোথাও কৃত্রিম বাঁধের আকৃতি ধারণ করে। কিছুদিন পূর্বে কাশ্মীর ভ্রমণ করেছিলাম। দেখলাম সুবিশাল পর্বতমালা, সেখান থেকে পানির নালা সমতালে বয়ে যাচ্ছে। কোত্থেকে পানি আসছে কোনো হদিস নেই। এরপর কানাডা সফর করলাম। সেখানেও অনেক বড় বড় পাহাড়। হাজার বছর ধরে পানি বয়ে চলছে। বড় শীতল সেই পানি। আহ! তোমার সৃষ্টি কত অপরূপ। কত অসীম তোমার কুদরত! সুবহানাল্লাহ!

## জমিন

জমিন তো আল্লাহর বড়ত্বের এমন এক নিদর্শন যা সর্বদিক থেকে, সমস্ত কোণ থেকে ডেকে চলছে, 'আমার স্রষ্টাকে চেনো। তিনি কত মহিমাময় সত্তা।' এই ভূপৃষ্ঠ আল্লাহ পাকের সিন্দুক। যেখান থেকে বেরিয়ে আসছে কুদরতের অগণন রত্নভাণ্ডার। এই ভূপৃষ্ঠ আল্লাহ পাকের দস্তরখানও। সমস্ত সৃষ্টিজীব সেখান থেকেই খাচ্ছে। এই ভূপৃষ্ঠ আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট ডাষ্টবিনও বটে। সমস্ত নষ্ট ও অতিরিক্ত উপকরণ সেখানে ফেলা হয় এবং তা মাটির সাথে মিশে যায়। এই যমিনই সমস্ত প্রাণী ও শস্যকূলের আবাসস্থল। ভূপৃষ্ঠেই সবাই থাকে। পাখির বসবাস বাহ্যত, শূন্যে দৃশ্যমান। মূলত তার জীবন-যাপনও এই জমিনে দাঁড়িয়ে থাকা গাছে। এই ভূপৃষ্ঠ পানির ভাণ্ডারও বটে। মাটিই পুরো সমুদ্রকে নিজের বুকে ধারণ করে আছে। সমস্ত নদী-নালা এর কূলে খেলা করছে। আল্লাহ জমিনের গভীরে পানির অলৌকিক পাইপ লাইন ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেখানেই জমিন খনন করা হয়, পানির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যা কুপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। এই জমিন নিজের ওপর বিচরণকারী সৃষ্টিজীবের সাথে এমন গভীর সম্পর্ক

রাখে যে, কোনো বস্তুই তার থেকে পৃথক হতে পারে না। কেউ অভিমান করেও তার থেকে দূরে যেতে পারে না। কেউ যত ওপরেই পৌঁছে থাক না কেনো, সে এই ধরণীতে ফিরে আসতে বাধ্য। যমীনের মধ্যে এমন শক্তি ও আকর্ষণ রেখে দেয়া হয়েছে— মানুষ যত উঁচুতেই পৌঁছে যাক, জমিন তাকে নিজের দিকে টেনে আনবে। জমিনের ওপর মরণশীল মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুও মৃত্যুবরণ করে এই জমিন থেকে দূরে যেতে পারে না। জমিন তাদের সবাইকেই নিজের বুকে জড়িয়ে নেয় এবং সমস্ত মানুষ কেয়ামতের দিন ওই জমিন থেকে উত্থিত হবে। ক্ষণে ক্ষণে এই জমিন নিজের রং পরিবর্তন করতে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে কাঠিন্য ও নম্রতায় পরিবর্তন করতে থাকে। জমিনের মধ্যে থাকা গুপ্তধন এবং খনিজ সম্পদও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের হয়। মোটকথা, জমিনের এইসব বৈশিষ্ট্য জমিনে বসবাসরত সবাইকে এই আহ্বান জানাচ্ছে যে, সৃষ্টিকর্তা সত্যিকারের মালিককে চেনো। জমিনের ওপর বসবাসরত সৃষ্টিজীবগুলোকেও একটু অনুধাবন করো। প্রতিটি ছোট বড় সৃষ্টিজীব আল্লাহর অস্তিত্বই প্রমাণ করছে।

## পিপীলিকা

পিপীলিকার শরীর আয়তনে অতন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু এটি আল্লাহর বড়ত্বের একটি বড় নিদর্শন। এর ছোট্ট শরীরে আল্লাহ পাক প্রচুর অনুভূতি ও শক্তি রেখেছেন! বলা যায়, পিপড়া পৃথিবীর সবচে' শক্তিশালী কুলি এবং শক্তিমান বোঝা বহনকারী। হাতির মতো প্রাণীরও এ শক্তি নেই যে, সে নিজ শরীরের সমপরিমাণ ভারী কোন জিনিসের বোঝা বহন করবে। কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন যে- এই পিপীলিকা নিজের শরীরের তুলনায় কয়েক গুণ ভারী বোঝা অনায়াসে বহন করে চলছে। একটি টিকটিকি মারা গেলে কয়েকটি পিপড়া মিলে সেটিকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যায়। একটি ঝিঁঝি পোকা টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য দু' একটি পিপড়াই যথেষ্ট। যেখানে ঝিঁঝি পোকার শরীর পিপড়ার তুলনায় কয়েক গুণ বড়। একটি টিকটিকি মরে পড়ে থাকলে মানুষ তার গন্ধ পায় না। না দেখা পর্যন্ত বুঝতে পারে না যে, টিকটিকি মরে পড়ে আছে; কিন্তু আপনি দেখে থাকবেন টিকটিকি মরে পড়ে থাকলে তৎক্ষণাৎ পিপীলিকা তার খোঁজে বের হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পিপীলিকার জটলা বেঁধে যায়। এই ছোট্ট জীবটির ঘ্রাণশক্তি কত প্রখর! এর শরীর দেখে অনুমান করা যায়, এর নাক কতটুকু হতে পারে! তার মধ্যে এই বিস্ময়কর ঘ্রাণশক্তি কি আল্লাহর শক্তিমত্তার প্রমাণ নয়? এ কারণেই আল্লাহ এতটুকু সৃষ্টিজীবের নামে কুরআন শরীফে সম্পূর্ণ একটি সূরা (সূরা নামল) অবতীর্ণ করেছেন। সেখানেও পিপীলিকার বিস্ময়কর কর্মযজ্ঞের বিবরণ এনেছেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন, সুলাইমান আ.-এর দলবল যখন পিপীলিকার উপত্যকা অতিক্রম করছিলো।

ওই সময় একটি পিপীলিকা সমস্ত পিপীলিকাকে ডেকে জানিয়ে দিচ্ছিলো :

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

'হে পিপীলিকাকূল! তোমরা তোমাদের গৃহে ঢুকে যাও। যেন সুলাইমান ও তার সৈন্যবাহিনী অসাবধানতাবসত তোমাদের পিষে না ফেলে।'

যদিও এই ঘটনা সুলাইমান আ.-এর মু'জিযা, তবুও এটা কত বড় ব্যাপার যে, একটা পিপড়া বিষয়টি বুঝতে পারলো, আবার সে নিজের গোত্রের নিরাপত্তার কথা চিন্তাও করলো। এই উপলব্ধি তাকে কে দিলো? পিপড়ার ছোট্ট মাথায় কত কিছু চলে এলো! ইনিই তো সেই রব— যার পরিচয় মূসা আ. ফেরাউনের দরবারে এভাবে দিয়েছিলেন-

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

'আমাদের রব তো তিনি যিনি প্রতিটি জিনিসকে উদ্ভাবন করেছেন অতঃপর দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।'

## চুতষ্পাদ জন্তু

চতুষ্পদ প্রাণী বাকশক্তিহীন হয়ে থাকে। কিন্তু সে বাকশক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও নিজের অবস্থার ভাষায় আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করে। বলে, আমাকে দেখো এবং নিজেকে ও নিজ প্রতিপালককে চেনো। আল্লাহও বলেছেন-

اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً.

অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুতে রয়েছে শিক্ষার উপাদান।' জন্তু হয়েও তারা মানুষের কত উপকারে আসছে। একদিকে নিজের প্রবল শক্তি থাকার পরও মানুষের প্রতি কত অনুগত ও বাধ্য। কখনো অবাধ্যতা করে না। একজন থেকে অপর জনের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কখনো নূন্যতম অভিযোগটি প্রকাশ করছে না। যেখানে রাখছে সেখানেই থেকে যাচ্ছে। সবুজ ঘাস না পাওয়া গেলে শুকনো ঘাস খেয়ে দিন অতিবাহিত করে নিচ্ছে। কখনো পানি পেতে বিলম্ব হলে সে কিছুই মনে করছে না। তাকে দিয়ে শক্তি সামর্থ্যের চেয়ে বেশি কাজ করালেও ধৈর্যধারণ করছে। মালিকের রুক্ষ স্বভাবও সহ্য করে নিচ্ছে। মারও খাচ্ছে। গরু মহিষ ক্ষেতে কাজ করে। কৃষকের ফসল ফলানোর কাজে প্রাথমিক প্রস্তুতি থেকে নিয়ে ফসল ঘরে আসা পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাজকে কত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেয়। এর দুধও আল্লাহ তাআলার এক অলৌকিক নিদর্শন।

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ

'পানকারীদের জন্য গোবর এবং রক্তের মাঝ থেকে আল্লাহ খাঁটি ও সুস্বাদু দুধ সরবরাহ করেছেন।' জন্তু থেকে এই দুধ দোহানোও কত সহজ। কিছু ঘাস খাওয়ায় মগ্ন হয়ে দুধ ছেড়ে দিচ্ছে। দুধও কেমন বিস্ময়কর উপাদান যে, মানুষ এর দ্বারা কত ধরনের জিনিস তৈরি করে তা ভোগ করছে। এই সকল চতুষ্পদ জন্তুর গোশতও মানুষের খাদ্য। শরীরের বিভিন্ন জায়গার গোশতের স্বাদও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। আল্লাহ পাকের এ কেমন কুদরত! একই শরীরে একেক অংশের গোশতের স্বাদ একেক রকমের। এই জন্তুগুলোর চামড়াও অনর্থক নয়। প্রাণীর শিং, বড় বড় হাড়ও -যা খাওয়া যায় না- সে সবও অনর্থক নয়। শিং জলযানে ব্যবহৃত নানা রকমের মেশিনারিজ প্রস্তুতে কাজে আসে। যেখানে লোহা, কাঠ ব্যর্থ সেখানে শিঙের সাহায্য নিতে হয়। আল্লাহ পাকের কত আশ্চর্য কুদরত! এই সব জন্তুর ত্যাগকৃত বর্জও আমাদের কাজে আসছে। গোবর শুকিয়ে জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও গোবর ফসলের জন্য উত্তম সার হয়। মোটকথা, আমরা যত চিন্তা করবো, শুধু আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনই দেখতে পাবো।

## মানুষ

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচে' বড় সৃষ্টি হচ্ছে 'মানুষ'। দৈহিক গড়নে মানুষ খুব বড় নয়, অনেক প্রাণী থেকেই ছোট। আসমান-যমীনের বড়ত্বের সাথে তার কোনো তুলনাই চলে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে 'বুদ্ধি' নামক যে রত্ন দান করেছেন, শুধু তার কারণেই সে সমগ্র জগতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সবাই তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। জগতের অধিপতি মানুষকে এমন চিন্তাশক্তি দান করেছেন যে, সে নিজের মেধা দিয়ে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে নিজের জীবনকে প্রতিনিয়ত আরও সহজ ও বিলাসী করে তুলছে। এটা আল্লাহরই কুদরত, যিনি মানুষকে এমন বিস্ময়কর যোগ্যতা দিয়েছেন। মানুষ আপন মেধা ও পরিশ্রমে নিজের আবাসস্থলকে উন্নত করতে করতে এখন দুইশ তলা বিল্ডিং বানিয়ে ফেলেছে। বাহনের ক্ষেত্রে উন্নতি করে বিমান ও রকেট আবিষ্কার করে ফেলেছে। মানুষের বাহন চাঁদে পৌঁছেছে, তাতেও তারা সন্তুষ্ট না। তারা এখন মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। নিজে জায়গায় বসে সে হাজার মাইল দূরে কথা বলছে, যেন মুখোমুখী বসে কথা বলছে। ঘরে বসে দূর দূরান্তের দৃশ্য দেখছে। মানুষই মানুষের শরীরের ভিতরগত অঙ্গকে বাইরে থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা অসুস্থতার কথা জেনে নিয়ে চিকিৎসা করছে। إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً নিজের কর্মের দ্বারা সমস্ত বিশ্বের সামনে সে খলিফা হিসেবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ পেশ করেছে।

এই সব উন্নতি সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা নিজের বড়ত্ব বোঝানোর জন্য মানুষের মধ্যে কিছু অসহায়ত্বও রেখেছেন। সে উন্নতি করতে করতে মেডিকেল

সায়েন্সকে যত উচ্চতায়ই নিয়ে যাক— অসুস্থ তাকে হতেই হবে। উন্নতির যে স্তরেই পৌঁছে যাক, তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতেই হবে। নিজের যৌবনকালে যাই করুক না কেনো, বার্ধক্যের মুখোমুখি তাকে হতেই হবে। প্রযুক্তিতে যত উন্নতিই করুক, নিজেকে নানান সমস্যা ও দূর্ঘটনা থেকে বাঁচাতে পারবে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে সমগ্র জগতের অধিপতি, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে মানতেই হবে। ইসলামে এই এক আল্লাহরই ইবাদতের আহ্বান করা হয়েছে, জগতের প্রতিটি ধূলিকণা যাঁর ক্ষমতার অধীন। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। তিনিই সবকিছুর অধিপতি। তাঁর কাছেই সবার ফিরে যেতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টি আহ্বান করছে, হে মানুষ! আমাকে দেখো এবং আপন স্রষ্টাকে চেনো। নীচে আরো কিছু সৃষ্টির পর্যবেক্ষণমূলক বিবরণ উপস্থাপিত হলো।

## বাতাস

বাতাসও আল্লাহর বড়ত্বের নিদর্শন। পরিমাণে এতো বিপুল যে, সমস্ত যমিনের পরিধিকে চার দিক থেকে কত কত মাইল উচ্চতা পর্যন্ত ঘিরে রেখেছে। যা কয়েক প্রকার গ্যাসের সমষ্টি এবং সমস্ত প্রাণীর বেঁচে থাকার মাধ্যম। সমস্ত প্রাণীই এই বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। আল্লাহ তাআলা কেমন বিস্ময়কর পদ্ধতি বানিয়েছেন যে, ধারাবাহিক এই অক্সিজেনের ব্যবহার হচ্ছে; অথচ শেষ হচ্ছে না। গাছপালা বাতাস থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইড নিচ্ছে এবং অক্সিজেন দিচ্ছে। আর প্রাণীকূল অক্সিজেন গ্রহণ করে কার্বন-ডাই অক্সাইড ত্যাগ করছে। এর মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় থাকছে। এটা তো আল্লাহরই সৃষ্ট পদ্ধতি।

এ ছাড়া বাতাসের শক্তিমত্তা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করে। যখন এই বাতাসের গতি বেড়ে যায় তখন সমস্ত সৃষ্টিজীব ভীত হয়ে ওঠে। প্রবল গতিতে যখন এই বাতাস প্রবাহিত হয়, তখন না উঁচু বিল্ডিংকে ছেড়ে দেয় না বৃক্ষকে। মানুষকে তো ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে। মানুষের প্রযুক্তি বাতাসের গতিমুখ পাল্টাতে এবং তার গতিরোধ করতে ব্যর্থ।

এই বাতাসই ঋতু পরিবর্তনের মাধ্যম। বাতাস বার্তাও বহন করে। কোথাও বৃষ্টি হলে অন্যত্র তা অনুভূত হয়। গরমকালে মানুষ এই বাতাসকে এয়ার কন্ডিশন কিংবা কুলারের মাধ্যমে গরম থেকে ঠাণ্ডা করে। শীতকালে এই বাতাসকেই হিটারের মাধ্যমে গরম করে ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করে। এ ছাড়াও রাস্তায় তিন, চার বা এর চেয়ে বেশী সংখ্যক চাকার গাড়ি চলছে সেগুলোর সবকটির চাকাতে হাওয়া ভরে ওই গাড়িকে বাতাসের মতো গতিময় করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যদি এই বাতাসকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন তাহলে সমস্ত গাছপালা ও জীব-জন্তু মড়ার স্তূপে পরিণত হবে। এই বাতাস ডেকে ডেকে বলছে, আমাকে যে সৃষ্টি করেছেন তাঁর বড়ত্ব মেনে নাও।

## পানি

পানি দেখতে কত সাধারণ জিনিস মনে হয়। অথচ জীবনের জন্য তা অপরিহার্য। পানি ছাড়া জীবনের কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ বলেছেন,

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.

'আমি সবকিছুকে পানি থেকেই জীবন দান করেছি'। পৃথিবীর ৭১ ভাগ অংশই পানি। তাই মানুষের শরীরেরও বড় অংশ পানিই। কোনো কারণে পানিশূন্যতা সৃষ্টি হলে মানুষ নিজেকে প্রাণহীন মনে করতে থাকে। সমস্ত জড়পদার্থ এই পানির মাধ্যমেই খাদ্য পেয়ে থাকে। জীব পদার্থও এই পানি ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না। বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, এই পানিতে দুই ধরনের গ্যাসের সংমিশ্রণ থাকে। এক. অক্সিজেন, যা জ্বলতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়টি হাইড্রোজেন যা নিজে জ্বলে। কিন্তু পানিকে জ্বালায় না। না জ্বলার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। বরং জ্বলন্ত বস্তুকে নেভাতে সাহায্য করে। আল্লাহর বিস্ময়কর নেযাম হলো, পানি তিন রূপে থাকে। ভারি, প্রবহমান এবং গ্যাস। তিনটি রূপেই তার পৃথক পৃথক ব্যবহার রয়েছে। এই প্রতিটি রূপই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্বাভাবিক অবস্থায় তো এটা নিছক পানি। যখন আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করে ভূমিকে সিঞ্চিত করতে চান তখন একে বাষ্পের আকৃতি দিয়ে উপরে উঠিয়ে মেঘের রূপ দান করেন। তারপর এই মেঘকে যেখানে ইচ্ছা আপন পদ্ধতিতে পৌঁছে দেন। যখন চান তখন বৃষ্টি রূপে বর্ষণ করেন। কখনো চাইলে বাষ্পকে জমাট বরফ বানিয়েও বর্ষণ করেন। যেটিকে মানুষ শিলাবৃষ্টি নামে জানে। পানির একটি বিরল বৈশিষ্ট্য হলো, এর স্বভাব অন্যান্য ধাতুর বিপরীত। এটি আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের নিদর্শন বৈ কিছু নয়। সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে খুব বেশী অবগত নয়। যেখানে পানি ছাড়া অন্য সব জিনিস গরম করলে তরল হয়, সেখানে পানির জমাট ভাব বৃদ্ধি পায়। আবার ঠাণ্ডা করলে অন্য ধাতু আকারে কমে যায়, এক্ষেত্রেও পানির স্বভাব ব্যতিক্রম। ঠাণ্ডা হলে পানি প্রথমত কমে; কিন্তু 4.C থেকে পানি বাড়তে থাকে। অর্থাৎ তখন এর ঘনত্ব কমে আসে; কিন্তু আকার বড় হতে থাকে। এ কারণেই আমরা বরফকে পানিতে ভেসে থাকতে দেখি। এর অনেক বড় একটি উপকারী দিক হলো, যখন শীতার্ত অঞ্চলসমূহে তাপমাত্রা জিরোর নিচে নেমে আসে তখন নদী-নালা ইত্যাদি জলাশয়গুলোতে ওপরে কিছু পানি বরফে পরিণত হয়ে নিচের অংশগুলোকে বরফ হওয়া থেকে রক্ষা করে। এর মাধ্যমে ওখানকার জীব-জন্তু বেঁচে থাকতে পারে। যে অঞ্চলে যাতায়াত জলযানের মাধ্যমে হয়, সেখানে এর ফলে জলযান চলতে পারে। সব জলাশয়ের পানি বরফ হয়ে গেলে বরফে জমে পানির সব জীবজন্তুকে মরতে হতো এবং বরফ গলে যাওয়ার পর এই জন্তুগুলোর মড়া বেরিয়ে এসে পুরো পরিবেশই দূষিত করে তুলতো। সেই অঞ্চলে বেঁচে থাকাই

কঠিন হয়ে উঠতো। পানির এই বৈশিষ্ট্যটিও সেই প্রজ্ঞাবান সর্বজ্ঞানীর বড়ত্ব প্রকাশ করে। এছাড়াও পানির অন্যান্য সব বৈশিষ্ট্যই আল্লাহর বড়ত্ব প্রমাণ করে। পরিষ্কার করার যে অনন্য গুণ পানিতে রয়েছে সেটিও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। পানি আল্লাহ তাআলার প্রধান নেয়ামতগুলোর একটি। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলে এই পানির পরিমাণ কমিয়ে বাড়িয়ে মানুষকে শাস্তি দেন। পানি কমাতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। মাটিকে শুষ্ক বানিয়ে দেন। সেই সময় বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতা কারো থাকে না। আবার কখনো এত বিপুল পরিমাণ পানি দান করেন যে, সব ফসলই নষ্ট হয়ে যায়। নদী নালায় বন্যার জোয়ার ওঠে এবং পুরো এলাকা বিরাণ হয়ে যায়। নূহ আ.-এর কওম-কে এই পানি দ্বারাই আযাব দেওয়া হয়েছিলো। মাটি থেকেও পানি নিসৃত হচ্ছিলো আবার আকাশ থেকেও বর্ষিত হচ্ছিলো। পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত পানিতে ডুবে গিয়েছিলো। এই ভূপৃষ্ঠের একাত্তর ভাগ পানি। আল্লাহর কাছে সবকিছুর অসীম ভাণ্ডার বিরাজমান। আকাশ ও মাটির মাঝে পানির একটি নদী আছে- যা এতো বড় যে, তার সামনে এই ভূপৃষ্ঠ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। সে নদী রবের গুপ্ত ভাণ্ডার। সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই। আল্লাহই জানেন।

## বৃষ্টি

বৃষ্টিও পানিরই এক ভিন্ন রূপ। সমুদ্র থেকে পানি বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে ওপরে গিয়ে মেঘের আকৃতিতে একত্রিত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মে নিচে নেমে আসে। যে অঞ্চলে বর্ষিত হওয়ার আদেশ হয়, সেই অঞ্চলে বর্ষিত হয় এবং কোনো বৈষম্য ছাড়া সবখানেই বর্ষিত হয়। এই বর্ষণের মাধ্যমে মৃত জমিন জীবিত হয়ে ওঠে। বৃষ্টির উপকারিতা একেক জায়গায় একেক রকম। এটি আল্লাহ পাকের অলৌকিক নিদর্শন যে, বৃষ্টি এক; অথচ উপকার বিভিন্ন। উর্বর ভূমিতে বৃষ্টি হলে তা শস্য, ফল, তরকারী, জীবজন্তুর ঘাস, আরো অনেক প্রকারের উদ্ভিদ জন্মায়। এমন গাছপালার জন্ম হয় যা মানুষের খাদ্য ও ওষুধ হয়। জঙ্গলে বর্ষিত হলে বিভিন্ন রকমের উপকারী কাঠের গাছ জন্মে। বনভূমিকে বৃষ্টি শস্য শ্যামল সবুজে পরিণত করে। পাথুরে পাহাড়েও বৃষ্টি হয়। সেখানে একদানা শস্যও জন্মে না। তবুও সেখানে বৃষ্টি হয়। সেখান থেকে পানি প্রবাহিত করে আল্লাহ নদী-নালা, বিলে-ঝিলে পৌঁছে দেন। সারা বছর সেখান থেকে পানির প্রয়োজন পূরণ হয়। যমিনও পানি শোষণ করে নিজের ভেতরে জলভাণ্ডার তৈরি করে। কূয়া ও টিউবয়েলের মাধ্যমে সেই পানি সারা বছর মানুষের কাজে লাগে। সমুদ্রেও বৃষ্টি হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলো, সমুদ্রে বৃষ্টির মাধ্যমে মুক্তার জন্ম হবে। বৃষ্টির একটি ব্যাপক উপকার হলো, গরমের তীব্রতা কমে যায়। ধুলা-বালু পরিষ্কার হয়ে যায়। জমিন যেন গোসল করে সব ময়লা আবর্জনা থেকে মুক্ত হয়। এই

উপকারগুলো ছাড়াও বৃষ্টির আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। বৃষ্টি অনেক মানুষের জন্য উপার্জনের মাধ্যম। মানুষজন ঘরের ছাদ ঠিক করাচ্ছে। তাতে করে শ্রমিকদের উপার্জন হচ্ছে। মানুষ ছাতা বিক্রি করে এবং ছাতা মেরামত করে সংসার চালাচ্ছে। কত মানুষ রেইনকোট তৈরি করে এবং তা বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে। তিনিই আল্লাহ্ যিনি সব ক্ষমতার অধিকারী।

## অদৃশ্য সৃষ্টি

আল্লাহ্ তাআলা এমন অনেক জীবও সৃষ্টি করেছেন, যা দেখা যায় না। অনেক কষ্টে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তা দেখা সম্ভব হয়। আল্লাহর কি মহিমা! মানুষ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। আল্লাহ্ ক্ষুদ্রতর সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের কুদরত দেখিয়ে দিয়েছেন। এই সৃষ্টির নাম 'ভাইরাস' এবং 'ব্যাক্টেরিয়া'। ব্যাকটেরিয়াও অনেক উপকারে আসে। কিছু কাজ ব্যাকটেরিয়া ছাড়া হয় না। যেমন ব্যাকটেরিয়াই দুধকে দইয়ে রূপান্তরিত করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা যায়, এক ফোঁটা দুধে হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। যদি এক লিটার দুধে এক ফোঁটা দই মিশে যায় তাহলে এই ব্যাকটেরিয়াই সম্পূর্ণ দুধকে দইয়ে রূপান্তরিত করবে, তখন দুধের স্বাদ বদলে যাবে। ঠিক তেমনিভাবে ভাইরাসও অনেক কাজে লাগে। এটি শক্তিশালী মানুষকেও একদম দুর্বল ও শক্তিহীন বানিয়ে দিতে পারে। এত সূক্ষ্ম যে, মশা যখন রক্ত খাওয়ার জন্য মানুষের শরীরের ওপর বসে তখন এর সুঁইয়ের মাধ্যমে অগণিত ভাইরাস মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে। ফলে মানুষের চামড়ায় চুলকানী হয়। এই ভাইরাস ভেতরে গিয়ে রক্তে মিশে মানুষের শরীরকে অসুস্থ বানিয়ে ফেলতে পারে। এরকম বিভিন্ন প্রকারের ভাইরাস রয়েছে। এগুলো মানুষের শরীরে প্রবেশ করে নানা ধরণের রোগ তৈরি করে। আল্লাহ্ তাআলা তার এই অদৃশ্য সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে নিজের শক্তি প্রদর্শন করেন। প্রতিদিন নতুন নতুন ভাইরাস আবিস্কৃত হচ্ছে। আর তা নিয়ন্ত্রণ করতে নতুন নতুন গবেষণাও হচ্ছে।

## ঋতু

আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্বের আরেকটি নিদর্শন হলো 'ঋতু'। মানুষ পরিবর্তন ভালোবাসে। একই অবস্থা দেখে দেখে সে ক্লান্তবোধ করে। এই কারণে আল্লাহ্ তাআলা নিজ কুদরতের দ্বারা পরিবেশ পরিবর্তন করতে থাকেন। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টাও এক রকম থাকে না। এই চব্বিশ ঘণ্টাকে দিন ও রাতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আবার পুরো দিনটিও এক রূপে থাকে না। ভোরের দৃশ্য একরকম। দ্বি-প্রহর ও পড়ন্ত বেলার রূপ আবার ভিন্ন ভিন্ন। সন্ধ্যা আসে ভিন্ন কমনীয়তা নিয়ে। যদি আল্লাহ্ পাক রাত কিংবা দিনকে পরিবর্তন করে দেন, রাতের পর দিন না আসে, তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন উপাস্য আছে, যে মানুষের জন্য দিন নিয়ে আসতে পারে? অথবা তিনি যদি দিনকেই স্থায়ী করে রাখেন,

রাত না দেন, তাহলে কোন উপাস্য তোমাদের জন্য রাত নিয়ে আসবে, যেখানে তোমরা প্রশান্তি লাভ করবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ ○ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○

'বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে, তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না ?'[১০৮]

এই দিন রাতের পরিবর্তন তো রয়েছেই। এ ছাড়াও পৃথিবীর বুকে ঋতুর পরিবর্তন ঘটছে। একই মুহূর্তে কোথাও ঠাণ্ডা, কোথাও গরম। কোথাও বর্ষা, কোথাও বসন্ত, কোথাও হেমন্ত। এগুলো আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের নিদর্শন। একই পৃথিবীর একেক প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন ঋতু। প্রত্যেক ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। প্রতিটি মৌসুমের উৎপাদিত ফলনও ভিন্ন ভিন্ন; যেগুলোর ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিটি ঋতু সৃষ্টিকর্তার পরিচয় বহন করছে।

## জগত ও পৃথিবী

(জনৈক পাইলট বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন)

আল্লাহ অনেক বড় জগত তৈরি করেছেন। আমাদের দুনিয়া এর একটি অংশ। যেটিকে সায়েন্সের পরিভাষায় ভূমণ্ডল বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ ভূমণ্ডলে মানুষ বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের জন্য যা কিছু প্রয়োজন ছিল সেগুলো পৃথিবীতে দিয়েছেন। অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের তুলনায় আমাদের পৃথিবী অনেকটাই অন্যরকম। পৃথিবী এমন এক জায়গা, যেখানে ঋতুর পরিবর্তন হয়, বাতাস বয়ে চলে, বৃষ্টি হয়, আবহাওয়া গ্রীস্ম ও শীতে পরিবর্তিত হয়, গাছ-গাছালি, সমুদ্র ও পাহাড় যেখানে আছে। যা মানুষের জীবনে কাজে লাগে। আল্লাহ শুধু পৃথিবীতেই এসব জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন। অন্য গ্রহ-উপগ্রহতে এগুলো নেই।

---

১০৮. সূরা কাসাস : ৭১-৭২।

## পৃথিবী (Earth)

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে সম্পূর্ণ গোলাকার বানান নি। এটি অনেকটা কমলালেবুর মতো ওপর ও নিচ থেকে চ্যাপ্টা ধরনের। পৃথিবীর গোলাকৃতি যদি ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত (উত্তর থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ থেকে উত্তর) মাপা হয় তবে পঞ্চাশ হাজার আটশত বাইশ (৫০৮২২) কিলোমিটার হবে। আর ডান থেকে বা দিকে (পূর্ব থেকে পশ্চিম, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে) মাপা হলে ৫০,৯৯৩ কিলোমিটার হবে। পৃথিবী দুই ধরনের ঘূর্ণয়নের মাঝে অবস্থান করছে। একটি তার অক্ষে, আরেকটি সূর্যের চারপাশে। পৃথিবীর নিজের অক্ষে ঘোরার মাধ্যমে আল্লাহ রাত এবং দিন দান করেন। পৃথিবী নিজের অক্ষে একবার ঘুরতে মোট ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট লাগে। আর সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট লাগে। এ কারণেই যদি এক বছর ৩৬৫ দিনে হয় তবে প্রতি চতুর্থ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে একটি দিন বৃদ্ধি পায়। (২৮এর পরিবর্তে ২৯দিন এর মাস হয়)। পৃথিবী নিজের অক্ষে ৬৬.১/২ ডিগ্রি ঝুঁকে ঘোরে। এই ঝোঁকার মধ্যে আল্লাহর অগণিত কুদরত লুকিয়ে আছে। এই কারণে ৬মাস পৃথিবীর উত্তর পার্শ্ব সূর্যের সামনে থাকে আর ৬মাস দক্ষিণ পার্শ্ব সূর্যের সামনে থাকে। যে পার্শ্বটি সামনে থাকে সেই মেরুতে ছয় মাস দিন থাকে আর ছয় মাস রাত থাকে। আল্লাহ যদি এই ৬৬.১/২ ডিগ্রি ঝোঁকার ব্যাপারটি না রাখতেন, তাহলে উভয় মেরু একই সাথে অন্ধকার হয়ে যেতো। কখনো ঋতুর পরিবর্তনই ঘটতো না। ঘূর্ণয়নের সময়ে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে। ৩রা জানুয়ারী পৃথিবী সূর্যের সবচে' নিকটবর্তী হয়, এটিকে Perihelion বলা হয়। আর ৩ জুলাই পৃথিবী সূর্য থেকে সবচে' বেশী দূরে অবস্থান করে, এটিকে Aphelion বলা হয়।

পৃথিবীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ পানি। আর বাকি অংশ ভূমি। যদি পৃথিবীকে ঠিক মাঝখান থেকে দু' টুকরো করে ফেলা হয়, উত্তর এবং দক্ষিণ দুই ভাগে ভাগ করা হয় তবে ভূখণ্ডের অধিকাংশ দক্ষিণে চলে যাবে। শুধু অস্ট্রেলিয়া, নিউজল্যান্ড, আফ্রিকার কিছু অংশ এবং উত্তর আমেরিকার কিছু অংশ উত্তর দিকের অংশে আসবে। এ কারণেই গরমকালে আমাদের ততটা গরম লাগে না, যতটা আফ্রিকাবাসীর লাগে। কারণ আমাদের অঞ্চলে যখন গরমকাল আসে, তখন পৃথিবী সূর্য থেকে দূরে থাকে। যখন আফ্রিকায় গরমকাল চলে তখন পৃথিবী সূর্যের কাছাকাছি থাকে।

পৃথিবীতে যত পানি আছে, তার বড় একটি অংশ আল্লাহ তাআলা দুই মেরুতে বরফের আকৃতিতে জমাট বাঁধিয়ে রেখেছেন। এ ছাড়া গ্রীনল্যান্ড, নর্থ কানাডা, আলাস্কা, নর্থ রাশিয়ায়ও বরফের বড় বড় পাহাড় রয়েছে। ইউরোপেও যথেষ্ট বরফ রয়েছে। আর সবচে' বৃহৎ বরফের পাহাড়টির নাম হিমালয়। যার

একটি চূড়ার উচ্চতা সমুদ্র থেকে প্রায় ২৭,০০০ ফুট ওপরে। যা পৃথিবীর বুকে সর্বোচ্চ। এই হিমালয়ের পরিধি এত বৃহৎ যে, এটির কিছু অংশ চীনে, কিছু অংশ ইন্ডিয়ায়, কিছু অংশ পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। বরং নেপাল এবং ভূটান পুরোটাই হিমালয়ের ওপর।

যদি আল্লাহ তাআলা এই বড় বড় বরফের পাহাড়গুলো গলিয়ে দেন তবে সেগুলোর পানি সমুদ্রের সাথে মিশে সমুদ্রের পানি অনেক বেড়ে যাবে। সমুদ্রের জলের স্তর উঁচু হয়ে যাবে। এটা ঘটলে কয়েকটি রাষ্ট্র -যেগুলো এখন পানি থেকে ২ কিংবা ৩ মিটার ওপরে রয়েছে- পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এই হলো একটি সমস্যা। আরেকটি সমস্যা হলো, বরফের মিঠে পানি সমুদ্রের নোনা পানিতে মিশে সমুদ্রের স্বভাব বদলে যাবে এবং পৃথিবীর ঋতুমালায় ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। এর বাইরে আরও নানা রকম সমস্যা হতে পারে, যার কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তাআলা এক ধরনের চুম্বকীয় আকর্ষণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। এই আকর্ষণ ব্যবহার করেই মানুষ ঠিকঠাক পথ খুঁজে পায়। আমাদের চুম্বকের দক্ষিণ পার্শ্ব পৃথিবীর উত্তর পার্শ্ব, আর আমাদের চুম্বকার্ষণের উত্তর প্রান্ত পৃথিবীর দক্ষিণ পার্শ্ব। এ কারণেই যখন আমরা কোনো চুম্বকের টুকরো কে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দেই, তখন চুম্বকের দক্ষিণ পার্শ্ব উত্তর দিকে আকর্ষণবোধ করে। কারণ পৃথিবীর ওই পার্শ্বটি তাকে টানছে। অন্যান্য দিকের অবস্থাও এরকম।

আমাদের জীবনে ঋতুর বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। আল্লাহ সম্পূর্ণ ভূপৃষ্ঠের ওপর বাতাসের আবরণ দিয়ে রেখেছেন। এই বাতাসের আবার কয়েকটি ভাগ রয়েছে। নাইড্রোজেন ৭৮%, অক্সিজেন ২১% আর আরগুন, কার্বনডাইঅক্সাইড, নিউন, হ্যালিউম ও অন্যান্য মিলে ১%। বাতাস কখনো শুষ্ক হয় না, এর মাঝে অল্প পরিমাণে হলেও আদ্রতার ভাব থাকেই।

পৃথিবীতে পানি এবং বাতাসের কয়েক ধরনের তরঙ্গ আছে। যেগুলোর নাম Lroposphere, Star posphere, Me sphere, Their sphere। সমস্ত ঋতুর আসা-যাওয়া একই স্থানে হয়ে থাকে। Troposphere এর উচ্চতা সমুদ্রের বুক থেকে নিয়ে বিষুবরেখার ওপর ৬০,০০০ ফুট, এবং দুই মেরুর ৩০,০০০ ফুট উপরে থাকে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে সঠিক ও যথাযথ পরিমাণে উষ্ণতা, ওজন এবং বাতাস তৈরি করে দিয়েছেন। আমরা সমুদ্র থেকে যত উপরে উঠতে থাকি উষ্ণতা তত কমতে থাকে, ওজন কমতে থাকে, বাতাসও হালকা হয়ে আসে। সূর্য থেকে পৃথিবীতে যতটুকু উষ্ণতা আসে তার ৪৫% মাটি নিজের ভেতর টেনে নিয়ে যায়। অবশিষ্ট ৫৫% আবহাওয়ায় বিরাজ করতে থাকে। এই ৪৫% দিয়েই সমগ্র পৃথিবী চলছে। বৃষ্টি নামা, ফসল উৎপন্ন হওয়াসহ অন্যান্য সবকিছু এতেই চলছে।

আল্লাহ যদি এই উষ্ণতাকে কিঞ্চিত কমিয়ে দেন তবে সমস্ত পৃথিবী ঠাণ্ডায় জমে যাবে। আর যদি একটু অল্প বাড়িয়ে দেন তাহলে গরমে পৃথিবী অসহ্য হয়ে উঠবে। যখনই আমরা সমুদ্রের বুক থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকি, টেম্পারেচার কমতে থাকে। হিসাব অনুযায়ী ১০০০ ফুট ওপরে উঠলে ২ডিগ্রি টেম্পারেচার কমে আসে। যেমন যদি মুম্বাইয়ের সমুদ্রপৃষ্ঠে টেম্পারেচার ৩০ ডিগ্রি হয়, সে সময়ে মুম্বাই থেকে ১০,০০০ ফুট উপরে উষ্ণতা ১০ ডিগ্রি হবে। আর ২০,০০০ ফুট উপরে টেম্পারেচার মাইনাস ১০ (১০) ডিগ্রি হবে। (এই ঠাণ্ডায় মানুষ উপযোগী পরিধেয় ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবে না)

এভাবে যত উপরে উঠবে ততই অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকবে। ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ ফুট উপরে অক্সিজেন এতোই কম, সেখানে কোনো মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব।

সমুদ্রের পিঠে বাতাসের ঘনত্ব ২৯.৯২ ইঞ্চি ধরা হয়ে থাকে। প্রতি ১০০০ ফুট ওপরে এক ইঞ্চি ভার কমতে থাকে। যদি আমরা অনেক উপরে উঠি কিংবা সমুদ্রের অনেক গভীরে প্রবেশ করি, তখন ওযন খুব কমে যাবে কিংবা বেড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে উঠবে। (৫)

আল্লাহ মানুষের শরীর এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাতে এক ধরনের উষ্ণতা আছে, যা পৃথিবীর উষ্ণতার মুখোমুখি করতে হতে পারে, ঠাণ্ডারও মুখোমুখি হতে পারে। মানুষের শ্বাস নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। সমস্ত গ্যাসের মধ্য থেকে অক্সিজেনকে পৃথক করে সেটিকে মানুষ গ্রহণ করে। মানুষের মধ্যে বিশেষ ধরনের ভারত্ব রয়েছে, যা পৃথিবীর ভারত্বের মুখোমুখি হতে সক্ষম। যদি মানুষ খুব ওপরে উঠে যায় তবে সেখানে ওজন কম থাকার কারণে মানুষের ভেতরের ভারত্ব বাইরে বেরিয়ে আসবে। এতে তার শরীরের অভ্যন্তরের বিভিন্ন জিনিসও বেরিয়ে আসবে। ফলে শরীর ফেটে যাবে।

আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠে এক ধরনের আকর্ষণ রেখেছেন। যার কারণে সবকিছু মাটির সাথে মিলে থাকে। আমরাও মাটিতে সহজে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে চলতে পারছি। যদি এই আকর্ষণ আল্লাহ বাড়িয়ে দেন তবে মাটি থেকে পা তোলাই কঠিন হয়ে যাবে। আর যদি কিছু আকর্ষণ কমিয়ে দেন, তবে মাটিতে এক পা রাখাটাই অসম্ভব হয়ে যাবে। এ কারণেই চাঁদের বুকে মানুষ হাঁটতে পারে না। কারণ সেখানে এই আকর্ষণ আল্লাহ রাখেননি।

## বাতাস (Air)

পৃথিবীর বুকে সূর্য বিভিন্ন কোণ থেকে আলোকরশ্মি বিতরণ করে। যে কারণে প্রতিটি জায়গার তাপমাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। যেখানে বাতাস উষ্ণ হয়, সেখানে বাতাস ছড়িয়ে পড়ে এবং চাপ কমে যায়। যেখানে বাতাস ঠাণ্ডা হয়, সেখানে বাতাস

সংকুচিত হয় এবং বাতাসের চাপ বেড়ে যায়। বাতাস সব সময় ভারী জায়গা থেকে হালকা জায়গার দিকে ছোটে- যাতে সবখানে এক ধরনের ভারত্ব বজায় থাকে। এই ভারত্ব ওঠা নামা করার কারণেই পৃথিবীতে বাতাস প্রবাহিত হয়।

বাতাস বিভিন্ন ধরনের হয়—

১. যে বাতাস মরুপ্রান্তর বা উষ্ণ অঞ্চল দিয়ে চলাচল করে, তা উষ্ণ ও শুষ্ক হয়।

২. যে বাতাস উষ্ণ অঞ্চল থেকে সুমদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়, তা উষ্ণ ও আর্দ্র হয়।

৩. যে বাতাস সমুদ্র এবং শীতল অঞ্চল দিয়ে আসে, তা শীতল ও আর্দ্র হয়।

৪. যে বাতাস শীতল ও শুষ্ক অঞ্চল থেকে আসে, তা শীতল এবং শুষ্ক হয়।

প্রত্যেক প্রকারের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। একেকরকম বাতাসে আল্লাহ তাআলা একেকরকম উপকার রেখে দিয়েছেন।

সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে দিনের বেলা যে বাতাস শুষ্কতার দিকে ছোটে, সেটিকে 'সী ব্রীজ' বলে। আর যে বাতাস রাতের বেলা শুষ্কতা থেকে সমুদ্রের দিকে ছোটে, সেটিকে 'ল্যান্ড ব্রীজ' বলে।

একই বৈশিষ্ট্যের বাতাস যখন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাতাসের সাথে মেশে সেটিকে ইংরেজীতে 'ফ্রন্টস' বলে। ভিন্ন ভিন্ন রকমের ফ্রন্টস এর মাঝে বিভিন্ন রকমের আর্দ্রতা, বিভিন্ন রকমের উষ্ণতা ও ভর থাকে। কোল্ড ফ্রন্টস সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হয়। ওয়ার্ম ফ্রন্টস হয়ে থাকে তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এই দুই ধরণের ফ্রন্টস মিলে আবার যে ফ্রন্টস তৈরি হয়, সেটির বৈশিষ্ট্য দু'টির তুলনায় পুরো আলাদা হয়ে থাকে। এটিকে Occluded বলা হয়।

## Fo fronts

যখন দুই ধরনের ফ্রন্টস পরস্পরে ভিন্ন দিক থেকে এসে মিলিত হয় তখন এটি এক ধরনের ঘূর্ণিতে রূপান্তরিত হয়। মাত্রাতিরিক্ত ঘূর্ণির কারণে ঝড় সৃষ্টি হয়। সেটির আবার কয়েক ধরণ রয়েছে। ট্রপিকাল সাইক্লোন এবং এক্সট্রালিটার ট্রপিকাল সাইক্লোন, ইত্যাদি।

যে অঞ্চলে পাহাড় থাকে, সেখানে দিনে উপত্যকা থেকে পাহাড়ের দিকে বাতাস প্রবাহিত হয়। একে 'বিলি ব্যান্ড' বলে। আর যা ওপর থেকে নীচের দিকে নেমে আসে সেটিকে 'মাউন্টেন ব্যান্ড' বলে। এক ধরনের বাতাস আছে, যেটির নাম 'জেট স্ট্রিম'। এটি সমুদ্রের পৃষ্ঠ থেকে ৪০ থেকে ৬০ হাজার (৪০,০০০-৬০,০০০) ফুট উপরে থাকে। এটি এক ধরনের ঘূর্ণির মাঝে চলমান। যেমন রেলগাড়ি চলছে। এর গতি ১০০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার হয়ে

থাকে। যদি কোন বিমান এই বাতাসের নিশানায় চলে আসে তবে সেটির গতি প্রভাবিত হয়, খুব ঝাটকাও অনুভূত হয়। আল্লাহ এই জেট সিস্টেম এর মাঝে কোথাও কোথাও বড় ধরনের শূন্যতা রেখে দিয়েছেন। যদি বিমান এই শূন্যস্থানে পড়ে তবে এক সেকেন্ডে শত শত ফুট নিচে এসে পড়বে। এটিকে ক্লিয়ার এয়ারার ব্যালেন্স বলা হয়ে থাকে। এটা দেখা যায় না।

আরো কত ধরনের বাতাস আল্লাহ পাক বানিয়েছেন, এ সবের বিবরণ যদি এখানে একত্রিত করা হয়, তাহলে এই রচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে।

## কুয়াশা (Fog)

আদ্র বাষ্প শীতল হওয়ার কারণে সেটা খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পানির ফোঁটায় পরিবর্তিত হয়ে ধোঁয়ার মতো হয়ে যায়। কখনো এটি খুব হালকা হয়, আবার কখনো ঘন হয়। কখনো এই কুয়াশা এত ঘন হয় যে, কাছের কোনো জিনিসও দেখা যায় না। এগুলোকে Radiation fog, Advection fog, Upslope fog, percipitation fog, steam fog, aou, lce fog ইত্যাদি বলা হয়।

## মেঘ (Clouds)

আল্লাহর আদেশক্রমে যখন সূর্যের তাপ পানির ওপর পড়ে তখন তা পানিকে উষ্ণ করে তোলে। সে পানি জলীয় বাষ্পে পরিবর্তিত হয়ে গ্যাসের আকৃতিতে ওপরে ওঠে। সাধারণত এটি চোখে ধরা পড়ে না, যেমন অক্সিজেন দেখা যায় না। যখন জলীয় বাষ্প ওপরে ওঠে, তখন উষ্ণতা কম থাকার কারণে আবার তা পানির ফোঁটায় পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এই ফোঁটা অনেক ক্ষুদ্রাকৃতির হয়, চোখে ধরা পড়ে না। তারপর তা ধোঁয়ার মতো দেখায়। যেটিকে আমরা মেঘ বলে থাকি। যখন এই মেঘ আরো ওপরে ওঠে তখন উষ্ণতা আরো হ্রাস পায়। আর এই ছোট ছোট পানির ফোঁটাগুলো মিলে বড় হয়ে যায়। যখন এগুলো এই পরিমাণ ভারী হয়ে যায় যে, বাতাস তাকে ওঠাতে পারে না, তখন এসব আবার নীচের দিকে নামতে থাকে এবং আমরা তাকেই বৃষ্টি বলি।

যত ধরনের বাতাস হয়ে থাকে তত ধরনের মেঘ তৈরি হয়। প্রায় বারো ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মেঘ রয়েছে।

সমুদ্রের পৃষ্ঠ থেকে নিয়ে ৬৫০০ ফুট পর্যন্ত যে মেঘ সৃষ্ট হয়, এটিকে নিম্নস্থ মেঘ (low clouds) বলে। এতে, tratus, Nimbo-stratus, Aur tratus, low clouds, cumulus, strato নামের মেঘ তৈরি হয়।

৬৫০০ ফুট ওপরে থেকে নিয়ে ২০,০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত যে মেঘ হয়ে থাকে সেটিকে 'মধ্যস্থ মেঘ' (Middle clouds) বলে থাকে। এতে Alto Aur alto stratus, তৈরি হয়।

২০,০০০ ফুট উচ্চতা থেকে নিয়ে আনুমানিক ৬০,০০০ ফুট পর্যন্ত যে মেঘ সৃষ্ট হয় সেটিকে 'উচ্চস্থ মেঘ' (High clouds) বলে থাকে। এতে Cirrus,

cirro-stratus Aur cirro cumules....

এই তিন প্রকারের মেঘ স্তরে স্তরে ভাজের আকৃতিতে তৈরি হয়। এ ছাড়াও মেঘের আরো কয়েক ধরণ রয়েছে। যেগুলো পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে থাকে। এটির নিম্নভাগ মাটি থেকে ১০০০ ফুট উচ্চতার হয়ে থাকে, আর উপরের সর্বশেষ চূড়া ৪০,০০০ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কখনো কখনো উপরের পার্শ্ব ৬০,০০০ ফুটেরও বেশি উপরে চলে যায়। এতে cumulus, towering cumulus এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ Cumulonimbus হয়ে থাকে।

## ঘূর্ণিঝড় (Tornado)

মেঘে কখনো কখনো ঝড় সৃষ্টি হয়। যা এতো তীব্রতর হয় যে, অনেক গ্রাম ও শহর তার রোষানলে পড়ে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই মেঘখণ্ডে বাতাসের ঘূর্ণি থাকে এবং এ থেকেই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্ট হয়। যেটিকে Tornadoes আমরা বলে থাকি। এই ঘূর্ণন ৩০০ থেকে ২০০০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এতে আল্লাহ এতো শক্তি দিয়ে রেখেছেন যে, এই বাতাস বড় গাছ পর্যন্ত গোড়া সমেত উপড়ে ফেলতে পারে। শহরের পর শহর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই বাতাসের গতি ৪০০ কিলোমিটারের চেয়েও বেশি হয়। যদি এই বতাস সমুদ্রের পানিতে ঘূর্ণি তৈরি করে, তখন পানিতে যে ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি হয়, বড় বড় জলযানও তাতে আক্রান্ত হয়ে ডুবে যেতে পারে। একে 'ওয়াটার স্পাউট' বলা হয়। কখনো কখনো আল্লাহর কুদরতে মেঘের মধ্যে এই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়ে মাটিতে আসার আগেই তার শক্তি শেষ হয়ে যায়। তখন তা থেকে আর ক্ষতির আশংকা থাকে না। তাকে Funnal clouds বলে। আল্লাহ তাআলার কুদরত আরো অনেক রয়েছে। মেঘ সম্পর্কে শুধু সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করা হলো।

ভারতে বৃষ্টির মৌসুম ব্যতীত অন্য মৌসুমগুলোতে পাঞ্জাব, দিল্লী, ইউপি ও অন্যান্য স্থানে ওপরের দিকে অনেক কুয়াশা হয়। বৃষ্টির মৌসুম ছাড়াই বৃষ্টিপাত হয়। শীতের সময় খুব ঠাণ্ডা পড়ে। এসব বাতাসের কারণে হয়ে থাকে। যেটি পশ্চিমদিকে (West) চলে। যেটিকে আমরা 'ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রাবনেস' বলি। এটিও আল্লাহর একটি কুদরত। মুম্বাইয়ে অথবা তার আশপাশের এলাকায় কখনো কখনো (snow fall) তুষারপাত হয় না। এগুলো আল্লাহর অলৌকিক শক্তিমত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

## বিদুৎ -ligt and elctro megnatic wave (EMW)

আল্লাহ তাআলা বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেছেন। এটি এক সেকেন্ডে তিন লাখ কিলোমিটার অতিক্রম করে (৩,০০,০০০কি.মি./সে.)। অর্থাৎ এটি এক সেকেন্ডে ছয়বার পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে। এর গতি ঘণ্টায় একশত আট কোটি কিলোমিটার (১০৮, ০০,০০,০০ কি.মি./ঘণ্টায়)। এই গতি (EMW)

এরও হয়ে থাকে। মহাবিশ্বে আর কোন সত্তা আল্লাহর মতো এমন গতিময় বাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম? এই (EMW) এর ব্যবহার আমরা মোবাইল এবং অন্যান্য যন্ত্রে করে থাকি। আমি এখনই আমেরিকায় ফোন করলাম, মুহূর্তেই ও প্রান্তে আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলতে পারলাম। মনে হয় যেন, মুখোমুখি বসে আছি। (কল যেতে এক সেকেন্ডও বিলম্ব হয় না)। আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদে অবস্থিত মানুষের সাথে কথা বলতে পারছি।

বিদ্যুৎ এক ঘণ্টায় যে পরিমাণ পথ অতিক্রম করে এটিকে প্রথমে ২৪ দিয়ে পূরণ দিন, তারপর ৩৬৫ দিয়ে দিন (১০৮,০০,০০,০০×২৪×৩৬৫) ফলাফলে যা বেরিয়ে আসে সেটি হচ্ছে বিদ্যুৎ বছরে যে পরিমাণ অতিক্রম করে থাকে। এটিকে আমরা আলোকবর্ষ বলে থাকি। আল্লাহ তাআলার এই পৃথিবী এতো বড় যে, এখানে লাখো ছায়াপথ রয়েছে। কোটি কোটি তারকা রয়েছে। কিছু ছায়াপথের বিস্তৃতি অনেকগুলো আলোকবর্ষের দূরত্ব সমপরিমাণ। কিছু তারকা এমন আছে যা পৃথিবী থেকে বেশক'টি আলোকবর্ষের দূরত্বে রয়েছে। কিছু তারকার দূরত্ব অনুমানও করা যায় না। অনেক তারকা আজও আবিষ্কৃত হচ্ছে। যখন তারকা এতো দূরে, ছায়াপথ এতো দূরে, এগুলো সংখ্যায়ও একটি নয়, অগণিত ও অসংখ্য। যখন এসব এতো দূরে তাহলে আকাশ কত দূরে!

নবী কারীম সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি لا اله الا الله একশত বার পড়ে তাকে জমিন থেকে আকাশ পর্যন্ত মধ্যখানের জায়গা সমপরিমাণ সওয়াব দিয়ে ভরপুর করে দেওয়া হয়। একটু অনুমান করুন, ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশ পর্যন্ত সওয়াব কী পরিমাণ হতে পারে।

পৃথিবী থেকে সূর্য কয়েক গুণ বড়। কিছু তারকা আছে যা সূর্যের চেয়েও বড়। আকাশের বুকে এমন তারকা একটি নয়, অগণিত। একটি আরেকটির চেয়ে অনেক দূরত্বে। ওই আকাশ এগুলোকে নিজের বেষ্টনির মধ্যে নিয়ে রেখেছে। আকাশকে আল্লাহ তাআলা কত বড় বানিয়েছেন!

রাসূলে কারীম সা. বলেছেন: 'ওঠো, আগে বাড়ো, এমন জান্নাতের দিকে, যার প্রস্থ আসমান-যমীনের তুলনায় অনেক বেশি।' একটু অনুমান করুন, যখন আকাশ এতো বড় তখন জান্নাত কত বড় হতে পারে। এখানে কেবল তার প্রস্থের কথাই বলা হয়েছে, আল্লাহই জানেন এর দৈর্ঘ কত!

এই আকাশের সামনে আমাদের পৃথিবীর কী শক্তি! সেই মহান আল্লাহর সামনে আমাদের কী শক্তি যিনি এই সমস্ত বানিয়েছেন?

সমস্ত পৃথিবীর মানুষ, জিন জাতি, ফেরেশতা সবাই মিলেও আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করলেও আল্লাহর বড়ত্বের হক আদায় হবে না।

এ তো আল্লাহর কুদরতের ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন: যদি সমস্ত বৃক্ষকে কলম বানানো হয়, কালি হয় সমুদ্ররাজির পানি,

সেই কালিকে যদি দ্বিগুণ করেও দাও এবং আল্লাহর বড়ত্বের বিবরণ লিখতে শুরু করো, কলম ভেঙে ভেঙে শেষ হয়ে যাবে, কালি ফুরিয়ে যাবে- তারপরও আল্লাহর বড়ত্বের বিবরণ সমাপ্ত হবে না। তো এই সাধারণ দাস (ক্যাপ্টেন মুহাম্মাদ তালহা) আল্লাহর বড়ত্বে আর কীই বা লিখতে পারবে?

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর নৈকট্য দান করুন। আমীন।

## আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি

কৃতজ্ঞতা আদায়ের তিনটি পদ্ধতি— ১. হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা। ২. যবানের কৃতজ্ঞতা। ৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কৃতজ্ঞতা।

**হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা :** হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতার অর্থ হলো, প্রকৃত দাতাকে ভালোবাসো, তাঁর নেয়ামতকে স্বীকার করো এবং অঙ্গীকার করে তার অনুগত করো, স্বীকার করত তাঁর অনুগত থাকো। কৃতজ্ঞতা মূলত ৫টি জিনিসের ওপর নির্ভর করে।

১. কৃতজ্ঞ ব্যক্তি 'মাশকুর' (যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে) এর সামনে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করা। ২. তাঁকে মনে প্রাণে ভালোবাসা। ৩. তাঁর নেয়ামত স্বীকার করা। ৪. তাঁর প্রশংসা করা ও গুণাবলী বর্ণনা করা। ৫. নেয়ামতদাতার নেয়ামতকে তাঁর অপছন্দনীয় জায়গায় ব্যবহার না করা।

নবী কারীম সা. বরেছেন, যে ব্যক্তিকে বারোটি গুণ দেয়া হয়েছে আক্ষরিক অর্থেই তাকে ইহকাল ও পরকালের সমগ্র কল্যাণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো কৃতজ্ঞ হৃদয়।[১০৯]

**মুখের কৃতজ্ঞতা :** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নেয়ামত স্বীকার করা এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করা, সে সব নেয়ামতের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা। যেরূপ আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন :

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. (الضحى:١١)

'আর আপনি আপনার রবের নেয়ামতের কথা বর্ণনা করতে থাকুন।'

এই আয়াতের মর্মার্থ নবী কারীম সা. থেকে হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সা. বলেছেন– যে ব্যক্তিকে কেউ উপহার দিলো তখন তার উচিত তার পরিবর্তে তাকে উপহারের অনুরূপ কোনো বস্তু দেওয়া। আর যদি এর পরিবর্তে তার কাছে উপহার দেয়ার মতো কিছু না থাকে তখন সে সুন্দর ভাষায় তার প্রশংসা করবে। কারণ যে প্রশংসা করলো সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।[১১০]

---

১০৯. তিরমিযী: ২০১৯, হাসান

১১০. তিরমিযী ১৯৫৭, আবু দাউদ ১৪১৭৯, বুখারী ৪৮১৪, মুসলিম ৩৯৭৩।

উক্ত হাদীসে মানুষকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. কৃতজ্ঞ মানুষ। ২. অকৃতজ্ঞ ও নেয়ামতের কথা গোপনকারী। ৩. সে ওই নেয়ামতসমূহকে প্রদর্শন করে, অথচ সে নেয়ামতপ্রাপ্ত নয়।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কৃতজ্ঞতা :** সম্পদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা আদায়ের পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা। কারণ কৃতজ্ঞতা কেবল মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমেই পূরণ হবে না; বরং সে সত্য পথে ব্যয় করাও চাই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ.

'হে দাউদের সন্তানবৃন্দ! তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করো। আমার খুব কম বান্দাই শোকরগুযার।'[১১১]

ওলামায়ে কেরাম বলেন, নেয়ামতের শুকরিয়া তিন জিনিসের মাধ্যমে হয়—

১. আল্লাহ যখন দান করেন তখন তাঁর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করা।

২. নেয়ামত যাই হোক না কেনো, তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া।

৩. যতক্ষণ পর্যন্ত ওই নেয়ামতের দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে ততক্ষণ তার অবাধ্যতা না করা। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষত চোখ-কান আল্লাহর বড় বড় নেয়ামতগুলোর অন্যতম। এগুলোর ব্যবহার আল্লাহর মর্জিমতো হওয়াই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। সুতরাং নাক, কান দ্বারা ওই সমস্ত জিনিস দেখবে না, বা শুনবে না যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। নবী কারীম সা. বলেছেন, আল্লাহ পাক যখন কোনো বান্দাকে নেয়ামত দান করেন, তখন তার মধ্যে ওই নেয়ামতের প্রভাব দেখতে চান।

## চমকপ্রদ উক্তিমালা

- ভালো কাজে ধোঁকার আশ্রয় নেওয়া ভালো কাজকে ধ্বংস করে দেয়। (হযরত আলী রা.)
- কৃতজ্ঞ মুমিন আল্লাহর ক্ষমার বেশি নিকটবর্তী। (হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.)
- প্রার্থনাকারী বান্দা আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়। (হযরত উসমান গণি রা.)
- যদি কোথাও হালাল ও হারাম একত্র হয় তখন হারামের প্রাধান্য থাকে। চাই হারাম যত অল্পই হোক না কেনো। (হযরত উমর ফারুক রা.)
- পৃথিবীর কোনো মানুষই মূর্খ নয়। প্রত্যেকের কাছ থেকেই কিছু না কিছু শেখার আছে।
- যে ব্যক্তি দুনিয়া কামাই করার জন্য ইলম অর্জন করে, ওই ইলম অন্তরে স্থান পায় না।

---

১১১. সূরা সাবা : ১৩।

## হারাম শরীফের সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন

উক্ত ঘটনাটি তাফসীরে ইবনে কাছীরে কুরআন শরীফের আয়াত يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ الخ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত আছে। ঘটনাটি হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মিহরীয যখন শাম সফরে যাচ্ছিলেন তখন আবু মাহযুরা রা.-কে —যার কোলে তিনি তার পিতৃ-মাতৃহারা দিনগুলো কাটিয়েছিলেন— প্রশ্ন করলেনঃ আপনার আযানের ব্যাপারে ওখানকার (শামের) মানুষজন অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করবে। তাই আপনি আপনার ঘটনাটি আমাকে শোনান। তিনি বললেন, আচ্ছা শোনো। নবী কারীম সা. হুনাইন থেকে ফিরছিলেন। পথে নামাযের সময় হয়ে গেলে নবীজী সা.-এর মুয়াজ্জিন আযান দিলো। আমরা কৌতুকের স্বরে সেটির অনুকরণ করে মশকরা করতে লাগলাম। সে আওয়াজ নবীজীর কানেও চলে গেলো। তখন কিছু সৈন্য এসে আমাদেরকে পাকড়াও করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলো। নবীজী সা. জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে সবচে' উঁচু কণ্ঠস্বর কার ছিল? সবাই আমার দিকে ইঙ্গিত করলো। নবীজী সা. আমাকে ছাড়া সবাইকে ছেড়ে দিলেন এবং আমাকে বললেন, দাঁড়াও, আযান দাও। আল্লাহর শপথ! ওই মুহূর্তে আমার কাছে নবীজী সা. এবং তাঁর আদেশ পালন থেকে বেশী অপছন্দীয় জিনিস আর কিছু ছিল না। কিন্তু আমি অসহায় ছিলাম, তাই দাঁড়িয়ে গেলাম। নবীজী সা. এবার নিজে আমাকে আযান শেখালেন এবং নবী সা. আমাকে যা শিখাচ্ছিলেন আমি তা বলতে লাগলাম। (এভাবে পূর্ণ আযান বললাম)। যখন শেষ হলো তখন নবীজী সা. আমাকে একটি থলে দিলেন। যার মধ্যে রূপা ছিলো। অত:পর নিজের হাত মুবারক দিয়ে আমার মাথা থেকে পিঠ পর্যন্ত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার মাঝে বরকত দান করুন। আল্লাহর কসম! তখন আমার অন্তর থেকে নবীজীর প্রতি শত্রুতার ভাব একদমই চলে গেলো। এর পরিবর্তে আমার অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গেলো। আমি নিবেদন করলাম, আমাকে যেন নবীজী সা. মক্কার মুয়াজ্জিন বানিয়ে দেন। নবীজী সা. আমার এই আবেদন গ্রহণ করলেন। আমি মক্কায় চলে গেলাম। সেখানকার গভর্নর এতাব ইবনে উসাইদ-এর সাথে সাক্ষাত করে মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।

হযরত আবু মাহযুরা রা.-এর নাম, সামুরাহ ইবনে মুঈর ইবনে লুযান। তিনি হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর চার মুয়াজ্জিনের অন্যতম ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত মক্কায় মুয়াজ্জিন হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আরযাহু।

## আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কারিশমা

ইমাম মালেক রহ. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সা. একবার সমুদ্রের তীরবর্তী এক অঞ্চলের উদ্দেশে একটি সৈন্যবাহিনী

প্রেরণ করেছিলেন। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. ছিলেন তাদের আমীর। বাহিনীতে তিনশত সৈন্য ছিল, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। পথে আমাদের খাদ্য ফুরিয়ে গেলো। আবু উবায়দা আমাদের নির্দেশ দিলেন, সৈন্যবাহিনীর সবার খাদ্য একত্রিত করা হোক। আমার কাছে খেজুর ছিলো। সেখান থেকে প্রতিদিন আমরা একটু একটু করে খেতাম। সবশেষে ওই খেজুরও শেষ হয়ে গেলো। তখন খাদ্য হিসেবে শুধু একটি করে খেজুর ভাগে পাওয়া যেত। ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমরা মৃতপ্রায়। কিন্তু সমুদ্র পর্যন্ত তো পৌঁছতে হবে। অবশেষে আমরা যখন সমুদ্রের তীরে পৌঁছলাম, দেখতে পেলাম সমুদ্রের তীরে একটি মাছ টিলার মতো উঁচু হয়ে পড়ে আছে। আমরা সমস্ত সৈন্যবাহিনী পূর্ণ তেরো দিন সে মাছটি খেলাম। আবু উবায়দা মাছটির দুটি পাঁজর কামানের মতো দাঁড় করাতে আদেশ করলেন। ওই কামানের নিচ দিয়ে একজন উট আরোহী গেলো, কিন্তু মাছের হাড় আরোহীর চুলও স্পর্শ করলো না।

আরেক বর্ণনায় জাবের রা. এভাবে বলেন, সমুদ্র তীরে আমরা একটি উঁচু টিলার মতো দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম, একটি সামুদ্রিক জীব মরে রয়েছে। যাকে আম্বর বলা হতো। আবু উবায়দা বললেন, এটি তো মৃত, তারপর বললেন, আমরা নবী কারীম সা.-এর প্রেরিত বাহিনী। ক্ষুধার যন্ত্রণার কাছে অসহায় হয়ে গেছি। তাজা গোশত, ইচ্ছামতো খাও। আমরা সেখানে এক মাস অবস্থান করেছিলাম। খেয়ে খেয়ে আমাদের স্বাস্থ্য উন্নত হয়ে গিয়েছিলো। এর চোখের কোঠরের ভেতর থেকে আমরা ড্রাম ভরে ভরে তেল বের করতাম। এতো বড় বড় টুকরো কাটা হতো যেন একেকটি আস্ত গাভী। আবু উবায়দা এর চোখের কোটরের হাঁড়ে তেরোজনকে বসিয়েছিলেন। পাঁজরের একটি হাঁড় নিয়ে কামানের আকৃতিতে মাটিতে দাঁড় করিয়েছিলেন। তখন এর নীচ দিয়ে বড় বড় উট অতিক্রম করেছে। মোট কথা, সেই মাছ অত্যন্ত বৃহৎ আকৃতির ছিলো। তারপর সেই গোশত শুকিয়ে পথের খাবার হিসেবে সাথে নিয়েছিলাম। যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম এবং নবীজী সা.-কে ঘটনা শোনালাম। নবীজী সা. বললেন, এটি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো। তোমাদের কাছে কিছু থেকে থাকলে আমাকেও খাওয়াও। আমরা নবীজীর কাছে কিছু শুষ্ক গোশ্ত পাঠালে নবীজী সেখান থেকে খেলেন।[১১২]

## কুরআনের অলংকারিক ও ভাষাগত কারুকার্য

যখন আমাদের নবী কারীম সা. প্রেরিত হলেন, সে সময় আরবে ছিলো ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রের জয়জয়কার। সাহিত্যের সমৃদ্ধির কাল। আরবের কবিরা এত উন্নত কবিতা রচনা করছিলেন যে, পৃথিবী তাদের সামনে নত হয়ে গিয়েছিল।

---

১১২. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ২/২১।

অতঃপর আল্লাহ পাক নবীজী সা.-কে আল্লাহর কিতাব এমনভাবে দান করলেন যে, তাদের কাছে সেটি বিদ্যুৎ চমকের মতো হয়ে গেলো। আল্লাহর কালামের নূর তাদের মস্তক অবনত করে দিলো এবং তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস হয়ে গেলো, এটা মানুষের কালাম হতে পারে না। সমগ্র জগতবাসীকে বলে দেওয়া হলো, ডেকে ডেকে শুনিয়ে শুনিয়ে ঘোষণাকারী বার বার ঘোষণা করে বললো, কেউ আছে যে এমন ভাষায় কথা বলতে পারবে? একা একা নয়। সবাই মিলে চেষ্টা করো। শুধু মানুষ নয়। সঙ্গে জ্বিনদেরও নিয়ে নাও। আর পূর্ণ কুরআন শরীফের সমপরিমাণও নয়, শুধুমাত্র দশটি সূরার সমান তৈরি করে আনো। আচ্ছা, তারও প্রয়োজন নেই– তার সবচেয়ে ছোট সুরার মত ছোটো একটি সূরাই তৈরি করে নিয়ে এসো। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের সামনে সবার কোমর ভেঙে গেলো, সাহস হারিয়ে গেলো, গলা শুকিয়ে এলো এবং বাকশক্তি স্তব্ধ হয়ে গেলো। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারেনি, আর না কখনো পারবে। আশ্চর্য! কোথায় আল্লাহর কালাম আর কোথায় তাঁর সৃষ্টির কথা? সে সময় এই মু'জিযা সবাইকে প্রভাবিত করলো। বিরুদ্ধাচারীরা আত্মসমর্পণ করে দলে দলে আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে ইসলামের শামিয়ানা তলে আশ্রয় নিলো।[১১৩]

## মনের গোপন কথা আল্লাহ জানেন

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ তাআলা বলেন— বুকের গোপন কথা আর মুখের প্রকাশ্য কথা সবগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ পাক সবিশেষ অবগত। ছোট থেকে ছোট কোনো কথাই তাঁর কাছে গোপন থাকতে পারে না। তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে। ভূগর্ভে, পাহাড়ে, সমুদ্রে, আকাশে, বাতাসে, শূন্যে- জগতের যেখানে যা কিছু আছে সবই তাঁর জ্ঞানের অধীনেই আছে। সবকিছুকে ঘিরে আছে তাঁর অসীম ক্ষমতা। যেভাবে চান, যা চান তাই করেন। আল্লাহ এতো বিপুল জ্ঞানের অধিকারী। এতো অসীম ক্ষমতার অধীকারীকে প্রত্যেকের ভয় করা উচিত। তাঁর আনুগত্যে নিমগ্ন থাকা উচিত। তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা উচিত। তিনি জ্ঞানী আবার শক্তিমানও। হতে পারে, কাউকে সুযোগ দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করবেন, তখন কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন। সেদিন কোনো সুযোগ দেবেন না। কাউকে মুক্তি দেবেন না। একদিন বিগত জীবনের ভালো-মন্দ সব কর্ম তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হবে। মানুষ ভালো কাজ দেখে আনন্দিত হবে। আর মন্দ কর্ম দেখে দাঁতে দাঁত পিষে আফসোস করবে আর

---

১১৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ১/সূরা আলে ইমরান।

চাইবে, আহ! যদি আমি এগুলো থেকে অনেক দূরে থাকতাম![১১৪]

## ধার্মিক মানুষের প্রতিবেশী হোন

وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ الخ-এই আয়াতের আলোচনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণিত একটি হাদিস আছে। নবী কারীম সা. বলেছেন, একজন নেককার মুমিনের কারণে তাঁর চারপাশের শত শত পরিবার থেকে আল্লাহ তাআলা বিপদ-আপদ দূর করে দেন।[১১৫]

## মানুষের মন খুব সংকীর্ণ

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اِذًا لَاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا.

এখানে মানবজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিবৃত হচ্ছে। আল্লাহর রহমত কখনই শেষ হওয়ার নয়। কোনো জিনিস যদি কারো হাতে চলে আসে, তখন সেটা নিয়ে সে কৃপণতা শুরু করে। যেমনটি অন্য আয়াতে এসেছে- যদি রাজত্বের কোনো এক বিরাট অংশের সে মালিক হয়ে যায়, তারপরও কাউকে সে এক কানাকড়িও খেতে দিবে না। এটাই মানুষের স্বভাব। হ্যাঁ, যার ভাগ্যে আল্লাহর তাওফিক জোটে, সে এই মন্দ স্বভাবকে ঘৃণা করে। সে দানশীল এবং পরকল্যাণকামী হয়। সব কাজে তাড়াহুড়া মানুষের স্বভাব। বিপদের সময় হায়-হুতাস শুরু করে। আর শান্তিতে থাকলে ভুলে যায়, অন্যকে বাঁধা দেওয়া শুরু করে। তবে হ্যাঁ, নামাযী ব্যক্তি তা থেকে মুক্ত। এ বিষয়ে কুরআন শরীফে আরো আয়াত রয়েছে। এগুলো থেকে আল্লাহর করুণা, দয়া-মায়ার কথাও বোঝা যায়। বুখারী মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ, রাত-দিনের সার্বক্ষণিক দানের কারণে তার হাতের ধনরাজি কমে যায় না। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যে খরচ হয়েছে তাতেও তাঁর ধন-ভাণ্ডার একটুও কমে যায় নি।[১১৬]

## দু'টি বিস্ময়কর হাদীস

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا.

মুসনাদে আহমাদে এসেছে, হযরত উসমান রা.-এর জনৈক গোলাম বর্ণনা করেন, একবার উসমান রা. সাথী-সঙ্গীদের সঙ্গে বসে ছিলেন। এই সময় মুয়াজ্জিন এসে পৌঁছলো (নামাযের সময় হয়েছে, এই সংবাদ দেওয়ার জন্য)। তখন উসমান রা. পানি চাইলেন। একটি পাত্রে প্রায় তিন পোয়া পরিমাণ পানি আনা হলো। তিনি ওযু করে বললেন, নবী কারীম সা. এভাবে ওযু করে ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি আমার মতো এভাবে ওযু করে যোহরের নামায আদায় করবে তার সকাল থেকে যোহর পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আসরের সময়েও এভাবে

---

১১৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ১/৫৮।

১১৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ১২৮।

১১৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ৩/৭৩।

নামায পড়লে যোহর থেকে আসর পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তারপর মাগরিবের সময়েও এভাবে নামায পড়লে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তারপর এশার সময়েও এভাবে নামায পড়লে মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তারপর রাতে শোওয়ার পর ভোরে উঠে ফজরের নামায আদায় করলে এশা থেকে ভোর পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এগুলোই ওই নেকীসমূহ যা অনিষ্টতা দূর করে।[১১৭]

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

মুসনাদে আহমদে নোমান ইবনে বশীরের সূত্রে বর্ণিত, একদিন এশার নামাযের পর হুযুর সা. আমাদের কাছে এলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নীচে নামিয়ে নিলেন। আমাদের মনে হলো, সম্ভবত আকাশে নতুন কিছু ঘটেছে। দৃষ্টি অবনত করার পর নবী কারীম সা. ইরশাদ করলেন: আমার পরে মিথ্যাবাদী এবং অত্যাচারী সম্রাটদের আগমন হবে। যে তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে, অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করবে সে আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই। আর যে তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে না, অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করবে না সে আমার এবং আমি তার।[১১৮]

## একটি হাদীস শোনার জন্য হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. এক মাস সফর করেছেন

মুসনাদে আহমদে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.-থেকে বর্ণিত, তনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছলো, জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম সা.-এর কাছ থেকে একটি হাদীস শুনেছেন। তিনি সেটি বর্ণনা করছেন। আমি হাদীসটি সরাসরি তাঁর থেকে শোনার জন্য একটি উট ক্রয় করলাম এবং সফরের পাথেয় গুছিয়ে নিয়ে রওয়ানা দিলাম। এক মাস সফর করে শামে পৌঁছে সেই ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হলাম। পৌঁছে জানলাম, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা.। আমি গেটের প্রহরীকে বললাম, যাও। গিয়ে সংবাদ দাও, দরজায় জাবের অপেক্ষমান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। সংবাদ শুনেই তিনি কোনো রকমে চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে ছুটে এলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আলিঙ্গন করার পর আমি বললাম, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি কেসাসের বিষয়ে নবী কারীম সা.-এর একটি হাদীস শুনেছেন। আপনার কাছে সরাসরি হাদীসটি শুনবো-তাই আমার এখানে ছুটে আসা। হাদীসটি শোনার পূর্বে আমার বা আপনার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে- এই আশংকায় সংবাদ শোনার পরপরই আমি রওনা করেছি। এখন

---

১১৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ৩/৯৯।

১১৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ৩/১০০।

আপনি কি শোনাবেন, সে হাদীসটি কী? তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূল কারীম সা.-এর কাছে শুনেছি, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টিকে নিজের সামনে একত্রিত করবেন। সেদিন সবাই হবে নগ্ন দেহ, খৎনাহীন, সহায় সম্বলহীন। তারপর তাদের সকলকে ডাকবেন, সে আওয়াজ কাছের ও দূরের সবাই একই রকম শুনতে পাবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের অধিপতি, বদলা গ্রহণকারী, কোনো জাহান্নামী সে পর্যন্ত জাহান্নামে যাবে না, যতক্ষণ তার কোনো অধিকার কোনো জান্নাতীর কাছে থাকবে আর আমি তার সেই হক আদায় না করে দেবো। আর কোনো জান্নাতী সে পর্যন্ত জান্নাতে যাবে না যতক্ষণ তার কোনো অধিকার কোন জাহান্নামীর কাছে থাকবে আর আমি সে হক তাকে আদায় না করে দেবো। চাই তা একটি থাপ্পড়ের আঘাতই হোক না কেনো। আমরা বললাম, হুযূর! এই হক কীভাবে আদায় করে দেওয়া হবে? অথচ আমরা তো তখন নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ, সহায়-সম্বলহীন থাকবো! নবী কারীম সা. বললেন, হ্যাঁ! সেদিন হক নেক আমল আর বদ আমল থেকে আদায় করা হবে।

হাদীসে আছে, নবী কারীম সা. বলেছেন: শিংহীন কোনো বকরীকে যদি কোনো শিংবিশিষ্ট বকরী আঘাত করে, কেয়ামতের দিন তারও বদলা নেওয়া হবে।[১১৯]

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ○

নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, আল্লাহর বড়ত্ব বোঝানোর জন্য এই ঘোষণা করে দিন- যদি সমুদ্রের সমস্ত পানি কালি হয়, এরপর আমার রবের বাণীমালা প্রকাশ করতে থাকে, তবে সমুদ্রের জল ফুরিয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর গুণের বিবরণ ফুরাবে না। এরপর যদি আরেকটি সমুদ্র আনা হয়, তারপর আরেকটি, তারপর আরও একটি, তবু আল্লাহর কুদরত, তাঁর প্রজ্ঞা এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের বিবরণ শেষ হবে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অর্থাৎ, পৃথিবীর বুকে যত বৃক্ষ রয়েছে, সব যদি কলম হতো আর সাগরের পর আরো সাত সাগর যদি সে সব কলমের কালি হতো, তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হতো না। আল্লাহর বাণী অগণিত, অসংখ্য। আল্লাহর যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গ সম্মান ও মর্যাদা অনুধাবন করার সাধ্য কার আছে? তাঁর উপযুক্ত প্রশংসা ও গুণাবলী প্রকাশ কে করতে পারবে? নিশ্চয় আমাদের রব ঠিক তেমন, যেমনটি

---

১১৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর: সূরা কাহাফ

তিনি নিজে বলছেন। নিঃসন্দেহে আমরা তাঁর যে প্রশংসা করছি, তিনি এরও অনেক অনেক উর্ধ্বে। স্মরণ রাখুন, দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামত জান্নাত ও আখেরাতের নেয়ামতরাজির বিপরীতে একটি শস্যদানার মতই।[১২০]

## আল্লাহর পরিচয় জানার আমল

আল্লামা ইবনে কাইয়িম রহ. বর্ণনা করেন, আমার কাছে ইবনে তাইমিয়া বর্ণনা করছেন— অন্তরকে জীবন্ত করতে আল্লাহর এই দু'টি নাম اَلْحَيُّ الْقَيُّوْم-এর অসীম প্রভাব রয়েছে। ইঙ্গিতে তিনি যেন বোঝাতে চাইলেন, ইসমে আযম এ দু'টির মধ্যেই রয়েছে। আমি তাঁর কাছেই শুনেছি, ফজরের সুন্নত ও ফরযের মাঝামাঝি সময়ে যে ব্যক্তি নিয়মিত ধারবাহিকতার সাথে يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ চল্লিশবার পাঠ করবে তার হৃদয় জীবন্ত হবে, আল্লাহর পরিচয় সে অর্জন করবে এবং তার অন্তর কখনো মরবে না।[১২১]

## ছাত্রদের জন্য বিশেষ উপহার

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর যখন কোনো মাসআলায় দ্বিধা হতো কিংবা কোনো আয়াত কষ্ট হতো তখন তিনি জনমানবহীন নিরিবিলি কোনো মসজিদে চলে যেতন, কপাল মাটিতে নামিয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এটা বলতে থাকতেন— يَا مُعَلِّمَ اِبْرَاهِيْمَ فَهِّمْنِيْ (হে ইবরাহীমের শিক্ষক! আমাকে বুঝিয়ে দিন )। তখন সেই মাসআলা আল্লাহর পক্ষ থেকে সমাধান হয়ে যেতো।[১২২]

**পাদটিকা :** আমার মতামত হলো, বর্তমানে নিরিবিলি মসজিদ খোঁজার চেষ্টা করবেন না। নিজ মহল্লা কিংবা অন্য কোথাও যে কোনো মসজিদে গিয়ে এই আমল করে নেবেন। মহিলারা নিজ ঘরেই করে নিবেন। না আপনি ইবনে তাইমিয়া না আমি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

## জীবনভর কল্যাণ প্রত্যাশা করো

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উক্ত আয়াতের অধীনে তাফসীরে ইবনে কাছীরে আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন, জীবনভর কল্যাণ অন্বেষণ করো এবং আল্লাহর নেয়ামতরাজিকে দৃষ্টির সামনে রাখো। আল্লাহর রহমতের সুশীতল বাতাসের স্পর্শ যিনি পান, তিনি সৌভাগ্যবান। তিনি যাকে ইচ্ছা করুণাধারায় সিক্ত করেন। আল্লাহর কাছে মিনতি করো, তিনি যেন তোমার দোষ গোপন

---

১২০. তাফসীরে ইবনে কাছীর: সূরা কাহাফ।

১২১. মাদারিজুস সালেকীন: ১/৪৪৮, আকওয়ালে সলফ : ২৪০।

১২২. তারীখে দাওয়াত ও আযীমত: ৩/১৬৫।

করেন। আর তোমাকে দুনিয়ার বিপদাপদ ও নফসের মসিবত থেকে রক্ষা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। গুনাহ যেমনই হোক না কেনো, তাওবা করে নাও। শিরক করে ফেললেও তাওবা করে নাও। তিনি কবুল করে নেবেন।[১২৩]

## হৃদয় কি পরিবর্তনশীল

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ এর আলোচনায় তাফসীরে ইবনে কাছীরে এই হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে, উম্মে সালমা রা. বলেন, আমি বললাম— ইয়া রাসূলাল্লাহ! হৃদয় কি পরিবর্তনশীল? নবী কারীম সা. বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহ চাইলে মানুষের হৃদয়কে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করেন আর যদি চান তাহলে তিনি বক্র পথেও ঠেলে দেন। এ কারণেই আমরা আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ অর্থাৎ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের হৃদয়সমূহকে সঠিক নির্দেশনা দানের পর পুনরায় বক্র করবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাদের করুণা দান করুন। নিশ্চয় আপনি বড় দয়াময়। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিন, যার সাহায্যে আমি আমার জন্য ওই জিনিস প্রার্থনা করতেই থাকবো। নবীজী বললেন, এই প্রার্থনা করো- اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا اَحْيَيْتَنِيْ। নবী কারীম সা. ইরশাদ করেছেন, মানুষের হৃদয়সমূহ আল্লাহর হাতে একটি হৃদয়ের মত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ফেরান। তারপর নবীজী সা. এই দোয়া পাঠ করলেন: اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا اِلٰى طَاعَتِكَ অর্থ: হে হৃদয় পরিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়কে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন।[১২৪]

## মূর্তিপূজার শুরু যেভাবে

মুফাসসিরগণ বলেন, মূর্তিপূজার শুরু এভাবে যে, সৎ মানুষরা যখন মৃত্যুবরণ করতেন তখন তাদের অনুসারীরা তাদের কবরের ওপর মসজিদ বানাতো, সেখানে তার ছবি রেখে দিতো এবং তা দেখে তার অবস্থা ও ইবাদত স্মরণ করতে থাকতো এবং তার মতো হওয়ার চেষ্টা করতো। এভাবে যখন কিছুকাল অতিক্রান্ত হলো, তখন তার ছবির পরিবর্তে ভাস্কর্য তৈরি করে নিলো। কিছুদিন পর ওই ভাস্কর্যের সম্মান ও উপাসনা শুরু হলো। এই সব ভাস্কর্যের নামও পূর্ববর্তী সৎ লোকদের নামে রাখা হতো। যেমন: উদ, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নসর ইত্যাদি। যখন এই ভাস্কর্য পূজা বেড়ে গেলো তখন আল্লাহ তাআলা নূহ আ. কে এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, শুধু এক আল্লাহর উপাসনা করবে। তিনি বললেন, হে কওম! শুধু আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া আর কারো কোনো

---

১২৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ৩/৮৩।

১২৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ২/৮৯।

ক্ষমতা নেই। অন্যথায় তোমাদের ওপর আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি নেমে আসবে। তখন তাঁর কওম উত্তর দিলো: আমাদের পূববর্তী পিতৃপুরুষগণও এমনই করতেন। তুমি তাদের উপাসনা থেকে আমাদের বাধা দিচ্ছো? আমরা মনে করছি এই বিষয়ে তুমি গভীর ভ্রান্তিতে আছো![১২৫]

## জান্নাতের আলোচনা

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ الخ-এর ব্যাখ্যায় ইবনে কাছীর রহ. লিখেছেন: এখানে মুমিনদের নেক কাজের পরিবর্তে তাদের যে উত্তম প্রতিদান মিলবে সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহ, স্থায়ী শান্তি, চিরন্তন জান্নাত। যেখানে স্বচ্ছ পানির ঝরণাধারা বহমান। যেখানে উঁচু থেকে উঁচু অট্টালিকা, সুসজ্জিত অভিজাত বিলাসবহুল গৃহ ও ভবন থাকবে। হুযুর সা. বলেছেন, দু'টি জান্নাত তো শুধু স্বর্ণেরই হবে। সেখানকার পাত্র ও অন্যান্য সবকিছু স্বর্ণের হবে। দু'টি হবে রূপার। সেখানকার সমস্ত পাত্রও ও অন্যান্য সবকিছু রূপার হবে। জান্নাতে আল্লাহর দীদার অর্জনের মুহূর্তে কোনো পর্দার অন্তরায় থাকবে না। শুধু আল্লাহর কুদরতি চেহারার ওপর তাঁর বড়ত্বের আবরণ থাকবে। এটি জান্নাতে আদনে হবে। হাদীসে এসেছে: মুমিন ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি তাঁবু থাকবে। সেটি মুক্তো দিয়ে তৈরি হবে। সেটির দৈর্ঘ হবে ষাট মাইল। মুমিন ব্যক্তির স্ত্রীগণ সেখানে থাকবেন। সে তাদের কাছে আসা যাওয়া করবে। কিন্তু স্ত্রীরা একে অপরকে দেখতে পাবে না। নবী কারীম সা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে, নামায আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে, আল্লাহর ওপর তার হক হলো, আল্লাহ তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। সে হিজরতকারী হোক, কিংবা নিজ দেশে অবস্থানকারী হোক না কেনো। সাহাবীরা বললেন, তাহলে আমরা এই হাদীসটি অন্যদের শোনাবো। নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন: জান্নাতে একশত স্তর থাকবে, যেগুলো আল্লাহ তাঁর রাস্তায় আত্মত্যাগকারীদের জন্য বানিয়েছেন। প্রতি দুই স্তরের মাঝে এতটুকু ব্যবধান থাকবে যতটুকু ব্যবধান আকাশ ও মাটির মাঝে। অতএব তোমরা যখনই আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের প্রার্থনা করবে। এটি সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত। জান্নাতের সবগুলো নালা সেখান থেকেই প্রবহমান। এর ছাদ আল্লাহর আরশ। তিনি আরো বলেন: জান্নাতবাসী জান্নাতী বালাখানাগুলো এভাবে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা আকাশে উজ্জ্বল তারকা দেখতে পাও। এটাও জেনে রাখো যে, সমস্ত জান্নাতে বিশেষ এক উঁচু স্থান থাকবে। যার নাম 'ওয়াসিলা'। এটি আরশের অতি নিকটে। এই স্থানটিই নবী কারীম সা.-এর। নবীজী সা. বলেছেন: যখন তোমরা আমার ওপর দরুদ পেশ করবে তখন আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওয়াসিলার প্রার্থনা করবে। সাহাবীরা

---

১২৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ২/৭৭।

জিজ্ঞাসা করলেন, ওয়াসিলা কী? রাসুল সা. উত্তর দিলেন, জান্নাতের ওই সর্বোচ্চ স্তর, যা একজন ব্যক্তিই পাবে। আল্লাহর কাছে আমার দৃঢ় প্রত্যাশা, সেই ব্যক্তি আমিই হবো। নবী কারীম সা. বলেন, মুয়াজ্জিনের আজানের উত্তর দাও। সে যে সব বাক্য উচ্চারণ করে, তোমরাও সেগুলো পাঠ করো। তারপর আমার ওপর দরুদ পাঠ করো। যে ব্যক্তি আমার ওপর দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় দশ রহমত তার ওপর অবতীর্ণ করবেন। তারপর আমার জন্য ওয়াসিলার প্রার্থনা করো। সেটি জান্নাতের সে স্তর যা সমগ্র সৃষ্টির মাঝে এক ব্যক্তি পাবে। আমার আশা, সেটি আমাকেই দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি আমার জন্য ওই ওয়াসিলা'র প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার শাফাআত কিয়ামতের দিন হালাল হবে। নবীজী সা. বলেন, আমার জন্য ওয়াসিলা-এর প্রার্থনা করো। পৃথিবীতে আমার জন্য যেই ওয়াসিলার দোয়া করবে কিয়ামতের দিন আমি তার সাক্ষীও সুপারিশকারী হবো।

সাহাবায়ে কেরাম রা. একদিন নবীজী সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জান্নাতের কথা শোনান। সেটি কী দিয়ে তৈরি? নবীজী উত্তর দিলেন, স্বর্ণ-রূপার ইট দিয়ে, যেটির আস্তর হবে নিখাঁদ মেশকে আম্বর, সেটির কংকর হবে মুক্তা এবং ইয়াকুত পাথর। মাটি হবে জাফরানের। সেখানে যে নেয়ামতই চাইবে, তাই পাবে। যেগুলো কখনোই শেষ হওয়ার নয়। সেখানে চিরস্থায়ী জীবন পাবে, যার পর মৃত্যুর চৌকাঠ পাড়ি দিতে হবে না। সেখানে কাপড় পুরনো হবে না, বার্ধক্য আসবে না। জান্নাতের গৃহসমূহ এমন যে, তার বাইরে থেকে ভেতর দেখা যাবে আর ভেতর থেকেও বাইরের দৃশ্য দেখা যাবে। এক গ্রাম্য বেদুঈন জিজ্ঞাসা করলো, এই সব বালাখানা কার জন্য হবে? নবী সা. ইরশাদ করলেন, যে ভালো কথা বলে, অপরকে খাদ্যদান করে, রোযা রাখে এবং রাতে মানুষজন শুয়ে পড়ার পর তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে। নবীজী বলেন, কেউ আছো যে জান্নাতের প্রতি আগ্রহী এবং জান্নাতে প্রবেশের চেষ্টা করো? আল্লাহ শপথ! জান্নাতে চার দেয়ালের কোনো সীমা–পরিসীমা নেই। সে তো এক উজ্জ্বল চিরস্থায়ী আলোকখণ্ড, সুবাষিত কানন, উঁচু ও অধিক পবিত্র মহলসমূহ, প্রবহমান তরঙ্গায়িত ঝর্ণাধারা, অমূল্য রেশমী জোড়া বস্ত্র, চিরস্থায়ী আবাস, ফল-ফলাদি, বিস্তৃত সবুজ বাগান, প্রশস্ত এবং প্রশান্তিময়, নিরাপত্তা এবং নিশ্চয়তা, নেয়ামত এবং করুণা এবং আলিশান সুদৃশ্য প্রাসাদ। সাহাবায়ে কেরাম রা. এ বিবরণ শুনে বলে উঠলেন, আমরা এই জান্নাতে যেতে উৎসুক এবং এই জান্নাত পাওয়ার জন্য উদগ্রীব। নবীজী সা. বললেন, ইনশাআল্লাহ বলো। লোকজন 'ইনশাআল্লাহ' বললো। তারপর নবীজী বললেন, এই সব নেয়ামতের চেয়ে বড় নেয়ামত আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। আল্লাহ জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তারা বলবেঃ لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك! আল্লাহ তাআলা বলবেন, বলো, তোমরা সন্তুষ্ট? সবাই উত্তর দেবে, কেনো সন্তুষ্ট হবো না? হে পরওয়ারদেগার! আপনি তো আমাদের ওই সকল

নেয়ামত দিয়েছেন যা কোনো সৃষ্টিই পায়নি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, নাও। তোমাদেরকে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট নেয়ামত দান করছি। তারা বলবে, এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে? আল্লাহ তাআলা বলবেন, শোনো! আমি আমার সন্তুষ্টি তোমাদের দান করলাম। আজকের পর আমি কখনো তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবো না। হুযুর সা. বলেন, যখন জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছবে তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আরো কিছু চাও, তাও দেবো। তারা বলবেঃ আপনি আমাদের যা দিয়ে রেখেছেন এরচেয়ে উত্তম আর কিছু তো হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলবেন, সেটা আমার সন্তুষ্টি যা সর্বোৎকৃষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।[১২৬]

**প্রশ্ন :** আপনার বয়ানে নবীদের ছবির কথা শুনেছিলাম, অনুগ্রহ করে সূত্রসহ বর্ণনা করুন।

**উত্তর :** সূরা আ'রাফে এক আয়াত আছে— الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ-এর আলোচনায় তাফসীরে ইবনে কাছীরে এসেছে, হিশাম ইবনুল আস বর্ণনা করেন, রোম সম্রাট হিরাক্লিষ্ট-এর কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আমাদের দু'জনকে প্রেরণ করা হয়। ঘটনার বর্ণনার ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে তিনি বলেন, সে (রোমসম্রাট) আমাদের বিদায় দিলো। আমরা অতিথিশালায় অবস্থান গ্রহণ করলাম। আমাদের আতিথেয়তা করা হলো। আমরা সেখানে তিনদিন ছিলাম। একরাতে আমাদের ডেকে পাঠানো হলো। আমরা গেলে আমাদের উদ্দেশ্য আবার জিজ্ঞাসা করলো। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য আবার খুলে বললাম। সে তখন স্বর্ণ-রূপায় মোড়ানো একটি বড় জিনিস আনালো। সেটাতে ছোট ছোট ঘরের মতো ছিলো। সেগুলোর ওপরে দরজা তালাবদ্ধ ছিলো। সে একটি ঘরের তালা খুলে সেখান থেকে একটি কালো রেশমি কাপড় বের করলো। সেটাতে লাল বর্ণের একটি ছবি ছিলো। এক ব্যক্তি, বড় বড় চোখ বিশিষ্ট, স্থূল উরু, দীর্ঘ এবং ঘন দাঁড়ি, মাথার চুল দু' ভাগে ভাজ করা খুব চমৎকার এবং দীর্ঘ। আমাদের জিজ্ঞাসা করলো, চিনো একে? আমরা বললাম, না। সে বললো, ইনি আদম আ.। তাঁর দেহে অনেক পশম ছিলো। তারপর আরেকটি তালা খুললো। সেখান থেকেও একটি কালো রেশমি কাপড় বের করলো। সেখানে গৌর বর্ণের এক ব্যক্তির ছবি ছিলো। কোঁকড়ানো চুল। লাল বর্ণের চোখ। বড় মাথা। চমৎকার দাঁড়ি। সে বললো, ইনি নূহ আ.। তারপর আরেকটি তালা খুলে আরেকটি ছবি বের করলো। অনেকটা গৌর বর্ণের। সুদর্শন চোখ। প্রশস্ত ললাট। লম্বাকৃতির চেহারা। শুভ্র দাঁড়ি। হাস্যোজ্জ্বল মুখশ্রী। সে বললো, চেনো ইনি কে? ইনি ইবরাহীম আ.। এরপর সে একটি উজ্জ্বল ও গৌর বর্ণের পাত্র থেকে নবী কারীম সা.-এর ছবি বের করে বললো, একে চেনো? তারা বললেন, হ্যাঁ, ইনি তো

---

১২৬. তাফসীরে ইবনে কাছীরঃ ২/সূরা তাওবাহ।

মুহাম্মাদ সা.। ছবি দেখে আমাদের মাঝে বিশেষ অনুভূতির সঞ্চারণ হলো। সম্রাট বলতে লাগলো, আল্লাহই ভালো জানেন, ইনি মুহাম্মাদ সা. কি না। তারপর সে দাঁড়িয়ে গেলো আবার বসে গেলো এবং বলতে লাগলো, আল্লাহর শপথ! ইনিই তিনি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তিনিই। এই ছবি দেখে মনে করো তুমি তাকেই দেখেছো। তিনি কিছুক্ষণ ছবিটির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, এটি শেষ পাত্র ছিলো। কিন্তু আমি তাকে সবার শেষে উপস্থাপন করার পরিবর্তে কিছু পাত্র বাদ দিয়ে তার ছবি বের করলাম যেন আমি তোমাদের সততা পরীক্ষা করতে পারি। তারপর আরেকটি পাত্র খুললো। আরেকটি ছবি বেরিয়ে এলো। বাদামী বর্ণের নরম আকৃতি। কোকড়ানো চুল। তীব্র চাহনি। তীক্ষ্ম চক্ষু। রাগী চেহারা। জোড়া দাঁত এবং মোটা ঠোঁট। বলতে লাগলো, ইনি মূসা আ.। এর সাথে আরেকটি ছবিও ছিলো। যা অনেকটাই এর মতোই, তবে এই ছবিটিতে চুলে তেল দেওয়া। আচড়ানো পরিপাটি। প্রশস্ত ললাট, বড় বড় চোখ। সে বললো, ইনি হারুন ইবনে ইমরান আ.। তারপর আরেকটি পাত্র থেকে আরেকটি ছবি বের করে আনলো। বাদামী বর্ণের, মধ্যমাকৃতি, সোজা চুল, চেহারায় রাগের চিহ্ন। সে বললো, ইনি লুত আ.। তারপর একটি শুভ্র বর্ণের রেশমি কাপড় বের করলো। চমৎকার বর্ণের একজন মানুষ। গড়ন খুব দীর্ঘ নয়। হালকা পাতলা শরীর। বড় সুন্দর চেহারা। সে বললো, ইনি ইসহাক আ.। তারপর আরেক দরজা খুলে শুভ্র একটি রেশমি কাপড় বের করে আমাদের দেখালো। এঁর চেহারা ইসহাক আ.-এর আকৃতির সাথে অনেকটাই মিল ছিল। তবে তাঁর ঠোঁটে একটি তিল ছিলো। সে বললো, ইনি ইয়াকুব আ.। তারপর আরেকটি সাদা কাপড়ের ছবি বের করে আনলো। তিনি গৌর বর্ণের, খুব সুন্দর মুখশ্রী, চেহারায় নূর, ইখলাস এবং খোদাভীতির ছাপ। অনেকটা লাল বর্ণের। সে বললো, ইনি ইসমাইল আ.। তারপর আরেকটি পাত্র থেকে শুভ্র রেশমি কাপড় বের করলো। যার সাথে হযরত আদম এর ছবিটির মিল ছিল। চেহারায় সূর্যের ঔজ্জ্বল্য যেন ঝলকাচ্ছিলো। বললো, ইনি ইউসুফ আ.। তারপর আরেকটি ছবি বের করলো। লাল বর্ণের, মাংসল গোড়ালী। বড় বড় চোখ। বৃহৎ আকৃতির উদর। খর্বকায় গড়ন। তরবারীর সাজে সজ্জিত। সে বললো, ইনি দাউদ আ.। তারপর আরেকটি ছবি বের করলো। মোটা উরু। লম্বা পা। ঘোড়ার পিঠে আরোহী। সে বললো, ইনি সুলাইমান আ.। তারপর আরেকটি ছবি বের করলো। যুবক, কালো দাঁড়ি, ঘন চুল, খুব সুন্দর চোখ। চমৎকার মুখশ্রী। সে বললো, ইনি ঈসা ইবনে মারয়াম আ.। আমরা বললাম, আপনি এই সব ছবি কোত্থেকে পেলেন? আমরা জানি, ছবিগুলো অবশ্যই আম্বিয়া আ.দেরই হবে। কারণ আমরা আমাদের নবীর ছবি ঠিক ঠিকই চিনতে পেরেছি। সে বললো, আদম আ. আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, আমার সন্তানদের মধ্যে নবীদের কথা আমাকে

বলুন। তখন আল্লাহ তাআলা এই ছবিগুলো হযরত আদম আ.-কে দিলেন। এগুলোকে আদম আ. পশ্চিম অঞ্চলে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। যুল কারনাইন এগুলো বের করেন এবং দানিয়াল আ.-কে দেন। তারপর সে বললো, আমি তো চাচ্ছি, নিজের দেশ ছেড়ে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তির দাস হয়ে থাকতে এবং সে অবস্থাতেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

তারপর আমাদের বিদায় জানালো এবং অনেক উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করলো। যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলো। আমরা ফিরে আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর কাছে এলাম। তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা শোনালাম। তখন তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তাকে তাওফিক দিলে অবশ্যই সে এমনটি করতো। তারপর বললেন, নবী কারীম সা. আমাদের বলেছেন, ইয়াহুদিদের কিতাবে নবীজী সা.-এর গুণাবলী আছে ।[১২৭]

## নবী সা. কসম সহকারে এই দোয়া বলেছেন

সকাল-সন্ধ্যা তিনবার এ দোয়া পড়লে জান্নাতে প্রবেশ করবে—

### সকালের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ اٰمَنْتُ بِكَ مُخْلِصًا لَّكَ دِيْنِيْ اِنِّيْ اَصْبَحْتُ عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْ سَيِّئِ عَمَلِيْ وَاسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوْبِيْ الَّتِيْ لَا يَغْفِرُهَا اِلاَّ اَنْتَ.

‘হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনার। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার দাস। আপনার সমীপে একনিষ্ঠ চিত্তে আপনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যথাসম্ভব আপনার প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদার ওপর আমার জীবনে প্রভাত এসেছে। আমার সমস্ত মন্দ কর্ম থেকে আপনার কাছে তওবা করছি। আর আমার সব গুনাহের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি, যে গুনাহ আপনি ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না।’

### সন্ধ্যার দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ اٰمَنْتُ بِكَ مُخْلِصًا لَّكَ دِيْنِيْ اِنِّيْ اَمْسَيْتُ عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْ سَيِّئِ عَمَلِيْ وَاسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوْبِيْ الَّتِيْ لَا يَغْفِرُهَا اِلاَّ اَنْتَ.

‘হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনার। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার দাস। একনিষ্ঠ চিত্তে আপনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যথাসম্ভব আপনার প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদার ওপর

---

১২৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ২/সূরা আরাফ।

আমার জীবনে সন্ধ্যা এসেছে। আমার সমস্ত মন্দ কর্ম থেকে আপনার কাছে তওবাহ করছি। আর আমার সেই সব গুনাহের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি, যা আপনি ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না।'

**ফযীলত:** হুযুর সা. শপথ করে বলেন: যে ব্যক্তি সকালে তিনবার সকালের দোয়া পাঠ করবে, সন্ধ্যার মধ্যে তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতে যাবে আর যদি সন্ধ্যাবেলা সন্ধার দোয়া তিনবার পাঠ করে, সকালের মধ্যে তার ইন্তেকাল হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাবে। (ত্বাবরানী: আল মাতজারুর রাবেহ সূত্রে)

## আনাস ইবনে মালেক রা.-এর দোয়া

### অন্যায়কারী ও অত্যাচারীর সমস্ত কষ্ট থেকে বাঁচার দোয়া

بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَدِيْنِىْ، بِسْمِ اللهِ عَلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ وَوَلَدِىْ، بِسْمِ اللهِ عَلٰى مَا اَعْطَانِىَ اللهُ، اَللهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا، اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَعْظَمُ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اِنَّ وَلِىِّ اللهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ.

'আল্লাহর নামে সাহায্য চেয়ে নিজের জান ও দীনের নিরাপত্তা চাইছি। আল্লাহর নামে সাহায্য চেয়ে নিজের পরিবার-পরিজন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা চাইছি। আল্লাহর নামে সাহায্য চেয়ে আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন তার নিরাপত্তা চাইছি। আল্লাহ আমার রব, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমি যা ভয় পাই, যে বিষয়ে শংকা করি তার থেকে আল্লাহই অনেক শ্রেষ্ঠ, অনেক বড়, অনেক সম্মানিত, অনেক মহান, অনেক মহিমাময়। হে আল্লাহ! আপনার কাছে আশ্রিত ব্যক্তি বিজয়ী। আপনার প্রশংসাবাক্য মহান। আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে, বিতাড়িত সকল শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং সকল অত্যাচারীর অনিষ্ট থেকে। (সামনের অংশটি কোরআনের আয়াত) যদি তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তবে আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করেছি। তিনি আরশের মহান অধিপতি। নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি সৎলোকদের বন্ধু।'

### অত্যাচারী হাজ্জাজ হযরত আনাস রা.-এর কিছুই করতে পারেনি

প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা শায়েখ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তার কিতাব 'জামউল জাওয়ামে'তে আবুশ শায়েখ রহ.-এর কিতাবুশ শাওয়ারিব এবং ইবনে আসাকির রহ.-এর তারিখের সূত্রে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত আনাস রা. এবং প্রখ্যাত

অত্যাচারী শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আসসাকাফী একত্রে বসে ছিলেন। হাজ্জাজ তার এক সেবককে বললেন, এঁকে (হযরত আনাস রা. কে) বিভিন্ন জাতের চারশ ঘোড়া দেখাও। যখন তিনি ঘোড়া দেখে ফিরলেন, তখন হাজ্জাজ হযরত আনাস রা.-কে বললেন, আচ্ছা বলুন তো! আপনার মনিব অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা.-এর কাছেও এ রকম ঘোড়া এবং বিভিন্ন ভোগ্য সামগ্রী ছিলো? আপনি কখনো দেখেছেন? (হাজ্জাজ সম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় ছিলেন। ঐতিহাসিকদের গ্রন্থসমূহে এই মূর্খের আত্মম্ভরিতামূলক নানা বাক্য ছড়িয়ে আছে। সাধারণত তিনি সাহাবায়ে কেরামের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চাইতেন। নিম্নের ঘটনাটিও এরকম একটি) হযরত আনাস রা. কোনো রকম দ্বিধা ছাড়া উত্তর দিলেন, অবশ্যই। আমি নিজে নবী কারীম সা.-এর কাছে তুলনামূলক এর চেয়ে অনেক উন্নত জিনিস দেখেছি। নবীজী সা.-কে এও বলতে শুনেছি: ঘোড়া লালনকারী তিন প্রকারের হয়। ১. যে ঘোড়া পালন করে এই ইচ্ছায় যে, তা দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। এমন ঘোড়ার মল-মূত্র, গোশত, ঘাম-রক্ত কেয়ামত দিবসে সে ব্যক্তির আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে। ২. যে এই ইচ্ছায় ঘোড়া পালে, যেন প্রয়োজনের সময় ঘোড়ায় চড়তে পারে এবং পায়ে হেঁটে চলার কষ্ট থেকে বাঁচতে পারে। তার ভাগে সওয়াব-গুনাহ কোনোটাই জুটবে না। ৩. ওই ব্যক্তি যে ঘোড়া পালে যশ-খ্যাতি ও নাম কামাতে। যাতে লোকের মনে এ কথা আসন গেড়ে নেয়, অমুকের কাছে এতো বেশী ও এমন এমন উন্নত ঘোড়া আছে। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর হে হাজ্জাজ! তোমার এই সব ঘোড়া তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আনাস রা.-এর কথা শুনে হাজ্জাজ উত্তেজিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আনাস! তুমি নবীজীর খেদমত করেছো। যদি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করতাম, তাছাড়া আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তোমার ব্যাপারে সুপারিশ করে আমার কাছে যে চিঠি লিখেছেন– তার পক্ষপাতিত্ব না থাকতো, তাহলে জানি না আজ আমি তোমার সাথে কী আচরণ করতাম! হযরত আনাস রা. উত্তর দিলেন, আল্লাহর শপথ! তুমি আমার কিছুই করতে পারতে না। তোমার সেই সাহসও নেই যে, তুমি খারাপ ইচ্ছায় আমার দিকে তাকাবে। কেননা আমি আমার সর্দার নবী কারীম সা.-এর কাছ থেকে কিছু এমন বাক্য শিখে রেখেছি, যে ব্যক্তি এই বাক্যগুলো নিয়মিত পাঠ করবে, এর বিনিময়ে তাকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তাই আমি সবসময় সে বাক্যগুলোর আশ্রয়ে থাকি। আর এই বাক্যগুলোর বরকতে আমার কোনো বাদশার দাপটের ভয় নেই। আমার মধ্যে শয়তানের অনিষ্টতার শংকা নেই। হাজ্জাজ এই কথার প্রভাবে আরো হতভম্ব হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে অত্যন্ত নম্রতা ও নমনীয়তার সাথে আকুতি করতে লাগলো, হে আবু হামযা! সেই বাক্যগুলো আমাকেও শিখিয়ে দিন! আনাস রা. উত্তর দিলেন, আমি তোমাকে কখনো তা

শেখাবো না। আল্লাহর কসম! তুমি এর উপযুক্ত নও।

হযরত আনাস রা.-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। তাঁর খাদেম হযরত আবান উপস্থিত হয়ে ডাক দিলো। আনাস রা. জিজ্ঞাসা করলেন: কী চাও? বললেন, ওই বাক্যগুলো শিখতে চাই যা হাজ্জাজ আপনার কাছ থেকে শিখতে চেয়েছিলো; কিন্তু আপনি তাকে শেখাননি। আনাস রা. উত্তর দিলেন, তোমাকে অবশ্যই শেখাবো। তুমি এর উপযুক্ত। আমি দশ বছর নবীজী সা.-এর খেদমত করেছি। এমন অবস্থায় রাসূল সা.-এর ইন্তেকাল হয়েছে যে, রাসূল সা. আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তেমনিভাবে তুমিও দশ বছর আমার খেদমত করেছো। আমিও দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিচ্ছি যে, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সকাল-সন্ধ্যায় এই বাক্যগুলো পাঠ করো। তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ও তাআলা সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন।

**গবেষণামূলক অনুসন্ধান: ১.** উল্লেখিত দোয়াকে দোয়ায়ে আনাস বলা হয়। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামও এই দোয়ার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ এই দোয়া স্বয়ং নবী কারীম সা. তাঁর বিশেষ খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালেক রা.-কে শিখেয়েছিলেন। যিনি দশ বছর পর্যন্ত নবীজীর সা.-এর খেদমত করেছেন। আর এটা জানা কথা যে, প্রত্যেক মনিব নিজের সেবকের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে অন্তরের গভীর থেকে তাকে দোয়া দিয়ে থাকেন। এই দোয়ার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এখানেও এমনই হয়েছে। একবার নবীজী সা. তার মায়ের অনুরোধে তার ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের দোয়া করেছিলেন। নবীজী সা.-এর ওই দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বয়স, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সীমাহীন বরকত দান করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো একশ বছরেরও বেশি। তার ঔরসে প্রায় একশ' জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে তেহাত্তরজন ছেলে এবং বাকিরা মেয়ে। তাঁর বাগানে বছরে দুই বার ফলন হতো। এ তো ইহকালীন বরকত ছিলো। (যা নবীজীর উসিলায় তাঁর অর্জিত হয়েছিলো)। পরকালীন বরকত তো মানুষের অনুমানের বাইরে।

**২.** এই দোয়াটি হযরত মাওলনা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. পূর্ণ ব্যাখ্যার সঙ্গে তার বই 'আপকে মাসায়েল আওর উনকা হাল'-এর ষষ্ঠ খণ্ডের ২৩৩তম পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এর ব্যাখ্যা শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ফার্সী ভাষায় انس استيناس انوار القبس فى شرح دعاء রচনা করেছেন। সম্ভবত হযরত লুধিয়ানভী রহ. এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটিকে সামনে রেখেই এটির ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেছেন।

**৩.** এই দোয়ার বাক্য বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে

**এক.** যেভাবে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই.

بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَدِيْنِىْ، بِسْمِ اللهِ عَلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ وَوَلَدِىْ، بِسْمِ اللهِ عَلٰى مَا اَعْطَانِىَ اللهُ، اَللهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا، اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَعْظَمُ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ.

'আল্লাহর নামে সাহায্য চেয়ে নিজের জান ও দীনের নিরাপত্তা চাইছি। আল্লাহর নামে সাহায্য চেয়ে নিজের পরিবার-পরিজন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা চাইছি। আল্লাহর নামে সাহায্য চেয়ে আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন তার নিরাপত্তা চাইছি। আল্লাহ আমার রব, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমি যা ভয় পাচ্ছি, যে বিষয়ে শংকা করছি তার থেকে আল্লাহ অনেক শ্রেষ্ঠ, অনেক বড়, অনেক সম্মানিত, অনেক মহান, অনেক মহিমাময়। হে আল্লাহ! আপনার কাছে আশ্রিত ব্যক্তি বিজয়ী, আপনার প্রশংসাবাক্য মহান। আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি আমার আত্মার ক্ষতি থেকে, বিতাড়িত সকল শয়তানের ক্ষতি থেকে এবং সকল অত্যাচারীর ক্ষতি থেকে। (সামনের অংশ কুরআনের আয়াত) যদি তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তবে আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর উপরেই ভরসা করেছি। তিনি আরশের মহান অধিপতি।'[১২৮]

(তিন)

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَدِيْنِىْ، بِسْمِ اللهِ عَلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ وَوَلَدِىْ، بِسْمِ اللهِ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ اَعْطَانِىَ اللهُ، بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ، بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ، بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ دَاءٌ، بِسْمِ اللهِ افْتَتَحْتُ وَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ، تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَرَبُّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اِجْعَلْنِىْ فِىْ جَوَارِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اِنَّ وَلِيِّىَ اللهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ، فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

**গবেষণামূলক অনুসন্ধান :** ইবনুস সুন্নী স্বীয় গ্রন্থ 'আমালুল ইয়াওমী ওয়াল্

---

১২৮. আদ্দুয়া ২/১২৯৪, সূত্র যয়ীফ।

লাইলা'-তে এই হাদীসের যে সূত্র বর্ণনা করেছেন সেখানে এটাও উল্লেখ রয়েছে।

**এক.** খলীফাতুল মুসলিমীন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান হাজ্জাজের নামে হযরত আনাস ইবনে মালিকের বিষয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে এই বাক্যটি বিশেষভাবে লেখা ছিলো। "انظر الى انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم" অর্থাৎ, আনাস ইবনে মালিকের প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখো। এ কারণেই হাজ্জাজ প্রথমে অনেক সম্মানসূচক ও বিনয়ানবত আচরণ করেছেন। তারপর উক্ত ঘটনাটি ঘটিয়েছেন।

**দুই.** হযরত আনাস যখন হাজ্জাজকে দোয়া শেখাতে অস্বীকৃতি জানালেন, তখন তিনি তার ছেলেকে বলেছিলেন, আচ্ছা! তুমি তোমার চাচার কাছ থেকে এই দোয়াটি শিখে নাও।[১২৯]

**তিন.** শায়েখ ইসমাঈল বারুসুঈ বর্ণনা করেন, হাজ্জাজের কাছে যখন সবাই জানতে চেয়েছিলো, কেনো আনাস রা.-কে ছেড়ে দিলেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি তাঁর কাঁধের কাছে দু'টি বড় বাঘ দেখেছি। যেগুলো মুখ খুলে (শিকারের অপেক্ষায়) ছিলো।[১৩০]

আপনার জন্য একবার দৃষ্টি দেওয়ার ব্যাপার
আমার জন্য সেটিই জীবন
আমার ক্ষুদ্রতার লজ্জা আমার আছে
আপনার বড়ত্বও আমি অনুভব করি
কিন্তু নিজের হৃদয়কে কী করবো আমি!
সে তোমার সাক্ষাতের তৃষ্ণায় বিভোর!

**পাদটিকা :** উক্ত দোয়াটি আমি 'মুমিন কি হাতিয়ার' নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছি। বইটি নিয়মিত পাঠযোগ্য।

## ভুলে যাওয়ার চিকিৎসা

اَللّٰهُمَّ اَخْرِجْ عَنْهُ الشَّيْطَانَ.

'হে আল্লাহ! শয়তান ও তার দুর্বিপাককে তার থেকে মিটিয়ে দিন।'

**দ্রষ্টব্য :** কোনো কোনো সময় মানুষের স্মরণশক্তি এ কারণে প্রভাবিত হয়ে যায় যে, শয়তান ও জিন মানুষের শরীরে প্রবেশ করে স্মরণশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাই যদি কখনো নিশ্চিত হওয়া যায়, ভুলে যাওয়ার কারণ এটাই তখন সেক্ষেত্রে এই সমস্যাকে এভাবে দূর করা যেতে পারে।

**পদ্ধতি :** যদি কেউ অন্য কাউকে ফুঁক দিতে চায় তবে এভাবে اَللّٰهُمَّ اخْرِجْ عَنْهُ الشَّيْطَانَ. পড়ে নেবে। আর যদি নিজের ওপর ফুঁক দিতে চায় তবে اَللّٰهُمَّ اخْرِجْ عَنِّى الشَّيْطَانَ. পড়বে।[১৩১]

---

১২৯. জামউল জাওয়ামি' ১৪/৪৮, হাদীস নং: ৯২৭৯, ইবনুস সুন্নীর বর্ণনা: ৯০পৃ:, হাদীস নং: ৩৪৬।

১৩০. তানভীরুল আযহান: ৫২।

১৩১. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, ইবনে সুন্নী: ১৪৭, হাদীস নং: ৫৭৮।

## হযরত উসমান ইবনুল আস রা.-এর বিস্মৃতিরোগ যেভাবে সেরে গিয়েছিলো

হযরত উসমান ইবনুল আস রা. বলেন, একবার আমি নবীজী সা.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি তো তীক্ষ্ম স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, কিন্তু আমার শরীরে কোনো সমস্যাদায়ক জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যে কারণে আমার মুখস্থকৃত বিদ্যাসমূহের কিছু অংশ ভুলে গেছি। (যেন ভুলে যাওয়ার রোগে আক্রান্ত হয়েছি)। আমার কথা শোনামাত্রই নবীজী সা. আমার বুকে হাত রেখে (উপরোক্ত) দোয়া পড়লেন। এর বরকতে আল্লাহ আমার ভুলে যাওয়ার রোগ দূর করে দিলেন।

## নিরাপত্তা ও উদ্দেশ্য পূরণের দোয়া

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

অর্থ: আমি আল্লাহর নামের সাহায্যে বের হচ্ছি। সবকিছু আল্লাহর হাতে অর্পণ করে দিচ্ছি। ভালো কাজ করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আল্লাহর তাওফিক ছাড়া সম্ভব নয়।

ফযীলত: হযরত আনাস রা.-এর বর্ণনায় এসেছে, নবী কারীম সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে এই সুসংবাদ শোনানো হয়ে থাকে যে, এই 'তাওয়াক্কুল'-এর বরকতে তোমার যাবতীয় দায়িত্ব (পরিবার-পরিজন এবং অর্থসম্পদের নিরাপত্তা ইত্যাদি) নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তোমাকে সমস্ত কষ্টদায়ক জিনিস থেকে রক্ষা করা হয়েছে। আর তাছাড়া ওই শয়তানও দূর হয়ে যায়।

## আল্লাহর কাছে রাখা আমানত হুবহু ফেরৎ পেলেন

উল্লেখিত দোয়াটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, যখন মানুষ নিজেকে এবং সংশ্লিষ্টদেরকে আল্লাহর দায়িত্বে অর্পণ করে দেয় তখন আল্লাহ বিস্ময়কর ও বিরলতম পদ্ধতিতে নিরাপত্তা বিধান করেন। আরো ভালোভাবে অনুধাবনের জন্য নিম্নের ঘটনাটি উপস্থাপন করা হলো[১৩২]—

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, আমি অনেক কিতাবে এই বর্ণনা দেখেছি, যেটি যায়েদ ইবনে আসলাম নিজের পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একবার হযরত ওমর ফারুক রা. মজলিসে উপস্থিত লোকজনকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তার ছেলেকে নিয়ে উপস্থিত হলো। হযরত উমর

---

১৩২. (ترمذى باب ما يقول اذا خرج من بيته قال حديث حسن جلد٢ صفحه ١٨١ رقم الحديث: ٣٤٢٦- نزل الابرار صفحه ٦٧، ابو داود باب ما يقول خرج من البيت رقم الحديث ٥٠٩٥، عمل اليوم والليلة لابن السنى ص:٥٠ رقم الحديث ١٧٨)

ফারুক রা. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি এমন সাদৃশ্য কাকের মধ্যেও দেখিনি, যেমনটা তোমার ও তোমার ছেলের মধ্যে দেখছি। সে উত্তর দিলো, আমিরুল মু'মিনীন! এই বাচ্চাকে তার মা ওই সময় জন্ম দিয়েছে যখন সে মারা গেছে। এ কথা শুনে হযরত উমর ফারুক রা. সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, আমাকে এই ছেলের ঘটনা শোনাও।

তখন সে বললো, আমিরুল মু'মিনীন! একবার আমি এমন অবস্থায় সফরের ইচ্ছা করলাম, যখন আমার স্ত্রী গর্ভবতী। সে আমাকে বললো, তুমি আমাকে এমন অবস্থায় রেখে সফরে যাচ্ছো? আমি বললাম, এই বাচ্চাকে আমি আল্লাহর হাতে অর্পণ করে দিয়ে যাচ্ছি। এ কথা বলে আমি সফরে রওনা হয়ে গেলাম। কয়েক বছর ঘরের বাইরে ছিলাম। যখন ঘরে ফিরে এলাম তখন পেরেশান হয়ে গেলাম। ঘরের দরজায় তালা দেয়া। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করলাম, আমার স্ত্রী কোথায়? তারা বললো, তার তো ইন্তেকাল হয়ে গেছে। এটা শুনেই আমি اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়লাম। আমার এক চাচাতো ভাইকে সাথে নিয়ে তার কবরে গেলাম। দীর্ঘ সময় আমি তার কবরের কাছে বসে কাঁদলাম। আমার ভাই আমাকে সান্ত্বনা দিলো এবং ঘরে চলে আসতে বললো। কিছু দূর ফিরে আসতেই আমি কবরস্থানে আগুন দেখতে পেলাম। আমি ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আগুন কিসের? সে উত্তর দিলো, এই আগুন প্রতিদিন রাতে ভাবীর কবর থেকে প্রজ্জ্বলিত হয়।

এটা শুনেই আমি اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়লাম। বললাম, আমার স্ত্রী তো খুবই নেককার ছিলো এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তো। তাহলে এই অবস্থা হবে কেনো? তুমি আমাকে আবার কবরটির কাছে নিয়ে চলো। সে আমাকে আবার নিয়ে গেলো। যখন আমি কবরস্থানে প্রবেশ করলাম, চাচাতো ভাই সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। আমি একাই আমার মরহুমা স্ত্রীর কবরের নিকট গেলাম এবং এক অদৃশ্য কণ্ঠ শুনতে পেলাম, কে যেন বলছিলো, হে আল্লাহর কাছে নিজের আমানত অর্পণকারী! তোমার আমানত ফেরত নাও। যদি তুমি তার মাকেও আল্লাহর কাছে অর্পণ করতে, তাহলে তাকেও তুমি পেতে। এটা শুনে আমি কবর থেকে ছেলেকে উঠিয়ে নিলাম। ছেলেকে উঠিয়ে নেয়া মাত্রই কবর সমান হয়ে গেলো। আমিরুল মু'মিনীন! আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, এই ঘটনা সম্পূর্ণ সত্যি।[১৩৩]

## বিরান ভূমিতে বিপদগ্রস্থ পথিকের আমল

يَا عِبَادَ اللّٰهِ اِحْبِسُوْا يَا عِبَادَ اللّٰهِ اِحْبِسُوْا.

(আল্লাহ পাক পৃথিবীর মানুষের দেখভাল করার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। তাদের সম্বোধন করে বিপদাক্রান্ত ব্যক্তি বলবে—) 'হে আল্লাহর

---

১৩৩. হায়াতুল হায়াওয়ান : ২২৫।

বান্দারা! (আল্লাহর হুকুমে) রক্ষা করো, বাঁচাও।' কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, يَا عِبَادَ اللهِ اَعِيْنُوْنِىْ। (হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য করো)।[১৩৪]

**ফযীলত :** ১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল কারীম সা. বলেছেন: যখন কোনো জনপদে তোমাদের বাহনে কোনো ক্ষতি সাধিত হবে তখন তোমরা উল্লেখিত اِحْبِسُوْا দোয়াটি পাঠ করো।

২. হযরত উতবাহ ইবনে গাযওয়ান রা. নবী কারীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কোনো জিনিস হারিয়ে যাবে (বাহন কিংবা পাথেয় ইত্যাদি), অথবা তোমরা এমন স্থানে থাকবে যেখানে তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং তোমাদের কোনো প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তোমরা পড়বে, يَا عِبَادَ اللهِ اَعِيْنُوْنِىْ

৩. তাবরানীতে হযরত উতবাহ ইবনে গাযওয়ান থেকে মারফু' রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যখন তোমাদের কোন জিনিস হারিয়ে যাবে কিংবা তোমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হবে এবং সেখানে তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না তখন তোমরা তিনবার এ দোয়া পড়বে: يَا عِبَادَ اللهِ اَعِيْنُوْنِىْ আল্লাহর এমন বান্দাও সেখানে আছে যাদের তোমরা দেখছো না। তোমরা উক্ত দোয়াটি পড়লে তারা তোমার সাহায্য করবে।

উল্লেখিত প্রতিটি হাদিসের সারমর্ম হলো, জঙ্গল কিংবা জনশূন্য প্রান্তরে যদি কোনো বিপদ আসে (উদাহরণস্বরূপ, বিরান ভূমিতে বাহনের কোনো ক্ষতি হলো অথবা জান-মালের ক্ষতি হবার আশংকা দেখা দিলো) তখন এই দোয়া يَا عِبَادَ اللهِ اَعِيْنُوْنِىْ তিনবার পড়বে। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেফাযতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। গায়বী সাহায্য পাওয়া যাবে। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত কার্যকর। আমাদের বড়রা একে কার্যকর দোয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার রহ. 'ঈযাহুল মানাসিক'-এর পাদটিকায় তাবরানীর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করার পর এবং ইবনে হাজার মক্কীও 'আলফুতুহাত' গ্রন্থে এই আমলটিকে কার্যকর আমল বলেছেন।

## শত্রুর দৃষ্টি থেকে বাঁচার কার্যকর আমল

১. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ[১৩৫]

২. اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْ آذَانِهِمْ وَقْرًا[১৩৬]

---

১৩৪. কিতাবুল আযকার, ইমাম নববী : ৫৩২, আল ফুতুহাত : ৫/১৫০, হিসনে হাসীন : ২৮৩, নুযুলুল আবরার : ৩৩৫।

১৩৫. সূরা নাহাল : ১০৮।

১৩৬. সূরা কাহাফ : ৫৭।

৩. اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ، وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ [১৩৭]

وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشَاوَ

**ফযীলত :** হযরত কা'ব রা. বলেন, নবী কারীম সা. যখন মুশরিকদের চোখের আড়ালে থাকতে চাইতেন তখন কুরআন শরীফের উল্লেখিত তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর কল্যাণে কাফেররা (শত্রুপক্ষ) নবীজী সা. কে দেখতে পেতো না।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, হযরত কা'ব রা.-এর আয়াত তিনটির সাথে সূরা ইয়াসীনের আয়াতটিকেও একত্রিত করে নিতে পারেন। যেটি নবীজী সা. মক্কা থেকে হিজরতের সময় পড়েছিলেন। যখন মুশরিকরা নবী কারীম সা.-এর ঘর ঘেরাও করে রেখেছিলো, নবী কারীম সা. ওই আয়াত পড়ে মাটি নিয়ে তাদের ওপর নিক্ষেপ করে সবার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, অথচ তারা কিছুই টের পেলো না। ইয়াসীনের আয়াতটি হলো,

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ. [১৩৮]

**একই রাস্তা দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও দেখতে পেলো না**

হযরত কা'ব রা. বলেন, নবী কারীম সা.-এর এই ঘটনা এবং তাঁর আমল আমি শাম দেশে এক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। সেই ব্যক্তির কোনো প্রয়োজনে রোম সাম্রাজ্যে যাওয়ার দরকার পড়ে। দীর্ঘকাল সে সেখানেই অবস্থান করছিলো। কিছুদিন পরই রোমের কাফেররা তাকে কষ্ট দিতে শুরু করলো, তখন ওই ব্যক্তি সেখান থেকে পলায়ন করলো। রোম সাম্রাজ্যের লোকজন তার পিছু ধাওয়া করলো। তখন হযরত কা'ব রা.-এর বর্ণিত রেওয়ায়াত তার স্মরণ হলো। সে ওই আয়াত পড়া শুরু করলো। যার বরকতে আল্লাহ তাআলা শত্রুদের চোখ এভাবে আবৃত করে দিলেন যে, সে আর তার শত্রুরা একই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, তবু তারা তাকে দেখতে পেলো না।

**গায়ে গায়ে লাগছে অথচ ধরতে পারলো না**

ইমাম ছা'লাবী রহ. বলেন, হযরত কা'ব রা. যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আমি তা রায় (বিখ্যাত শহর)-এর এক বাসিন্দার কাছে বর্ণনা করি। ঘটনাচক্রে দীলাম (ইরাক)-এর কাফেররা তাকে আটক করলো। কিছুদিন সে তাদের কারাগারে ছিলো। একদিন সে সুযোগ পেয়ে পলায়ন করলো। লোকেরা তাকে ধরার জন্য পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু পলায়নরত ব্যক্তিটি হযরত কা'ব রা.-এর

---

১৩৭. সূরা জাছিয়া : ২৩, তাফসীরে কুরতুবী ১০/২২১, মাআরিফুল কুরআন : ৪৯১, ১৫তম পারা, রুকু : ৫, বনী ইসরাঈল।

১৩৮. সূরা ইয়াসীন : ৯।

বর্ণিত আয়াতগুলো পড়া শুরু করলো। ফলে শত্রুদের চোখে এমন আবরণ পড়ে গেলো যে, তারা তাকে দেখতে পেলো না। অথচ সে তার শত্রুদের সাথে এমনভাবে মিলেমিশে চলছিল যে, কখনো কখনো তার পোশাকও শত্রুদের পোশাকের সাথে লেগে যাচ্ছিলো।

## পিছু ধাওয়াকারী সামনে চলে গেলো

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, আমি নিজের শহর উন্দুলুস (স্পেন) এ কর্ডোভার কাছাকাছি মানশুর কেল্লায় অবস্থানের সময় এ ঘটনাটি ঘটে। আমি শত্রুদের সামনে দিয়ে পলায়ন করে আগে চলে গেলাম এবং এক জায়গায় বসে পড়লাম। শত্রুরা আমার পেছনে দুই অশ্বারোহীকে প্রেরণ করলো। সেখানে শূন্য প্রান্তরে আমি একাই ছিলাম। আমি সূরা ইয়াসীনের শুরু থেকে فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ পর্যন্ত পড়তে লাগলাম। এই দুই অশ্বারোহী আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় পরস্পরে বলাবলি করছিল যে, 'এই পলায়নকারী কোনো মানুষ নয়, নির্ঘাত শয়তান কিংবা জ্বিন মনে হচ্ছে।' আল্লাহ তাআলা এই আয়াতসমূহের বরকতে তাদেরকে আমার ক্ষেত্রে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিলেন।[১৩৯]

## ধ্বংস ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

'মহান ও সহনশীল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আরশের মহান অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আসমানে ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, আরশের সম্মানিত অধিপতি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।'[১৪০]

**ফযীলত:** হযরত আলী রা. বলেন, নবী কারীম সা. আমাকে এমন কিছু কালেমা শিখিয়েছেন, যেগুলো অন্যায়কারী, অত্যাচারী সম্রাট কিংবা বিপদে ফেলতে পারে এমন যে কোনো জিনিস থেকে বাঁচার জন্য পড়তে বলেছেন। (আহমাদ, নাসাঈ, কানয) হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী কারীম সা. অধিকাংশ সময় এ দোয়া পড়তেন। (তিরমিযী)

## হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফও কিছু করতে পারেনি

হযরত আবু রাফে' রা. থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রা. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ (যার অত্যাচার প্রসিদ্ধ) এর সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিদায়ের সময় তিনি মেয়েকে বললেন, যখন হাজ্জাজ তোমার কাছে আসবে তখন এই দোয়া পড়ে নেবে। এই দোয়া শিখিয়ে দেওয়ার পর

---

১৩৯. তাফসীরে কুরতুবী: ১০/২২১।

১৪০. বুখারী: বিপদের সময় দোয়া অধ্যায়, ২/৯৩৯, হাদীস নং: ৪৩৪৫- ফাতহুল বারী, তারতীবে মুসনাদে আহমাদ: ১৪/২৬৩- আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী: ৮৯।

হযরত আব্দুল্লাহ পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বললেন, হুযুর সা. কোনো ধরনের কঠিন বিপদে ও চিন্তায় পড়লে এই দোয়া পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই দোয়ার বরকতে হাজ্জাজের মতো অত্যাচারী কখনো ওই মেয়েকে কোনো ধরনের কষ্ট দিতে পারেনি। (হায়াতুস সাহাবা)

এই ঘটনাটি ফাতহুল বারীতে নাসাঈ এবং তাবরানীর সূত্রে এভাবে লেখা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রা. নিজের মেয়ের বিয়ের সময় উপদেশস্বরূপ বলেছিলেন, যখন তোমার বিপদ হবে তখন কিবলামুখী হয়ে এই দোয়া (বিপদ থেকে মুক্তিদানকারী উপরোক্ত দোয়া) পড়বে।[১৪১]

## ডেকেছিলো হত্যার জন্য কিন্তু...

হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী এই হাদীসটির বর্ণনাকারী। তিনি বলেন, হাজ্জাজ আমাকে অত্যাচারের জন্য ডেকে পাঠালো। সে সময় আমি এই দোয়াটি পড়তে লাগলাম। আমাকে দেখেই সে বললো, আমি তো তোমাকে হত্যা করার জন্য ডেকেছিলাম। কিন্তু এখন আমার দৃষ্টিতে তুমি অত্যন্ত প্রিয় হয়ে গেছো। বলো, তোমার কী প্রয়োজন? আমার কাছে চাও। এরপর সসম্মানে আমাকে মুক্ত করে দিলো।[১৪২]

## আমল করেই মুক্তি পেলেন

আবু বকর ইবনে আলী নামের এক মুহাদ্দিস ইস্পাহানে বসবাস করতেন। একবার তার বিরুদ্ধে কেউ সম্রাটের কাছে নালিশ করলো। সম্রাট তাকে কয়েদ করে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। এই ঘটনার বর্ণনাকারী ব্যক্তি আবু বকর রাজী রহ. বলেন, আমি সে সময় ইস্পাাহানেই বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবু নাঈম-এর কাছে হাদীস লেখতাম। এক রাতে আমি নবী কারীম সা.-কে স্বপ্নে দেখলাম। তখন জিবরাঈল আমীন ছিলেন নবীজীর ডান পাশে। নবীজী সা. আমাকে বললেন, আরে তুমি! আবু বকর ইবনে আলীকে আমার এই বার্তা পৌঁছে দিয়ো, সহীহ বুখারীতে পেরেশানির যে দোয়া রয়েছে তা যেন গুরুত্বের সাথে ততক্ষণ পাঠ করে যতক্ষণ না তার মুক্তি মেলে। ভোরে উঠেই আমি তার কাছে গিয়ে স্বপ্নটির কথা বললাম। তিনি সে মতে আমল শুরু করে দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই আল্লাহ তাঁকে মুক্তি দান করলেন।[১৪৩]

**অনুসন্ধান :** আল ফাত্হুর রাব্বানী এবং আল কামিল এ বলা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রা. শুধু হাজ্জাজের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যই হাজ্জাজের মতো অত্যাচারীর কাছে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা-মেয়ে কেউই

---

১৪১. ফাতহুল বারী: ১১/১৭৬।
১৪২. ফাতহুল বারী: ১১/১৭৬।
১৪৩. ফাতহুল বারী: ১২/১৭৭।

এ বিয়েতে রাজি ছিলেন না। হাদীসের বর্ণনাকারী হাম্মাদ আবু রাফে' থেকে বর্ণনা করেন, এই দোয়ার বরকতে হাজ্জাজ ওই সম্ভ্রান্ত নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে নি। সে তার কাছে যেতে ব্যর্থ হয়েছিলো ।[১৪৪]

**দুই.** ইবনুস সুন্নী বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আলহাদ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রা. সবসময় এই দোয়াটির প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করতেন। তা ছাড়া এই দোয়া পড়ে জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে ফুঁ দেওয়ার আমলও করতেন। মেয়ে বিদায়ের সময় মেয়েকে এই দোয়া পাঠের প্রতি বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন।[১৪৫]

নিষ্পাপদের মাঝে বসবাসরত সে দুনিয়াত্যাগী মানুষ
যাকে দেখে ক্ষমা বলে, এদিকে এসো! আমি পাপী!
কী কারিশমা দেখাবেন করুণাময় হাশর দিবসে
নিষ্পাপরা চিৎকার করে উঠলো, 'আমিও পাপী!'

## চুরি-ডাকাতি থেকে রক্ষার দোয়া

قُلِ ادْعُو اللّٰهَ أَوِ ادْعُوْ الرَّحْمٰنَ، اَيًّا مَا تَدْعُوْفَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا.

'আপনি বলে দিন, তোমরা 'আল্লাহ' বলে ডাকো কিংবা 'রাহমান' বলে ডাকো। যে নামেই ডাকো না তাঁর অনেকগুলো সুন্দর নাম রয়েছে। আর নামাযে তোমরা আওয়াজ উঁচু করো না, আবার খুব ক্ষীণও করো না। এই দুইয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করো।'[১৪৬]

**ফযীলত:** হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সা. উক্ত আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন- وَهُوَ اَمَانٌ مِنَ السَّرَقَةِ অর্থাৎ এই দোয়ার মাধ্যমে চুরি থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে।[১৪৭]

## আয়াতের বরকতে চোরের কাণ্ড

একবার জনৈক সাহাবী রা. রাতে এই আয়াত পড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর ঘরে চোর প্রবেশ করলো। ঘরে যা কিছু ছিলো সব কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজার কাছে এসে দেখলো, দরজা বন্ধ। দরজা বন্ধ দেখে সে খুব চিন্তিত হলো। বেরিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় তার মাথায় আসছিলো না। এরপর সে জিনিসপত্র সব ঘরে রেখে দিলো। এবার দরজার কাছে এসে দেখলো

---

১৪৪. আল ফাতহুর রাব্বানী: ১৪/২৬৩।
১৪৫. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, ইবনে সুন্নী: ৮৯।
১৪৬. সূরা বনী ইসরাঈল: ১৫ পারা/১১০তম আয়াত।
১৪৭. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ২২৮।

দরজা খোলা। দরজা খোলা দেখে তার ভেতরে আবার লোভ জেগে উঠলো। সে আবার জিনিসপত্র ওঠালো। কিন্তু দরজার কাছে এসে দেখলো দরজা বন্ধ। এরকম তিনবার হলো। এদিকে সাহাবী বিছানায় শুয়ে শুয়েই এ কৌতুক দেখছিলেন। এই বিস্ময়কর নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ-ব্যবস্থা দেখে প্রথমে তিনি হাসলেন। তারপর চোরকে বললেন, اِنِّيْ اَحْصَنْتُ بَيْتِيْ আরে মিয়া! আমি তো আমার পুরো ঘরে নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে রেখেছি। তুমি চুরি করবে কিভাবে? এভাবে সেই চোর ব্যর্থ হয়ে গেলো।[১৪৮]

## বন্দিদশা থেকে মুক্তিদানকারী দোয়া

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

(বেশি বেশি এই দোয়া পড়তে থাকা।)

'ইবাদত করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার সাধ্য মহান ও মহিমাময় আল্লাহর তাওফিক ছাড়া সম্ভব নয়।'

## শেকল আপনা-আপনি খুলে গেলো

হযরত আউফ ইবনে মালিক আশজাঈ রা. একবার নবী কারীম সা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, আমার ছেলে সালেম রা.-কে শত্রুরা পাকড়াও করেছে। তার মা খুব অস্থির হয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আমার কী করা উচিত? উপায় বলে দিন। নবী কারীম সা. তাকে স্ত্রীসহ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. বেশি বেশি পড়তে বললেন। তারা দু'জন নির্দেশ অনুযায়ী তাই করলেন। এই আমলের প্রভাব এমন হলো যে, একদিন সালেম বসে ছিলেন। হঠাৎ তার বেড়ি খুলে গেলো। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পলায়ন করলেন। শত্রুদের একটি উটনি পেয়ে গেলেন এবং তার ওপর আরোহণ করলেন। পথে উটের পাল দেখতে পেলেন, তাদেরও নিজের সাথে হাকিয়ে নিয়ে এলেন।

শত্রুরা তার পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু তিনি কারো হাতে ধরা পড়লেন না। সোজা নিজের ঘরে এসে পৌঁছলেন এবং দরজায় দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিলেন। হযরত আউফ রা. কণ্ঠ শুনে স্ত্রীকে বললেন, আল্লাহর কসম! এটা তো সালেম! স্ত্রী বললেন, আরে সে কোত্থেকে আসবে! বেচারা তো কয়েদখানায় কষ্টে কাতরাচ্ছে। (তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিলো না, শত্রুর কয়েদখানা থেকে সে কিভাবে আসতে পারে!) এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এবং খাদেম দরজার দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। দরজা খুলে দেখলেন, হযরত সালেম রা. দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরের পুরো আঙ্গিনা উটে ভরে আছে। অবস্থা দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হলেন, ভালোমন্দের খোঁজ-খবর নেওয়ার পর বললেন, এই উট কোথা থেকে? তিনি

---

১৪৮. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ২২৮।

পুরো ঘটনা শোনালেন। শুনে হযরত আউফ রা. বললেন, আচ্ছা! একটু অপেক্ষা করো, আমি নবীজীর কাছ থেকে জেনে আসি। নবী কারীম সা. বললেন, এই সব এখন তোমাদের সম্পত্তি, যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারো।[১৪৯]

**অনুসন্ধান :** কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী নবী কারীম সা. তাঁকে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ করেছেন। হতে পারে নবীজী তাঁকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি বেশি বেশি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পড়তে বলেছেন।

## শত্রুর ওপর বিজয়লাভের ব্যবস্থাপত্র

يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

'হে বিচারদিবসের অধিপতি! আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার কাছেই সাহায্য চাই।'[১৫০]

## ফেরেশতারা চারদিক থেকে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করলো

হযরত আবু তালহা রা. বলেন, আমরা এক যুদ্ধে নবী কারীম সা.-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন শত্রুর মুখোমুখি হই তখন নবী কারীম সা.-কে উপরোক্ত দোয়াটি পড়তে শুনেছি। আমি দেখলাম, শত্রুবাহিনীর লোকজন কচুকাটা হয়ে পড়ে যাচ্ছে। সম্ভবত ফেরেশতারা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে মারছিলেন।[১৫১]

## আল্লামা ইবনে তায়মিয়ার শিক্ষাদান

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তায়মিয়া রহ. একবার জিহাদের উদ্দেশ্যে সেই সময়ের শাসকের সাথে বের হলেন। যুদ্ধ শুরু হলে সম্রাট নিজের ধারণা অনুযায়ী বরকতময় মনে করে জোরে জোরে বলছিলো, হে খালেদ ইবনুল ওয়ালীদের প্রতিপালক! (সম্ভবত তার উদ্দেশ্য ছিলো, হে খালেদ ইবনুল ওয়ালীদকে সাফল্যদানকারী রব! আমাদেরকেও বিজয় ও সাফল্যদান করুন।) আল্লামা ইবনে তায়মিয়া একথা শোনামাত্র প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন, বলো,

يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

নেকদিল সম্রাট তাই করলেন। মুহূর্তের মধ্যে শত্রুর ওপর বিজয় নিশ্চিত হয়ে গেলো।'[১৫২]

---

১৪৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ৫/৩৭৬, মাআরিফুল কুরআন: ৮/৪৮৭।

১৫০. হায়াতুস সাহাবা : ৩/৬০২, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, ইবনে সুন্নী : ৮৭, আযকার, নববী: ১৫০।

১৫১. হায়াতুস সাহাবাহ ৩/৬০২, নুযুলুল আবরার: ২৬০।

১৫২. নুযুলুল আবরার: ২৬০।

## সব ধরনের রোগে এই দোয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أُعِيْذُكَ بِاللهِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ. مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ.

'সেই আল্লাহর নামে যিনি বড় করুণাময়, অতি দয়াশীল, যিনি এক, অমুখাপেক্ষী, যিনি জন্ম দেননি, নেনও নি, তার কোনো সমকক্ষ নেই, তোমার হিফাযত প্রার্থনা করছি সেই অনিষ্ট থেকে, যা তুমি অনুভব করছো।'[১৫৩]

হযরত উসমান রা. থেকে বর্ণিত, একবার আমি অসুস্থ হলাম। নবী কারীম সা. আমাকে দেখতে এলেন। উপরোক্ত দোয়াটি পড়লেন এবং যাওয়ার সময় বলে গেলেন, এই দোয়াটি পড়ে ফুঁ দিও, এর কোনো তুলনা নেই।

মুহাদ্দিস তাবরানী রহ.-র কিতাব 'আদ দোয়া' তে একথাও উল্লেখিত হয়েছে, নবী কারীম সা. উল্লেখিত কালিমাগুলো পড়ে আমাকে ফুঁ দিলেন। এবং এই দোয়ার বরকতে আল্লাহ আমাকে সুস্থতা দান করলেন।[১৫৪]

## একটি মকবুল দোয়া

এমনকি চিকিৎসাহীন রোগীর ক্ষেত্রেও পরীক্ষিত

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

'হে আল্লাহ! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও কল্যাণ দান করুন। আর জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের রক্ষা করুন।'[১৫৫]

**ফযীলত:** এই দোয়াটি পরিপূর্ণ কল্যাণ কামনা করার দোয়া। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে যখন কেউ দোয়া করতে বলতো, তখন তিনি এই দোয়াটি পাঠ করতেন। যদি কেউ এর চেয়ে বেশি দোয়া করার অনুরোধ করতো তখন তিনি বলতেন, এর চেয়ে বেশি আর কী দোয়া করবো?

## তীব্র অসুখ থেকে মুক্তি

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর বর্ণনা, নবী কারীম সা. একবার এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। সেই সাহাবী অসুস্থতার কারণে দুর্বল হতে হতে পাখির ছানার মতো হয়ে গিয়েছিলেন। রাসূল কারীম সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী দোয়া করো? তিনি উত্তর দিলেন, আমি দোয়া করি, হে আল্লাহ! যে শাস্তি তুমি আমাকে আখেরাতে দিতে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দাও। এ

---

১৫৩. আদ্দুয়া: ৩/১৩৪২, আলফুতুহাত, আবু ইয়ালা ১৪/৭২।

১৫৪. আদ দোয়া: ২/১৩২৪, আদ দোয়াউল মাসনুন: ৩১১।

১৫৫. মুসলিম: ২/২৪৩ باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا হাদীস নং: ২৬৮৮, আল ফাতহুর রাব্বানী, তারতীবে মুসনাদে আহমাদ: ১৪/২৮৭, ইবনে কাছীর: ৩২৭।

কথা শুনে নবীজী সা. বললেন, ভাই! তুমি তা সহ্য করতে পারবে না। (তাই এরকম দোয়া করো না)। তার পরিবর্তে তুমি এমনটি কেনো প্রার্থনা করছো না-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

হযরত আনাস রা. বলেন, এরপর তিনি এই প্রার্থনা শুরু করলেন। এর বরকতে আল্লাহ তাআলা তাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করলেন।

**অনুসন্ধান :** (১) হাদীসে قد صار مثل الفرخ এসেছে। যে কারণে এর অর্থ মুরগীর এমন ছানা যা এই মাত্র ডিম থেকে ফুটেছে। আর জানা কথা তখন সে খুবই দুর্বল থাকে। এদিকে লক্ষ্য করে বর্তমান যুগের কিছু ওলামা বলেছেন: এইড্স রোগীদের জন্য এই দোয়াটি উপকারী। এই রোগীরও ঠিক তদ্রূপ অবস্থা হয়ে থাকে। অতএব তার উচিত পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এই দোয়া পাঠ করতে থাকা। ইনশাআল্লাহ অতিদ্রুত আরোগ্য লাভ হবে।

(২) উক্ত হাদীস থেকে যেমন দোয়াটির গুরুত্ব বোঝা যায়, সাথে সাথে এও বোঝা যায়, পরকালীন শাস্তি ও বিপদ প্রার্থনা করা উচিত নয়।

## অহেতুক সন্দেহ দূরকারী চিকিৎসা

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[১৫৬]

**পদ্ধতি :** তিনবার পড়ে উল্টো দিকে তিনবার থুথু ফেলবে।

## প্রখ্যাত সাহাবীর অহেতুক সন্দেহ দূর হয়ে গেলো

হযরত উসমান ইবনুল আস আসসাকাফী রা. (যিনি বনু ছাকীফের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নবম হিজরীতে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন) বলেন, একবার আমি নবী কারীম সা.-এর কাছে অভিযোগ করি, হে আল্লাহর রাসূল সা.! শয়তান আমার কেরাত ও আমার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তেলাওয়াতে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। (অনুগ্রহপূর্বক এর চিকিৎসা বলে দিন)। নবীজী সা. বললেন, এটি খানযাব শয়তান। (যেটি এভাবে অনিষ্ট করে থাকে)। অতএব যখনই তোমার এমনটি অনুভূত হবে, তখন তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে (বেশি বেশি اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়ে) এবং উল্টো দিকে ফিরে তিনবার থুথু ফেলবে। আমি এমনটি করলাম। এর বরকতে আল্লাহ তাআলা আমার মনের অহেতুক দ্বিধাদ্বন্দ্ব চিরদিনের জন্য দূর করে দিলেন।

**টিকা :** আল্লাহর নবী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রা ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত ওয়াসওয়াসা বিষয়ক আরো কিছু দোয়া...

**এক.** হাদীসে এসেছে, হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন- নবী কারীম সা.

---

১৫৬. কিতাবুল আযকার, নববী: ১০৫।

বলেছেন, মনে ওয়াসওয়াসা আসলে آمَنَّا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ তিনবার পড়বে।[১৫৭]

**দুই.** বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনায় এসেছে, নবী কারীম সা. বলেছেন, ওয়াসওয়াসার ক্ষেত্রে বেশি বেশি اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم পড়ো।[১৫৮]

**তিন.** হযরত ইবনে আব্বাস রা. একজনকে বলেছেন, যখন ওসওয়াসা তোমাকে পেরেশান করবে, তখন এই আয়াত পড়ো, هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ-[১৫৯]

**চার.** অনেক উলামায়ে কেরাম ওযু এবং নামাযের ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে বলেছেন।[১৬০]

**পাঁচ.** আবু সুলাইমান দারানী আহমাদ ইবনে আবুল হাওয়ারীকে ওয়াসওয়াসা প্রতিরোধের জন্য সর্বদা হাসি-খুশি থাকতে বলেছেন। কারণ স্বরূপ বলেছেন, মুমিনের আনন্দ শয়তানের সবচেয়ে অপছন্দনীয়। সে কারণে মুমিনের আনন্দ ও খুশি দেখলে ওয়াসওয়াসা নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে।[১৬১]

## সব ধরনের ব্যথা উপশমকারী দোয়া

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمَنَا.[১৬২]

**পদ্ধতি :** আল্লামা নববী রহ. এই দোয়া পাঠের বিশেষ একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যা দোয়ার বিষয়, ক্ষেত্র এবং স্থান অনুযায়ী খুবই উপযোগী। তিনি বলেন, প্রথমে শাহাদাত আঙ্গুলে কিছু থুথু নিয়ে নেবে। তারপর আঙ্গুলটি মাটিতে লাগাবে। এরপর এই আঙ্গুল ব্যথার স্থানে ঘোরাতে ঘোরাতে উল্লেখিত দোয়াটি বেজোড় সংখ্যক বার পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ, কয়েকবার এরকম করলে আল্লাহ তার ব্যথা উপশম করে দেবেন।

## প্রস্রাব বন্ধ হলে বা মূত্রনালীতে পাথর হলে– এই দোয়া পড়বে

رَبُّنَا الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ، اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ وَاغْفِرْلَنَا حَوْبَنَا وَخَطَايَانَا، اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ، فَاَنْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ.

'তিনি আমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশে রয়েছেন। তাঁর নাম বড়

---

১৫৭. কিতাবুল আযকার, নববী: ১০৪।

১৫৮. কিতাবুল আযকার, নববী: ১০৪।

১৫৯. আবু দাউদ শরীফ, ওয়াসওয়াসা রোধ অধ্যায়: ৬৯৬, হাদীস নং: ৫১১০।

১৬০. কিতাবুল আযকার, নববী: ১০৫।

১৬১. কিতাবুল আযকার, নববী: ১০৫।

১৬২. বুখারী, রুকিয়াতুন্নবী সা. অধ্যায়: ২/৮৫৫, হাদীস নং: ৫৭৪৫, নুযুলুল আবরার: ২৭২।

পবিত্র, আপনার আদেশ আকাশে-মাটিতে যেরূপ দয়া আপনি করেছেন আসমানবাসীর ওপর। অতএব আপনি আপনার করুণা মাটিতে দান করুন এবং আমাদের অপরাধ ও ত্রুটি ক্ষমা করুন। আপনি পবিত্র ব্যক্তিদের রব। আপনার আরোগ্য-ভাণ্ডার থেকে আরোগ্য এবং আপনার রহমতের ভাণ্ডার থেকে কিছু রহমত এই ব্যথার ওপর অবতীর্ণ করুন।'[১৬৩]

**পদ্ধতি:** নিজেই এই দোয়া পড়তে থাকবে। নিজে না পারলে অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে ফুঁ দেওয়াবে। অথবা কাগজে লিখে সেটির পানি পান করবে।[১৬৪]

## দোয়া পড়তেই প্রস্রাব শুরু হলো

হযরত আবু দারদা রা.-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার পিতার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে। মূত্রনালীতে পাথর হয়েছে। তখন আবু দারদা রা. তাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিলেন, যা তিনি স্বয়ং নবী কারীম সা.-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন। পরবর্তীতে সে লোক এই দোয়াটি পড়তেই তার পিতার প্রস্রাব শুরু হয়ে গেলো।

ইমাম নাসাঈ এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন, ইরাকের দুই ব্যক্তি কোনো এক লোকের প্রস্রাব বন্ধ হওয়ার সমস্যা নিয়ে হযরত আবু দারদার খেদমতে এলো। হযরত আবু দারদা রা. বললেন, আমি নবী কারীম সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তির অথবা তার ভাইয়ের এই (প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার) সমস্যা হবে, সে যেন এই (পূর্বোল্লেখিত) দোয়াটি পড়ে। পরে তারা এই দোয়াটি পড়লে সাথে সাথে সেই ব্যক্তির প্রস্রাব শুরু হয়ে যায়।[১৬৫]

## ফোঁড়ার চিকিৎসা

اَللّٰهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيْرِ وَمُكَبِّرَ الصَغِيْرِ صَغِّرْ مَابِيْ.

'হে আল্লাহ! বৃহৎকে ক্ষুদ্রে পরিণতকারী, ক্ষুদ্রকে বৃহৎকারী! আমার ফোড়া নিঃশেষ করে দিন।'[১৬৬]

## উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রা.-এর ফোঁড়া ফেটে গেলো

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রা. বলেন, একবার নবী সা. আমার ঘরে এলেন। আমার আঙ্গুলে ফোঁড়া হয়েছিলো। তা দেখে তিনি

---

১৬৩. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, ইবনে সুন্নী: হাদীস নং ৫৬৭, আবু দাউদ শরীফ: ঝাঁড়ফুঁক অধ্যায়, পৃ: ৫৪৩, হাদীস নং: ৩৮৯২, নুযুলুল আবরার: ২৬৭।

১৬৪. আদ-দোয়াউল মাসনুন: ৩০৫।

১৬৫. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, ইবনে সুন্নী: হাদীস নং ৫৬৭।

১৬৬. আল আযকার, নববী: ১০৭, নুযুলুল আবরার: ২৭১, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, ইবনে সুন্নী: ১৬২, হাদীস নং ৬৩৫।

বললেন: তোমার কাছে যারীরা (সুগন্ধিযুক্ত ভারতীয় এক প্রকার গাছের লাকড়ি) আছে? বললাম, জ্বি আছে। তিনি সে লাকড়ির একটি টুকরা ফোঁড়ার ওপর রাখলেন এবং বললেন, এখন এই দোয়া পড়ো। আমি পড়লাম এবং সাথে সাথে সে ফোঁড়া ফেটে ঠিক হয়ে গেলো।

**অনুসন্ধান :** ১. অধিকাংশ বর্ণনায় 'নবীজীর কোনো এক স্ত্রী' এসেছে। কিন্তু হাকেম রহ. তার বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে হযরত যয়নব রা.-এর নাম উল্লেখ করেছেন।[১৬৭]

দুই. الذريرة نوع من الطيب مجموع من اخلاط، قيل هي فتات قصب ما كان النشاب وغيره (النهاية:٢/١٥٦) (যারীরা বিভিন্ন সুগন্ধির সমষ্টি এক প্রকার আতর। কেউ কেউ বলেছেন, বাঁশের লাকড়ির খোসা, যে বাঁশ দ্বারা তীর ইত্যাদি বানানো হয়)

## জ্বর সারার তদবীর

بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ وَاللهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ حَاسِدَةٍ وَطَرْفَةِ عَيْنٍ وَاللهُ يَشْفِيْكَ.

'আল্লাহর নামের সাহায্যে তোমাকে ফুঁ দিচ্ছি, আল্লাহ তোমাকে কষ্টদায়ক সব রোগ থেকে আরোগ্য দান করুন, আর হিংসাত্মক হৃদয় থেকে এবং চোখের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখুন এবং আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করুন।'[১৬৮]

## চোখের পলকে নবী কারীম সা.-এর জ্বর সেরে গেলো

হযরত উমর ফারুক রা. বলেন, একবার আমি এবং আবু বকর রা. নবী কারীম সা.-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় নবীজী সা.-এর মারাত্মক জ্বর ছিলো। তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমরা সালাম দিলে নবীজী সা. উত্তরও দিতে পারলেন না। নবীজীর এই অবস্থা দেখে আমরা ঘরের বাইরে চলে এলাম। বের হওয়া মাত্রই রাসূল সা.-এর সংবাদদাতা এসে উপস্থিত হয়ে বললো, নবীজী আমাদের ডাকছেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম, নবীজী সা. এমনভাবে বসে আছেন যেন তাঁর কোনো কষ্টই ছিল না। নবীজী সা. বললেন, তোমরা বাইরে যাওয়া মাত্রই আমার কাছে দু'জন ফেরেশতা এলো। একজন মাথার কাছে, অন্যজন পায়ের কাছে বসলো। পায়ের কাছের জন মাথার কাছের জনকে জিজ্ঞাসা করলো, এঁর কী কষ্ট হচ্ছে? অন্যজন উত্তর দিলো, তাঁর

---

১৬৭. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ এর পাদটিকা, ইবনে সুন্নী: ১৬২।

১৬৮. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, ইবনে সুন্নী: ১৪৫ পৃষ্টা, হাদীস নং ৫৬৯।

প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে। পায়ের কাছে বসা ফেরেশতা বললো, তাহলে তাঁকে এই কালিমাগুলো পড়ে ফুঁ দিয়ে দাও, তাতে তার উপকার হবে। (এই কথা বলে ফেরেশতা উল্লেখিত দোয়াটি পড়লো) নবী কারীম সা. বললেন, তারা ওই দোয়াটি পড়ে ফুঁ দিলেন। সাথে সাথে আমার সমস্ত কষ্ট চলে গেলো। এই সুসংবাদ শোনানোর জন্য আপনাদের দু'জনকে ডেকে আনলাম।

## ঋণ পরিশোধের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

(١) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি চিন্তা ও কষ্ট থেকে, আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি ভীতি এবং কৃপণতা থেকে, আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি ঋণের প্রাবল্য এবং মানুষের প্রতাপ থেকে।[১৬৯]

## অসহায় করে দেয়া ঋণ শোধ হয়ে গেলো

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, হুযুর সা. একদিন মসজিদে গেলেন। হঠাৎ আনসারী সাহাবী আবু উমামা রা.-এর ওপর নবীজী সা.-এর দৃষ্টি পড়লো। নবীজী তাকে প্রশ্ন করলেন, হে আবু উমামাহ! কী ব্যাপার? আজ তোমাকে নামাযের সময় ছাড়াই মসজিদে বসা দেখতে পাচ্ছি? তিনি উত্তর দিলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সীমাহীন পেরেশানি ও ঋণ আমাকে ঘিরে ফেলেছে। হুযুর সা. বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দেবো, যা তুমি পাঠ করলে আল্লাহ তোমার পেরেশানি দূর করে দেবেন এবং তোমাকে ঋণ থেকে মুক্ত করবেন? তিনি উত্তর দিলেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজী সা. বললেন, সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়াটি পড়বে—

(٢) اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ، مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا اَنْتَ تَرْحَمُنِىْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! হে অস্থিরতা থেকে মুক্তি দান কারী! পেরেশানি খতমকারী! অসহায়দের আহ্বানে সাড়া দান কারী, ইহকাল ও পরকালের করুণাময় ও দয়াময়! আপনি আমাকে এমন করুণা করুন, যা দ্বারা আপনি অন্য সবার করুণা থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করবেন।[১৭০]

**ফযীলত :** নুযুলুল আবরারে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী

---

১৬৯. হায়াতুস সাহাবা: ৩/৫৩৩, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১০/২২৪, আবু দাউদ: ২/৩৭০।

১৭০. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১০/২২৩, নুযুলুল আবরার: ২৬৩, (২) নুযুলুল আবরার: ২৬৩।

কারীম সা.-এর সূত্রে নিজের পিতার কাছে ঋণ পরিশোধের জন্য উক্ত দোয়া বর্ণনা করেছিলেন। বলেছিলেন, এই দোয়া হযরত ঈসা আ. তাঁর সঙ্গীদের এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে শেখাতেন।

## পিতা-কন্যার দু'জনের বিস্ময়কর ঘটনা

(এক) বায়হাকীতে হযরত আয়েশা রা.-এর এ বর্ণনা এসেছে, একবার আমার পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. আমার ঘরে এলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি নবী কারীম সা.-এর কাছ থেকে এমন এক দোয়া শুনেছি- যদি কোন ব্যক্তির ওপর পাহাড়সম ঋণের বোঝাও থাকে, সে এই দোয়া পড়লে আল্লাহ তার ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেবেন। তারপর আমি দোয়াটি পড়ে শোনালাম। হযরত আবু বকর রা. বলেন, আমার ওপর অনেক ঋণ ছিলো, যে কারণে আমি বেশ চিন্তিত ছিলাম। এই দোয়ার বরকতে কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা ব্যবসায় এমন মুনাফা দান করলেন, যত ঋণ ছিলো সব পরিশোধ করে ফেললাম।

(দুই) হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমার ওপর হযরত আসমা বিনতে উমাইস রা.-এর এক দিনার ও তিন দিরহাম ঋণ ছিলো। আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। যখনই আসমাকে দেখতাম, লজ্জায় পড়ে যেতাম। কিন্তু যখন এই দোয়া পড়তে থাকলাম, তখন আল্লাহ তাআলা রুজিতে এতো বরকত দান করলেন যে, সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে গেলো।[১৭১]

**বিশেষ অনুসন্ধান :** নুযুলুল আবরারে মুসতাদরাকে হাকেমের সূত্রে এই হাদীসের অতিরিক্ত এই অংশটুকু বর্ণিত হয়েছে। 'হযরত আসমা বিনতে উমাইস রা. যখনই আমার ঘরে আসতেন, লজ্জায় তার দিকে তাকাতে আমার কষ্ট হতো। কারণ ঋণ শোধ করার জন্য আমার কাছে কিছু ছিলো না। তারপর যখন এই দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক এর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা হয়ে গেলো, তখন আমি ঋণ শোধ করার পর আত্মীয় স্বজন এবং অন্যদের মাঝেও অর্থ বণ্টন করেছি। আমার ভাতিজি আব্দুর রহমানের মেয়েকে অলংকারও দিয়েছি, এরপরও কিছু অর্থ অবশিষ্ট রয়ে যায়।

## কোনো বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখলে পাঠ্য দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

'সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর যিনি তোমার বিপদ থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তাঁর অগণিত সৃষ্টির ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'

---

১৭১. তিরমিযী শরীফ, বিপদাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখলে কী দোয়া পড়বে অধ্যায়: ২/১৮১, হাদীস নং ৩৪৩১, ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৩৮৯২, কিতবুদ্দুয়া লিততাবরানী : ২৫৩, হাদীস নং ৭৯৭, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, ইবনে সুন্নী : ৮২ পৃষ্টা, হাদীস নং ৩০৮।

**ফযীলত:** হযরত উমর রা. বলেন, আল্লাহর নবী সা. ইরশাদ করেছেন: যখনই কোনো ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ (অসুস্থ, এ্যাক্সিডেন্টে আহত, কারাগারে আটক, ইত্যাদি খারাপ অবস্থায়) কাউকে দেখবে, সাথে সাথে ওই দোয়া পড়বে। আল্লাহ তাআলা তাকে জীবনভর সেই বিপদ থেকে মুক্ত রাখবেন।

## অটোমেটিক এলার্ম

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا.

'আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার কাছে ওহি আসে যে, তোমাদের রব একজন। অতএব যে নিজ রবের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে সে যেন সৎকর্ম করে এবং নিজের প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।'[১৭২]

**ফযীলত :** (এক) হযরত যর ইবনে হুবাইশ রা. নবী কারীম সা. থেকে বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ আয়াত এই ইচ্ছায় পড়বে যে, রাতের অমুক অংশে আমি ঘুম থেকে জাগবো এবং আমার চোখ খুলে যাবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে সেই নির্দিষ্ট সময়ে জাগ্রত করে দেবেন।

(দুই) হযরত আয়েশা রা. নবী কারীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন সূরার কথা বলবো, যার সওয়াব আকাশ ও ভূপৃষ্ঠের মাঝের শূন্যতাকে ভরে দেয় এবং এই সূরা যে লেখে সেও সওয়াব পায়, যে পড়ে সেও সাওয়াব পায়। যে ব্যক্তি এটি শুক্রবারে পড়বে পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি শোয়ার সময় এই সূরার শেষ পাঁচ আয়াত পড়ে, এর বরকতে সে রাতের যে মুহূর্তে জাগ্রত হতে চাইবে, আল্লাহ তাকে সেই মুহূর্তেই জাগ্রত করে দেবেন। এটি সূরা কাহাফ।

**ফায়দা :** প্রথম বর্ণনা দ্বারা এটা বোঝা যায়, নির্দিষ্ট সময়ে জাগ্রত হওয়ার জন্য ওই সূরার শুধু শেষের আয়াত পড়বে, পরবর্তী বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় পূর্ণ পাঁচ আয়াত পড়তে হবে। অর্থাৎ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়বে।

## মুহাদ্দিস ও প্রখ্যাত ক্বারীর পর্যবেক্ষণ

এক. মুহাদ্দিস আব্দুহু বলেন, আমি দোয়াটি অনেকবার যাচাই করে দেখেছি এবং কার্যকর হিসেবে পেয়েছি।

দুই. ইবনে কাছীর মক্কী বলেন, আমি অসংখ্যবার জিহাদ ও এরকম সময়ে

---

১৭২. কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, আবু উবায়দ: সূরা কাহাফের ফযীলত অধ্যায়, আবু মুহাম্মদ ইবেন আকীলাহ আল মক্কী: ১৬৮/২, ফয়জুল কদীর: ৩/১০৪।

এই আমলটি যাচাই করেছি। যখন এটা পড়ে শুয়েছি, যে সময়েই আমার জাগতে মনে চাইতো, সে সময়েই আমার চোখ খুলে যেতো। আমি اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকি।[১৭৩]

## দাঁতের ব্যথার জন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

(১) اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُ مَايَجِدُ وَفَحْشَهُ بِدَعْوَةِ نَبِيِّكَ الْمَكِيْنِ الْمُبَارَكِ عِنْدَكَ.

'হে আল্লাহ! তার কষ্ট ও কাঠিন্যকে আপনার কাছে সম্মানিত ও মর্যাদাবান নবীর দোয়ার ওসিলায় দূর করে দিন।'[১৭৪]

## ইবনে রাওয়াহার দাঁতের যন্ত্রণা দূর হয়ে গেলো

বায়হাকী আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার তিনি নবী কারীম সা.-এর কাছে দাঁতের ব্যথার সমস্যার কথা জানালেন। নবী কারীম সা. হাত মুবারক তার মাড়িতে রাখলেন এবং সাতবার উপরোক্ত দোয়াটি পড়লেন।

## হাত মুবারক ওঠানোর পূর্বেই আল্লাহ ব্যথা দূর করে দিলেন

(২) بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَسْئَلُكَ بِعِزِّكَ وَجَلَالِكَ وَقُدْرَتِكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ فَاِنَّ مَرْيَمَ لَمْ تَلِدْ غَيْرَ عِيْسٰى مِنْ رُوْحِكَ وَكَلِمَتِكَ اَنْ تَكْشِفَ مَا تَلْقٰى فَاطِمَةَ بِنْتَ خَدِيْجَةَ مِنَ الضُّرِّ.

'আল্লাহর নাম, গুণ, বড়ত্ব, মহত্ত্ব এবং সর্ব ক্ষমতার সাহায্যে নিবেদন করছি, আপনি তো এমন ক্ষমতাবান যে, মারয়াম হযরত ঈসা আ.-কে আপনার বিশেষ আদেশ এবং 'কুন' শব্দের মাধ্যমেই জন্ম দিয়েছেন। আপনি ফাতিমা বিনতে খাদিজার দাঁতের কষ্ট দূর করে দিন।'

হুমায়দী রহ. বর্ণনা করেন, হযরত ফাতিমা রা. হুযুর সা.-এর কাছে এসে দাঁতের ব্যথার কথা বললে রাসূল সা. ডান হাতের শাহাদাত আঙুল যে দাঁতে ব্যথা ছিল সেখানে রেখে এ দোয়া পড়লেন। হযরত ফাতিমা রা.-এর দাঁতের যন্ত্রণার উপশম হয়ে গেলো।

## সুগারের রোগীদের জন্য সুখবর

দুই বেলা খাবারের পর নীচে উল্লেখিত আয়াত শুধু একবার পাঠ করে নিজের ডান হাতের পাঁচ আঙ্গুলে ফুঁ দেবে এবং পাঁচ আঙ্গুল চেটে নেবে। অষুধ যা খাওয়ার খেতে থাকবে। আয়াতটি হলো :

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ. (سورة الشعراء: ١٣٠)

ইনশাআল্লাহ, সুগার অতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

---

১৭৩. যিয়াদাহ ওয়াল ইহসান, পাদটিকা: ২/১৬৯।

১৭৪. মাদারিজুন নবুওয়াত: ১/৪২২, সূত্র: বায়হাকী।

## এক মেয়ে ও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের চমকপ্রদ গল্প

উম্মে আবান হিন্দাহ বিনতে নোমান ইবনে বশীর আল আনসারি ছিলেন অতি রূপবতী, সুন্দরী ও সাহিত্যিক। তার প্রথম বিয়ে হয়েছিলো রাওহ ইবনে যম্বার সাথে। এরপর হাজ্জাজ তাকে শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করে দুই লাখ দিরহামে বিয়ে করে নেন। কিন্তু তার অন্তরে হাজ্জাজের প্রতি ঘৃণাই ছিলো। একবার আয়নায় নিজের সৌন্দর্য ও রূপ দেখছিলো আর হাজ্জাজের সাথে নিজের তুলনা করতে করতে এক সময় আচমকা মুখে এই কবিতা চলে এলো,

وهل هند الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغل

হিন্দা তো এক সম্ভ্রান্ত জাতের আরবী অশ্ব, যাকে বিয়ে করে নিয়েছে এক খচ্চর।

فان ولدت فحلا فلله درها وان ولدت بغلا فجاء به البغل

এখন যদি সুপুরুষ সে জন্ম দেয় তবে কতই না ভালো, আর যদি খচ্চর জন্মে তবে মনে করবে খচ্চর থেকে খচ্চরই জন্ম নেয়।

সে যখন এই কবিতা আবৃত্তি করছিলো, তখন হঠাৎ হাজ্জাজ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং পংক্তিগুলো শুনে প্রচণ্ড রাগে তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। পরে আব্দুল্লাহ ইবনে তাহের-এর মাধ্যমে তিনি মহর পরিশোধ করে দেন। কিন্তু আত্মসম্মানবোধসম্পন্না এই নারী ইবনে তাহেরকে এই অর্থ উপহার স্বরূপ দিয়ে বললেন, ছাকীফের কুকুর থেকে মুক্তি পাওয়ার সুসংবাদ শোনানোর জন্য তোমাকে এই অর্থ দিয়ে দিলাম। এর পর আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তার রূপ ও সৌন্দর্যের কথা শুনে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। এই নারী উত্তরে যা লিখলেন, আমিরুল মু'মিনীনের জানা থাকা উচিত যে, পাত্রে কুকুর মুখ দিয়ে ফেলেছে। চিঠি পড়ে আব্দুল মালিক খুব হাসলেন এবং উত্তরে লিখলেন, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا اِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ فَاغْسِلِي الْإِنَاءَ يَحِلُّ الْإِسْتِعْمَالُ. অর্থাৎ- তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ দিবে তখন সে যেন সেটি সাতবার মাটি দ্বারা ধৌত করে নেয়। অতএব তুমিও ধুয়ে নাও, ব্যবহার করার যোগ্য হয়ে যাবে।

হিন্দা আব্দুল মালিকের উত্তর পড়ে লিখলেন: আমিরুল মু'মিনীন! আমি এক শর্তে বিয়েতে রাজি আছি। আমাকে উঠিয়ে নেওয়ার সময় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আসসাকাফী আমার বাহনের লাগাম ধরে মুআররাহ (সিরিয়ার এক নগরীর নাম) থেকে আপনার শহর পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দেবে। তখন সে নগ্ন পায়ে হেঁটে যাবে এবং তার গায়ে তখন পিতৃপুরুষের মূল পোশাক (উটের রাখালদের পোশাক) থাকবে। শর্ত শুনে আব্দুল মালিক খুব হাসলেন এবং শর্ত মঞ্জুর করে হাজ্জাজকে সে অনুযায়ী আদেশ করলেন। হাজ্জাজ বাদশার আদেশের সামনে নিরুপায়। মন না চাইলেও আদেশ পালনার্থে তাকে প্রস্তুত হতে হলো। হিন্দাকে

উঠিয়ে নেওয়ার সময় হলে হাজ্জাজ এসে উপস্থিত হলো এবং হিন্দার উটের লাগাম ধরে নগ্ন পায়ে সামনে চলতে লাগলো। হিন্দার সাথে বান্ধবীরা ও খাদেমারাও ছিলো। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে হিন্দা নিজের সখীদের সঙ্গে কৌতুক এবং বিদ্রূপ করে যাচ্ছিলো। হীফাকে বললো: আরে সখী! বাহনের পর্দা একটু সরাও তো দেখি। এরপর হাজ্জাজকে দেখে অট্টহাসি দিলো।

এভাবে ঠাট্টা ও কৌতুক করতে করতে যখন তারা আব্দুল মালিকের শহরের কাছাকাছি পৌঁছলো তখন সেই জ্ঞানী ও বিচক্ষণ নারী অদ্ভূত ও বিরল এক পদ্ধতিতে নিজের বুদ্ধি দিয়ে হাজ্জাজের মুখে কালি লেপন করে দিলেন। সম্ভবত হাজ্জাজ জীবনে এতো অপদস্থ ও লাঞ্ছিত কখনো হননি। সেই বিদূষী নারী নিঃশব্দে একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে মাটিতে ফেলে দিলেন। হাজ্জাজকে সম্বোধন করে বললেন: "يا جمال" হে উষ্ট্রী চালক! আমার একটি রৌপ্যমুদ্রা পড়ে গেছে। উঠিয়ে দাও তো।

হাজ্জাজ মাটিতে রৌপ্যমুদ্রা খুঁজতে শুরু করলো, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রাই তার চোখে পড়তে লাগলো। তখন সে বললো, এখানে তো দিরহাম নেই, দিনার আছে। হিন্দা বললেন, না ওটা তো দিরহাম ছিলো। হাজ্জাজ আবার বললেন, আরে দিনারই! তখন তিনি রূপকভাবে বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سَقَطَ مِنَّا دِرْهَمٌ فَعَوَّضَنَا اللّٰهُ دِيْنَارًا. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমার থেকে একটি দিরহাম পড়ে গিয়েছে, এর পরিবর্তে তিনি দিনার দান করেছেন। (তোমার মতো অপদস্থ ব্যক্তির পরিবর্তে বাদশাহ আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের মতো ব্যক্তিত্ব-এর সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনের সম্মান অর্জিত হচ্ছে)। হাজ্জাজ পুরো কথাই বুঝতে পারলো। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে চুপ থাকলো। তার মুখে কোনো উত্তর এলো না। এভাবেই সে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে পৌঁছে গেলো।[১৭৫]

**পাদটিকা:** আলহামদুলিল্লাহ, এ পর্যন্ত প্রুফ দেখা মদীনা মুনাওয়ারায় সমাপ্ত হলো, আল্লাহ কবুল করুন।

## ঘটনার আলোকে দাওয়াত ও ফিকির

**বিরল এক মুসাফির :** 'ইচ্‌হরা' লাহোরের নিকটবর্তী একটি মফস্বল শহর। (সে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, যখন ইচ্‌হরার জনবসতি লহোর থেকে একদম ভিন্ন ছিলো এবং মাঝে দীর্ঘ দুরত্বের ক্ষেত ছিলো) কয়েক বছর হলো এই মফস্বল শহরে মাগরিবের নামায পড়া শুরু হয়েছে। একদিন সেই শহরে শীর্ণকায় এক মুসাফিরের আগমন ঘটলো। তিনিও নামাযে অংশ গ্রহণ করলেন। যদিও এই

---

১৭৫. আ'লামুন্ নিসা: ৫/২৫৬-২৫৯, তারীখুল ইসলাম ও ওয়াফায়াতুল মাশাহির ওয়াল আ'লাম, যাহাবী: ৬/১৭১, আল ইসাবাহ: ৫/৩০২, সিয়ারু আ'লামিন্ নুবালা: ৫/৩০২, আল বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়া: ৯/১১০১, আল মুনতাযাম ফী তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম: ৬/৩৩৬।

ব্যক্তির শরীরে কয়েকটি হাড় ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, তবুও তার চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিলো। নামায শেষ হলে সবাই যার যার ঘরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় এক মুসলিম খাবার নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে আগন্তুককে বললো, আপনার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি, অনুগ্রহ পূর্বক খেলে সম্মানিতবোধ করবো।

মুসাফির উত্তর দিলেন, ক্ষমা করবেন। আমার কিছু বাধা-নিষেধ আছে। স্থানীয় মুসলিম বললো, হযরত! চিন্তার কোনো কারণ নেই, সাধারণ রুটি এনেছি। ঝাল কম আর ঘরে তৈরি ঘিয়ে ভাজা।

মুসাফির বললেন, ভাই! আমার উদ্দেশ্য এটা না। স্থানীয় মুসলিম বললো, তাহলে? মুসাফির চুপ হয়ে গেলেন। স্থানীয় মুসলমানগণ তার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর মুসাফির মুখ খুললেন। বললেন, আশা করি, আপনি আমাকে মাফ করবেন। আপনাকে কিছু বলা বা শোনানোর কোনো ইচ্ছা আমার ছিলো না, কিন্তু আপনি খাবার নিয়ে এসেছেন, তাই বাধ্য হয়ে এখন কিছু বলাটা আবশ্যক মনে করছি। আপনি জানেন, শরীয়তে হালাল রিযিক অনুসন্ধান করা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মতোই ফরজ। একটি হাদিস এমনও আছে, যদি মুসলমানের মুখের লোকমা বৈধ না হয় তবে আল্লাহ তার ফরয-নফল কোনো ইবাদতই কবুল করেন না। যেহেতু ইংরেজ উপনিবেশকালে হালাল-হারামের পার্থক্যকরণ উঠে গিয়েছিলো, তাই আমি যতক্ষণ না পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারি, ততক্ষণ আমি কোনো ভাইয়ের কিছু খাই না।

স্থানীয় মুসলিম লোকটি বলতে শুরু করলো, হযরত! আপনি এ কথা বলছেন! আল্লাহ রক্ষা করুন! আমি হারামখোর নই। এটি চুরির খাদ্য নয়। যা আপনার সামনে রাখা হয়েছে তা আমার নিজস্ব উপার্জন। এখানে হাঁটে বড় মেলা হয়ে থাকে, আমি সেখানে ব্যবসা করে থাকি। আপনি ওই ধারণা করবেন না। মুসাফির জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনার ব্যবাসায় কোনো সুদী লেনদেন হয় না?

স্থানীয় মুসলিম উত্তর দিলো, এ তো আমি বলতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রে হাট থেকে আমাদের ঋণ নিতে হয়। তখন নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয়। এভাবে ব্যবসার নানা ক্ষেত্রে আমরাও সুদ উসুল করে থাকি। মুসাফির বললেন, ভালো। আমি ক্ষমা চাচ্ছি, আপনার অযথা কষ্ট হলো। শরীয়তের বিধানমতে যে ব্যবসায়িক মুনাফায় সুদের অংশ থাকে, সেটি হালাল হতে পারে না। হতে পারে, আপনি ব্যাবসায়িক নীতি কিংবা সরকারী রীতিমালার কাছে বাধ্য, কিন্তু আমি বাধ্য নই। অবশ্যই আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে। আপনার মনেও কষ্ট লেগেছে। কিন্তু ইসলামী শিষ্টাচারের উসিলায় আশা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

একথা বলে মুসাফির ব্যক্তি স্থানীয় মুসলিমের দিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে কিবলামুখী হয়ে বসে পড়লেন, যিকিরে মশগুল হয়ে গেলেন। স্থানীয় লোকটি এই শেষোক্ত উত্তরটিতে মারাত্মক পেরেশান ও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লো। সীমাহীন অনুতপ্ত হয়ে পাত্র উঠিয়ে মাথা নিচু করে ফিরে এলো। পড়শি এক লোকের কাছে এসে বললো, মসজিদে এক মুসাফির ব্যক্তি এসেছেন, আপনি গিয়ে তাকে খাবার খাইয়ে আসুন। পড়শি এই লোকটি হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। ডাক্তার সাহেব খানা নিয়ে মসজিদে গেলেন। মুসাফির কোমলভাবে সদাচারী হয়ে ডাক্তার সাহেবের সাথে পরিচিত হলেন। ডাক্তার সাহেব কথা বলতে পছন্দ করতেন। তিনি নিজের গল্প শোনাতে শুরু করে দিলেন। বললেন, হযরত! আমার ওপর আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ, বেতন তো একশ রুপি, সাথে উপরি কামাই হিসেবে প্রতিদিনই কিছু আসে। বড় ছেলেটি কোর্টে কাজ করে, ওর বেতন পচাত্তর রুপি আর সাথে বাড়তি দুই-চার রুপি প্রতিদিনই আনতে পারে। এখানে আমার জমিও আছে, সেখান থেকে প্রতি বছর শষ্য আসে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডাক্তার সাহেবের গল্প শেষ হলে মুসাফির তাকে বড় মুহাব্বতের সাথে বোঝালেন, ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুষ নেওয়া বড় অন্যায়। আর শেষে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে খানা খেতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করলেন। মুসাফিরের কথা এতো বিবেচনাপূর্ণ এবং গাম্ভীর্যময় ছিলো যে, ডাক্তার সাহেবও লজ্জায় মাথা নিচু করে সেখান থেকে চলে এলেন। এদিকে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আগে থেকেই অপেক্ষা করে ছিলেন। উভয়েই অত্যন্ত অনুতাপের সাথে পরস্পরে নিজেদের অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প করছিলেন। এক নেককার মুসলিম ব্যক্তিও সেখানে এসে দু'জনের গল্প শুনলো। মুহূর্তেই ঘটনা পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো।

ডাক্তার সাহেব এবং ব্যবসায়ী ভদ্রলোক মিলে প্রস্তাব করলো, এখন স্থানীয় কোনো জমিদারের ঘর থেকে খাবার পাঠানো দরকার। যাতে সেখানে সুদ-ঘুষের কোনো অভিযোগ আসতে না পারে। তো স্থানীয় এক জমিদারের ঘর থেকে খাবার পাঠানো হলো।

মুসাফির তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কোনো বন্ধকী জমি আছে কি? উত্তরে জমিদার সাহেব হ্যাঁ সূচক বলায় মুসাফির তাকেও ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও জমি বন্ধক রাখে তার উপার্জন কোনোভাবেই হারাম মুক্ত হতে পারে না। এরপর এক আলেম ব্যক্তিকে পাঠানো হলো। তার মাঝে খুঁত বের হলো, তিনি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বোনদের উত্তরাধিকারের সম্পদ থেকে অংশ দেননি। এই অজুহাতে তার খাবারও ফিরিয়ে দিলেন মুসাফির। বললেন, আপনি আপনার বোনদের সম্পত্তি গ্রাস করেছেন। আপনার প্রতিটি লোকমার কমপক্ষে অর্ধাংশ হারাম তো অবশ্যই। মাগরিবের

নামাযের পর থেকে শুরু হয়ে এভাবে রাত নয়টা বেজে গিয়েছিলো। অনেক মুসলমান খাবার নিয়ে মসজিদ থেকে লজ্জিত হয়ে ফিরে এসেছেন।

মুসাফির كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا.-এর কষ্টিপাথর নিয়ে মসজিদে বসে ছিলেন, যেই খাবার নিয়ে আসতো তাকেই এই কুরআনী পাথরে পরীক্ষায় ফেলতেন এবং লজ্জিত অবস্থায় ফেরত পাঠাতেন। গোটা এলাকায় শোরগোল পড়ে গেলো। জায়গায় জায়গায় এ আলোচনাই হচ্ছিলো। স্থানীয় মুসলমানরা ক্ষুধা এবং নিদ্রা ভুলে গেলো। ঘরে-বাজারে-অলিতে গলিতে, বাড়ির আঙ্গিনায় যেখানেই চারজন মানুষ বসতো, সেখানেই এ আলোচনা হচ্ছিলো। যখন কোথাও কোনো মুসলমানকে বলা হতো, তুমি খাবার নিয়ে যাও, তখনই সে কানে হাত দিয়ে ফেলতো। কেউ বলছিলো, আমি ঘুষখোর। কেউ বলছিলো, আমি সুদখোর। কেউ বলছিলো, আমি অল্প হলেও নিই। কেউ বলছিলো, আমি বোনদের অংশ দেই না। কেউ বলছিলো, আমার ছেলের উপার্জনে হারাম আছে। এভাবে ভেতরের সমস্ত দোষ মানুষের মুখে চলে আসছিলো। সেগুলোর মৌখিক ঘোষণা দিচ্ছিলো তারা। ইচ্‌হরাতে হাজারো মুসলমান থাকার পরও একজন মানুষও হালাল খাওয়ার দাবি নিয়ে সামনে আসতে সাহস করছিলো না। গ্রামের মুরুব্বিদের মাথা নত হয়ে গিয়েছিলো। অনুভূতিশীল মুসলমানগণ লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাচ্ছিলেন। হাজারো মুসলমান থাকার পরও এমন একজন নেই, যে এই হালাল খাবার অন্বেষী মেহমানকে একবেলা খাওয়াতে পারে? রাত দশটা বেজে গেলো। কারো ঘর থেকে তখনো খাবার যায় নি। এই মুসাফির কি তাহলে ইচ্‌হরা থেকে না খেয়েই চলে যাবে? নবীজী সা.-এর উম্মত কি হারাম খাবারই খেয়ে চলেছে? সময় যত গড়াচ্ছিলো, মানুষের মনের অস্থিরতা ততই বেড়ে চলছিলো। এভাবে রাত এগারোটা বেজে গেলো।

শেষে উপস্থিত লোকজনের মাঝে আশার বাতি জ্বললো। এক ব্যক্তি বললো, আমি এখনই আমার বোনদের অংশ দিয়ে দিচ্ছি। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো। তার দেখাদেখি দ্বিতীয় আরেকজনও বললো, আমি বন্ধকী জমি ছেড়ে দিচ্ছি। সে ছেড়ে দিলো। তৃতীয় আরেকজন বললো, আজকের পর আমি কখনো সুদ নিবো না। সে সুদী কারবার ত্যাগ করলো। মোটকথা, এভাবে ইচ্‌হরার অগণিত মুসলিম তাওবাহ এবং ইস্তেগফার করলো। কেউ ঘুষ ছেড়ে দিলো, কেউ মিথ্যা সাক্ষ্যদানের পেশা ছেড়ে দিলো। কেউ গান-বাজনা ছেড়ে দিলো। কেউ ইয়াতীমের আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার স্বংকল্প করলো। এরপর তাওবাহকারীর দল মসজিদে মুসাফিরের কাছে এসে বললো, ইচ্‌হরার অগণিত মুসলমান এখন আল্লাহর দরবারে বিনয়াবনত হয়েছে। তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে এবং সংশোধনের স্বংকল্প করে এখন আপনার কাছে এসেছে, এই খাবার পেশ করছে।

মুসাফির ব্যক্তি ঘটনাবলীর বিবরণ শুনে সিজদায় পড়ে গেলেন। তারপর

দস্তরখান বিছানো হলো। মুসাফির কয়েক লোকমাই খেলেন মাত্র, তারপর লোকদের বিদায় দিয়ে দিলেন। ভোরে ইচ্‌হরার অগণিত মানুষজন আল্লাহওয়ালা এই মানুষটিকে এক নযর দেখার জন্য দলে দলে মসজিদে আসতে লাগলো। যার দুনিয়াবিমুখ একটি কাজই ইচ্‌হরার অসংখ্য মুসলমানকে জীবনের সঠিক দিশা দিয়ে প্রকৃত মুসলিমে রূপান্তরিত করেছে। সাক্ষাত করতে এসে তারা অবাক হয়ে জনতে পারলো, মুসাফির তাহাজ্জুদের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেছেন আর ফেরেননি।

আল্লাহওয়ালা কিভাবে সৃষ্টির সংশোধন করে থাকেন– সে শিক্ষা এই ঘটনা থেকে আমরা পাই। এই মুসাফির কোনো উপদেশ দেননি, ওয়াজ করেননি, কোনো বই প্রকাশ করেননি। শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করেননি। তিনি মাগরিব থেকে তাহাজ্জুদ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা সময় মসজিদে কাটিয়েছেন। কিন্তু যখন সেখান থেকে বেরিয়ে গেছেন ততক্ষণে অসংখ্য মুসলিমের সংশোধন হয়ে গিয়েছিলো। অগণিত এতিম নিজের হক বুঝে পেয়েছে। অনেক মেয়ে তার শরয়ী অধিকার ফিরে পেয়েছে। বহু ঘুষখোর ঘুষ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অনেক জুয়াড়ি জুয়া ত্যাগ করেছে। এরা তো সেই সব লোকই ছিলো, যাদের কাছে অগণিত বার কুরআন শরীফ পড়া হয়েছে। কুড়িবার ওয়াজ শুনেছেন। যাদেরকে একাধিকবার পঞ্চায়েতে ডেকে পাওনাদারের পাওনা মেটাতে বলা হয়েছে। কিন্তু এরা অন্যায় থেকে তওবা করেনি। কিন্তু আজ একরাতেই তারা নিজে নিজেই এমন তাওবা করলো, যেন আর তাদের কোনো গুনাহই নেই। আরো বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, সময়টুকু কেবল মাগরিব থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত। এমন আমলওয়ালা ও আল্লাহওয়ালা মানুষের কিঞ্চিত দৃষ্টিপাতে জাতি ও রাষ্ট্রের ভাগ্যই পরিবর্তন হয়ে যায়। আসুন, নিজের ভেতরে সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক উন্নতি সৃষ্টি করি।

## হযরত উমর রা.-এর প্রবর্তিত রীতি

হযরত উমর রা. অসংখ্য রীতির প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন। যেগুলোর মাধ্যমে তিনি উম্মাহর মধ্যে শৃঙ্খলা এনেছিলেন। যেমন জামাতের সাথে তারাবীহ নামাযের ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। নবী কারীম সা.-এর সময় জামাতের সাথে তারাবীহ পড়া হতো না। তারাবীহ সবাই নিজের মতো করে একা পড়ে নিতো। হযরত আবু বকর রা.-এর সময়েও এভাবেই চলছিলো। হযরত উমর রা. নিজ শাসনামলে সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামাতের সাথে তারাবীহ পড়ার পদ্ধতি চালু করেন এবং উম্মাহকে শৃঙ্খলায় আনেন। এভাবে এক মজলিসে এক শব্দে তিন তালাককে তিনি তিন তালাক হিসেবেই সাব্যস্ত করেন এবং এ নিয়ে ধোঁকাবাজির পথ বন্ধ করে দেন। এটিও তিনি উম্মতের শৃঙ্খলাবিধানের জন্যই করেছিলেন। এ ছাড়াও যারা যুদ্ধ করে ইরাক জয় করেছিলো, তিনি সেই

মুজাহিদদের মাঝে ইরাকের ওই জমিনগুলো বণ্টন করেন নি; বরং সেগুলোতে কর আরোপ করেছেন। এটাও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার জন্য করেছিলেন।

## হযরত উসমান রা. কর্তৃক প্রবর্তিত রীতি

হযরত উসমান রা. দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গিয়েছেন। প্রথমত, তিনি জুমআর প্রথম আযানটি বৃদ্ধি করেছেন। দ্বিতীয়ত, কুরআন শরীফকে সরকারী রেকর্ড থেকে বের করে মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন। এবং উম্মাহকে কুরাইশের বাকরীতিতে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। এই দু'টি হযরত উসমান রা.-এর বড় কীর্তি ছিলো। এর মাধ্যমে তিনি উম্মাহর মধ্যে শৃঙ্খলা এনেছেন। নবী কারীম সা.-এর যুগে জুমআর দু'টি আযানই হতো। প্রথম আযানটি হতো যখন ইমাম সাহেব মিম্বরে এসে বসতেন। এই আযান মসজিদের দরজার ছাদে দেওয়াহতো। তারপর খুতবা শেষ হওয়ার পর নামায শুরু হওয়ার পূর্বে ইকামত হতো, এটি দ্বিতীয় আযান ছিলো। হযরত উসমান রা.-এর সময়ে মদীনার জনবসতি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিলো। লোকজন আজানের পর খুতবা চলাকালীন সময়ে আসতেই থাকতো। এ কারণে হযরত উসমান রা. একটি আযান বাড়িয়েছেন, যেন সবাই খুতবা শুরু হওয়ার পূর্বেই মসজিদে পৌঁছতে পারে। সেমতে প্রথম আযানের দশ মিনিট পর উসমান রা. মিম্বরে আসন গ্রহণ করতেন। তারপর দ্বিতীয় আযান ইমামের সামনে দেওয়া হতো। তারপর নামাযের পূর্বে ইকামত হতো। এভাবে জুমআর প্রথম আযানের প্রবর্তনের মাধ্যমে উম্মাহকে সুশৃঙ্খল করেন। এটি উসমান রা.-এর সুন্নাত।

**দ্বিতীয় কাজের বিবরণঃ** নবী কারীম সা.-এর তিরোধানের পর পরই মুসাইলামাতুল কাযযাবের সাথে ইয়ামামার যুদ্ধ হয়। সেখানে উল্লেখযোগ্য অনেক হাফেযে কুরআন শহীদ হন। হযরত উমর রা. শংকা প্রকাশ করে আবু বকর রা.-কে পরামর্শ দেন, কুরআন শরীফকে সরকারী রেকর্ডে সংরক্ষণ করা হোক, যেন কুরআন শরীফের কোনো অংশ হারিয়ে যাওয়ার আশংকা তৈরি না হয়। হযরত উমর রা. এজন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তখন আবু বকর রা. কুরআন শরীফ সরকারী সংরক্ষণে নিয়ে আসেন। তারপর হযরত উসমান রা.-এর রাষ্ট্র পরিচালনার শেষের দিকে দেখা যায়, মানুষ বিভিন্নভাবে কুরআন লিখে রেখেছে। কেউ অবতীর্ণ হওয়ার বিন্যাসানুসারে, কেউ লওহে মাহফুযের বিন্যাস অনুযায়ী। এতে করে বিভাজন বেড়ে যাচ্ছিলো। যখন হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. আরমেনিয়া এবং আযারবাঈজান যুদ্ধ থেকে ফিরলেন, তখন তিনি হযরত উসমান রা.-কে এ বিষয়ে অবগত করলেন এবং বললেন, এভাবে চলতে থাকলে কুরআনের ব্যাপারে মতপার্থক্য তৈরি হয়ে যাবে, আপনি এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিন। উসমান রা. হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. কে ডেকে পাঠালেন এবং তিন-চারজনের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে

তাদেরকে কুরআন সংকলনের আদেশ দিলেন।

কমিটি কুরআনের পাঁচটি কপি তৈরি করেন। এক কপি হযরত উসমান রা. নিজের কাছে মদীনায় রেখে বাকিগুলো বিভিন্ন শহরে পাঠিয়ে দেন। আর এমর্মে আদেশ জারি করলেন, এখন মুসলমানরা এই কুরআন থেকে কপি করে নেবে। আরও নির্দেশ দিলেন, মানুষ বিভিন্নভাবে যে কুরআন লিখে রেখেছে, তা যেন রাষ্ট্রীয় হেফাযতে তুলে দেওয়া হয়। এভাবে হযরত উসমান রা. সবাইকে এই কুরআনের ওপর ঐক্যবদ্ধ করেন।

মোটকথা, উসমান রা. এখানে দুইটি কাজ করেছেন। এক. মানুষকে বিদ্যমান কুরআনের ওপর ঐক্যবদ্ধ করেন। একারণেই তাঁকে جامع الناس على هذا القران বলা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে جامع القران বলা হয়।

দুই: হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর যুগে যে কুরআন শরীফ সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে ছিলো সেটিকে সেখান থেকে বের করে জনসাধারণের হাতে তুলে দেন।[১৭৬] যে কারণে আজও কুরআন দুনিয়ার কোনো ইসলামী রাষ্ট্রীয় রেকর্ডে সংরক্ষিত নেই। সৌদি সরকার কুরআন ছাপাচ্ছে, তাফসীর ছাপাচ্ছে। এটি তাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু মূলত সৌদি সরকারসহ অন্য কোনো ইসলামী রাষ্ট্রই কুরআনের সংরক্ষক নয়। কুরআন কারীমকে হযরত উসমান রা. সরকারী আওতা থেকে মুক্ত করে মুসলিম জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। যেমনটি নবী কারীম সা. করেছিলেন। আজও সমগ্র মুসলিম জাতি কুরআন শরীফ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে রেখেছে। বিশেষ কোনো ইসলামী রাষ্ট্র এর জিম্মাদার নয়। এটি হযরত উসমান রা.-এর দ্বিতীয় বড় অবদান।

## হযরত আলী রা. কর্তৃক প্রবর্তিত রীতি

হযরত আলী রা. রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব আসার পরপরই মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম যুদ্ধ হযরত আয়েশা রা.-এর সঙ্গে হয়। যেটিতে হযরত আয়েশা রা. উটের পিঠে বসে ছিলেন। সে কারণেই যুদ্ধটিকে 'জঙ্গে জামাল' বলে। এই যুদ্ধে হযরত আয়েশা রা.-এর সৈনিকরা পরাজয় বরণ করে। হযরত আলী রা.-এর বাহিনী গনীমতের মাল জমা করেন এবং অনেকে বন্দী হন। তখন হযরত আলী রা. এই বক্তৃতা দিলেন, যদি গনীমতের সম্পদ বণ্টন করতেই হয় তবে বন্দীদের দাস দাসী বানাতে হবে। বলো, তোমাদের মধ্যে কে এমন দুর্ভাগা আছো, যে মা আয়েশা রা.-কে দাসী বানাবে? ব্যস, পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। আর এই বিষয়ে মাসআলা চূড়ান্ত হয়ে গেলো যে, যদি মুসলমানদের দুই দল পরস্পর লড়াই করে তাহলে কোনো সম্পদ গনীমত হবে না এবং কোনো বন্দীকে দাস-দাসীও বানানো হবে না। এটি হযরত আলী রা.-এর সুন্নত। (তুহফাতুল কারী, মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী)

---

১৭৬. কুরআন সংকলনের ইতিহাস পাঠে তুহফাতুল আলমাঈ: ১/৬১-৬৬ দেখুন।

## নির্বাচিত কবিতামালা

আমার হৃদয়ের ছাই ঘেটো না
মুচকি হেসে এর আগুন আরও বাড়িয়ে দিও না
এই প্রদীপ তো প্রদীপই
তোমার হাত না আবার জ্বালিয়ে দাও

***

হেথা মানুষের দিবা-রজনীর বাস
কোনো স্বার্থের অবগুণ্ঠনে আবৃত
তোমার এই দৃষ্টির স্বচ্ছতা
হৃদয়ের গোপন কথা যেন না বলে দেয়

***

রাত্রি যায় অপেক্ষার অস্থির প্রহর গুণে
জানতে চেয়ো না, ভোর এলো কি করে
কখনো একটি প্রদীপ নিভিয়েছি
কখনো আরেকটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছি

***

কখনো 'আহ' বেরিয়ে এসেছে ঠোঁট চিরে
কখনো আঁখিদ্বয় সিক্ত হয়েছে অশ্রুতে
এ তোমার বেদনার প্রদীপ
কখনো নিভে যায়, কখনো জ্বলে ওঠে

***

নতুন দিগন্তের নতুন স্বপ্ন
নতুন মৌসুমের গোলাপ
এ ভালোবাসার প্রদীপ
একে ঘৃণার ফুৎকারে নিভিয়ে দিও না

***

কেনো যে আমার তকদিরে আপনি হাত মেলেন
কিছু প্রদীপ এভাবেই নিভে যায়, জ্বলে না

****

আমাকে আমার আমার মত থাকতে দাও
তোমার কী ভরসা আছে খোঁজো
তোমার এ করুণা বড় সংক্ষিপ্ত
আমার ব্যথা আরো বাড়িয়ে দিও না

***

ভালোবাসার পরিচ্ছদে সৌন্দর্য কখনো ঢাকাও পড়ে
সজ্জাহীন আমি যেদিকে যাই, তুমিও চলো আমার সাথে
আবরণহীন চাঁদের দৃষ্টিতে কোনো প্রভাব নেই এমন তো নয়
তার দিকে এত তীব্র আবেগ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকো না

## নবী কারীম সা.-এর ভালোবাসা

আরশ থেকে ভূ-শয্যা অব্ধি, স্বর্ণমুদ্রা-রৌপ্যমুদ্রা সব
সমুদ্রও মণিমুক্তো হয়েছে, পরশপাথর হয়েছে পর্বত
এই সমস্ত গাছ লা'ল ও যমরদ পাথর
এক সাথে দাঁড়িয়ে আছেন সাইয়েদুল আবরার
তারপর ইউনুসকে প্রশ্ন করা হলো, কী চাই?
'তাঁর জুতাজোড়া হাতে পেলে উঠিয়ে রাখতাম মাথায়।'

## সম্মানিত পিতার স্মরণে

জীবনভর থাকবে তোমায় স্মরণ মাওলানা উমর
দাওয়াত ও খেদমতে ছিলো উৎসর্গিত ছিলো যার জীবন
আমরা ভুলতে পারি না তাঁর কুরআনী
দুনিয়ায় মানুষের আকৃতিতে তিনি ছিলেন এক ফেরেশতা

***

ভালোবাসার জন্য বিশেষ কিছু হৃদয় থাকে
এ তো সেই সংগীত যা সব তালে গাওয়া যায় না
নিজে নিজের খোঁজে, নিজের প্রতিভার কথা
আমরা তোমাকে সারা পৃথিবীর মধ্যে বেছে নিয়েছি

## ক্যান্সারের বহু পরীক্ষিত চিকিৎসা

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ. আয়াতখানি ২০২২ বার পড়ে অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ফুঁ দিতে হবে। পানি এবং অষুধের মধ্যে ফুঁ দিয়ে সেটি সেবন করাবে। ইনশাআল্লাহ অনেক উপকারে আসবে। শুরুতে এবং শেষে ১১বার করে দরুদ শরীফ পড়ে নেবে।

## ছয় নেয়ামত

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, হযরত উসমান গণী রা. হুযুর সা.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নবীজী সা.-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআন কারীমের আয়াত لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (আকাশ ও ভূপৃষ্ঠের সমস্ত চাবি তাঁর হাতে) এর উদ্দেশ্য কী? নবীজী সা. বললেন: (আকাশ ও ভূপৃষ্ঠের সমস্ত চাবি দ্বারা) এই বাক্যগুলো উদ্দেশ্য।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُوَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَلْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

হে উসমান! যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই কালিমাগুলো দশবার পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ছয়টি নেয়ামত দান করবেন,

১. শয়তান ও তার শাগরেগদদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবেন।
২. তাকে সওয়াব ও প্রতিদানের বড় ভাণ্ডার দেওয়া হবে।
৩. ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট হুরদের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন।
৪. তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
৫. সে জান্নাতে হযরত ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে থাকবে।
৬. বারোজন ফেরেশতা তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শোনাতে থাকবে এবং সম্মানের সাথে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।[১৭৭]

## দীনদার হওয়ার সহজ উপায়

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ করার পর বলতেন, আমি একটি ওয়াদা নিতে চাই। ওয়াদাটি হলো, প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হয়েছি এই ভেবে কায়মনোবাক্যে এই দোয়া করবে, হে আল্লাহ! আমি আপনার দীনের ওপর চলতে চাই। অতএব আমাকে আপন বানিয়ে নিন। আপনার নৈকট্য দান করুন। যদি কেউ এমনভাবে চল্লিশ দিন করতে পারে তবে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি আল্লাহ তাকে দীনের পথে চলার তাওফিক অবশ্যই দান করবেন।

## হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষিত অজিফা

১. সমস্ত প্রয়োজনের জন্য প্রতি ফরয নামাযের পর ১১বার দরূদ শরীফ পড়ে ১০১ বার اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ পড়বে, তারপর আবার ১১বার দরূদ শরীফ পড়বে।

২. সন্তানদের দীনের পথে পরিচালনার জন্য দিনে ৩১৩বার رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا. পড়বে।

## সবধরনের সমস্যার জন্য পড়বে

সব ধরনের অসুস্থতা, বিপদ-আপদ, ব্যাবসায়িক ঋণ ও শত্রু থেকে বাঁচা ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় এই আয়াত সকালে পাঠ করবে, তাহলে কখনো কখনো সন্ধ্যার আগেই ফল পেয়ে যাবে। আর কখনো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় একটু অপেক্ষা করতে হতে পারে। তবে এর প্রভাব আলহামদুলিল্লাহ সময়মতই দৃশ্যমান হবে। দোয়ার সময় কেবল আরবিটাই পড়বে, অর্থ সাথে দেয়ার উদ্দেশ্যে হলো, যেন পাঠক বুঝতে পারে সে কী পড়ছে।

---

১৭৭. রুহুল মায়ানী: ২৪/২২।

## আয়াতে তাওহিদ

١. وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ . لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ.

'আর তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি বড় করুণাময় ও অতি দয়াশীল।' (সূরা বাকারা : ১৬৩)

٢. اَللّٰهُ لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○

'আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ব্যবস্থাপক। তাঁকে তন্দ্রা-নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আসমান যমীনে যা আছে সব তাঁর। কে আছে যে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারবে? তিনি তাদের সামনের-পেছনের সবকিছু জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্যও আয়ত্ব করতে পারে না, তিনি যতটুকু চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও ভূখণ্ডকে ঘিরে আছে, এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না।'

(সূরা বাকারা)

٣. الم ○ اللّٰه لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ○ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ○ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّٰه لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ○

'আলিফ লাম মিম। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আপনার ওপর যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছেন এই অবস্থায় যে, এই কিতাব পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করছে। তিনিই তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন এর আগে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয় যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধগ্রহণকারী।

(সূরা আলে ইমরান : ১-৪)

٤. إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء ○ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ سورة ال عمران

'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে আসমান-যমীনে কোনোকিছু গোপন থাকে না। তিনিই তোমাদের আকৃতি দান করেন যেভাবে ইচ্ছা। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (সূরা আলে ইমরান।

٥. شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ ○

'আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছে ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণ, ন্যায় ও ইনসাফের ধারক হয়ে- তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম কেবল ইসলামই।

٦. اللهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً. سورة النساء

'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনিই তোমাদের কেয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে?'

٧. ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ○

'তিনি তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সবকিছুর স্রষ্টা তিনিই। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত করো, তিনি সব বিষয়ের কর্মবিধায়ক।' (সূরা আনআম)

٨. اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ○

'আপনার কাছে যে ওহি প্রেরণ করা হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করুন। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি মুশরিকদের উপেক্ষা করুন।' (সূরা আনআম)

٩. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

'আপনি বলুন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর

বার্তাবাহক। আকাশ-মাটির রাজত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। জীবনদানকারী তিনিই, মৃত্যুদানকারীও তিনি। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আনো, যিনি আল্লাহ ও তাঁর সকল কালিমায় বিশ্বাসী। তাঁর অনুসরণ করো; যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো।' (সূরা আ'রাফ)

١٠. وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

'আর তাদের কেবল এক উপাস্যের ইবাদত করতে বলা হয়েছে, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাদের সমস্ত অংশীদার সাব্যস্তকরণ থেকে তিনি পবিত্র।' (সূরা তাওবা)

١١. فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

'যদি তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তবে আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আমি তাঁর ওপর ভরসা করেছি, তিনি আরশের মহান অধিপতি।'

(সূরা তওবাহ, আয়াত ১২৯)

١٢. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

'যখন সে পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে গেলো, তখন বললো- আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম যে, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যার ওপর বনী ইসরাঈল বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আমি মুসলিমদের দলভুক্ত।' (সূরা ইউনুস)

١٣. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ○

'যদি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখো, আল্লাহর জ্ঞান নিয়েই এটা অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তোমরা কি মুসলিম?' (সূরা হুদ)

١٤. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَـنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ○

'আর তারা রহমানকে অস্বীকার করে। আপনি বলুন, তিনি আমার

রব, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আমি তাঁর ওপর ভরসা রেখেছি, তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (সূরা রা'দ)

١٥. يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ ○

'তিনি রূহ নিজের আদেশসহ ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করেন নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার ওপর, এই মর্মে যে, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তোমরা আমাকে ভয় করো।' (সূরা নাহল)

١٦. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ○ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى ○

'যদি তুমি সশব্দে কথা বলো, তবে গোপন ও লুকায়িত সব তিনি জানেন। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।'

(সূরা ত্বহা)

١٧. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى○ إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ○

"আর আমি তোমাকে নির্বাচন করেছি, অতএব তুমি তা মনযোগ দিয়ে শোনো যা তোমাকে বলা হচ্ছে। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আমার স্মরণার্থে তুমি নামায কায়েম করো।'

(সূরা ত্বহা)

١٨. إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ○

'নিশ্চয় তোমাদের রব এক উপাস্য, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি সবকিছুকে নিজের জ্ঞান দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।' (সূরা ত্বহা)

١٩. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ○

'আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার কাছে এ বার্তা দিয়েছি যে, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, অতএব তোমরা আমার ইবাদত করো।' (সূরা আম্বিয়া)

٢٠. وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○

"আর মাছওয়ালা যখন ক্রোধান্বিত হয়ে চলে গেলো, সে মনে

করেছিলো যে, আমি তাঁকে পাকড়াও করবো না, পরে সে আঁধারে ডাকলো যে, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আপনি পবিত্র, আমি তো অপরাধী ছিলাম।' (সূরা আম্বিয়া)

٢١. فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ○

'আল্লাহ তাআলাই মহান, যিনি প্রকৃত অধিপতি, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি আরশের সম্মানিত অধিপতি।' (সূরা মু'মিনুন)

٢٢. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ○ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

'তিনি জানেন যা তোমরা গোপন করো আর প্রকাশ করো। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি আরশের মহান অধিপতি।' (সূরা নামল)

٢٣. وَهُوَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ○

'আর তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, ইহকাল-পরকালে শুধু তাঁরই স্তুতি, তাঁরই শাসন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (সূরা কাছাছ)

٢٤. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ○

'আর তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সবকিছু ধ্বংসশীল, তিনি ছাড়া। রাজত্ব শুধু তারই এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (সূরা কাছাছ)

٢٥. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ○

'হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্বীকার করো, আল্লাহ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে যে আসমান-যমিন থেকে তোমাদের রিযিক দান করে? তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় বিপথে চালিত হচ্ছো। (সূরা ফাত্বির)

٢٦. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ ○

'তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তারা তখন অহংকার প্রদর্শন করে।' (সূরা ছাফফাত)

২৭. ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ○

'তিনি তোমাদের রব আল্লাহ, রাজত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, অতএব তোমরা কোন দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো?'

(সূরা যুমার)

২৮. حم ○ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ○

'হা-মিম। প্রবল পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ গ্রন্থ। যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন, তাওবা কবুল করেন, ক্ষমতাবান, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তনস্থল।'

(সূরা গাফের : ১-৩)

২৯. ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ○

'তিনি আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, অতএব তোমরা কোথায় বিপথে চালিত হচ্ছো?

(সূরা গাফের)

৩০. هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তোমরা দীনকে তাঁর তরে একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাকো। সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর।' (সূরা গাফের)

৩১. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ○ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ○

'আসমান-যমীন এবং তার মধ্যবর্তী স্থানের রব, যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যুদান করেন। তিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক।' (সূরা দুখান)

৩২. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ○

'অতএব জেনে রাখুন, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আপনার এবং মুমিন নর-নারীদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আল্লাহ তোমাদের শয়নস্থল ও প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।'

(সূরা মুহাম্মাদ)

٣٣. هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○

'তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের সর্বজ্ঞানী, তিনি করুণাময়, দয়াশীল।' (সূরা হাশর)

٣٤. هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

'তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই মালিক, তিনিই পবিত্র, শান্তিদানকারী, নিরাপত্তাদাতা, তত্ত্বাবধায়ক, পরাক্রমশালী, মহিমাময়। তাদের সব শরীক স্থাপন করা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনি আল্লাহ, স্রষ্টা, যথাযথ সৃষ্টিকারী, আকৃতি দানকারী, তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ, আসমান যমীনের সব কিছু তাঁর গুণগান পাঠ করে, তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।' (সূরা হাশর)

٣٥. اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

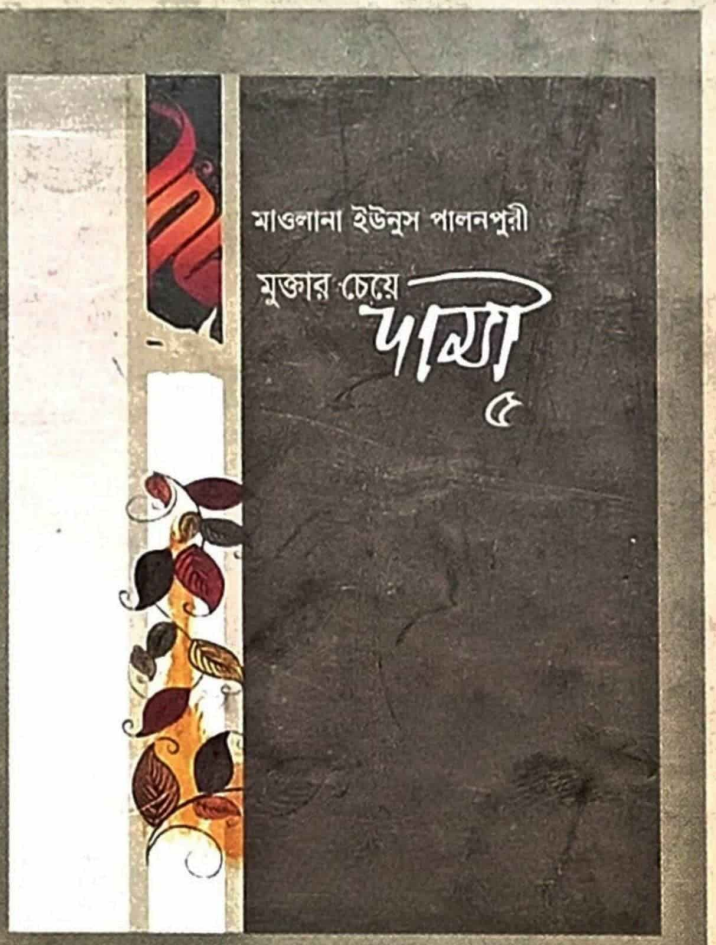
'আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যেন আল্লাহর ওপরেই মু'মিনরা ভরসা রাখে।' (সূরা তাগাবুন)

٣٦. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ○

'পূর্ব-পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, অতএব কর্মবিধায়ক হিসেবে তুমি তাঁকেই গ্রহণ করো।' (সূরা মুয্যাম্মিল)

**আলহামদুলিল্লাহ!**

**॥ ৯ম ও ১০ম খণ্ড সমাপ্ত ॥**




আকিক পাবলিকেশন্স

শুনি অসীমের আহ্বান

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮৯৮৫২, ০১৭২৪৬০৪১৩৬
E-mail : akikpublication@gmail.com